২য় খণ্ড

ড. রাগিব সারজানি

ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস



অনুবাদ

সাদিক ফারহান

সম্পাদনা

আবু মুসআব ওসমান

ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস

ড. রাগিব সারজানি

ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস

২য় খণ্ড

মওদুদ বিন তুনতেকিন থেকে ইমাদুদ্দিন জিনকি

অনুবাদ

সাদিক ফারহান

সম্পাদনা

আবু মুসআব ওসমান

মাকতাবাতুল হাসান

ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস (২য় খণ্ড)
মূল গ্রন্থ : কিস্‌সাতুল হুরূবিস সালীবিয়্যাহ (قصة الحروب الصليبية)
প্রথম প্রকাশ : জিলকদ-১৪৪১/জুলাই-২০২০
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জিলকদ-১৪৪১/জুলাই-২০২০

প্রকাশক
মাকতাবাতুল হাসান
৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০
মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা
অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com - niyamahshop.com - wafilife.com
প্রচ্ছদ : গ্রাফিক্স টিম মাকতাবাতুল হাসান
নামলিপি : যামীম কেফায়েত
ISBN : 978-984-8012-53-6

মূল্য : ৭০০/- টাকা মাত্র

Crusade Juddher Itihash [2nd part]
by Dr. Ragheb Sergani
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail: rakib1203@gmail.com Facebook/maktabahasan

।। অর্পণ ।।

পরমপ্রিয় উসতাদ
মাওলানা জাফর আহমাদ সাহেব হাফিজাহুল্লাহ
—এর দস্ত মুবারকে
কিতাবের কালো হরফ ছাপিয়ে,
যিনি হৃদয়ের শিক্ষক।

—সাদিক ফারহান

অনুবাদকের কথা

ইতিহাসের গলি-ঘুপচিঘোরা বোদ্ধা পাঠক নয় কেবল, সাধারণ ঈমানদার মুসলিম মাত্রেরই জানা আছে ক্রুসেডের কথা; আবহমানকাল ধরে চলে আসা এক রক্তপিচ্ছিল অতীতের কথা। ধর্মীয় চেতনা ও বিরোধকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া এ যুদ্ধ সময়ের অতিবাহনে পরিণত হয় সাম্রাজ্য দখলের অতৃপ্ত নেশায়। এরপর ইউরোপিয়ানদের চার্চকেন্দ্রিক ঘৃণ্য রাজনৈতিক খেল হয়ে ওঠে এই ধর্মধর্ম লড়াই। যেখানে সকল শিরক, বাতিল ও অপশক্তির একমাত্র বিরোধীদল হিসেবে সটান হয়ে রয় ইসলাম। বহু দিকপাল ও জগৎজয়ীর মেধা, বুদ্ধি ও রক্তের উপর দিয়ে, মুসলমানদের শিবিরে বারবার লাল হয়ে ওঠে বিজয়ের পতাকা।

কেবল সাধারণ পাঠের কোনো সাবলীল বিলাস নয়, বরং ক্রুসেড মানে আগামীর পথনির্মাণের অনন্য মানচিত্র; দীর্ঘ অতীতের ভয়ংকর এবং সর্বমুখী আগ্রাসনের এপিঠ-ওপিঠ খতিয়ান। কালের দাবি ও সময়ের যৌক্তিকতায় বর্তমানে যা রক্তাক্ত ও বিক্ষত উম্মাহর বিজয়মন্ত্রের অন্যতম উপাদেয়। রাজনীতি, অর্থনীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি, সমরনীতি ও আদর্শ; সবক্ষেত্রেই নব্যক্রুসেডীয় আগ্রাসন রোধে 'ফেলে আসা' এ রোমহর্ষক ইতিহাস হতে পারে আমাদের সময় বদলের ধারালো হাতিয়ার। এর পাঠ থেকে উদাসীন হলে; ভ্রান্ত, বিচ্যুত বা বিস্মৃত হলে—ধেয়ে আসা ঢেউয়ের শক্ত আঘাতে আমাদের হারিয়ে যেতে হবে বাতিলের অতলে; বা পুড়ে ছাই হতে হবে সর্বগ্রাসী পশ্চিমা অনলে।

ইতিহাসের অমোঘ ও অনস্বীকার্য এক বাস্তবতা হলো, নানান শিরোনাম সাঁটানো কথিত আধুনিক ও যুগোপযোগী পাশ্চাত্য সভ্যতা, বিশ্ববাসীর জন্য আজ অবধি সত্যিকারার্থে কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনি। কারণ তাদের মূল বিশ্বাস ও ধারণা হলো, যেকোনো মূল্যে মানবজাতিকে তাদের প্রকৃত প্রভু ও প্রভাবক থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। আর সৃষ্টিকে স্রষ্টা থেকে দূরে সরানোর অর্থ অনেকটা গাছ রেখে গাছের মূল শেকড় কেটে ফেলার মতো। মহান প্রভুর দাসত্ব ছেড়ে পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্রের দাস হয়ে

ওঠার নিকৃষ্ট আহ্বানে, তারা মূলত শতাব্দীকাল ধরে এটাই করে আসছে। অতীতের সেই ভয়ংকর ও আত্মঘাতী আদর্শকেই, নতুন নামে, আধুনিক মোড়কে ও আকর্ষণীয় শিরোনামে, বুদ্ধিবৃত্তিক পরিভাষায় ফেরি করে হাজির হয়েছে নব্য ক্রুসেডারের দল। পক্ষান্তরে সূচনার উষাকাল থেকেই ইসলামি সভ্যতার মূল লক্ষ্য হলো, মানবজাতিকে তাগুতের দাসত্ব হতে বের করে এক আল্লাহর দাসত্বে ফিরিয়ে আনা। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে চৌদ্দশ বছরের ইতিহাসে ইসলাম এর অসংখ্য প্রমাণ ও কর্ম, পৃথিবীবাসীর সামনে উপস্থাপন করেছে।

সুতরাং দুটি বিপরীতমুখী সভ্যতা, ধর্ম, সংস্কৃতি বা মতবাদ কখনোই একসাথে চলতে পারে না। আবশ্যিকভাবেই তাই যেকোনো একটিকে অপরটির উপর বিজয়ী হতে হয়েছে। বাহু ও বুদ্ধির বলে ধরাশায়ী করতে হয়েছে অপরপক্ষের অস্ত্র ও চেতনার ধার। বলাবাহুল্য—সভ্যতার এ আমৃত্যু লড়াইয়ে ইসলামকে বিজয়ের আসনে বসাতেই আয়োজিত হয়েছিল আমাদের অতীতের পাঠশালা। যুগের ক্রুসেডারদের শক্ত মোকাবিলা করে, আজও তাই আমাদেরকেই এগিয়ে যেতে হবে সর্বাগ্রে ও সম্মুখসমরে। কেননা, ইতিহাস সাক্ষী, পার্থিব জীবন-জগতের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিগত সময়ে কেবল মুসলমানদের হাতেই নিরাপদ ছিল। যখনই ক্ষমতা অন্যদের হাতে চলে গেছে, ভূরাজনৈতিক শঠতা ও চক্রান্তের ফাঁদে যখনই তারা নিয়ন্ত্রণের লাগাম তুলে নিয়েছে, তখন থেকেই তারা ছিল অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মূল কারিগর।

সন্দেহ নেই, মুসলিম উম্মাহ আজ এক মহাক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। জাগরণমুখী এ জাতিকে অবদমিত করে রাখার লক্ষ্যে পশ্চিমাবিশ্ব মুসলমানদের পায়ে পায়ে পরিয়ে দিয়েছে ষড়যন্ত্রের শেকল। চতুষ্পার্শ্ব থেকে জাপটে ধরা এ লাগাম ছাড়িয়ে, স্বমহিমায় জ্বলে ওঠা নিতান্ত সহজ কাজ নয়। বরং মুক্তি পেতে হলে হাঁটতে হবে যুক্তি ও শক্তির পথে। শত্রুকে ময়দানে ছেড়ে দিয়ে অদৃশ্য মদদের লোভে আকাশপানে চেয়ে থেকে লাভ হবে না কোনো। বরং তাদেরকে পরাজিত করতে চোখের সামনে মেলে ধরতে হবে অতীতের জানালা। পাথর ও মুক্তোকে আলাদা করে মগজে বসাতে হবে সময়ের রূপরেখা। সর্বোপরি 'ইদাদ' ও 'ইসতিদাদ' যথাযথ হলেই তবে, আমাদের ঘরে উঠবে বিজয়ের সোনালি ফসল।

ধর্মের সাথে ধর্মের এ সংঘাত আজকের নতুন কিছু নয়। সাম্রাজ্য দখলের ঘৃণ্য লালসার রক্তস্নাত এ বৈরিতা যুগ যুগ ধরে চলে আসা এক চরম বাস্তবতা। যুগান্তরের চাহিদাকে মাথায় রেখে, মুক্তি ও বিজয়ের আশায়, নবি-সাহাবার বাতানো পথে চূড়ান্ত সাফল্যের প্রেরণায়, অস্ত্র হাতে চোখ-কান খোলা রেখে লড়ে গেছেন ইতিহাস-বিজয়ী আমাদের সাহসী বীর সৈনিকেরা। কাজেই হতাশা নয় কোনো, বর্তমানের 'মহাক্রান্তিকাল' অতিক্রম করে আমাদেরকেও ঘুরে দাঁড়াতে হবে শীঘ্রই; ঠিক যেমনিভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন আমাদের পূর্বসূরি শার্দূলেরা। তবে তারই জরুরতে জানতে হবে, 'যাদের নিয়ে গর্ব মোদের' তারা কীভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল সমসাময়িক ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে; মুসলমানদের সম্ভ্রম রক্ষার সংগ্রামে কী ঘটেছিল তাদের সাথে, কতটা তার সোনা কতখানি খাদ, কোথায় ছিল সাফল্য আর কোথায় পাতা ছিল ভয়ংকর ফাঁদ। জয়-পরাজয়, শক্তি ও দুর্বলতার সে-সব দুর্দান্ত সময়ের সবটুকু ধারণ করেই, দুর্গম আগামীর জন্য প্রস্তুত হতে হবে আমাদের।

অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হিসেবে সুদীর্ঘকালের ক্রুসেড নিয়ে যুগে যুগে কলম ধরেছেন বিভিন্ন ঐতিহাসিক, ঔপন্যাসিক এবং শব্দশ্রমিকেরা। যুগমানসের দাবি ও উপযোগিতাকে সামনে রেখে, নতুনভাবে সাজিয়েছেন এর ভাষাগত শব্দবন্ধন। উম্মাহর চিরজাগরণী সুর ও সার হিসেবে, কোনো কালেই ক্রুসেডেতিহাসের আবেদন রুক্ষ হয়নি। ফলত সময়ের পালাবদলে এবং লেখকের হাতবদলে ক্রুসেডের রচনা ছিল একটি যৌক্তিক ও চলমান তৎপরতা।

সেই ধারাবাহিকতায় বর্তমান আরববিশ্বের জনপ্রিয় ঐতিহাসিক, লেখক, চিন্তক ও গবেষক ড. রাগিব সারজানি যুগ-প্রয়োজনীয়তার অনুভবে চুলচেরা বিশ্লেষণে তুলে এনেছেন ক্রুসেডের বিস্তারিত বয়ান। স্বভাবজাত রীতি অনুযায়ী তিনি শুধু ইতিহাসের তরতরে বিবরণ দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং প্রতিটি ঘটনা ও সিদ্ধান্তকে দাঁড় করিয়েছেন বিবেকের কাঠগড়ায়; পয়েন্টে পয়েন্টে তুলে এনেছেন একাধারে তার সার-সর, গাদ ও খাদের সবটুকু। অতীতের স্পষ্ট ইতিহাস এবং ভবিষ্যতের স্বচ্ছ ধারণাকে সামনে রেখে, যেখানে পাঠকের জন্য থাকছে সঠিক ও সরল বর্তমান গ্রহণের সুবর্ণ সুযোগ।

বইটি আমার আনুষ্ঠানিক অনুবাদের প্রথম পরিবেশনা বলা যেতে পারে। আমি রাব্বুল আলামিনের প্রতি কৃতজ্ঞ এ-জন্যও যে, বইটির যৌথ অনুবাদে আমি সহযাত্রী ও দিকনির্দেশক হিসেবে পেয়েছি বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য পরিচিত, সমাদৃত এবং স্বীকৃত লেখক, অনুবাদক ও সম্পাদক উসতাদ আবু মুসআব ওসমান সাহেবকে। তিনি প্রথম খণ্ডের অনুবাদের পাশাপাশি দ্বিতীয় খণ্ডেরও মূল কার্যকরী সম্পাদনা, সংশোধন ও সংযোজন করে দিয়েছেন। তাঁর কৌশলী হাতের যত্ন পেয়ে আমার মতো নবীনের অনুবাদও পাঠকের জন্য দারুণ সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে বলেই দৃঢ় বিশ্বাস রাখছি।

ইতিহাসবিষয়ক পাঠকনন্দিত প্রকাশনা হিসেবে মাকতাবাতুল হাসানের পরিচয় ও প্রসিদ্ধি নতুন করে জানানোর নয়। পাঠকের টেবিলে নির্ভুল ও সর্বোচ্চ সুন্দর কাজ তুলে দিতে তাদের চিন্তা, পরিকল্পনা, শ্রম ও চেষ্টা বরাবরের মতোই মুগ্ধকর। ক্রুসেড সিরিজের কাজে অংশীদার হতে পেরে কাছ থেকেই তাদের দরদ ও দৌড় অনুভব করতে পেরেছি। ভালো ও উত্তমের সবটুকুর জন্য তাই মাকতাবাতুল হাসান পরিবারের প্রতি প্রেম নিবেদন করছি। আল্লাহ বইটিকে তার উদ্দেশ্যপূরণে সফল করুন, সংশ্লিষ্টদের সকল মেহনত ও প্রার্থনা কবুল করুন!

—সাদিক ফারহান

২৯ শাওয়াল, ১৪৪১ হিজরি

বিষয় সূচি

বিষয় পৃষ্ঠা

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ইমাদুদ্দিন জিনকির বংশপরিচয়-১২৫

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ইমাদুদ্দিন জিনকি যেভাবে সর্বোচ্চ শিখরে-১৪৩

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ইমাদুদ্দিন জিনকি ও উম্মাহর বিনির্মাণ-১৯১

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ইমাদুদ্দিন জিনকি : ঐক্য ও জিহাদ-২০৩

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ইমাদুদ্দিন জিনকি ও ক্রুসেড রাজ্য এডেসা বিজয়-৩২৯

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

গল্পের সমাপ্তি-৩৭১

বিংশ পরিচ্ছেদ
শেষ দৃশ্যের পরের কথা-৩৮১

উপসংহার-৪০১

পরিশিষ্ট

ইমাদুদ্দিন জিনকি-পরবর্তী সময়ের ইসলাম-খ্রিষ্টবাদ সংঘাতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ-৪০৩

মানচিত্র সূচি

ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মওদুদ বিন তুনতেকিন রহ.-এর ইতিহাস

মওদুদ বিন তুনতেকিন রহ.-কে ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাসের প্রথম ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামি নেতা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তিনি জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহকে জীবনের সুস্পষ্ট নীতি এবং ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে জীবনের কৌশলগত লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। জিহাদ ও ক্রুসেডারদের দমন-চিন্তা কখনোই তার চিন্তাজগৎ থেকে অদৃশ্য হয়নি। তার পূর্বে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যারা সংগ্রামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, বিশেষ কোনো পরিস্থিতির দাবিতে, সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অথবা আপন ভূখণ্ডে ক্রুসেডারদের আগ্রাসন প্রতিহত করতে এক-দুইবার জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন। কেবল বিশেষ পরিস্থিতির দিকে না তাকিয়ে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদকে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করার নীতি প্রথমবারের মতো আমরা মওদুদ বিন তুনতেকিনের শাসনামলেই প্রত্যক্ষ করেছি। অথচ তিনি ছিলেন ক্রুসেড রাজ্যগুলো থেকে তুলনামূলক দূরে অবস্থিত মসুলের শাসক। এতটা দূরে থেকেও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে তার অব্যাহত লড়াইয়ের চেতনা এ কথাই প্রমাণ করে যে, শাসনভূমির নিরাপত্তা নয়, তিনি লড়াই করতেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি লাভের আশায় এবং আল্লাহর পথে লড়াইয়ের প্রতি স্বভাব-অনুরাগের কারণে।

মওদুদের জিহাদি তৎপরতা

দায়িত্ব গ্রহণ করার পরই মওদুদ বিন তুনতেকিন মসুলের প্রশাসনিক বিন্যাসের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেন এবং বিগত কয়েক বছর ধরে বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাব কাটিয়ে রাজ্যজুড়ে স্থিতিশীল পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন। তিনি রাজ্যে ন্যায় ও ইনসাফ এবং

দয়া ও সহানুভূতির শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।[১] আপন কর্মগুণে তিনি জনসাধারণের নিখাদ ভালোবাসা ও নিঃশর্ত আনুগত্য অর্জন করতে সক্ষম হন। মওদুদ শুরুতেই ঘোষণা করে দেন যে, তার জিহাদ হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। তার এমন সুস্পষ্ট ঘোষণা সৈন্যদের চেতনাকে শাণিত করে তোলে, মনোবল ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে। প্রত্যেকে উপলব্ধি করে যে, জিহাদ তার নিজস্ব দায়িত্ব এবং সকলের সম্মিলিত জিহাদ হবে কেবলই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। ইতিপূর্বে তারা যখন নির্দিষ্ট কোনো শাসকের জন্য বা আশেপাশে উদ্ভূত কোনো সংকটের কারণে জিহাদ করত, তখন তারা লড়াই করত শিথিলতার সঙ্গে, প্রতিরোধ করত অসতর্ক হয়ে। তখন বিজয় তাদের উদ্বেলিত করত না, পরাজয়ের বিষাদ তাদের ছুঁয়ে যেত না। এটি হলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের চেতনা লালনকারী বাহিনীসমূহের স্বভাব-প্রকৃতি, যাদের যুদ্ধের সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য থাকে না। কিন্তু মওদুদ রহ. শুরুতেই তার জনগণ ও সৈন্যদের সামনে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পুরোপুরি সুস্পষ্ট করে দেন। তার এই পদক্ষেপ মসুল রাজ্যে চমৎকার ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে, যার প্রভাব বিদ্যমান ছিল পরবর্তী কয়েক প্রজন্মের মনোজগতেও।

মওদুদের পরবর্তী পদক্ষেপও ছিল চমৎকার। তার এ পদক্ষেপ ছিল বিজয়ের পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে তার গভীর উপলব্ধিজ্ঞানের পরিচায়ক। তিনি বিভক্ত মুসলিমসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে সকলের কর্মপ্রচেষ্টা একীভূত করার চেষ্টা করেন। ঐক্য-চিন্তার ধারক মওদুদ রহ. কুরআনের এই অনন্যসাধারণ নির্দেশনার মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন—

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

তোমরা আল্লাহর রশিকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখো এবং পরস্পরে বিভেদ করো না। [সুরা আলে-ইমরান: ১০৩]

মওদুদ আশেপাশের শাসক-প্রশাসকদের সঙ্গে পত্রবিনিময় করে সকলের সেনাবাহিনীকে এক পতাকাতলে নিয়ে আসার এবং সকলকে ইসলামি ভূখণ্ড থেকে ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করার অভিন্ন লক্ষ্যে পরিচালিত করার চেষ্টা করেন।

১. ইবনুল ইবরি, *তারীখু মুখতাসারিদ দুওয়াল*, পৃষ্ঠা : ১৯৯।

পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ ছিল নিঃসন্দেহে চমৎকার। কিন্তু তাতে একটিমাত্র ত্রুটি রয়ে গিয়েছিল! আর তা হলো, মওদুদ বিন তুনতেকিন ছিলেন ভীরু-কাপুরুষদের যুগে বিরল এক মহান পুরুষ! তার এই সমুন্নত লক্ষ্য ও সুমহান পদক্ষেপ সে যুগের শাসক-প্রশাসকদের মনোজগতে স্থান করে নিতে পারেনি। আর তাই তাদের পক্ষ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়াও পরিলক্ষিত হয়নি। যারা তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল, তাদের আচার-আচরণেও এ বিষয়টি প্রতিভাত হয়নি যে, তারা জিহাদের গুরুদায়িত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছে। বরং তারা সাড়া দিয়েছিল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ পাওয়ার লোভে, নয়তো মওদুদ কিংবা তার প্রধান শাসক সেলজুক সুলতান মুহাম্মাদের প্রভাব-ভীতির কারণে। তবে কারণ যাই হোক, মওদুদ বিভিন্ন শাসক-প্রশাসকের সমন্বয়ে একটি জোট গঠন করতে এবং ঐক্যের প্রয়োজনের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। তিনি নতুন করে সকলের মাঝে সঞ্চার করেন ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার নীতি-আদর্শ।

মওদুদের প্রচেষ্টায় এই প্রথমবারের মতো ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সুবিন্যস্ত ইসলামি জোট গঠিত হয়। ঐক্যবদ্ধ মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং মওদুদ রহ.। এক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা করেন মারদিন ও হাসানকেইফের আমির ইলগাজি বিন উরতুক। তিনি ছিলেন অঞ্চলটির সাবেক আমির সুকমান বিন উরতুকের ভাই। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুকমান বিন উরতুক অবরুদ্ধ ত্রিপোলির সহায়তায় রওনা হওয়ার পর পথিমধ্যে ইন্তেকাল করেন। মওদুদের সঙ্গে আরও জোটবদ্ধ হয়েছিলেন আহলাত[২] (Ahlat) ও তিবরিজের আমির সুকমান কুতবি (বলাবাহুল্য, ইনি সুকমান বিন উরতুক নন!)। এ ছাড়া দামেশকের আমির তুগতেকিনও তাদের সঙ্গে পত্রবিনিময় করে যোগাযোগ রাখছিলেন। পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তুগতেকিনও কিছুটা ক্রুসেডবিরোধী লড়াইয়ের চেতনা লালন করতেন।[৩]

অভিযানের লক্ষ্যবস্তু ছিল সুস্পষ্ট। নেতৃবৃন্দ এডেসা অভিমুখে অগ্রসর হয়ে অধিকৃত ইসলামি রাজ্যটিকে ক্রুসেডারদের দখল থেকে উদ্ধার করার মনস্থ করেন। ৫০৩ হিজরি সনের শাওয়াল মাসে (১১১০ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল

---

২. আরবি নাম خلاط (খিলাত)। [সম্পাদক]

৩. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১৫৪।

মাসে) মুসলিম বাহিনী মসুল হতে রওনা হয়। কয়েকদিনের মধ্যে তারা ফুরাত নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত এডেসা নগর-দুর্গের কাছে পৌঁছে যায়। এডেসা-দুর্গকে সে সময়ের অন্যতম সুরক্ষিত দুর্গ গণ্য করা হতো। মওদুদ সেখানে পৌঁছে নগরীর চারপাশে অবরোধ আরোপ করেন।[৪]

এডেসার শাসক বল্ডউইন ডি বুর্গ পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধি করে দ্রুত বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজা ১ম বল্ডউইনের কাছে সাহায্যবার্তা প্রেরণ করেন। পরিস্থিতি-গুরুত্বের বিবেচনায় তিনি তিল-বাশিরের প্রশাসক জোসেলিনকে বার্তাবহনের দায়িত্ব দেন। পত্রটি যখন রাজার কাছে পৌঁছায়, তখন তিনি বৈরুত নগরী অবরোধে ব্যস্ত।[৫]

মওদুদ দীর্ঘ দুই মাস এডেসা অবরোধ করে রাখেন এবং সম্ভাব্য সকল পন্থায় নগরীটির নিরাপত্তাব্যবস্থা ভেদ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু অতি সুরক্ষিত নগরীটির মজবুত নিরাপত্তাব্যবস্থার সামনে তার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। এরই মধ্যে ১ম বল্ডউইন এডেসা রাজ্যের সহায়তায় সৈন্যসমাবেশ ঘটান। তিনি নিজে তার বাহিনীর একাংশ নিয়ে এডেসা অভিমুখে ছুটে আসেন। ত্রিপোলির শাসক বারট্রামও তার সঙ্গে যোগ দেন। অপরদিকে এন্টিয়ক অধিপতি টেনক্রেড বল্ডউইন ডি বুর্গের সঙ্গে পূর্ব-শত্রুতার জেরে তার সহযোগিতায় অগ্রসর হতে অস্বীকৃতি জানান।[৬]

মওদুদ অনুভব করেন যে, মুসলিম বাহিনী শীঘ্রই দুই ক্রুসেড বাহিনীর মাঝে অবরুদ্ধ হয়ে পড়তে যাচ্ছে। কারণ, এদিক থেকে যখন বল্ডউইন ডি বুর্গের নেতৃত্বে এডেসার সৈন্যরা বেরিয়ে আসবে, ওদিক থেকে তখন ১ম বল্ডউইন ও বারট্রামের বাহিনী তার ফেরার পথ বন্ধ করে দেবে। আর তাই বিচক্ষণ সেনাপতি মওদুদ সুস্পষ্ট সামরিক মেধাবলে তার সৈন্যদের এডেসার দক্ষিণ-পূর্বে হাররানের দিকে সরিয়ে নেন। তিনি চাচ্ছিলেন এভাবে ধীরে ধীরে আরও দক্ষিণে সরে গিয়ে ক্রুসেডার বাহিনীকে প্রলুব্ধ করতে এবং এডেসা থেকে দূরে টেনে নিয়ে যেতে। ছয় বছর পূর্বে বালিখের যুদ্ধেও এই কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছিল। মুসলিম বাহিনী

---

৪. Albert d' Aix, p. 670.

৫. সালিহ বিন ইয়াহইয়া, *তারীখু বাইরুত*, পৃষ্ঠা : ১৮।

৬. Albert d' Aix, p. 670,672.

হাররানে পৌঁছতেই দামেশকের অধিপতি তুগতেকিন তার বাহিনী নিয়ে মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেন।[৭]

ঝানু শাসক ১ম বল্ডউইন মুসলিম বাহিনীর পদক্ষেপ অনুসরণ করে মওদুদের কৌশল ধরে ফেলেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, এই তুলনামূলক কম সংখ্যক সৈন্য নিয়ে আরও গভীরে প্রবেশ করে হাররানের দিকে অগ্রসর হওয়া তার জন্য মোটেও সমীচীন হবে না। তিনি তৎক্ষণাৎ টেনক্রেডের কাছে বার্তা পাঠিয়ে তাকে তার বাহিনী নিয়ে দ্রুত চলে আসতে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক চূড়ান্ত যুদ্ধে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করেন।[৮] বল্ডউইনের চাপে একরকম বাধ্য হয়েই টেনক্রেড আসতে সম্মত হন। তিনি পনেরোশ সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে এডেসায় চলে আসেন।[৯] টেনক্রেড এডেসায় পৌঁছতেই ১ম বল্ডউইন টেনক্রেড ও বল্ডউইন দ্য বুর্গকে নিয়ে সমঝোতা বৈঠকে বসেন এবং উভয়ের পুরোনো বিরোধ সমাধান করে দেন![১০]

সচেতনতার সঙ্গে এসব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি ১ম বল্ডউইন কায়সুম অঞ্চলের আর্মেনীয় শাসক কোগ বাসিলের সঙ্গেও সমঝোতা করেন। কোগ বাসিল তার বাহিনীর একটি অংশ নিয়ে ক্রুসেডারদের শক্তি বৃদ্ধি করতে তাদের সঙ্গে মিলিত হন।[১১]

এভাবে ক্রুসেডার বাহিনীর শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। অবশ্য এসব তৎপরতার সংবাদ মওদুদের অজানা ছিল না। তিনি পূর্বের কৌশল বহাল রেখে ক্রুসেডারদের এডেসা ও তিল-বাশির থেকে আরও দূরে টেনে নিতে চেষ্টা করেন, যাতে পরাজয়কালে তারা আশ্রয়ের জায়গা খুঁজে না পায়।[১২] তবে ১ম বল্ডউইনও মওদুদের সঙ্গে মেধার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি মওদুদের পরিকল্পনা বুঝে ফেলেন এবং মুসলিম বাহিনীর পিছু নেওয়া হতে বিরত থাকেন। ১ম বল্ডউইন যেহেতু ইতিপূর্বে

---

৭. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ১৬৯-১৭১।

৮. Setton: op. cit., 1, p. 399.

৯. Stevenson: op. cit., p. 88.

১০. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১৫৪।

১১. Stevenson: op. cit., p. 88.

১২. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৪৩।

এডেসা রাজ্যের শাসক ছিলেন, তাই এ অঞ্চলের ভৌগোলিক প্রকৃতি এবং তুলনামূলক দক্ষিণে প্রবেশ করার ঝুঁকি সম্পর্কে তার জানা ছিল।[১৩]

এ সময় বল্ডউইনের কাছে সংবাদ আসে যে, উবায়দিরা শীঘ্রই বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যে হামলা চালাতে পারে। ওদিকে আলেপ্পো অধিপতি রিজওয়ান কর্তৃক টেনক্রেডের শাসনাধীন এন্টিয়কের নিকটবর্তী বিভিন্ন দুর্গে অভিযান প্রস্তুতির সংবাদও এসে পৌঁছায়।[১৪] এসব আশঙ্কাজনক সংবাদে ক্রুসেডার নেতাদ্বয় আপন আপন রাজ্যের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধ ছাড়াই ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে ১ম বল্ডউইন ভেবে দেখেন যে, এডেসা রাজ্যসীমার অন্তর্ভুক্ত এই বিরাট অঞ্চলের বিভিন্ন জনপদ, জায়গির ভূমি ও কৃষিঅঞ্চল এভাবে ফেলে রেখে গেলে এ অঞ্চলের ক্রুসেডার ও আর্মেনীয় জনগণ বিরাট ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাবে। আর তাই তিনি মুসলিম বাহিনীর আসন্ন আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য ফুরাতের পূর্ব তীরে অবস্থিত এসব অঞ্চলের সকল খ্রিষ্টান জনসাধারণকে ফুরাতের পশ্চিম তীরে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। এর ফলে ফুরাতের পূর্ব তীরে ক্রুসেডারদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে কেবল দুই বড় নগরী এডেসা ও সারুজ।[১৫]

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক্রুসেডার বাহিনীগুলোর প্রত্যাবর্তনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে জনগণকে দ্রুত সরিয়ে নেওয়া শুরু হয়। ক্রুসেডারদের পরিকল্পনা বুঝতে পেরে মওদুদ দ্রুত তার বাহিনী নিয়ে উত্তরে চলে আসেন। ক্রুসেডাররা যদিও দ্রুত ফিরে যাচ্ছিল; কিন্তু তিনি ক্রুসেডার বাহিনীর পেছনের অংশের নাগাল পেয়ে যান। এ ছাড়াও আকস্মিক স্থানান্তরের সিদ্ধান্তে যারা দ্রুত সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছিল, এমন অনেক সাধারণ জনগণও মুসলিম বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। মুসলিম বাহিনী ক্রুসেডার বাহিনীর পশ্চাৎ-অংশের ওপর দ্রুত বিজয় লাভ করে; অর্জন করে বিপুল সংখ্যক বন্দি, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও অস্ত্রশস্ত্র।[১৬]

---

১৩. Matthieu d' Edesse, p. 93.

১৪. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১৫৫-১৫৬।

১৫. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ১৭৩-১৭৪, Guillaume de Tyr, p. 463 & Grousset: Hist. des. Croisades 1,p. 454.

১৬. Matthieu d' Edesse, p. 93 -94.

স্বভাবতই এটি নিষ্পত্তিমূলক কোনো যুদ্ধ ছিল না। কারণ, মুসলিম বাহিনী নাগাল পাওয়ার পূর্বেই ক্রুসেডার বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য ফুরাত পাড়ি দিয়ে পশ্চিমে চলে গিয়েছিল কিংবা এডেসা ও সারুজের দুর্গ-অভ্যন্তরে আশ্রয় নিয়েছিল। এতৎসত্ত্বেও এ অভিযান এমন কিছু ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়, যা মোটেও উপেক্ষা করার মতো নয়। যেমন :

১. এই অভিযানে মুসলমানদের লক্ষ্য ও গতিপথ ছিল সরল-সঠিক; ঝান্ডা উত্তোলিত হয়েছিল একমাত্র জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর লক্ষ্যে।

২. ক্রুসেড ইতিহাসে এটিই ছিল প্রথম অভিযান, যেখানে বিভিন্ন ইসলামি রাজ্যের বাহিনী ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করেছিল। বিশেষত তুগতেকিন দামেশকের বাহিনী নিয়ে ইরাক ও পারস্যের বাহিনীর সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলেন।

৩. এ যুদ্ধে খ্রিষ্টান ক্রুসেডাররা অনুভব করতে পেরেছিল যে, এখনো মুসলমানদের হিম্মত টুটে যায়নি, সংকল্প দমে যায়নি; তারা অধিকৃত অঞ্চলগুলোর কথা ভুলে যায়নি। সন্দেহ নেই, এমন অনুভব ক্রুসেডারদের মানসিকতায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।

৪. ক্রুসেডাররা প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র ও জনসম্পদ ফেলে গিয়েছিল, যা মুসলমানদের শক্তিবৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

৫. ফুরাতের পূর্ব পাশের বিভিন্ন দুর্গ ও ভূমির কর্তৃত্ব মুসলমানদের হাতে চলে আসে। ক্রুসেডারদের দখলে থেকে যায় কেবল এডেসা ও সারুজ নগরী। নগরীদুটির প্রতিরক্ষাব্যবস্থা যথেষ্ট শক্তিশালী হলেও আশেপাশের কৃষিভূমি মুসলমানদের কর্তৃত্বে চলে যাওয়ায় নগরীদুটি কার্যত বিচ্ছিন্ন ও অসহায় হয়ে পড়ে। নিঃসন্দেহে এটি ক্রুসেড রাজ্য এডেসাকে অনেকটা দুর্বল করে ফেলে।[১৭]

এভাবেই নিষ্পত্তিমূলক কোনো যুদ্ধ না হলেও বাহ্যত অপূর্ণ একটি অভিযান বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখে যেতে সক্ষম হয়। অভিযান শেষে মওদুদ ফিরে যান মসুলে; অন্যান্য রাজন্যও ফিরে যায় নিজ নিজ রাজ্যে।

---

১৭. Albert d' Aix, p. 675.

গণজাগরণ!

এই অভিযানের পর বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলিম জনসাধারণ ভাবতে শুরু করে যে, আশা এখনো ফুরিয়ে যায়নি; বেদনাদায়ক এ বর্তমানের পরিবর্তন ঘটানো এখনো সম্ভব। একই সঙ্গে তারা অনুভব করে যে, ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মূলত মওদুদ একাই করছেন; তাকে সহায়তাকারী বাহিনীগুলো মোটেও তার সঙ্গে তুল্য নয়। এ সময় জাতির নিষ্ঠাবান ব্যক্তিবর্গ দ্রুত সবাইকে নবোদ্যমে উদ্দীপ্ত করতে এবং সবার হৃদয়ে আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট হন। তাদের প্রচেষ্টায় আলেপ্পোতে জ্ঞানী-গুণী, আলিম-ফকিহ, বণিক ও সাধারণ জনতার একটি প্রতিনিধিদল প্রস্তুত হয়ে বাগদাদে যাওয়ার মনস্থ করে। আলেপ্পোবাসী তাদের অলস-অথর্ব শাসক রিজওয়ানের কর্মকাণ্ডে নিরাশ হয়ে পড়েছিল। প্রতিনিধিদলটি বাগদাদে খলিফা মুসতাযহির বিল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। কিন্তু পূর্বেও আমরা জেনেছি, তিনি তো প্রকৃত অর্থে 'খলিফাতুল মুসলিমিন' ছিলেন না; ছিলেন নামেই খলিফা! তাই আলেপ্পোর প্রতিনিধিদলের আগমন তার মন-মানসকে সামান্যও প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়। তিনি তার স্বভাব-রীতি অনুযায়ী তাদের পরিবেশ-পরিস্থিতির খোঁজ-খবর নেন, তাদের দুর্দশায় সৌজন্যমূলক দুঃখ ও সহমর্মিতা প্রকাশ করেন এবং কার্যকর সহায়তার পরিবর্তে তাদেরকে পূর্ণ 'আন্তরিক সহায়তা'র আশ্বাস প্রদান করেন! তিনি তাদের দুঃখ-দুর্দশা ও সংকটময় পরিস্থিতি দূর হওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করারও প্রতিশ্রুতি দেন![১৮]

এমনটিই ছিল স্বাভাবিক। তার মতো অসহায়-নিরুপায় ব্যক্তির কাছ থেকে এমন প্রতিক্রিয়াই ছিল প্রত্যাশিত। কিন্তু আলেপ্পোর প্রতিনিধিদল খলিফার দুর্বল সান্ত্বনায় তুষ্ট না হয়ে এবার বাগদাদের সাধারণ জনগণের শরণাপন্ন হয় এবং তাদের কাছে পরিস্থিতির ভয়াবহতা ও আক্রান্ত অঞ্চলের মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থা তুলে ধরে। প্রতিনিধিদল তাদেরকে এই বলে সতর্ক করে যে, আজ শাম অঞ্চল যে দুর্যোগের শিকার হয়েছে, উদাসীনতার চাদরে মুড়ি দিয়ে থাকলে নিঃসন্দেহে আগামীকাল পুরো মুসলিম বিশ্ব একই পরিণতির শিকার হবে!

---

১৮. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৪১।

আল্লাহর শোকর, বাগদাদে তখনও এসব কথা মন দিয়ে শোনার মতো কিছু কান ছিল; ছিল অনুভূতিসম্পন্ন কিছু বিবেক, সচেতন ও জাগ্রত কিছু হৃদয়। এটি সুস্পষ্ট যে, বাগদাদে তখনও মহান উজির নিজামুল মুলক রহ.-এর প্রতিষ্ঠিত নিজামিয়া মাদরাসাসমূহের প্রভাব অবশিষ্ট ছিল এবং ইলমের নুর ও জ্ঞানের আলোয় বাগদাদকে সমৃদ্ধকারী আলিমসমাজের নিষ্ঠাপূর্ণ কর্মপ্রচেষ্টার প্রভাব তখনও বিদ্যমান ছিল। আর তাই প্রতিনিধিদলের প্রচেষ্টা জনসাধারণের মাঝে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, যা সমকালীন পরিস্থিতিতে একেবারেই অভাবনীয় ছিল! ৫০৪ হিজরি সনের দ্বিতীয়ার্ধের এক শুক্রবারে (১১১১ খ্রিষ্টাব্দে) বাগদাদের জনতা বিরাট বিক্ষোভের ডাক দেয়। বিক্ষোভ থেকে সুস্পষ্ট ভাষায় ইসলামি ভূখণ্ড থেকে ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করতে জিহাদ শুরু করার দাবি জানানো হয়। বিক্ষুব্ধ জনতা জুমার সামান্য পূর্বে সুলতানের মসজিদ অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং সকলে মসজিদে ঢুকে পড়ে। প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ জনতা মসজিদটির মিম্বর ভেঙে ফেলে। বিপুল সংখ্যক জনসাধারণের উপস্থিতিতে পুরো এলাকায় তুমুল আন্দোলন চলতে থাকে। এমনকি সেদিন মসজিদটিতে জুমার নামাজ আদায় করাও সম্ভব হয়নি। সুলতান মুহাম্মাদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে জনতাকে শান্ত করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু এক সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ার পরও সুলতানের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ গৃহীত না হওয়ায় বিক্ষুব্ধ জনতা পরের শুক্রবার আবারও পথে নামে। এবার তারা সরাসরি খলিফা-প্রাসাদের মসজিদ অভিমুখে অগ্রসর হয়। রাজপ্রহরীরা বাধা দিলে বিক্ষুব্ধ জনতা তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এবং তাদেরকে হটিয়ে মসজিদে ঢুকে যায়। উত্তেজিত জনতা মসজিদে খলিফার বসার জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ কক্ষের জানালা ও মসজিদের মিম্বর ভেঙে ফেলে। গত সপ্তাহে যেমন সুলতানের মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করা সম্ভব হয়নি, এ সপ্তাহে একই পরিস্থিতির অবতারণা হয় খলিফার মসজিদে।

পরিস্থিতি বেশ জটিল আকার ধারণ করে। এ অবস্থায় নিশ্চুপ বসে থাকলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা ছিল। পরিস্থিতির দাবি ছিল, খলিফা ও সুলতান সমস্যার সমাধানে কোনো দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তাদের সামনে দুটি পথ খোলা ছিল—জনতার দাবি মেনে নিয়ে ক্রুসেডারদের

বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জিহাদের লক্ষ্যে সৈন্যসমাবেশ ঘটানো কিংবা উত্তেজিত জনতার বিরুদ্ধে দমন-অস্ত্র ব্যবহার অর্থাৎ তাদেরকে গ্রেফতার, বেত্রাঘাত ও হত্যাসহ প্রচলিত বিভিন্ন শাস্তির হুমকি প্রদান!

যেহেতু আন্দোলনরত জনগণ ছিল সংখ্যায় অনেক এবং তাদের আন্দোলন ছিল সুবিন্যস্ত ও পরিকল্পিত, তা ছাড়া তারা ছিল এক-অভিন্ন লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ, তাই খলিফা ও সুলতান পুরো বিষয়টি নিয়ে নতুন করে চিন্তা করেন এবং শেষ পর্যন্ত জনতার দাবির সামনে নতি স্বীকার করে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সৈন্যসমাবেশ শুরু করেন। এমনকি সুলতান মুহাম্মাদ আসন্ন অভিযানের সেনাপতি হিসেবে তার পুত্র মাসউদের নাম ঘোষণা করেন। অবশ্য এ ঘোষণা ছিল নিছক আনুষ্ঠানিকতা মাত্র; বাস্তব নেতৃত্ব মওদুদ বিন তুনতেকিনকেই প্রদান করা হয়।[১৯]

বাগদাদের এই গণজোয়ার ছিল ইতিহাসের এক যুগান্তকারী গণজাগরণ। প্রশ্ন হতে পারে—বাগদাদের মতো আলেপ্পো, দামেশক, হামা বা হিমসে কেন বিক্ষোভ বা গণ-উত্থানের ঘটনা ঘটেনি? আমরা বলব, উত্তর একেবারেই সুস্পষ্ট। বাগদাদের জনগণ দীর্ঘকাল ধরে লাভ করেছে ইলম, জিহাদ ও আত্মমর্যাদাবোধসহ সমুন্নত মানসিকতা তৈরিতে কার্যকর বিভিন্ন গুণের দীক্ষা। বিগত সময়ে হাজারো আলিম বাগদাদের বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গন ও জনগণের মানসিক উন্নয়নের সংস্কারপ্রচেষ্টায় অবদান রেখেছেন। তাদের অনেকেই হয়তো ইতিমধ্যে পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নিয়েছেন এবং নিজেদের কর্মপ্রচেষ্টার এই ফলাফল দেখে যেতে পারেননি। বাগদাদের এই গণজাগরণের পেছনে এটি যে অন্যতম কার্যকারণ ছিল, তা ঐতিহাসিক ইবনুল আছিরের পর্যবেক্ষণেও ফুটে উঠেছে। তিনি তার মনোজ্ঞ ইতিহাসগ্রন্থ *আল-কামিল ফিত-তারীখ*-এ উল্লেখ করেছেন, বাগদাদের এ গণবিদ্রোহ আলিম-ফকিহদের এক বড় জামাতের তত্ত্বাবধানে সংঘটিত হয়েছিল।[২০]

নিঃসন্দেহে প্রশ্নের উত্তর একেবারেই সুস্পষ্ট!

আলিমগণই ছিলেন এই গণজাগরণের মূল চাবিকাঠি!

---

১৯. প্রাগুক্ত, ৯/১৪১।

২০. প্রাগুক্ত, ৯/১৪১।

ইলম ও আলিমগণের সাহচর্যের প্রভাবেই জেগে উঠেছিল বাগদাদবাসী!

জাতির আলিমসমাজ যদি সঠিক পথে চলেন, তাহলে জাতির সবকিছুই সঠিক পথে পরিচালিত হয়। পক্ষান্তরে আলিমসমাজই যদি বিপথে হাঁটেন, ভ্রষ্টতার শিকার হন, কীভাবে আশা করা যায় সততা ও কল্যাণ?! আর তাই মোটেও অসারতা নেই নবীজির এ বাণীতে—

«إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ»

নিশ্চয়ই আলিমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী।[২১]

নেই কোনো অসারতা এই নববি ঘোষণাতেও—

«إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَه وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضِيْنَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِيْ جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ»

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা, তার ফিরেশতাগণ এবং আসমান ও জমিনের অধিবাসীগণ এমনকি গর্তের পিপীলিকা ও (পানির) মাছ পর্যন্ত মানুষকে কল্যাণ শিক্ষাদানকারী (আলিম)-এর জন্য দোয়া করে।[২২]

ঐক্যের নাটক!

৫০৫ হিজরি সনের শুরুতে (১১১১ খ্রিষ্টাব্দে) ব্যাপক পরিসরে মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসমাবেশ শুরু হয়। যেহেতু বাহিনীর প্রধান ও মহান মুজাহিদ আমির মওদুদ বিন তুনতেকিনের অবস্থান ছিল মসুলে এবং মসুলেই ছিল বাহিনীর কেন্দ্রীয় শক্তি ও মূল অংশের প্রতিনিধিত্বকারী সচেতন জনসাধারণের নিবাস, তাই সকলে মসুলেই সমবেত হতে থাকে।

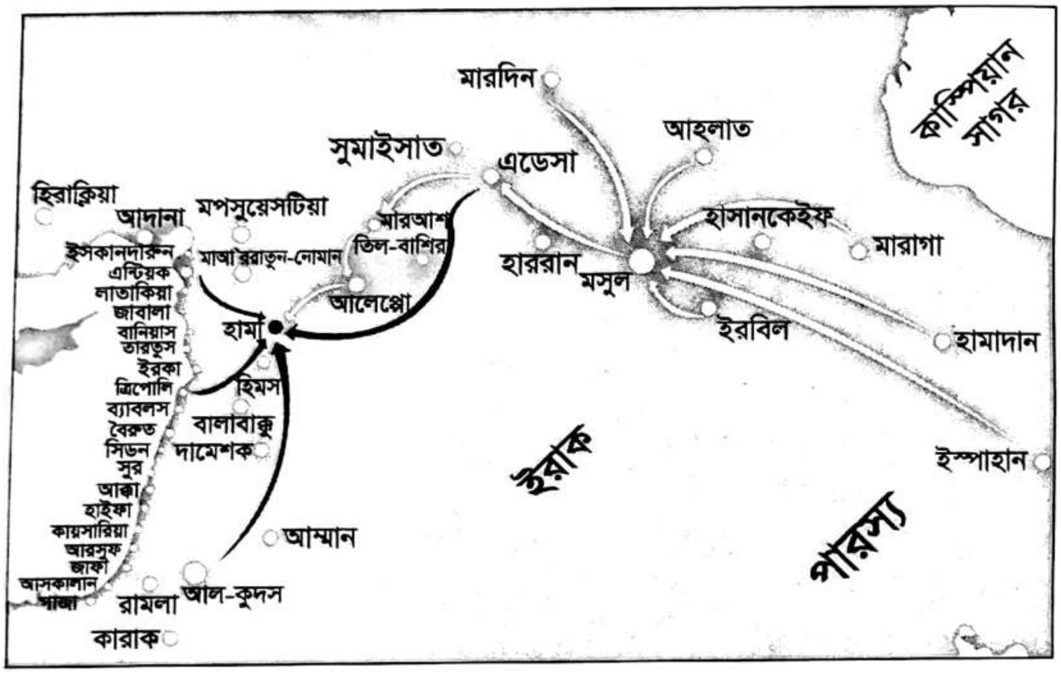
বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সৈন্যদল আসতে থাকে। বাগদাদ থেকে সুলতান-পুত্র মাসউদ একটি বাহিনী নিয়ে আগমন করেন। (বর্তমান তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চল ও ইরানের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত) আহলাত ও তিবরিজ থেকে

---

২১. ইমাম আবু দাউদ, *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৩৬৪১, ইমাম তিরমিজি, *সুনানে তিরমিজি*, হাদিস নং ২৬৮২ ও ইমাম ইবনে মাজা, *সুনানে ইবনে মাজা*, হাদিস নং ২২৩।

২২. ইমাম তিরমিজি, *সুনানে তিরমিজি*, হাদিস নং ২৬৮৫ ও তাবারানি, *আল-মুজামুল কাবির*, হাদিস নং ৭৯১২।

সুকমান আল-কুতবি, মারদিন থেকে ইয়াজ বিন ইলগাজি বিন উরতুক, (আজারবাইজানের) মারাগা (Maragheh) অঞ্চল থেকে কুর্দি আমির আহমাদিল, হামাদান থেকে আমির বুরসুক, তার দুই পুত্র ইলবাকি ও জিনকি এবং ইরবিল (Erbil) থেকে আবুল হাইজা আপন আপন বাহিনী নিয়ে বৃহত্তর ইসলামি বাহিনীতে যোগদান করেন[২৩]



মানচিত্র নং-২৩

৫০৫ হিজরি সনে/১১১১ খ্রিষ্টাব্দে মওদুদের নেতৃত্বে অভিযান

নিঃসন্দেহে বিশাল সৈন্যসমাবেশ ঘটেছিল। কিন্তু আমরা জানি, সংখ্যাধিক্যে কিছু আসে-যায় না; বাহিনীর ধরন ও প্রকৃতিই হলো আসল বিবেচ্য। মওদুদ ও তার সঙ্গী মসুলের বাহিনী বাদে বৃহত্তর মুসলিম বাহিনীর কারও মধ্যেই আমরা পরিস্থিতির গভীর উপলব্ধি-বোধ এবং নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেকে উৎসর্গ করার চেতনা খুঁজে পাইনি। অন্যান্য আমির ও রাজন্য বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল শুধুই সুলতান মুহাম্মাদের আনুগত্যের দাবিতে; আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নয়। হায়! এ দুই উদ্দেশ্যে সমবেত লোকদের মাঝে কত ফারাক, কত পার্থক্য!

---

২৩. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৪৩।

৫০৫ হিজরি সনের মুহাররম মাসে (১১১১ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে) সুবিশাল মুসলিম বাহিনী মসুল থেকে রওনা হয়। মুসলিম বাহিনী এডেসা নগরী অবরোধের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ফুরাতের পূর্ব তীরে অবস্থিত ক্রুসেডার-নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন দুর্গের পতন ঘটানোর লক্ষ্যে তৎক্ষণাৎ কাজ শুরু করে। প্রচেষ্টা সফল হয় এবং ক্রুসেডারদের বেশ কয়েকটি দুর্গ জয় করার পর মুসলিম বাহিনী খুব সহজে এডেসায় পৌঁছে যায় এবং নগরীটি ঘিরে অবরোধ আরোপ করে।

এডেসা নগরীর দুর্ভেদ্য নিরাপত্তাব্যবস্থা ছিল সুপ্রসিদ্ধ। তা ছাড়া মুসলিম বাহিনীর আগমন-সংবাদ জানতে পেরে ক্রুসেডাররা দীর্ঘ অবরোধে টিকে থাকার জন্য নগরীর অভ্যন্তরে যথেষ্ট পরিমাণ আহারদ্রব্য ও প্রয়োজনীয় রসদসামগ্রী মজুত করে নিয়েছিল। নগরপ্রাচীরের বাইরে এসে মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলা করার কোনো ইচ্ছাই তাদের ছিল না। ফলে একসময় মওদুদ অনুভব করেন যে, বৃথাই সময় নষ্ট হচ্ছে; অবরোধের মাধ্যমে নগরীটির পতন ঘটানো সম্ভব নয়।[২৪]

তাহলে মওদুদ এখন কী করবেন?!

মওদুদ সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনি বাস্তববাদী হবেন। তিনি সুরক্ষিত এডেসার অবরোধ তুলে নিয়ে ক্রুসেডারদের নিয়ন্ত্রিত অন্য কোনো দুর্গ অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনা করেন। পরিকল্পনামতো মুসলিম বাহিনী এডেসা নগরী ছেড়ে ফুরাতের পশ্চিম তীরে অবস্থিত এডেসা রাজ্যের দ্বিতীয় প্রধান নগরী তিল-বাশির অভিমুখে অগ্রসর হয়। নগরীটির প্রশাসনিক দায়িত্ব ছিল প্রসিদ্ধ ক্রুসেডার সেনাপতি জোসেলিন ডি কার্টেনির হাতে।[২৫]

মুসলিম বাহিনী তিল-বাশির ঘিরে কঠিন অবরোধ আরোপ করে এবং পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে নগরদ্বার উন্মুক্ত করার বা নগরপ্রাচীর ধসিয়ে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু তিল-বাশিরও ছিল এডেসার মতো সুরক্ষিত এবং দুর্ভেদ্য নগরী।[২৬]

---

২৪. প্রাগুক্ত, ৯/১৪৩।

২৫. Stevenson: op. cit., p. 91.

২৬. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৪৪।

দিনের পর দিন অতিবাহিত হতে থাকে, মুসলিম বাহিনীর পরিস্থিতি ক্রমেই কঠিন হতে থাকে। পরিস্থিতি পরিবর্তনের কোনো লক্ষণও পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। এরই মধ্যে সেনাপতি মওদুদের কাছে শাম থেকে দুটি সাহায্যবার্তা এসে পৌঁছায়।

প্রথম বার্তাটি আসে শাইজারের প্রশাসক সুলতান বিন মুনকিযের পক্ষ থেকে। বার্তায় তিনি জানান যে, এন্টিয়ক অধিপতি টেনক্রেডের বাহিনী তার রাজ্যে আক্রমণ চালাতে যাচ্ছে। ২য় বার্তাটি ছিল আলেপ্পোর দুষ্কর্মা শাসক রিজওয়ানের প্রেরিত। বার্তায় তিনি এন্টিয়কের শাসক টেনক্রেডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা বিনিময়ের আগ্রহ প্রকাশ করেন। টেনক্রেড সে সময় শাইজারের পাশাপাশি আলেপ্পোতে অভিযান পরিচালনা করছিলেন।[২৭] সন্দেহ নেই, বার্তাদুটিতে মুসলিম বাহিনীর জন্য দুশ্চিন্তার যথেষ্ট উপাদান ছিল। কেননা, নতুন করে যদি কোনো ইসলামি নগরীর পতন ঘটে, বিশেষত তা যদি হয় আলেপ্পোর মতো গুরুত্বপূর্ণ নগরী, নিঃসন্দেহে তখন পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে যাবে এবং ক্রুসেডারদের শক্তি অনেক বেশি বেড়ে যাবে।

এ সময় মওদুদ তিল-বাশিরের অবরোধ প্রত্যাহারের বিষয়ে দ্বিধায় পড়ে যান। বিশেষত রিজওয়ান মোটেও আস্থা রাখার মতো মানুষ নন। তবে অন্যায়-অপকর্ম করার মতো লোক কেবল রিজওয়ানই ছিলেন না! তিল-বাশিরের প্রশাসক জোসেলিন এ সময় মারাগার আমির আহমাদিলের কাছে পৌঁছে যান এবং তার সঙ্গে গোপনে সমঝোতা করেন। জোসেলিন তাকে তিল-বাশির থেকে অবরোধ তুলে নিতে মুসলিম বাহিনীর নেতৃবৃন্দকে রাজি করানোর বিনিময়ে লোভনীয় বিনিময়ের প্রস্তাব দেন। নিঃসন্দেহে এটি ছিল জিহাদের ময়দানে নিশ্চিত বিশ্বাসঘাতকতা এবং মুসলিম জনসাধারণের আশার প্রতীক মুসলিম বাহিনীর পিঠে ছুরিকাঘাতের নামান্তর!

আহমাদিল মুসলিম বাহিনীর নেতৃবৃন্দকে রিজওয়ানের সহায়তায় অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আশ্বস্ত করতে সক্ষম হন। সকলে এ বিষয়ে একমত হলে মওদুদ একপ্রকার নিরুপায় হয়ে তাদের মত মেনে নেন।

---

২৭. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ১৭৫।

অবশেষে পয়তাল্লিশ দিনের অবরোধের পর তিল-বাশির থেকে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।[২৮]

এরপর মওদুদ রিজওয়ানের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে টেনক্রেডের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আলেপ্পো অভিমুখে রওনা হন। কারণ, এখন এডেসার পতন গুরুত্বপূর্ণ নয়; গুরুত্বপূর্ণ হলো যেকোনো ইসলামি ভূখণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষা করা; হোক তা মসুল থেকে অনেক দূরের কোনো এলাকা।

মুসলিম বাহিনীর ব্যর্থ অভিযান

কিন্তু আলেপ্পোতে রিজওয়ানের কাছে যা প্রত্যাশিত ছিল, তা-ই ঘটে! রিজওয়ান মসুল, ইরাক ও পারস্যের সম্মিলিত বাহিনীর সামনে আলেপ্পোর নগরদ্বার রুদ্ধ করে দেন এবং ঘোষণা করেন যে, তিনি ক্রুসেডার বাহিনীর তুলনায় মুসলিম বাহিনীকে বেশি ভয় পাচ্ছেন![২৯]

রিজওয়ানের এই চরম প্রতারণামূলক পদক্ষেপে মুসলিম বাহিনী কঠিন সংকটে পড়ে যায়। রিজওয়ানকে সাহায্য করতে মুসলিম বাহিনী নিজেদের মূল সাহায্যক্ষেত্র উত্তর ইরাক থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে এবং শত্রু-ভূখণ্ডের অনেকটা ভেতরে চলে এসেছে। এদিকে রিজওয়ান তাদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। এখন যদি ক্রুসেডার বাহিনী চলে আসে, তাহলে নিঃসন্দেহে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করবে। তা ছাড়া আলেপ্পোর কাছেই ছিল ক্রুসেডারদের নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন দুর্গের অবস্থান। ওদিক থেকে বল্ডউইন ডি বুর্গ যদি মুসলিম বাহিনীর ফেরার পথ বন্ধ করে দিতে এবং তাদের কাছে সামরিক সহায়তা পৌঁছার পথ রুদ্ধ করে দিতে এডেসা থেকে বের হয়ে আসেন, তাহলে তো বিপদ বহুগুণে বেড়ে যাবে। চরম প্রতারক রিজওয়ান মুসলিম বাহিনীকে বাস্তবেই জটিল সংকটে ফেলে দিয়েছিলেন।

এমন পতনোন্মুখ পরিস্থিতিতে আলেপ্পোর জনগণের যেন হঠাৎ হুঁশ ফিরে আসে। এহেন ঘৃণ্য পদক্ষেপ থেকে রিজওয়ানকে নিবৃত্ত করতে তারা তীব্র বিক্ষোভ শুরু করে। কিন্তু রিজওয়ান আলেপ্পোর গণ্যমান্য ও নেতৃস্থানীয়

---

২৮. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১৫৯।

২৯. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৪৪ ও Setton: op. cit., 1,p. 400.

কয়েকজন ব্যক্তিকে বন্দি করে ফেলেন এবং আন্দোলন অব্যাহত রাখলে তাদের অনিষ্ট সাধনের হুমকি দিয়ে জনসাধারণকে দমন করেন।[৩০]

নিঃসন্দেহে রিজওয়ানের এই আচরণ ছিল ইতিহাসের এক চরম নিন্দনীয় চিত্র এবং উম্মাহর দুশমনদের সামনে নতজানু হয়ে নিজ জাতি, মাতৃভূমি ও স্বধর্মীয়দের ওপর দমন-নীতি ব্যবহারকারী এক নেতার বাস্তব রূপ।

মওদুদ অনুভব করেন যে, তিনি কঠিন বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে আটকে গেছেন। এরই মধ্যে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, রিজওয়ান মুসলিম বাহিনীকে মার দেওয়ার জন্য খোদ টেনক্রেডের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন! সবদিক বিবেচনা করে মওদুদ আলেপ্পো থেকে দূরে সরে দামেশকের কাছাকাছি পৌঁছতে আরও দক্ষিণে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। দামেশকের আমির তুগতেকিন প্রথমসারির মুজাহিদ না হলেও রিজওয়ানের তুলনায় শ্রেয়তর ছিলেন! মুসলিম বাহিনী আছি নদীর অববাহিকায় মাআ'ররাতুন-নোমানের কাছে পৌঁছার পর দামেশকের আমির তুগতেকিন সেখানে উপস্থিত হন এবং মুসলিম রাজন্যবর্গের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত মহান সেনাপতি মওদুদ বিন তুনতেকিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অথচ স্বাভাবিক প্রত্যাশা ছিল আঘাত আসবে ওদিক থেকে; এদিক থেকে নয়![৩১]

ইরাকি-পারসিক সম্মিলিত মুসলিম বাহিনীর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমির তুগতেকিন আলোচনায় মিলিত হন। আলোচনায় স্পষ্টত অনুমিত হচ্ছিল যে, তুগতেকিন যদিও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আগ্রহী; কিন্তু তিনি এই বিরাট মুসলিম বাহিনীকে (নিজ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিবেচনায়) ভয় করছেন। অবশ্য এমন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যেও তিনি সহজেই মওদুদ ও অন্যান্য রাজন্যের মধ্যে যে মোটাদাগের পার্থক্য আছে, তা অনুধাবন করতে সক্ষম হন। তিনি সুস্পষ্ট অনুভব করেন যে, প্রথমজন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে নিঃস্বার্থ লড়াইয়ের চেতনা লালন করেন; সম্পদ বা রাজত্বের কোনো লালসা তার মাঝে নেই। আর বাহিনীর অন্যান্য নেতা সে যুগের সাধারণ আমিরদের মতোই কেবল পার্থিব স্বার্থের মোহে অভিযানে বের হয়েছে; জিহাদের কোনো চেতনাই তাদের মাঝে নেই। এখান থেকেই মওদুদ ও তুগতেকিনের মধ্যে এক

---

[৩০]. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১৫৯।

[৩১]. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ১৭৫।

হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের সূচনা হয়। তবে তুগতেকিন আশঙ্কা করছিলেন যে, অন্যান্য রাজন্য তার রাজ্যের অনিষ্ট সাধন করতে পারে।[৩২] তাই মুসলিম বাহিনীকে দামেশক হতে দূরে রাখা নিশ্চিত করতে তিনি আলোচনায় সকলকে ত্রিপোলিতে আক্রমণে রাজি হতে পীড়াপীড়ি করেন। এতে তুগতেকিনের আরেকটি স্বার্থ নিহিত ছিল। যেহেতু ক্রুসেড রাজ্য ত্রিপোলির অবস্থান ছিল দামেশক রাজ্যের অধীনস্থ অঞ্চলের তুলনামূলক নিকটে, তাই তিনি এর মাধ্যমে তার জন্য তুলনামূলক অধিক অনিষ্টকর ক্রুসেডার নেতা ত্রিপোলি-শাসক বারট্রামকে ঘায়েল করতে চাচ্ছিলেন।[৩৩]

তুগতেকিনের মনোজগতে পার্থিব স্বার্থ-চিন্তা ও প্রবৃত্তির লালসা যেমন বিদ্যমান ছিল, দ্বীনি কল্যাণ-চিন্তা ও শরিয়তের চাহিদাও বিরাজমান ছিল। এই দ্বিমুখী চেতনার সংঘাতের কারণে তার পদক্ষেপ ও কার্যক্রমগুলো হতো সাংঘর্ষিক ও পরস্পর বিরোধী। তার পদচারণায় না মওদুদের মতো স্বচ্ছ জিহাদি চেতনা প্রতিভাত হতো, না রিজওয়ানের মতো সুস্পষ্ট দালালির চেতনা! এ ধরনের লোকের সংখ্যা অনেক। এমন অনিশ্চিত চেতনাধারী লোকদের দ্বারা কিছু কল্যাণ সাধিত হলেও সংস্কার ও পরিবর্তনের আশা করা যায় না!

এদিকে যখন মুসলিম বাহিনীতে চারিত্রিক অবক্ষয়জনিত বিভাজন, ওদিকে তখন ক্রুসেডার কাঠামোতে দৃশ্যমান ঐক্যের আয়োজন! এন্টিয়কের শাসক টেনক্রেড এ সময় বাইতুল মুকাদ্দাসের অধিপতি ১ম বল্ডউইনের কাছে সাহায্যবার্তা প্রেরণ করেন এবং ত্রিপোলি, এডেসা ও তিল-বাশিরের শাসকদের প্রতি মুসলমানদের মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম গড়ে তোলার আহ্বান জানান।[৩৪]

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় একটি নীতি হলো—কোনো সেনাদল যদি এভাবে ঐক্যের লক্ষ্যে অগ্রসর হয়, তখন অবশ্যই তাদের প্রভাব-ভীতি ছড়িয়ে পড়ে; আর যে সেনাদল ঘোরতর

---

৩২. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৪৪ ও *আত-তারীখুল বাহির*, ১৭-১৮।

৩৩. ইবনুল আদিম, যুবদাতুল হালাব, ২/১৬০।

৩৪. Grousset: Hist. des. Croisades 1, p. 469.

কঠিন মুহূর্তেও ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না, তাদের ভাগ্যে বিজয়ের আশা করা যায় না!

মুসলিম শিবিরের পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। অধিকাংশ রাজন্যের শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়ে ভয়-ডর-শঙ্কা। হঠাৎ করেই মারা যান সুকমান আল-কুতবি (ধারণা করা যায়, অতি ভীতিই ছিল তার মৃত্যু-কারণ)। যুদ্ধ না করার উপযুক্ত অজুহাত পেয়ে যাওয়ায় আহলাত ও তিবরিজের বাহিনী প্রস্থানের সিদ্ধান্ত নেয়! হামাদানের আমির বুরসুক অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং নিজ রাজ্যে সুচিকিৎসা গ্রহণের জন্য ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন! ফলে তার বাহিনীও শিবির ত্যাগ করে। জোসেলিনের সঙ্গে গোপনে আঁতাত করা আহমাদিল নিজ রাজ্য মারাগায় 'হঠাৎ সৃষ্ট' অভ্যন্তরীণ কিছু সমস্যার বাহানা দেখিয়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি এর মাধ্যমে এক ঢিলে দুই পাখি শিকার করেন; একদিকে ক্রুসেডার-বিরোধী যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যান, অপরদিকে সদ্য-মৃত আমির সুকমান আল-কুতবির রাজ্যে ভাগ বসানোর চেষ্টা করার সুযোগ পান।[৩৫] ইয়াজ বিন ইলগাজি এক আজব উদ্দেশ্যে মুসলিম শিবির ত্যাগ করেন; তার লক্ষ্য মৃত আমির সুকমান আল-কুতবির বাহিনীর ওপর হামলা চালিয়ে যা পারা যায় লুটে নেওয়া![৩৬] অবশ্য তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং উল্টো সুকমানের বাহিনী তার বাহিনীকে পরাজিত করে তাদের সঙ্গে থাকা সবকিছু লুট করে নিয়ে নিজেদের রাজ্যে ফিরে যায়!

এসব বিবরণও কেউ বিশ্বাস করবে?!

ভীরুতা ও কাপুরুষতা, পলায়ন ও বিশ্বাসঘাতকতার লক্ষ্যে এভাবে একদল রাজন্য ও সেনাপতি সকলে একজোট হতে পারে?!

হ্যাঁ, বাস্তবে এমনটিই ঘটেছিল! এখান থেকেই আমরা অনুমান করতে পারি, কেন ক্রুসেড আগ্রাসন চলাকালে মুসলমানদের ওপর বিরাট বিপর্যয় নেমে এসেছিল। যুগে যুগে দুর্বলতা ও অবসন্নতার সময় মুসলিম উম্মাহ যেসব সংকটের শিকার হয়েছে, তার কার্যকরণও আমরা এখান থেকেই

---

৩৫. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ১৭৬-১৭৭।
৩৬. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৪৪।

উপলব্ধি করতে পারি। উনিশশ আটচল্লিশ বা উনিশশ সাতষট্টির ট্র্যাজেডি তো আমাদের থেকে খুব দূরবর্তী অতীত নয়![৩৭]

মসুলের আমির মওদুদ এখন কার্যত নিঃসঙ্গ! তার সঙ্গে কেবল তার নিজস্ব বাহিনী এবং দামেশকের আমির তুগতেকিন। ওদিকে ক্রুসেডাররা সবদিক থেকে ছুটে আসছে। ক্রুসেডারদের যোদ্ধাসংখ্যা ষোলো হাজারের মতো; অবশিষ্ট মুসলিম সৈন্যদের তুলনায় যা অনেক বেশি।

এমন জটিলতর পরিস্থিতিতে মুসলিম বাহিনীর কাছে শাইজারের প্রশাসক সুলতান বিন মুনকিযের পক্ষ থেকে একটি বার্তা এসে পৌঁছায়। বার্তায় তিনি মুসলিম বাহিনীকে শাইজারে আশ্রয় গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন। তার এই প্রস্তাবে উভয় পক্ষেরই স্বার্থ নিহিত ছিল। এতে একদিকে যেমন শাইজারের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত হবে, অপরদিকে মুসলিম বাহিনীর নিরাপত্তাও নিশ্চিত হবে। ইবনে মুনকিযের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুসলিম বাহিনী শাইজার অভিমুখে রওনা হয় এবং সেখানে পৌঁছে নগরপ্রাচীরের অভ্যন্তরে সুরক্ষিত অবস্থান গ্রহণ করে। ক্রুসেডার বাহিনীও ততক্ষণে চলে এসেছে সিংহভাগ পালিয়ে যাওয়ার পর অবশিষ্ট মুসলিম বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার লক্ষ্যে।[৩৮]

নিজেদের এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় মওদুদের বাহিনীর অবস্থান তখন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। মওদুদ তাই এ অঞ্চলে দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ অবস্থায় আটকে থাকতে চাচ্ছিলেন না। তার সামনে তখন একটাই পথ খোলা—ক্রুসেডার বাহিনীকে ভয় দেখিয়ে নিজেদের প্রত্যাবর্তনের পথ করে নেওয়া। এ কারণেই মওদুদ দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে ক্রুসেডারদের ওপর হামলা চালিয়ে পুনরায় দুর্গে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি আশা করছিলেন, এভাবে ঝটিকা হামলার শিকার হলে ক্রুসেডাররা প্রভাবিত হয়ে যুদ্ধে না জড়িয়ে তাকে ফিরে যাওয়ার সুযোগ করে দেবে।

মওদুদের হৃদয়ের নিষ্ঠাপূর্ণ ইচ্ছার কথা আল্লাহ তাআলা জানতেন। আল্লাহ তাই শত্রুপক্ষের সুবিশাল বাহিনীর অন্তর্জগতে ভীতি সঞ্চার করে দেন। মুসলিম বাহিনীর দুঃসাহসী আক্রমণে তারা ভীত হয়ে পড়ে। বরং

---

৩৭. ১৯৪৮ সালের আরব-ইহুদি সশস্ত্র বাহিনী যুদ্ধ ও ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। [সম্পাদক]

৩৮. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৪৪।

মওদুদ ক্রুসেডার বাহিনীর পেছনের অংশে হামলা চালিয়ে কিছু যুদ্ধলব্ধ সম্পদও হাসিল করে নেন!

ক্রুসেডাররা বিবেচনা করে দেখে যে, এই অদম্য বীর মুজাহিদের পথ ছেড়ে দিয়ে শাম অঞ্চলের বিভিন্ন দুর্বল প্রকৃতির রাজন্যবর্গের রাজ্যে হানা দেওয়াই তাদের জন্য নিরাপদ। মওদুদও বাস্তববাদী ছিলেন। তিনি দেখছিলেন যে, বর্তমান অবস্থায় যুদ্ধচিন্তায় অটল থাকা নিজের বাহিনীকে ধ্বংসাত্মক পরিণতির দিকে ঠেলে দেওয়ার নামান্তর। তাই তিনি মসুলের পথ ধরেন। তুগতেকিনও ফিরে যান দামেশকে।[৩৯]

সম্মিলিত মুসলিম বাহিনীর এই অভিযান যদিও মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়; কিন্তু এর মধ্য দিয়ে অন্য একটি উপকারও হয়! এ অভিযানের মাধ্যমেই এসব প্রতারক নেতার মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যায়। কেবল মওদুদের সামনে নয়; সাধারণ জনগণও সুনিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করতে পারে যে, কারা আল্লাহর পথে লড়াইকারী নিষ্ঠাবান নেতা আর কারা অজুহাত দেখিয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়া কপট নেতা। যেকোনো আন্দোলন ও সংগ্রাম পূর্ণতায় পৌঁছার জন্য এই দৃষ্টিগত স্বচ্ছতা অনেক বেশি জরুরি। এমন স্বচ্ছতা থাকলে জনসাধারণ কল্পনার বালু-প্রাসাদ গড়ার মতো ভুল করে না; এমন ভণ্ড লোকদের ওপর নির্ভর করে সুমহান কোনো স্বপ্নের জাল বোনে না, যারা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে জানলেও কাজের কাজ কিছুই করতে পারে না!

মওদুদ দমার পাত্র নন!

এভাবে উপর্যুপরি আঘাতে জর্জরিত হয়েও মওদুদ তার দায়িত্ব ভুলে যাননি। যদিও তার রাজ্য ছিল শান্তিপূর্ণ এবং সংঘাতস্থল থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থিত, রাজ্যের পরিস্থিতি ছিল স্থিতিশীল এবং তিনি লাভ করেছিলেন জনগণের অকুণ্ঠ ভালোবাসা; কিন্তু তিনি তো ছিলেন আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ এবং দ্বীন ও উম্মাহর প্রতি আপন দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন একজন নেতা। আর তাই একের পর এক বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েও তিনি তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন।

---

৩৯. Setton: op. cit., 1,p. 400.

একই বছর অর্থাৎ ৫০৫ হিজরি সনের জিলকদ মাসে (১১১২ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে) তিনি পুনরায় তার বাহিনীকে প্রস্তুত করে আচমকা এডেসা নগরীতে আক্রমণ করেন! এডেসা দুর্গের দুর্ভেদ্যতা এবং নিজ বাহিনীর সৈন্য-স্বল্পতা সত্ত্বেও তিনি আবারও অভিযান পরিচালনায় পিছপা হননি। কিন্তু বাস্তবেই এত সামান্য সংখ্যক সৈন্য নিয়ে এডেসা জয় করা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি এডেসার কাছেই ফুরাতের পূর্ব তীরে অবস্থিত সারুজ নগরী অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নেন।[৪০] সারুজ ছিল ফুরাতের পূর্ব তীরে ক্রুসেডারদের দ্বিতীয় প্রধান ঘাঁটি। তবে মওদুদ আশঙ্কা করছিলেন যে, তিনি সারুজ অভিমুখে অগ্রসর হলে এডেসার শাসক বল্ডউইন ডি বুর্গ দুর্গ ছেড়ে বেরিয়ে এসে তার বাহিনীর পেছনের অংশে হামলা চালাতে পারেন। তাই তিনি তার বাহিনীর একটি অংশকে এডেসা অবরোধে রেখে অন্য অংশ নিয়ে সারুজ অভিমুখে অগ্রসর হন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে তিল-বাশিরের প্রশাসক জোসেলিনের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে যায়। তিনি যখন জানতে পারেন যে, মওদুদ তার বাহিনীর ক্ষুদ্র একটি অংশ নিয়ে সারুজ অভিমুখে রওনা হয়েছেন, তখন তিনি সুযোগ কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেন এবং তার বাহিনী নিয়ে সারুজের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। সারুজে পৌঁছে জোসেলিন মওদুদের বাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম হন। মুসলিম বাহিনীর অনেক সৈন্য হতাহত হয়। সম্ভবত মওদুদ তার বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা অনুমান করতে ভুল করেছিলেন এবং অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়েই বিরাট সংখ্যক ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়তে অগ্রসর হয়েছিলেন।[৪১]

হৃদয়ে পরাজয়ের ক্ষত নিয়েই মওদুদ দ্রুত এডেসায় ফিরে আসেন এবং এডেসা অবরোধ করে রাখা সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হন।

সারুজে যখন যুদ্ধ চলছিল, এদিকে এডেসা অবরোধকারী মুসলিম বাহিনী তখন এডেসার অভ্যন্তরে বসবাসকারী আর্মেনীয়দের সঙ্গে গোপনে সমঝোতা চুক্তি করতে সক্ষম হয়েছিল![৪২] চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তারা এডেসা নগরীর পূর্ব অংশের একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গের নিয়ন্ত্রণ মুসলমানদের

---

৪০. Stevenson: op. cit., p. 95.

৪১. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৪৭, Matthieu d' Edesse, p. 100.

৪২. Matthieu d' Edesse, p. 101.

হাতে তুলে দেয়। মুসলিম বাহিনীর সদস্যরা সেদিক দিয়ে এডেসার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে শুরু করে। এ সময়ই মওদুদ সারুজ থেকে ফিরে আসেন এবং তার সৈন্যদের নিয়ে দ্রুত এডেসার পতন প্রচেষ্টায় শরিক হন। তবে জোসেলিন ঘটনাপ্রবাহ অনুমান করতে পেরে তার বাহিনী নিয়ে দ্রুত সারুজ থেকে এডেসায় চলে আসেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মওদুদ অনুভব করেন যে, অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে সমবেত ক্রুসেডারদের পরাভূত করা সম্ভব নয়। তাই তিনি মসুলে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।[৪৩]

এভাবেই মওদুদ রহ. হতাশ না হয়ে একের পর এক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত এডেসা-পতনক্ষণের তখনও বেশ দেরি ছিল!

জিহাদের এই সুকঠিন পথের চূড়ান্ত মনজিল হলো জান্নাত। প্রত্যাশিত ফলাফল নয়; আপন সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ত্যাগই এখানে মুখ্য। উহুদ যুদ্ধের শহিদান নিহত হয়েছেন মুসলমানদের কঠিন এক দুর্যোগকালে! অথচ জান্নাতে তাদের মর্যাদা কত উঁচু! তারা অবস্থান করবেন সুরম্য প্রাসাদের সর্বোচ্চ স্তরে! হামজা বিন আবদুল মুত্তালিব হবেন জান্নাতে শহিদানের সর্দার![৪৪] কারণ, তারা নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করেছেন; অবহেলা বা শিথিলতা প্রদর্শন করেননি।

তবে মওদুদের গল্পের সমাপ্তি টানার আগে আমাদের জানতে হবে যে, এডেসায় কী এমন ঘটেছিল, যার কারণে খ্রিষ্টান হয়েও আর্মেনীয়রা মুসলমানদের সঙ্গে গোপনে পত্রবিনিময় করেছিল এবং তাদেরকে নগরীটিতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। এ ঘটনা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, আর্মেনীয় জনগোষ্ঠী ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের শাসনের তুলনায় ইসলামি শাসনকে হাজার গুণ সদয়, সহনীয় ও ন্যায়ানুগ বিবেচনা করেছিল। এ কারণেই তারা নিজেদের ধর্মীয় ভাইদের বলি দিয়ে মুসলমানদের সহায়তা করেছিল। ব্যক্তিবিশেষকে অর্থ

৪৩. Michel Le Syrien, III, p. 196.

৪৪. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'সকল শহিদদের সর্দার হবেন হামজা বিন আবদুল মুত্তালিব।' তাবারানি, *আল-মুজামুল আওসাত*, ৪/২৩৮ ও হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহিহাইন*, হাদিস নং ২৫৫৭। [অনুবাদক]

বা অন্য কিছুর লোভ দেখিয়ে সুবিধা অর্জন করা হয়নি; বরং একটি জনগোষ্ঠীর সিংহভাগের উদ্যোগে এমনটি সংঘটিত হয়েছিল। নিঃসন্দেহে এটি ইসলামি শাসনব্যবস্থা মূল্যায়নের এক প্রকৃষ্ট দলিল।

স্বভাবতই এ তথ্যে মোটেও বিস্ময়ের কিছু নেই যে, মওদুদ চলে যাওয়ার পরই এডেসায় ক্রুসেডারদের পক্ষ থেকে আর্মেনীয়দের বিচারের জন্য নিপীড়নমূলক সামরিক আদালত স্থাপন করা হয়। এরপর যেমনটি প্রত্যাশিত ছিল, তেমনই ঘটে; আর্মেনীয়দের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারমূলক রায় প্রদান করা হয়, বহু মানুষকে হত্যা করা হয়, অন্যদেরকে নগর-ত্যাগে বাধ্য করা হয়। ফলে ক্রুসেডার-আর্মেনীয় সহাবস্থান চূড়ান্ত পর্যায়ের কঠিন হয়ে ওঠে।[৪৫] অবশ্য বছর চারেক পূর্বে ৫০১ হিজরি সনে (১১০৮ খ্রিষ্টাব্দে) বল্ডউইন ডি বুর্গ বন্দিদশা থেকে ফিরে আসার পর থেকেই আর্মেনীয়দের সঙ্গে তার সম্পর্ক অস্থিরতাপূর্ণ ছিল।

সুস্পষ্ট অনুমিত হচ্ছিল যে, এডেসা রাজ্যের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি দিনে দিনে জটিল হয়ে উঠছে। বল্ডউইন এ সময় তার চারপাশের সকলকেই সন্দেহের চোখে দেখতে থাকেন এবং আশঙ্কা করেন যে, তারা তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে মুসলমানদের সঙ্গে গোপনে মিত্রতা করছে। সন্দেহ-রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মানসিক ভারসাম্যই হারিয়ে ফেলেন এবং শেষ পর্যন্ত রাজ্যের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা জোসেলিনকেও সন্দেহ করতে শুরু করেন! জোসেলিনের অপরাধ, আর্মেনীয় জনগোষ্ঠী তাকে পছন্দ করে! একপর্যায়ে তিনি জোসেলিনকে তিল-বাশিরের প্রশাসক পদ হতে বরখাস্ত করেন এবং তাকে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করেন। অথচ বল্ডউইনের বন্দিত্বের সময় এবং পরবর্তীকালে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুদ্ধে এই জোসেলিন বল্ডউইনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন, বল্ডউইনের অনুপস্থিতিতে এডেসা রাজ্যের শান্তি-নিরাপত্তা রক্ষায় কাজ করেছেন এবং সবশেষে মওদুদের বাহিনীকে পরাজিত করেছেন। কিন্তু এসবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে বল্ডউইন তাকে পদচ্যুত করেন।[৪৬] বিতাড়িত জোসেলিন বাইতুল মুকাদ্দাসের অধিপতি ১ম বল্ডউইনের কাছে চলে গেলে তিনি তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং তার ব্যাপক সামরিক

---

৪৫. Matthieu d' Edesse, pp. 104-106.

৪৬. Runciman: op. cit., 11,p. 124.

দক্ষতা কাজে লাগাতে তাকে তাবারিয়া ও জালিল অঞ্চলের জায়গির প্রদান করেন।[৪৭]

৫০৫ হিজরি সনে (১১১২ খ্রিষ্টাব্দে) মওদুদের অভিযান আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ হলেও মূলত একে কেন্দ্র করেই এডেসার অভ্যন্তরে ব্যাপক পরিসরে গোলযোগ সৃষ্টি হয় এবং পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। উপরি পাওনা হিসেবে ছিল এডেসাকেন্দ্রিক সংঘাতের ক্ষেত্র থেকে কঠিন প্রতিপক্ষ জোসেলিনের বিদায়!

ক্রুসেডারদের দ্বিতীয় প্রজন্ম

মওদুদের গল্পে ফেরার আগে আমরা একই বছর সংঘটিত কেন্দ্রীয় ঘটনাপ্রবাহ হতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আলোচনা করব। ৫০৬ হিজরি সনেই (১১১২ খ্রিষ্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর) এন্টিয়কের শাসক টেনক্রেড মৃত্যুবরণ করেন।[৪৮] মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রচণ্ড ধূর্ত ও হিংস্র টেনক্রেডের প্রয়াণ ছিল ক্রুসেড শিবিরের জন্য বিরাট ক্ষতি। টেনক্রেডকেই এন্টিয়ক রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা গণ্য করা হয়। তার মামা ও এন্টিয়কের প্রথম শাসক বোহেমন্ড বন্দি থাকা অবস্থায় তিনি তিন বছর রাজ্যটির ভারপ্রাপ্ত শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আর বোহেমন্ড ইতালিতে চলে যাওয়ার পর এন্টিয়কের শাসনকার্য পরিচালনা করেন দীর্ঘ আট বছর। কেবল মুসলমানদের বিরুদ্ধেই নয়; বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধেও তিনি ছিলেন প্রচণ্ড উদ্যমী। তার প্রচেষ্টাতেই মূলত এন্টিয়ক একটি মজবুত স্থায়ী অবস্থানে পৌঁছতে সক্ষম হয়।[৪৯]

যেহেতু টেনক্রেডের বৈধ কোনো উত্তরাধিকারী ছিল না, তাই মৃত্যুশয্যায় তিনি আরেক চরম শয়তান রজার সালের্নো (Roger of Salerno)-কে তার স্থলাভিষিক্ত করে যান। ধূর্ততা ও হিংস্রতা উভয় ক্ষেত্রেই রজার ছিলেন টেনক্রেডের স্বার্থক উত্তরসূরি।[৫০] তিনি ছিলেন এডেসা রাজ্যের

---

৪৭. Stevenson: op. cit., p. 106.

৪৮. Foucher de Chartres, p. 425.

৪৯. Matthieu d' Edesse, pp.281, 282 & Setton: op, cit., p. 401.

৫০. উসামা বিন মুনকিয, *আল ই'তিবার*, পৃষ্ঠা : ১১৮।

শাসক বল্ডউইন ডি বুর্গের ভগ্নিপতি। রজারের দায়িত্বগ্রহণের মধ্য দিয়ে তাই এন্টিয়ক-এডেসা সম্পর্ক মজবুত হওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়।[৫১]

রজারকে দায়িত্ব প্রদানের সময় টেনক্রেড এই শর্ত আরোপ করেন যে, ক্রুসেড রাজ্য এন্টিয়কের প্রথম শাসক বোহেমন্ডের পুত্র যখন পরিণত বয়সে উপনীত হবেন, তখন রজার তার হাতে রাজ্যের শাসনক্ষমতা তুলে দিতে বাধ্য থাকবেন। বোহেমন্ড-পুত্রের বয়স তখন মাত্র দুই বছর। পরবর্তীকালে ২য় বোহেমন্ড নামে পরিচিতি লাভকারী শিশুটি এ সময় ইতালিতে প্রতিপালিত হচ্ছিল।[৫২] দায়িত্ব পালনকালে রজার সালের্নো এন্টিয়কের প্রতি সম্বন্ধিত হয়ে 'রজার অফ এন্টিয়ক' এবং নিজ জন্মভূমি সিসিলির প্রতি সম্বন্ধিত হয়ে 'রজার অফ সিসিলি' নামেও পরিচিতি লাভ করেন।

এ বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য যে, টেনক্রেডের মৃত্যুর কিছুদিন পরই ৫০৬ হিজরি সনে (১১১৩ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতে) ত্রিপোলির শাসক বারট্রামও মৃত্যুবরণ করেন। ত্রিপোলির শাসক পদে বারট্রামের স্থলাভিষিক্ত হন তার পুত্র পন্স (Pons)। এভাবেই শাম অঞ্চলের দুই ক্রুসেড রাজ্যে ক্রুসেডারদের দ্বিতীয় প্রজন্মের নেতৃত্বের সূচনা হয়।[৫৩]

সিন্নাবরার যুদ্ধ

নতুন করে আবারও মওদুদ রহ.-এর ইতিহাসে ফিরে আসছি। মওদুদ আবারও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে নতুন অভিযান শুরু করার প্রস্তুতি শুরু করেন। তিনি কেবল বের হওয়ার উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষা করছিলেন। মওদুদের দৃষ্টি নির্দিষ্ট কোনো ক্রুসেড রাজ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তার লক্ষ্য ছিল, নির্দিষ্ট কোনো এলাকা নয়; বরং পুরো অধিকৃত অঞ্চলকে ক্রুসেডারদের হাত থেকে উদ্ধার করা। এরই মধ্যে ৫০৬ হিজরি সনের শেষ দিকে (১১১৩ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে) দামেশকের আমির তুগতেকিন মওদুদের কাছে সাহায্যবার্তা প্রেরণ করেন। তিনি এ

---

৫১. Runciman: op. cit., 11,p. 126 & Grousset: Hist. des. Croisades 1,p.pp. 482 -483.

৫২. Guillaume de Tyr, p. 483.

৫৩. King: The Kingths Hospitallers In the Holy land, p. 36.

সময় বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসক ১ম বল্ডউইনের পক্ষ থেকে হামলার আশঙ্কা করছিলেন।[৫৪]

তুগতেকিন মূলত বিভিন্ন ক্ষেত্রেই ১ম বল্ডউইনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। বিশেষ করে লেবানন অঞ্চলের সুর নগরীকে কেন্দ্র করে উভয়ের দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছেছিল। লেবানন অঞ্চলে সুর ছিল একমাত্র নগরী, যা তখনও ক্রুসেডারদের দখলদারিত্বের শিকার হয়নি। বিষয়টি বল্ডউইনের নজরে ছিল। তিনি এ সময় নগরীটির পতন ঘটাতে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। আক্রান্ত নগরবাসী তুগতেকিনের কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করলে তিনি তার বাহিনীর একটি অংশ নিয়ে অগ্রসর হন এবং বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে নগরীটির প্রতিরক্ষা করতে সক্ষম হন। তিনি এ সময় সুরবাসীকে বলেন, 'আমি সম্পদ বা কোনো দুর্গের কর্তৃত্ব লাভের আশায় নয়; একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় এখানে এসেছি। ভবিষ্যতেও যখনই শত্রুপক্ষ তোমাদের ওপর আক্রমণ করবে, আমি নিজে আমার সৈন্যদের নিয়ে তোমাদের সাহায্যার্থে চলে আসব।'[৫৫] ইতিহাসের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ তার এই বক্তব্যের সত্যায়ন করে। পরবর্তী সময়ে তিনি সুরবাসীর কাছে এই সাহায্যের কোনো বিনিময় দাবি করেননি।

তুগতেকিনের এই স্বপ্রণোদিত সহায়তা বল্ডউইনকে বেশ বিক্ষুব্ধ করে তোলে। তিনি এর প্রতিশোধ নিতে দামেশকের দক্ষিণে অবস্থিত বিভিন্ন এলাকায় হামলা চালাতে শুরু করেন। এই অভিযানে তিনি তাবারিয়া ও জালিল অঞ্চলের নতুন উদ্যমী প্রশাসক জোসেলিনের নেতৃত্বাধীন বাহিনীকে কাজে লাগান। এতটুকুতেই ক্ষান্ত না হয়ে বল্ডউইন এরপর কায়রোগামী দামেশকের বিভিন্ন কাফেলার ওপর হামলা চালাতে শুরু করেন। কাফেলাগুলো যদিও বাইতুল মুকাদ্দাসের ক্রুসেডারদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য উপকূলীয় পথ ছেড়ে অনেকটা ভেতর দিয়ে পথ চলত; কিন্তু বল্ডউইন তাদের নাগাল পেতে মৃত সাগরের দক্ষিণে ওয়াদিয়ে মুসা অঞ্চলে ওত পেতে থাকতেন। তিনি বণিক কাফেলার ওপর হামলা চালিয়ে বাণিজ্যপণ্য ও অন্যান্য সম্পদ ছিনিয়ে নিতেন এবং বণিকদের

---

[৫৪]. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৪৯।

[৫৫]. সিবতু ইবনিল জাওযি, *মিরআতুয-যামান*, (৫০৬-৫০৮ হিজরি সনের ঘটনাবলি)।

ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালাতেন।[৫৬] বল্ডউইনের প্রতিশোধস্পৃহা এরপরও চরিতার্থ হয়নি। বরং ক্রুসেডারদের বিভিন্ন পদক্ষেপ ও প্রস্তুতি দেখে তুগতেকিন অনুভব করেন যে, তারা সম্ভবত দামেশকের দক্ষিণাঞ্চলে বা খোদ দামেশক নগরীতেই বড় ধরনের হামলার পরিকল্পনা করছে। এ কারণেই বাধ্য হয়ে তিনি এ অঞ্চলের প্রকৃত নেতা মসুলের আমির মওদুদ বিন তুনতেকিনের কাছে সহায়তা কামনা করেন।[৫৭]

মওদুদ ভেবে দেখেন, ঝুঁকিপূর্ণ হলেও এটি ক্রুসেডারদের পরাভূত করার একটি অনুকূল সুযোগ। ঝুঁকির কারণ হলো, এক্ষেত্রে তাকে মসুল থেকে অনেক দূরে দামেশক রাজ্যের গভীরতম অঞ্চলে গিয়ে লড়াই করতে হবে। সম্ভবত প্রতিপক্ষের সঙ্গে মোকাবিলা হবে দামেশকের দক্ষিণ অঞ্চলে, যা মসুল থেকে এক হাজার কিলোমিটারেরও অধিক দূরত্বে অবস্থিত। তা ছাড়া তাকে লড়তে হবে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ক্রুসেড রাজ্য বাইতুল মুকাদ্দাসের বাহিনীর সঙ্গে। তদুপরি এ আশঙ্কাও আছে যে, এন্টিয়ক ও এডেসার ক্রুসেডাররা তার ফেরার পথ আটকে দেবে। তখন তো তিনি আরও জটিলতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন। এত সব ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও মওদুদ তুগতেকিনের আহ্বানে দ্বিধাহীন চিত্তে সাড়া দেন এবং যে মাসে তুগতেকিনের বার্তা মসুলে পৌঁছায় সে মাসেই অর্থাৎ ৫০৬ হিজরি সনের শেষ দিকে (১১১৩ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে) তার বাহিনী নিয়ে দামেশক অভিমুখে রওনা হন।[৫৮]

দামেশকের পথে রওনা হওয়ার পর যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি মওদুদের চিন্তাজগৎকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তা হলো—কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পরই তাকে ক্রুসেড রাজ্য এডেসার দক্ষিণ অংশ পাড়ি দিতে হবে বা নিদেনপক্ষে রাজ্যটির কোনো না কোনো অংশ অতিক্রম করতে হবে। সেক্ষেত্রে নিশ্চিত করেই রাজ্যটির ক্রুসেড শক্তি তার ওপর হামলে পড়বে। যেহেতু তিনি বেশ কয়েকবার এডেসায় অভিযান চালিয়েছেন এবং এডেসা নগরী অবরোধ করেছেন, তাই রাজ্যটির সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল

---

[৫৬]. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ২১৮ ও Albert d' Aix, p.693.

[৫৭]. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/ ১৪৯।

[৫৮]. প্রাগুক্ত, ৯/১৪৯।

চূড়ান্ত পর্যায়ের উত্তেজনাপূর্ণ। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই মহান মুজাহিদের দুশ্চিন্তা দূর করে দেন এবং তার যাত্রাপথ সুগম করে দেন।

এডেসা রাজ্যের অভ্যন্তরে সংঘটিত কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রুসেডাররা এ সময় নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যে মাসে মওদুদ মসুল থেকে দামেশকের উদ্দেশে রওনা হন, সে মাসেই অর্থাৎ ১১১৩ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে রাজ্যটিতে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, আর্মেনীয়রা ক্রুসেডারদের শাসন থেকে মুক্তি পেতে নতুন করে মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে। বিষয়টি সত্য হোক বা মিথ্যা; এর প্রতিক্রিয়ায় বল্ডউইন ডি বুর্গ চূড়ান্ত পর্যায়ের আগ্রাসী হয়ে ওঠেন।[৫৯] তার নির্দেশে এডেসার ক্রুসেডার বাহিনী কোনো প্রকার বাছবিচার ব্যতিরেকে ঘৃণ্য জাতিগত নির্মূল অভিযান শুরু করে। প্রথমে তারা নিরস্ত্র আর্মেনীয়দের নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে। এরপর এডেসার নগরদ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং বেঁচে থাকা অবশিষ্ট আর্মেনীয়দের নগরী ছেড়ে চলে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। যারা তখনও বেঁচে ছিল, তাদের অনেকে নিজেদের ঘরবাড়ি, সহায়সম্পত্তি সব ছেড়ে অনিশ্চিত গন্তব্যের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে; আবার অনেকে নিজেদের বাড়িতেই থেকে যায়। এরপর ক্রুসেডাররা তাদের ঘরে ঘরে প্রবেশ করে লুটপাট করে, তারপর আর্মেনীয়দের ভেতরে রেখেই ঘরগুলো জ্বালিয়ে দেয়। আর্মেনীয় ঐতিহাসিক 'ম্যাথিউ ডি এডেসা'র বর্ণনামতে এই জাতিগত নির্মূল অভিযানের সবচেয়ে বীভৎসতম দিন ছিল ১৩ মে। সেদিন আক্ষরিক অর্থেই নগরীটিতে গণহত্যা চালানো হয়। আর্মেনীয়দের সামগ্রিক ইতিহাসে দিনটি 'কালো দিবস' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ম্যাথিউর বর্ণনামতে সেদিন পরিস্থিতি এত ভয়াবহ ছিল যে, পিতা তার সন্তানকে চিনতে পারছিল না, সন্তান চিনতে পারছিল না পিতাকে। প্রত্যেকেই কোনোমতে জান-হাতে-নিয়ে পালানোর চেষ্টায় ছিল। নির্বিচারে সকল আর্মেনীয় নাগরিককে হত্যা বা বিতাড়িত করার পরই কেবল এই ধ্বংসযজ্ঞ থামে।[৬০] এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এডেসা রাজ্যের সামরিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা-পরিস্থিতি পুরোপুরি অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। এ কারণে বল্ডউইন ডি বুর্গ মওদুদের বাহিনীর গতিরোধ বা ফিরতি

---

৫৯. Grousset: Hist. des. Croisades 1, p. 490.

৬০. Matthieu d' Edesse, pp.104-106.

পথে বাধা প্রদানের চিন্তাও করতে পারেননি। নিঃসন্দেহে এটি ছিল সত্যিকারের মুমিন ও মহান মুজাহিদ মওদুদ বিন তুনতেকিনের জন্য রাব্বে কারিমের পক্ষ থেকে এক আসমানি তদবির ও অদৃষ্ট ব্যবস্থাপনা!

যদিও ইতিপূর্বে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযানে শরিক মুসলিম রাজন্যবর্গ মওদুদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তবুও ঐক্য-নীতির ধারক মওদুদ সবাইকে এক পতাকাতলে সমবেত করে একতার শক্তি অর্জনের লক্ষ্যে নতুন করে রাজন্যবর্গকে একজোট হওয়ার আহ্বান জানান। তার এবারের আহ্বানে সাড়া দেন উত্তর ইরাকের দিয়ারে বকর অঞ্চলের সিনজার রাজ্যের আমির কুমাইরুক এবং মারদিনের আমির ইয়াজ বিন ইলগাজি। আর স্বভাবতই মওদুদকে যিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন, সেই দামেশকের আমির তুগতেকিন তো ছিলেনই।[৬১]

সেলজুক বাহিনীগুলো হামা নগরীর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত সালামিয়া (Salamiyah) নগরীর কাছে একত্র হয়। এরপর সম্মিলিত মুসলিম বাহিনী সরাসরি তাবারিয়া নগরী অভিমুখে অগ্রসর হয়। ফিলিস্তিন অঞ্চলের বিখ্যাত তাবারিয়া হ্রদ (The Sea of Galilee)-এর পাশে অবস্থিত নগরীটির নিরাপত্তাব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত মজবুত। তাবারিয়ায় মওদুদের নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে তুগতেকিনের বাহিনীও মিলিত হয়। মুসলিম বাহিনী দ্রুত তাবারিয়া অবরোধ করলেও সুরক্ষিত নিরাপত্তার কারণে নগরীটির পতন ঘটানো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই মুসলিম বাহিনী সেখান থেকে অবরোধ প্রত্যাহার করে আশেপাশের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করতে থাকে এবং বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জনের পাশাপাশি ক্রুসেডারদের দখল থেকে বিভিন্ন এলাকা পুনরুদ্ধার করে। এভাবে অভিযান অব্যাহত রেখে মুসলিম বাহিনী একসময় তুর পাহাড়ের কাছে পৌঁছায়।[৬২]

মুসলিম বাহিনীর তৎপরতার সংবাদ দ্রুত বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসক ১ম বল্ডউইনের কাছে পৌঁছে যায়। পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধি করে তিনি দ্রুত সবগুলো ক্রুসেড রাজ্যে সাহায্য চেয়ে বার্তা প্রেরণ করেন।

---

৬১. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৪৯।

৬২. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৪৯ ও Albert d' Aix, p. 694.

এন্টিয়কের নতুন শাসক রজার ও ত্রিপোলির নতুন শাসক পন্স তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে তাবারিয়া অভিমুখে রওনা হয়ে যান। তবে এডেসার শাসক বল্ডউইন ডি বুর্গ নিজ রাজ্যের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে অভিযানে যোগ দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

সাহায্য চেয়ে বার্তা প্রেরণ করলেও উত্তর থেকে আগত মুসলিম বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করার সুযোগ বল্ডউইনের ছিল না। তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, দেরি করলে মুসলিম বাহিনী তার রাজ্যে ঢুকে পড়বে। সেক্ষেত্রে আল-কুদসে ক্রুসেডারদের অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়ে যাবে। কারণ আসকালান তখনও উবায়দিদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। আর তাই মুসলিম বাহিনী তার রাজ্যে প্রবেশ করতে পারলে আল-কুদস দু-দিক থেকে সেলজুক ও উবায়দি বাহিনী দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে। এসব দিক বিবেচনা করে অন্যান্য বাহিনীর অপেক্ষা না করেই বল্ডউইন দ্রুত নিজ বাহিনী নিয়ে উত্তরে তাবারিয়া অভিমুখে অগ্রসর হন।[৬৩]

দক্ষিণ দিক থেকে ক্রুসেডার বাহিনীর অগ্রসর হওয়ার সংবাদ পেয়ে মওদুদ দ্রুত লড়াইয়ের জন্য একটি উপযুক্ত স্থান সন্ধান করেন। তিনি তাবারিয়া হ্রদের দক্ষিণে জর্ডান নদী ও ইয়ারমুক নদীর মাঝে অবস্থিত 'উকহুয়ানা' নামে পরিচিত উপদ্বীপ এলাকাকে আসন্ন যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করেন।[৬৪] এখানেই থেমে না থেকে এরপর তিনি তাবারিয়া হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিমে জর্ডান নদীর ওপর অবস্থিত সিন্নাবরা সেতুর কাছে বল্ডউইনের জন্য এক কঠিন ফাঁদ পাতেন।

আল্লাহর পাকের অনুগ্রহে ৫০৭ হিজরি সনের ১৩ মুহাররম (১১১৩ খ্রিষ্টাব্দের ২০ জুন) বল্ডউইন সিন্নাবরা সেতুর কাছে মওদুদের পাতা ফাঁদে পা দেন।[৬৫] এমনকি তিনি পৃষ্ঠদেশের নিরাপত্তার জন্য তার বাহিনীর কোনো অংশকে পেছনে মোতায়েন না করে চরম অসাবধানতার পরিচয় দেন। বল্ডউইন যেন তার দীর্ঘ জীবনে অর্জিত সকল রণকৌশল ও সামরিক নিয়মনীতিই ভুলে গিয়েছিলেন! তার এই আচরণের একটাই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে—আল্লাহ তার দৃষ্টি অন্ধ করে দিয়েছিলেন!

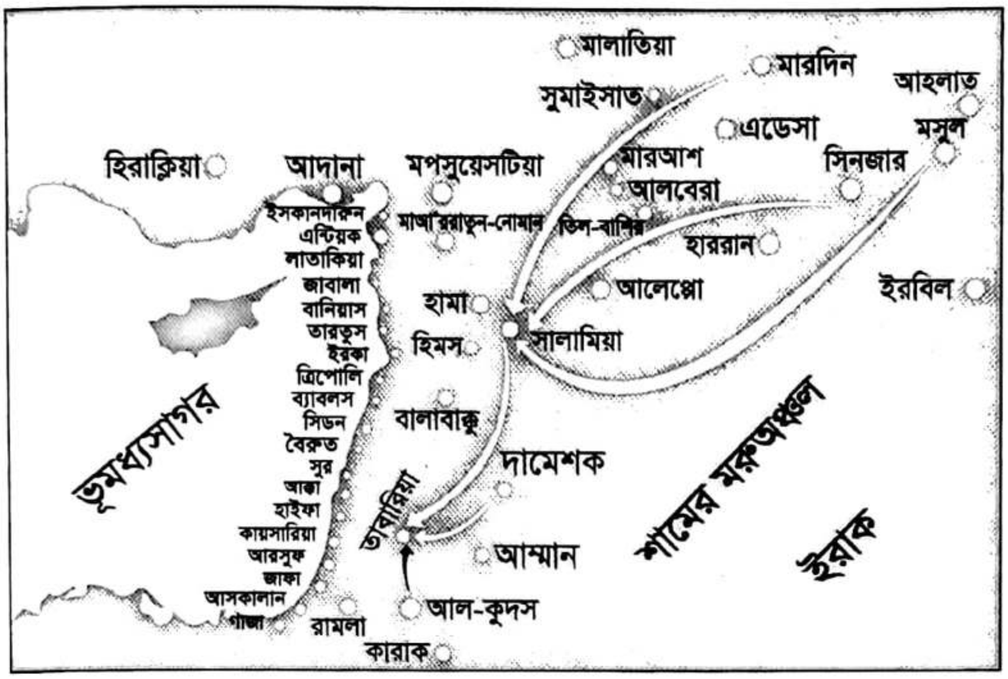
---

৬৩. সিবতু ইবনিল জাওযি, *মিরআতুয যামান*, পৃষ্ঠা : ৫৪৬-৫৪৭।

৬৪. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৪৯।

৬৫. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ১৮৫।

সিন্নাবরা সেতুর কাছে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইতিহাসে এ যুদ্ধ 'সিন্নাবরার যুদ্ধ' নামে খ্যাত। শুরুতেই প্রতিপক্ষকে হতচকিত করে দিয়ে হঠাৎ আক্রমণ যুদ্ধের গতিপথ মুসলমানদের পক্ষে নিয়ে আসতে অত্যন্ত ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখে।



মানচিত্র নং-২৪

সিন্নাবরার যুদ্ধ

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর কিছু সময় অতিবাহিত না হতেই ক্রুসেডার বাহিনী পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। দুই হাজারের অধিক ক্রুসেড যোদ্ধা নিহত হয়। সেনাপতি বল্ডউইন তার বাহিনীর অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশকে হারানোর পর অনেক কষ্টে প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হন। এ যুদ্ধে মুসলমানরা বিপুল পরিমাণ অশ্ব, যুদ্ধাস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করে।[৬৬] পূর্বের বছর এডেসা অভিযানে পরাজিত হয়ে সেনাপতি মওদুদ যে শিক্ষা পেয়েছিলেন, এদিন তিনি তার বদলা তুলে নেন। এ তথ্যটিও উল্লেখযোগ্য যে, সিন্নাবরার যুদ্ধেই ইতিহাস প্রথমবারের মতো প্রত্যক্ষ করে মওদুদের বাহিনীর এক নতুন ইসলামি তারকার সামরিক নিপুণতা ও রণদক্ষতা। নতুন উদিত এই তারকার নাম ইমাদুদ্দিন জিনকি। ইসলামি ইতিহাসের এই অনন্যসাধারণ সেনাপতি সিন্নাবরার যুদ্ধে বীরত্বের চরম

---

৬৬. Guillaume de Tyr, p. 486 Foucher de Chartres, p. 426.

পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। ঐতিহাসিক ইবনুল আছির এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

"তিনি এ যুদ্ধে রণদক্ষতার চূড়ান্ত স্তরে উপনীত হয়েছিলেন!" [৬৭]

সিন্নাবরার যুদ্ধের পরপরই মুসলিম বাহিনী জানতে পারে যে, রজার ও পন্সের বাহিনী বেশ কাছে চলে এসেছে। ওদিকে আল-কুদস ও উপকূলীয় বিভিন্ন নগরী থেকেও সহায়ক ক্রুসেডার বাহিনী চলে আসার আশঙ্কা ছিল। তাই তাবারিয়ায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ার পূর্বেই মওদুদ তার বাহিনী নিয়ে দ্রুত সটকে পড়ার সিদ্ধান্ত নেন।

সিন্নাবরার যুদ্ধের প্রভাবসমূহ

ক্রুসেডারদের ফাঁদে আটকে পড়া থেকে আত্মরক্ষা করতে মওদুদ তৎক্ষণাৎ সংঘাতময় অঞ্চল থেকে বেরিয়ে পড়েন। এর পরপরই ক্রুসেডাররা আবারও সৈন্যসমাবেশ ঘটাতে থাকে। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর শক্তি ও উন্নত আত্মবিশ্বাস প্রত্যক্ষ করে আপাতত তারা চূড়ান্ত কোনো লড়াইয়ে না জড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে তাবারিয়া হ্রদের পশ্চিমে একটি মালভূমিতে অবস্থান গ্রহণ করে। তখন মুসলিম বাহিনী অগ্রসর হয়ে তাদের অবরুদ্ধ করে রাখে। কিন্তু ক্রুসেডাররা নিজেদের অবস্থান থেকে নামতে অস্বীকৃতি জানিয়ে দূর থেকে তির, বর্শা নিক্ষেপ করতে থাকে।[৬৮] এ সময় মুসলিম বাহিনী ক্রুসেডারদের অবরোধ করে রাখা ছাড়াও ক্রুসেডারদের অধিকৃত আক্কা ও কুদসের মধ্যবর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন দুর্গ ধ্বংস করার জন্য অভিযান চালাতে থাকে। পাশাপাশি তারা ক্রুসেডারদের অনেক সম্পদও অর্জন করতে সক্ষম হয়।[৬৯]

একই সময় আসকালান থেকে একটি উবায়দি বাহিনী বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে অগ্রসর হয়। ক্ষুদ্র বাহিনীটির বাইতুল মুকাদ্দাসের বিশাল ক্রুসেডার বাহিনীর মোকাবিলা করার সামর্থ্য ছিল না। তাদের পরিকল্পনা ছিল এ অঞ্চলে কিছু ঝটিকা হামলা চালানো। কিন্তু উবায়দি বাহিনীটি সেলজুক বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে পরিস্থিতি আরও কঠিন করে তুলতে

---

৬৭. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৫৩।

৬৮. প্রাগুক্ত, ৯/১৪৯।

৬৯. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ১৮৫।

পারে এই আশঙ্কায় ১ম বল্ডউইন সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন।[৭০] কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, সুন্নি মুসলমানদের সঙ্গে ঐক্য ও সহযোগিতা বিনিময়ের কোনো ইচ্ছাই উবায়দিদের ছিল না। তাই তারা মওদুদের সঙ্গে কোনো ধরনের যোগাযোগ করার পরিবর্তে ঝটিকা অভিযানে প্রাপ্ত কিছু যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়েই আসকালানে ফিরে যায়।[৭১]

মুসলিম বাহিনী একটানা ছাব্বিশ দিন ক্রুসেডারদের ঘিরে রাখে। এ সময়ের মধ্যে একবারের জন্য হলেও তারা সরাসরি মোকাবিলা করার সাহস দেখাতে ব্যর্থ হয়। এরই মধ্যে ১১১৩ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ষোলো হাজার সশস্ত্র ক্রুসেডার তীর্থযাত্রী বহনকারী একটি ইউরোপীয় নৌবহর এ অঞ্চলের নিকটবর্তী আক্কা নৌবন্দরে এসে পৌঁছায়।[৭২] নিঃসন্দেহে এই বিরাট সংখ্যক জনবলের আগমনে পরিস্থিতি এবার ক্রুসেডারদের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

ক্রুসেডারদের বিরাট সৈন্যসমাবেশে বিপদ আঁচ করতে পেরে মওদুদ রহ. এবার প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা করেন। অতি সামান্য সংখ্যক সৈন্যকে হারিয়ে তিনি ইতিমধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিজয় অর্জন করেছেন। মুসলিম বাহিনীর নিরাপত্তা রক্ষার লক্ষ্যে আপাতত তিনি অর্জিত বিজয়েই তুষ্ট থাকেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী দেরি না করে মুসলিম বাহিনী উত্তর দিকে দামেশক অভিমুখে রওনা করে। সিন্নাবরার যুদ্ধে বিরাট ক্ষতির শিকার হওয়ায় মানসিক পরাভবতা ও প্রচণ্ড ভীতিতে আচ্ছন্ন ক্রুসেডাররা এ সময় মুসলিম বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনের চিন্তাই করেনি। তা ছাড়া এ সময় তারা আল-কুদসে উবায়দিদের বড় ধরনের অভিযানের আশঙ্কা করছিল। ফলে তারাও বর্তমান অবস্থান মেনে নিয়ে মুসলিম বাহিনীকে নিশ্চিন্তে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেয়।

প্রত্যাবর্তনকারী মুসলিম বাহিনী ৫০৭ হিজরি সনের রবিউস সানি মাসে (১১১৩ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে) দামেশকে প্রবেশ করে।[৭৩]

---

[৭০]. Foucher de Chartres, p. 426-427.

[৭১]. Grousset: Hist. des. Croisades 1, p. 274.

[৭২]. Albert d' Aix, p. 696 & Guillaume de Tyr, p. 437.

[৭৩]. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৫০।

এ পর্যায়ে আমরা ইতিহাসের ধারাবর্ণনায় সামান্য বিরতি দিয়ে সিন্নাবরার যুদ্ধ ক্রুসেড ইতিহাসে যেসব গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সৃষ্টি করেছিল, অল্পকথায় তা আলোচনার প্রয়াস পাব।

১. বিশেষত পূর্বের অভিযানগুলোর নেতিবাচক ফলাফলের পর এ যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলিম সেনাদল বরং ব্যাপকভাবে সকল মুসলমানের আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে। এ দিক থেকে যুদ্ধটিকে মুসলমানদের আত্মপরিচয় পুনরুদ্ধারকারী যুদ্ধ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এ যুদ্ধে মুসলমানদের মনোবল ও মানসিক শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়, বিপরীতে ক্রুসেডারদের ভেতর ভর করে পরাজয়ের শঙ্কা। আর তাই আমরা দেখেছি, বিপুল সেনাসমাবেশের পরও তারা মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলা করতে সাহস করেনি।

২. এ যুদ্ধে ক্রুসেডাররা দুই হাজারের অধিক সৈন্য হারায়। তাদের প্রচুর সম্পদ, অস্ত্র হাতছাড়া হয়ে যায়। তাবারিয়া অঞ্চলসহ দক্ষিণ দিকে প্রায় আল-কুদস নগরী পর্যন্ত তাদের অধিকৃত বিভিন্ন দুর্গ ধ্বংস করা হয়।

৩. এ যুদ্ধের মাধ্যমেই মুসলমানদের ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াই-নীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। আত্মরক্ষামূলক নীতির পরিবর্তে প্রতিপক্ষের ওপর স্বপ্রণোদিত আক্রমণ-নীতির সূচনা হয়। নিঃসন্দেহে এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ রণকৌশল নীতি। এর জন্য প্রয়োজন সুউচ্চ যুদ্ধ-চেতনা ও অগাধ আত্মবিশ্বাস, যা সিন্নাবরার যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল।

৪. মুসলিম বাহিনীতে ঐক্যের গুরুত্ব সুস্পষ্ট হয়। মূলত দামেশক ও মসুলের ঐক্যবদ্ধ অংশগ্রহণে সিন্নাবরার যুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়েছিল। তা ছাড়া অনেকটা প্রতীকী হলেও সিনজারের আমির কুমাইরুক ও মারদিনের শাসক ইয়াজ বিন ইলগাজিও এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীতে শরিক ছিলেন।

৫. সম্ভবত এটিও সিন্নাবরার যুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্জন যে, এ যুদ্ধের মাধ্যমেই হাজিব আক সুনকুরের পুত্র মহান মুসলিম বীর ইমাদুদ্দিন জিনকি পাদপ্রদীপের আলোয় আসেন। এ যুদ্ধে তিনি অভিনব রণদক্ষতা ও বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের মাধ্যমে সকলের দৃষ্টি

কাড়তে সক্ষম হন। চতুর্দিকে তার কীর্তিগাথা ছড়িয়ে পড়ে। এ বিষয়টি পরবর্তী সময় ক্রুসেডবিরোধী লড়াইয়ে ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছিল। নিশ্চিতভাবেই আমাদের আগামী আলোচনায় এই অনন্য সাহসী যোদ্ধা ব্যাপকভাবেই জায়গা করে নেবেন। সামনে যথাস্থানে আমরা সবিস্তারে তার জীবনকথা আলোচনার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

মওদুদ-হত্যা

মওদুদ বিন তুনতেকিন ৫০৭ হিজরি সনে (১১১৩ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে) দামেশকে প্রবেশ করেন। তিনি পুরো শীতকাল দামেশকে কাটিয়ে নতুন করে সৈন্যসমাবেশ এবং ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের মনস্থ করেন।[৭৪]

এই ছিল তার মনোবাসনা। কিন্তু উম্মাহর শত্রুরা ভাবছিল ভিন্ন কিছু। তারা গোপনে গাদ্দারি ও বিশ্বাসঘাতকতার এমন জঘন্য চিত্র অঙ্কন করছিল, ইতিহাসের পাতায় যার দৃষ্টান্ত বিরল!

হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয় এই ভেবে যে, উম্মাহর এই শত্রুরা খ্রিষ্টান ক্রুসেডার ছিল না; ছিল মুসলিম সন্তান কিংবা অন্তত ইসলামি পরিচয়ের দাবিদার!

মওদুদ রহ. ৫০৭ হিজরি সনের রবিউস সানি মাসের শেষ শুক্রবার (১১১৩ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে) জুমার নামাজ আদায়ের জন্য দামেশকের কেন্দ্রীয় মসজিদে প্রবেশ করেন। নামাজ শেষে তিনি যখন তুগতেকিনের হাত ধরে মসজিদের চত্বরে পায়চারি করছিলেন, তখন হঠাৎ করে শিয়া বাতিনি গোষ্ঠীর জনৈক আততায়ী তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে খঞ্জর দ্বারা আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সমাপ্ত হয় জিহাদ, আত্মত্যাগ ও কর্ম-অবদানে সমৃদ্ধ এক মহীরুহের জীবন সফর।[৭৫] আমাদের ধারণা, তিনি শহিদানের কাতারে গণ্য হবেন। আল্লাহর সিদ্ধান্তের বাইরে আমরা তার পবিত্রতার ঘোষণা দিই না! আল্লাহই তার উত্তম বিধায়ক হোন।

---

৭৪. Setton: op.cit.,1 p. 402.

৭৫. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৫০।

তুগতেকিন দ্রুত ঘাতকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন। এমনকি তিনি বিক্ষুব্ধ হয়ে তার লাশ আগুনে জ্বালিয়ে দেন।[৭৬] এভাবেই তিনি মহান সেলজুক উজির নিজামুল মুলকের হত্যাকাণ্ডের পর শিয়া বাতিনি চক্রের কৃত সবচেয়ে ঘৃণ্য অপকর্মটির ওপর পর্দা টেনে দেন।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়—এই জঘন্য অপরাধের পেছনে কে বা কারা কলকাঠি নেড়েছিল? মুসলিম বিশ্ব যে মহান মুসলিম নেতাকে কেন্দ্র করে ক্রুসেডারদের ঘৃণ্য দখলদারিত্ব থেকে অধিকৃত ইসলামি ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখছিল, তাকে হত্যা করে কারা নিজেদের আখের গোছাতে চেয়েছিল?

আলেপ্পোর শাসক রিজওয়ান প্রচার করেন যে, দামেশকের আমির তুগতেকিনই ছিলেন এ হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী। ইবনুল আছির ও ইবনুল কালানিসির মতো নেতৃস্থানীয় ঐতিহাসিকগণও এ প্রচারণার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে নিজেদের ইতিহাসগ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন। অবশ্য তারা এ মতটি সংশয়পূর্ণ ভাষায় উল্লেখ করেছেন। তাদের ভাষ্য হলো—

> 'কথিত আছে, শাম অঞ্চলের বাতিনি শিয়ারা তাকে নিজেদের জন্য হুমকি বিবেচনা করে হত্যা করে। আরেকটি মত হলো স্বয়ং তুগতেকিনই তার প্রতি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ায় তাকে হত্যা করতে ঘাতক নিযুক্ত করেন।'[৭৭]

পরবর্তী সময়ে সমকালীন মুসলিম-খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকগণ নির্বিশেষে এই অপবাদটি লুফে নিয়ে একে প্রমাণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তুগতেকিনই যে মওদুদ-হত্যার মূল কুশীলব, তাদের এই বিশ্বাসের অন্যতম উৎস হলো তুগতেকিন কর্তৃক দ্রুত ঘাতকের বিচার কার্যকর এবং তাকে হত্যা করে তার লাশ জ্বালিয়ে ফেলা। তারা বলেন, এটি এক ধরনের অপরাধের প্রমাণ মুছে ফেলা এবং গোপন অপরাধ থেকে দায়মুক্তির চেষ্টা।[৭৮]

---

৭৬. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৫০ ও ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ১৮৭।

৭৭. প্রাগুক্ত।

৭৮. Albert d' Aix, pp. 700 & Guillaume de Tyr, p. 487.

কিন্তু আমার বিশ্বাস, এ ঘটনার পেছনে তুগতেকিনের হাত ছিল না। যারা তুগতেকিনকে অভিযুক্ত করে থাকে, তাদের দাবি হলো—তুগতেকিন মওদুদ ও তার বাহিনীর শক্তিমত্তা উপলব্ধি করতে পেরে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পেছনে মওদুদের মূল লক্ষ্য হলো শাম ও দামেশক দখল করা। তাই তিনি নিজের রাজ্য হাতছাড়া হওয়ার আগেই পথ পরিষ্কার করার পরিকল্পনা করেছিলেন। আমার দৃষ্টিতে তাদের এ দাবি বিভিন্ন কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন :

১. মওদুদের আচরণে কখনোই তুগতেকিন বা অন্য কোনো মুসলিম রাজন্যের প্রতি প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতকতার মনোভাব প্রকাশ পায়নি। বরং তাদের প্রত্যেকের প্রতি এমনকি যুদ্ধের ময়দানে যারা তার সঙ্গে সুস্পষ্ট প্রতারণা করেছে, তাদের প্রতিও তিনি ছিলেন চূড়ান্ত সদয় ও সহনশীল। তিনি কখনোই কোনো মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে জড়ানোর চিন্তাও করেননি। ঝানু ও অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ তুগতেকিনও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ তিন বছরের যুদ্ধের পুরোটা সময় মওদুদের এসব গুণের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন।

২. সিন্নাবরার যুদ্ধ শেষে মওদুদ তার বাহিনী মসুলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি নিজে দামেশকে প্রবেশ করেছিলেন তার অল্প কয়েকজন বিশেষ অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে। প্রতারণা করার ইচ্ছা থাকলে তিনি তো পুরো বাহিনী সঙ্গে নিয়েই দামেশকে প্রবেশ করতেন। নিঃসন্দেহে এ বিষয়টিও তুগতেকিনকে আশ্বস্ত করেছিল।

৩. স্বয়ং ইবনুল আছির সিন্নাবরার যুদ্ধ-পূর্ববর্তী আলোচনায় প্রমাণ করেছেন যে, এ সময় মওদুদ ও তুগতেকিনের মাঝে হৃদ্যতা ও নিষ্ঠাপূর্ণ সৌহার্দ্য-সম্পর্ক ছিল।[৭৯]

৪. এটা কোনোভাবেই যৌক্তিক নয় যে, তুগতেকিন মওদুদকে হত্যা করে নিজের পথ পরিষ্কার করবেন। তিনি জানতেন, ক্রুসেডাররা তার ওপর হামলে পড়লে একমাত্র মওদুদের কাছেই তিনি আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারবেন। নিঃসন্দেহে তুগতেকিন সিন্নাবরার যুদ্ধের

---

৭৯. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৪৪।

পর দামেশকে ক্রুসেডারদের প্রতিশোধ অভিযানের আশঙ্কা করছিলেন। তাই সুনির্দিষ্ট এই সময়েই তিনি এমন কিছু করবেন, যা ক্রুসেডারদের দ্রুত প্রতিশোধ নিতে প্ররোচিত করবে, এমনটি ভাবা মোটেও যৌক্তিক নয়।

৫. তুগতেকিনকে আমরা একাধিকবার ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হতে দেখেছি, বিভিন্ন বিষয়ে তাকে ঈমানি দাবির পক্ষে অবস্থান নিতেও দেখেছি। তার এসব আচরণে অনুমিত হয় যে, আর যাই হোক, মুসলমানদের আশার প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে মওদুদের ন্যায় একজন সৎ-নিষ্ঠাবান নেতাকে হত্যা করার মতো বিশ্বাসঘাতক তিনি নন। এর অর্থ এই নয় যে, তার কোনো অন্যায় হতে পারে না। অতীতে তার বিভিন্ন ভুল হয়েছে, ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহেও হয়তো হবে; বড় কোনো অন্যায় করাও তার মতো ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু মওদুদ-হত্যার ন্যায় জঘন্য অপরাধে অভিযুক্ত করার জন্য চাই শক্ত প্রমাণ; অন্তত অভিযোগ যদি আনা হয় তুগতেকিনের মতো কারও প্রতি।

৬. ঘাতককে দ্রুত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেই এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, তিনিই হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা ছিলেন। বরং এমনও হতে পারে যে, তিনি এমনটি করেছিলেন যেন তার প্রতি ঘাতকের ব্যাপারে গড়িমসি ও তার দুষ্কর্মে মৌন সম্মতির অভিযোগ আরোপিত না হয়। এ জাতীয় ঘটনায় আমরা দেখে থাকি, প্রথমে হত্যাকারীকে আটক করা হয়, এরপর গোপনে অর্থের বিনিময়ে সমঝোতা করে তাকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়। এ কথাও মানার মতো নয় যে, তুগতেকিন ঘাতকের সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ করেছেন এবং তাকে দিয়ে কাজ সারার পর প্রমাণ মুছতে তাকে সরিয়ে দিয়েছেন। কারণ, ঘাতক ছিল শিয়া বাতিনি গোষ্ঠীর সদস্য। আর পূর্বেও আমরা জেনেছি যে, তুগতেকিন বাতিনিদের ভয় করতেন। তাই নিজেকে বাতিনিদের চক্ষুশূলে পরিণত করে তিনি তাদের সঙ্গে প্রতারণা করবেন, এটি যৌক্তিক নয়।

৭. তুগতেকিনই মূল হত্যাকারী, এ দাবির স্বপক্ষে যখন শক্ত কোনো প্রমাণ নেই, তাহলে এটাই কি সমীচীন নয় যে, মওদুদ হত্যাকাণ্ডে

কারা বেশি উপকৃত হচ্ছে, আমরা তা খুঁজে বের করব, তারপর পুরো দায় তুগতেকিনের ঘাড়ে না চাপিয়ে আনুপাতিক হারে সন্দেহভাজন সকলের মধ্যে দায়ভার বণ্টন করে দেবো?!

হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা কে?!

বাস্তবতা হলো মওদুদ-হত্যায় স্বার্থভোগী পক্ষ ছিল অনেক। এক্ষেত্রে প্রথমেই আসবে আলেপ্পোর শাসক রিজওয়ানের নাম। রিজওয়ান হয়তো নিজেকে দায়মুক্ত প্রমাণ করতেই দ্রুত তুগতেকিনের প্রতি অভিযোগের আঙুল তুলেছিলেন। রিজওয়ান মওদুদকে প্রচণ্ড রকম অপছন্দ করতেন, ভয়ও করতেন প্রচণ্ড। তিনি ভুলে যাননি যে, মাত্র দু-বছর পূর্বেই ৫০৫ হিজরি সনে তিনি মওদুদ ও তার বাহিনীর মুখের ওপর আলেপ্পোর প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে মারাত্মক বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন। বরং তখন তিনি মওদুদের বিরুদ্ধে এন্টিয়কের শাসক টেনক্রেডের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন![৮০] এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তখন আলেপ্পোর জনগণ মওদুদের জন্য নগরদ্বার উন্মুক্ত করে দিতে বিক্ষোভ করেছিল। আর তাই এ সম্ভাবনা মোটেও অমূলক ছিল না যে, জনগণ এখন বিশেষ করে সিন্নাবরায় মওদুদের মহান বিজয় প্রত্যক্ষ করার পর আলেপ্পোকে মওদুদের মসুল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তুলবে।

নিঃসন্দেহে সিন্নাবরার বিজয় আলেপ্পোবাসীসহ সমকালীন মুসলিম উম্মাহর কাছে মওদুদের জনপ্রিয়তা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। তদুপরি আলেপ্পো ছিল মসুলের প্রতিবেশী-রাজ্য। অতীতেও অনেক সময় যিনি মসুল শাসন করেছেন, আলেপ্পোও তিনিই শাসন করেছেন। আর তাই মওদুদ আলেপ্পোতে তার রাজ্য সম্প্রসারণের চেষ্টা করলে তা একান্তই স্বাভাবিক হতো।

তা ছাড়া বাতিনি শিয়াদের সঙ্গে রিজওয়ানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কেবল সম্পর্কই নয়; তিনি আলেপ্পোর আপামর জনসাধারণের রুচি ও মতাদর্শের বিরুদ্ধে গিয়ে শিয়া মতাদর্শের মুখপাত্র ও সমর্থকে পরিণত হয়েছিলেন। এই সবকিছুই ইঙ্গিত বহন করে যে, মওদুদ হত্যাকাণ্ডে রিজওয়ানই সবচেয়ে বেশি লাভবান ছিলেন।

---

৮০. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৪৪।

সঙ্গে এ তথ্যও যোগ করুন যে, রিজওয়ান তুগতেকিনকে প্রচণ্ড ঘৃণা করতেন এবং তুগতেকিন তার রাজ্যে হানা দিতে পারেন, এমন আশঙ্কা করতেন। আমরা হয়তো এ তথ্যটিও ভুলে যাইনি যে, তিনি তার ভাই ও দামেশকের সাবেক শাসক দাক্কাকের প্রতিও প্রচণ্ড বিদ্বেষী ছিলেন। সাম্রাজ্য বিস্তারের লালসায় তিনি বহুবার দাক্কাকের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়েছিলেন। তা ছাড়া রিজওয়ানের পূর্বেও এ ধরনের গুপ্তহত্যার অভিজ্ঞতা ছিল। ইতিপূর্বে তিনি রাজ্য হারানোর আশঙ্কায় বাতিনি গুপ্তঘাতকের মাধ্যমে হিমসের আমির জানাহুদ্দৌলা হুসাইন বিন মালাইবকে হত্যা করিয়েছিলেন। অথচ জানাহুদ্দৌলা ব্যক্তিজীবনে ছিলেন রিজওয়ানের মায়ের স্বামী (সৎ বাবা)। কিন্তু এসব সম্পর্কের বিন্দুমাত্র মূল্য রিজওয়ানের কাছে ছিল না। আর তাই নেতৃত্ব ও ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য রিজওয়ানের কাছ থেকে কোনো অন্যায় আচরণই অপ্রত্যাশিত ছিল না। এসব যুক্তি পাশাপাশি রাখলে এ সম্ভাবনাই আমাদের কাছে প্রবল মনে হয় যে, আলেপ্পোর শাসক রিজওয়ানই ছিলেন এই ঘৃণ্য অপকর্মের মূল হোতা।

তবে রিজওয়ান একাই এ হত্যাকাণ্ডের মুনাফাভোগী ছিলেন না। কারও প্ররোচনা ছাড়াই খোদ বাতিনি শিয়াদেরও এতে বিরাট স্বার্থ ছিল। বাতিনিরা ছিল সমকালীন শাম অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য শক্তি; রিজওয়ান ও তুগতেকিনের মতো শামের প্রধান নেতারাও তাদেরকে সমীহ করত। সন্দেহ নেই, মওদুদের মতো একজন ভারসাম্যপূর্ণ সুন্নি মুজাহিদ নেতার উত্থান বাতিনিদের অন্যায়কর্মের পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছিল এবং তাদের অনাচার-অবিচারের জীবনে বাধা সৃষ্টি করছিল। আর অন্যায় গুপ্তহত্যায় এমনিতেও বাতিনিদের কুখ্যাতি ছিল। সুতরাং এ সম্ভাবনা মোটেও সুদূরপরাহত নয় যে, কারও প্ররোচনা ছাড়া বাতিনি গোষ্ঠী নিজেরাই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।

মওদুদ হত্যায় ক্রুসেডারদেরও স্বার্থ ছিল। মোটেও অসম্ভব নয় যে, তারা বাতিনি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মিত্রতা করেছিল এবং এই বরেণ্য মুজাহিদকে সরিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে প্রচুর অর্থসম্পদ, যুদ্ধাস্ত্র বা বিভিন্ন দুর্গের কর্তৃত্ব প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছিল। মওদুদ তো তখন শাম অঞ্চলে সকল ক্রুসেডারের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

এমনও হতে পারে যে, রিজওয়ান, শিয়া বাতিনি সম্প্রদায় ও ক্রুসেডার শক্তি তিন পক্ষের বা যেকোনো দুই পক্ষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। আমার মতে দামেশকের আমির তুগতেকিনের পরিবর্তে অভিযোগের তির এদের দিকে তাক করাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন—মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও কীভাবে একজন বাতিনি ঘাতক এ কাজের দুঃসাহস করল? ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও দোদুল্যমান ধর্মবিশ্বাসের অনুসারী হয়েও; এমনকি বিনাবাক্যে ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত হয়েও কোন নীতি-আদর্শে প্ররোচিত হয়ে সে এই আত্মঘাতী তৎপরতায় জড়াল?

আমরা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের শুরুর দিকেও উল্লেখ করেছি যে, শিয়া ইসমাইলি সম্প্রদায় মুসতালিয়া ও নিযারিয়া নামে দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। ৪৮৭ হিজরি সনে (১০৯৪ খ্রিষ্টাব্দে) অষ্টম উবায়দি খলিফা মুসতানসির বিল্লাহ মারা যাওয়ার পর তার দুই পুত্র মুসতালি ও নিযার ক্ষমতা নিয়ে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। তখন মিশরের তৎকালীন উজির বদর আল-জামালি বয়সে ছোট মুসতালিকে খলিফা পদে অধিষ্ঠিত করেন।[৮১] এ সময় মিশরে অবস্থানকারী অন্যতম প্রভাবশালী ইসমাইলি ধর্মপ্রচারক হাসান বিন সাবাহ নিযারের পক্ষাবলম্বন করেন। মুসতালি ক্ষমতা গ্রহণের পর হাসান নিযারকে নিয়ে মিশর থেকে শামে চলে যান[৮২] এবং সেখানে 'নিযারিয়া ইসমাইলিয়া' নামে শিয়াদের একটি চরম জঘন্য গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। এই গোষ্ঠীটিই ইতিহাসে 'বাতিনি সম্প্রদায়' নামে পরিচিতি লাভ করে। কারণ, তাদের দাবি হলো কুরআনের প্রতিটি আয়াতের একটি বাহ্যিক ও

---

[৮১]. আল-মাকরিজি, *ইত্তিআ'জুল হুনাফা বি-আখবারিল আইম্মাতিল ফাতিমিয়্যীনাল খুলাফা*, ৩/১১।

[৮২]. উজির বদর আল-জামালি হাসান বিন সাবাহকে বন্দি করে মাগরিবে নির্বাসিত করেছিলেন। কিন্তু হাসানকে বহনকারী জাহাজ পথিমধ্যে ঝড়ের কবলে পড়ে বাতাসের টানে শামের উপকূলীয় এলাকায় চলে যায়। তখন হাসান বিন সাবাহ আক্কার উপকূলীয় এলাকায় অবতরণ করেন এবং সেখান থেকে নিজের এলাকা ইস্পাহানে ফিরে যান। এরপর তিনি সেখানে নিযারের পক্ষে প্রচারণা চালাতে থাকেন। ওদিকে নিযার তার ভাই মুসতালির কারাগারে বন্দি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র হাদি বিন নিযার মিশর থেকে পালিয়ে পারস্যে হাসান বিন সাবাহর কাছে চলে আসেন এবং নিযারিয়া মতাদর্শের প্রসারে কাজ করতে থাকেন। [সম্পাদক]

একটি অন্তর্নিহিত মর্ম রয়েছে। সাধারণ মানুষ কেবল প্রথমটি জানে, আয়াতসমূহের বাতিনি ও অন্তর্নিহিত মর্ম একমাত্র তারাই জানে। এই দাবিকে উপজীব্য করে তারা কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করতে থাকে এবং ভ্রান্ত বিভিন্ন আকিদা ও ব্যাখ্যা তৈরি করে ইসলামের গণ্ডি থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে যায়।[৮৩]

হাসান বিন সাবাহই এই ভ্রান্ত গোষ্ঠীর মূল নেতা ছিলেন। তিনি তার অনুসারীদের হাশিশ (এক ধরনের নেশা উদ্রেককারী উদ্ভিদের নির্যাস) পান করাতেন। ফলে তাদের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেত এবং তারা তাদের 'শায়খ' হাসান বিন সাবাহর অন্ধ আনুগত্য শুরু করত।

এরপর হাসান আরও ভয়ানক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি তার অনুসারীদের জন্য দুর্গম পাহাড়ের পাদদেশে একটি মনোরম উদ্যান গড়ে তোলেন এবং এর নামকরণ করেন 'জান্নাত'! তিনি সেখানে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপণ করেন, সব জাতের ফল-ফলাদির ব্যবস্থা করেন এবং ছোট ছোট কৃত্রিম ঝরনা ও প্রস্রবণ তৈরি করেন। তিনি সেখানে তার অনুসারী সুদর্শনা তরুণীদের নিয়োজিত করেন।[৮৪]

হাসান তার যেকোনো অনুসারীকে প্রথমে হাশিশ পান করিয়ে পুরোপুরি অচেতন করে ফেলতেন, এরপর অচেতন অবস্থায় কথিত জান্নাতে নিয়ে আসতেন।[৮৫] অচেতন অনুসারী যখন কিছুটা চেতনা ফিরে পেয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় থাকত, তখন তার সামনে হরেক পদের খাবার ও পানীয় পরিবেশন করা হতো। এরপর সে সুন্দরী যুবতীদের সঙ্গে অপকর্মে লিপ্ত হতো। তারপর তাকে পুনরায় হাশিশ পান করিয়ে অচেতন করে ফেলা হতো এবং 'জান্নাত' থেকে বের করে নিয়ে আসা হতো। চেতনা ফিরে এলে তাকে বলা হতো, আবারও জান্নাতে ফিরতে চাইলে 'শায়খুল জাবাল' (হাসান বিন সাবাহ)-এর নিঃশর্ত আনুগত্য করতে হবে। এভাবে কয়েকবার হাশিশ পান ও কৃত্রিম উদ্যানে আনা-নেওয়া করে তাকে হাশিশের নেশায় আসক্ত করে তোলা হতো এবং কৃত্রিম জান্নাত ও তার

---

৮৩. আবু হামিদ আল-গাজালি, *ফাযাইহুল বাতিনিয়্যা*, পৃষ্ঠা : ১১ ও Grousset: Hist. des. Croisades I,p. 530.

৮৪. Marco Polo: Travels, p. 50.

৮৫. Michaud: op. cit.,II,pp. 72 -73.

ভোগসামগ্রীর প্রতি পাগলপারা করে তোলা হতো। তারপর একদিন তাকে নির্দেশ দেওয়া হতো—যাও, আত্মঘাতী অভিযানে অংশ নিয়ে প্রাণ উৎসর্গ করে এসো। তাহলে তুমি চিরদিন জান্নাতে থাকতে পারবে![৮৬]

অনুসারী হিসেবে তারা সাদাসিধা, চিন্তা-ধর্মে সরল, দরিদ্র-নিপীড়িত, গ্রাম্য-গোঁয়ার লোকদের বাছাই করত। এসব লোক নেতাদের হাতের পুতুলে পরিণত হতো এবং নেতারা যা আদেশ করত, নির্দ্বিধায় তা পালন করত।[৮৭]

বাতিনিরা গুপ্তহত্যাকে শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করেছিল এবং চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের নিত্যনতুন কৌশল উদ্ভাবন করে ব্যাপকহারে গুপ্তহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল। সশস্ত্র গোষ্ঠী হওয়ায় তাদের লাগাম টেনে ধরা ছিল অত্যন্ত কঠিন। এ কারণে তাদের নাম শুনলেই শাসক-প্রজা নির্বিশেষে সকলের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠত!

যেহেতু তারা হাশিশ পানে অভ্যস্ত ছিল, তাই ইতিহাসে তারা 'নিযারিয়া', 'বাতিনি' ইত্যাদি নামের পাশাপাশি 'হাশশাশিন' নামেও পরিচিত। ইতিহাসে এদের অন্যায়কর্মের ফিরিস্তি বেশ দীর্ঘ। তাদের অনেক হত্যাপ্রচেষ্টা যেমন সফল হয়, ব্যর্থও হয় অনেক অপচেষ্টা।[৮৮] কিন্তু সব সময়ই তারা ছিল ভীতি ও ত্রাসের প্রতীক এবং সত্যের পথিকদের চলার পথে বাধা সৃষ্টিকারী।[৮৯]

---

৮৬. Marco Polo: Travels, pp. 49 -53

৮৭. Ivanow: An Islamic Ode in Praise of Fidawis, pp. 63 -64.

৮৮. যেহেতু বাতিনিদের মূল লক্ষ্য ছিল সারা বিশ্বে নিজেদের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করা, তাই তারা মুসলিম বিশ্বকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দিক থেকে নেতৃত্বশূন্য করার লক্ষ্যে গুপ্তহত্যা ও আত্মঘাতী হামলার মাধ্যমে সমকালীন ইসলামি বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামি শক্তি যথা আব্বাসি খিলাফত, সেলজুক, খোয়ারিজমি, জিনকি ও আইয়ুবি সালতানাতের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। তারা আব্বাসি খলিফা মুসতারশিদ, রাশিদ, বাগদাদের উজির নিজামুল মুলক ও সুলতান মুহাম্মাদ ঘুরিকে হত্যা করে এবং সেলজুক সুলতান মালিকশাহ, জিনকি সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ ও আইয়ুবি সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবিকে হত্যা করার জন্য একাধিকবার চেষ্টা চালায়। [সম্পাদক]

৮৯. শিয়া ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের মূল শাখা তিনটি—কারামাতিয়া, মুসতালিয়া ও নিযারিয়া। কালের পরিক্রমায় বর্তমানে যেহেতু কারামাতিয়া ও মুসতালিয়াদের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে, তাই বর্তমানে ইসমাইলিয়া বলে নিযারিয়া বা বাতিনি গোষ্ঠীকেই বোঝানো হয়। বর্তমানে তারা 'আগাখানিয়া' নামে অধিক প্রসিদ্ধ। আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল,=

এই আলোচনার পর আশা করি কোনো পাঠকের কাছে এ বিষয়টি অসম্ভব মনে হবে না যে, নেতাদের প্ররোচনায় কীভাবে একজন বাতিনি গুপ্তঘাতক মুসলিম উম্মাহর এক মহৎ পুরুষকে হত্যার লক্ষ্যে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিল। হয়তো তাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল অনন্ত জান্নাতের কিংবা নিদেনপক্ষে চরম আসক্তির বস্তু এক পেয়ালা হাশিশের!

আসমানি ইশারা!

এ বিষয়ে শেষ কথা হলো, এই ঘৃণ্য এবং জঘন্য হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত রহস্য তো আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কেউ জানে না, তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ মহান এক নেতাকে হারায়; যিনি এমন দুর্যোগপূর্ণ সময়ে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঝান্ডা বহন করেছিলেন, যখন অন্য সবাই এই মর্যাদার কেতন বহন করতে উদাসীনতা প্রদর্শন করেছিল। নিঃসন্দেহে মওদুদের মৃত্যুপরবর্তী সময় ছিল মুসলিম উম্মাহর জন্য বড় কঠিন সময়। তবে মওদুদ রহ.-এর শাহাদাতপরবর্তী পরিস্থিতির বিশ্লেষণের পূর্বে আমি বিস্ময়কর দুটি ঘটনার অবতারণা করতে চাচ্ছি। ঘটনাদুটির সংঘটনে কোনো বিস্ময় নেই; বিস্ময় সংঘটনের সময়ে!

প্রথম ঘটনা মওদুদ রহ.-এর শাহাদাতের মাত্র তিন মাস পূর্বে সিন্নাবরার যুদ্ধে ইমাদুদ্দিন জিনকি নামক ইসলামি ইতিহাসের এক মহান বীরযোদ্ধার আত্মপ্রকাশ। বড় বিস্ময়কর সময় নির্বাচন! কেন তিনি আরও অনেক পূর্বে আলোচনায় এলেন না? কেন আত্মপ্রকাশ করলেন না মওদুদের মৃত্যুর অনেক দিন পর? এর একমাত্র উত্তর তো এই যে, এমনটিই ছিল তাকদিরের লিখন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নির্ধারণ। তবে আমরা এর অন্তর্নিহিত রহস্য ও সূক্ষ্ম ইঙ্গিত খুঁজে বের করতে পারি। এই সুনির্দিষ্ট সময়ে তার আত্মপ্রকাশের মাঝে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল যে—

=ইউরোপ ও ভারতে প্রচুর সংখ্যক আগাখানিয়া মতাদর্শী বসবাস করে। বর্তমানে তাদের প্রধান নেতা ফ্রান্সে বসবাসকারী ও ব্রিটিশ নাগরিকত্বের অধিকারী করিম হুসাইন শাহ (৪র্থ আগাখান), যিনি বিখ্যাত ফোর্বস ম্যাগাজিনের ভাষ্য অনুসারে বিশ্বের শীর্ষ দশ ধনীর একজন। [সম্পাদক]

"মুসলিম জাতি মৃত্যুঞ্জয়ী, চির অমর জাতি। মুসলিম জাতির অস্তিত্ব কখনোই কালের গর্ভে বিলীন হওয়ার নয়। আমরা একজন নেতা হারালে তৎক্ষণাৎ আরেকজন আত্মপ্রকাশ করবেন; একজন বীরসেনানী শহিদ হলে তার ঝান্ডা বহনে অগ্রসর হবেন আরেকজন। এ ধারা চলবে ততদিন, যতদিন না আল্লাহ তাআলা পৃথিবী ও পৃথিবীর ওপরের সবকিছুর চূড়ান্ত মালিকানা গ্রহণ করবেন।"

নিঃসন্দেহে রাব্বে কারিমের এই শাশ্বত নীতি মুসলমানদের হৃদয়ে বিজয়ের আশা জিইয়ে রাখে। ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে দেখুন। যেখানেই উম্মাহর আশা-প্রত্যাশার কোনো প্রদীপ নিভে যেতে দেখবেন, সেখানেই দেখবেন নতুন এক প্রদীপ জ্বলে উঠেছে। অনন্যসাধারণ জাতির এ এক অনন্য বৈশিষ্ট্য!

দ্বিতীয় বিস্ময়কর ঘটনা, মওদুদ রহ.-এর শাহাদাতের মাত্র তিন মাস পর ৫০৭ হিজরি সনের জুমাদাল উখরা মাসে (১১১৩ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে) আলেপ্পোর শাসক রিজওয়ানের প্রয়াণ![১০]

রহস্যজনক মওদুদ হত্যাকাণ্ডের পেছনে রিজওয়ানের হাত থাক বা না থাক, একই সময়ে তার প্রস্থান ছিল নিতান্তই আশ্চর্যকর। রিজওয়ানের চারিত্রিক কলুষতা ছিল সর্বজনজ্ঞাত। মওদুদ-হত্যাই তার প্রথম বা একমাত্র অপরাধ ছিল না; এর পূর্বেও তিনি উম্মাহর স্বার্থবিরোধী নানারকম অপকর্ম ঘটিয়েছেন। এই সুনির্দিষ্ট সময়ে তার ইহধাম ত্যাগের মাঝে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল যে—

"প্রতিটি মানুষের জন্য একটি 'আজাল' বা সুনির্ধারিত সময় আছে। কেউ তা এড়িয়ে যেতে পারে না। আজালের পূর্বেও কেউ মারা যায় না, আজালের পরেও না। মরতে হবে সবাইকে, কেউ থাকতে পারবে না চিরদিন। সচ্চরিত্র-অসচ্চরিত্র, নেককার-বদকার, নিষ্ঠাবান মুমিন-বিশ্বাসঘাতক মুনাফিক সবাইকে ছুঁয়ে যাবে মৃত্যু। শাহাদাতের তামান্নায় সম্মুখ লড়াইয়ে অগ্রসর হওয়া মুজাহিদ যেমন মৃত্যুবরণ করবেন, বেঁচে থাকার আশায়

---

[১০]. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৫১।

গৃহকোণে আত্মগোপন করা কাপুরুষও তেমনই হীমশীতল মৃত্যুথাবার শিকার হবে।”

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এক শাশ্বত বিধান—প্রতিটি প্রাণীই গ্রহণ করবে মৃত্যু-স্বাদ।[৯১] তবে নিজের মৃত্যুর পথ মানুষ নিজেই বেছে নেয়! সুতরাং আপনার পথও আপনিই বেছে নিন। পুণ্যবানদের দোয়া সঙ্গে নিয়ে রবের অনুগত বান্দা হিসেবে মাথা উঁচু করে মৃত্যুকে বরণ করে নেবেন, না-কি মুমিনদের অভিশাপ সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর অবাধ্য বান্দা হিসেবে লাঞ্ছনা মাথায় নিয়ে মারা যাবেন, তা নির্বাচনের দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত আপনারই হাতে! আল্লাহর কাছে প্রার্থনা—তিনি আমাদেরকে তার সুন্নাত ও শাশ্বত নীতি অনুধাবন করার তাওফিক দিন।

* * *

[৯১]. সুরা আলে-ইমরান: ১৮৫।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মওদুদ রহ.-এর শাহাদাতের পরবর্তী পরিস্থিতির বিশ্লেষণ

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, মওদুদ-হত্যাকাণ্ড ছিল ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ পট পরিবর্তক। একে কেন্দ্র করে সামরিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে অনেক রদবদল ঘটে; পরিবর্তন ঘটে অনেক রাজ্য ও শাসকের চিন্তা ও দর্শনে, আদর্শ ও কর্মপন্থায়। মহান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মৃত্যুর পর সব সময় এমনটিই হয়ে থাকে; বিশেষত প্রয়াত ব্যক্তি যদি মর্যাদা ও মহত্ত্বে হন মওদুদের মতো কেউ। মওদুদের ন্যায় মহান ব্যক্তির সমকালীনতা যেসব প্রজন্মের ভাগ্যে জোটে না, তাদের জন্য আফসোস ছাড়া আর কীই-বা করা যাবে! এমন দুর্ভাগা প্রজন্মের যাপিত জীবনে বছরের পর বছর কেটে যায়; কিন্তু তারা উপলব্ধি করতে পারে না যাপিত জীবনের মূল্য এবং সময়ের দাবি ও দায়িত্ব। এই পরিচ্ছেদে (সংক্ষিপ্ত পরিসরে) আমরা মওদুদ-হত্যাকাণ্ড পরবর্তী দীর্ঘ পাঁচ-ছয় বছর সময়ের আলোচনা ও বিশ্লেষণ করব। অথচ পূর্বের পরিচ্ছেদে মওদুদের যুগের আলোচনায় আমরা কেবল বছর নয়; মাস ধরে ধরে ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ করেছিলাম। কারণ, তার সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল অনেক, অধিকাংশ মাসই ছিল ঘটনাবহুল। ক্রুসেড ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় সামনে আমরা যখন নুরুদ্দিন মাহমুদ বা সালাহুদ্দিন আইয়ুবির ন্যায় মহান ব্যক্তিদের যুগের আলোচনা করব, তখনও ঘটনাগুরুত্বের বিবেচনায় আমাদের আলোচনা হবে মাসনির্ভর, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে দিন ও দিনক্ষণনির্ভর! মহান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ আপন আপন যাপিত কালের চলমান ঘটনাপ্রবাহে এভাবেই প্রভাব সৃষ্টি করে থাকেন!

মওদুদ-হত্যাকাণ্ড পরবর্তী কয়েক বছরের উল্লেখযোগ্য পরিস্থিতি আমরা সামনের কয়েকটি পয়েন্টে উল্লেখ করছি।

[এক] সামগ্রিকভাবে মুসলিম বিশ্বের জিহাদি আন্দোলন

দুঃখের বিষয় হলো সমকালীন মুসলিম উম্মাহ তখনও এতটা পরিণত হয়নি যে, একজন দূরদর্শী মুজাহিদ নেতার অনুপস্থিতিতেও জিহাদি কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে। মূলত একটি পরিণত জাতি কখনো ব্যক্তিবিশেষের ওপর নির্ভর করে না। বরং দু-চারজন মহান ব্যক্তি বিদায় নিলেও তাদের মাঝে পর্যাপ্ত বিকল্প বিদ্যমান থাকে এবং বাধা-বিপত্তি ও দুর্যোগ-বিপর্যয় সত্ত্বেও তারা সর্বদা অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে। তৎকালীন মুসলিম উম্মাহর এই অপরিপক্বতার কারণেই মওদুদ রহ.-এর শাহাদাতের পর পূর্ণ ছয় বছর বরং তার চেয়েও দীর্ঘ সময় প্রকৃত জিহাদি তৎপরতা স্থগিত থাকে। এর অর্থ এই নয় যে, এ সময় হিলাল-ছালিব সংঘাত ও যুদ্ধের ধারা থেমে ছিল। যুদ্ধ হয়েছে; কিন্তু সেগুলো মওদুদের যুদ্ধের মতো ছিল না। এ সময়ের যুদ্ধগুলো ছিল দায়সারাভাবে দায়িত্ব পালন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন, জনগণের চোখে ধুলো দেওয়া কিংবা সর্বোচ্চ শত্রু-আক্রান্ত অঞ্চলের জনগণের নিরুপায় প্রতিরোধ-জাতীয়। এসব যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে না জিহাদি প্রেরণা ছিল, না ঈমানি চেতনা। ব্যতিক্রম দু-একটি যুদ্ধে জিহাদি চেতনা পরিলক্ষিত হলেও অভাব ছিল সফলতা নিশ্চিত করার মতো দক্ষ নেতৃত্বের। আর তাই ৫১৩ হিজরি (১১১৯ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত পরবর্তী ছয় বছরের ঘটনাপ্রবাহে আমরা যদিও কিছু যুদ্ধাভিযান প্রত্যক্ষ করব; কিন্তু পরিতাপের বিষয়, সেগুলো সবই ছিল নিষ্প্রাণ লড়াই; যার সর্বোত্তম উপমা হতে পারে—চায়ের কাপে তুফান!

[দুই] মসুল রাজ্য

আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, তৎকালীন মসুলের জনগণ ছিল জিহাদ-অনুরাগী এবং ইলম ও আলিমদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই স্বাভাবিক প্রত্যাশা এটাই ছিল যে, মওদুদ রহ.-এর ইন্তেকালের পর কোনো সৎ ও পুণ্যবান ব্যক্তিই মসুলের প্রশাসক পদে অধিষ্ঠিত হবেন এবং শাসক ও জনতার মাঝে সমন্বয় ও সংগতি বজায় থাকবে। যদিও প্রশাসক নির্বাচনের অধিকার মসুলবাসীর ছিল না, ছিল সেলজুক সুলতান মুহাম্মাদের হাতে; কিন্তু এমনটিই সুন্নাতুল্লাহ ও আল্লাহ পাকের শাশ্বত নীতি। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

«كَمَا تَكُونُونَ يُوَلَّى عَلَيْكُمْ»

> তোমরা যেমন প্রকৃতির হবে, তোমাদের দায়িত্ব তেমন প্রকৃতির মানুষকেই প্রদান করা হবে।[৯২]

মওদুদের পর মসুলের প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন এক মহান ও শ্রেষ্ঠতম তুর্কি সেনাপতি আক সুনকুর আল-বুরসুকি।[৯৩] ঐতিহাসিক ইবনুল আছির তার চরিত্র-বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন—

> তিনি ছিলেন মহানুভব ও পুণ্যবান। আলিম, জ্ঞানসাধক ও সৎ লোকদের ভালোবাসতেন। চিন্তা ও কর্মে ন্যায়-নীতি বজায় রাখতেন। শ্রেষ্ঠতম প্রশাসক ছিলেন। নামাজের প্রতি যত্নবান ছিলেন; নিয়মিত রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়তেন।[৯৪]

আক সুনকুর রহ. যদিও ঈমানি চেতনা ও উন্নত চরিত্রগুণের অধিকারী ছিলেন; কিন্তু তার সামরিক ও রাজনৈতিক দক্ষতা একই মানের ছিল না। রাজনৈতিক দক্ষতার অভাবের কারণেই তিনি পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন মুসলিম রাজ্যের সঙ্গে পার্শ্বসংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। বিশেষ করে মারদিনের আমির ইলগাজি বিন উরতুকের সঙ্গে তার সংঘাত ছিল চলমান পরিস্থিতির বিচারে একেবারেই অর্থহীন। ইলগাজির সঙ্গে বিরোধের কারণেই তিনি উত্তর ইরাক ও দিয়ারে বকর অঞ্চলে বিদ্যমান উরতুক পরিবারের সকল রাজন্যের সমর্থন হারিয়ে ফেলেন।[৯৫] এর ফলে তার অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তার কর্মতৎপরতা একমুখী না হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।

অপরদিকে সামরিক দুর্বলতার কারণেই ৫০৮ হিজরি সনের জিলহজ মাসে (১১১৫ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে) এডেসায় ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করলেও তিনি উল্লেখযোগ্য বিজয় অর্জনে ব্যর্থ হন। অধিকন্তু ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ব্যর্থ অভিযান শেষে ফেরার পথে তিনি অভিযানে তাকে সহায়তা না করায় উরতুক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন এবং বিরাট পরাজয়ের শিকার হন। উরতুকিদের বিরুদ্ধে

---

৯২. আবু আবদুল্লাহ আল-কুযায়ি, *মুসনাদুশ শিহাব*, হাদিস নং ৫৭৭। ইমাম বায়হাকি রহ. একই অর্থবোধক একটি হাদিস ভিন্ন শব্দে রেওয়ায়েত করেছেন। দেখুন : বায়হাকি, *শুআ'বুল ঈমান*, হাদিস নং ৭৩৯১।

৯৩. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৫৩।

৯৪. প্রাগুক্ত, ৯/২৩৬।

৯৫. প্রাগুক্ত, ৯/১৫৩-১৫৪।

লড়াইয়ে তার পনেরো হাজার সদস্যবিশিষ্ট বাহিনী ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে সুলতান মুহাম্মাদ ৫০৯ হিজরি সনে (১১১৫ খ্রিষ্টাব্দে) তাকে মসুলের প্রশাসক পদ হতে বরখাস্ত করে জুয়ুশ বেগকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন।[৯৬]

যে বছর আক সুনকুরকে বরখাস্ত করা হয়, সে বছরই সেলজুক সুলতান মুহাম্মাদ একটি বিরাট বাহিনী গঠন করেন এবং হামাদানের প্রশাসক বুরসুক বিন বুরসুককে বাহিনীটির নেতৃত্ব প্রদান করেন। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পাশাপাশি বাহিনীটির দায়িত্ব ছিল সুলতান মুহাম্মাদের আনুগত্য প্রত্যাখ্যানকারী বিচ্ছিন্ন মুসলিম রাজ্যগুলোকে বশীভূত করা এবং তুগতেকিনের শাসনাধীন দামেশক রাজ্য ও বদরুদ্দিন লুলুর শাসনাধীন আলেপ্পো রাজ্যের মতো শাম অঞ্চলের যেসব স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য সেলজুক সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত ছিল না, সেগুলোকেও বশীভূত করা। মসুলের নতুন আমির জুয়ুশ বেগও এ অভিযানে প্রধান সেনাপতি বুরসুক বিন বুরসুকের অধীনে অংশগ্রহণ করেন।[৯৭]

বিষাদিত সে অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ আর কী দেবো! কেবল পরিণতির কথাই বলি। অভিযান শেষ হয় এক বিস্ময়কর নির্লজ্জ মোকাবিলার মধ্য দিয়ে; যার এক পক্ষে ছিল সেলজুক বাহিনী, অপর পক্ষে সম্মিলিত ক্রুসেডার বাহিনীর সঙ্গে দিয়ারে বকর, আলেপ্পো ও দামেশকের মুসলিম বাহিনী!

এসব মুসলিম রাজন্যের দৃষ্টিতে ক্রুসেডারদের চেয়ে সেলজুকরা ছিল অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ও অনিষ্টকর! তাই তারা সেলজুক মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এন্টিয়কের শাসক রজার ও অন্যান্য ক্রুসেডার নেতাকে মিত্রতার প্রস্তাব প্রদান করে! আর এভাবেই এসব অঞ্চলের মুসলিম বাহিনীগুলো ক্রুসেডারদের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের সঙ্গে এক পতাকাতলে সমবেত হয়ে অবতীর্ণ হয় 'মুসলিম শত্রু'-বিরোধী লড়াইয়ে!

নিঃসন্দেহে এটি ছিল চিন্তাগত দীনতা; বরং বলা ভালো দৃষ্টিভঙ্গির শূন্যতা! পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, কোনো বিচারেই এর কোনো

---

৯৬. প্রাগুক্ত ৯/১৬১।

৯৭. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৫৮।

যৌক্তিকতা ছিল না। এ ধরনের অযাচিত বিভক্তির বিবরণ শুনে যেকোনো শ্রোতাই বিস্ময়ে হতবাক হবেন; হোক তিনি মুসলিম কিংবা অমুসলিম!

আরও আক্ষেপের বিষয়, এ যুদ্ধ শেষ হয় বুরসুক ও তার নেতৃত্বাধীন সেলজুক বাহিনীর পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। মুসলিম-ক্রুসেডার জোট যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে অকল্পনীয় পরিমাণ সম্পদ লাভ করে। অবশ্য সমুদয় সম্পদই ক্রুসেডার নেতা রজার তার বাহিনীর জন্য নিয়ে নেন। রজার যখন এন্টিয়কে ফিরে আসেন, এন্টিয়কবাসীর তখন খুশির সীমা নেই! রজার যে শুধু বিপুল সম্পদরাজিই নিয়ে আসেননি; সঙ্গে নিয়ে এসেছেন মুসলিম শিবিরের বিভেদ-বিভক্তির সংবাদ![৯৮]

রণক্ষেত্রের নামের প্রতি সম্বন্ধ করে ইতিহাসে এ যুদ্ধ পরিচিতি লাভ করে 'দানিসের যুদ্ধ' নামে।

দানিসের যুদ্ধের পরও জুয়ুশ বেগ মসুলের প্রশাসক পদে বহাল থাকেন। পরবর্তী সময়ে তার পক্ষ থেকে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিশোধমূলক প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়নি।

যে মরণব্যাধি এভাবে জাতিকে ক্ষেত্রবিশেষে আপন ভাইয়ের রক্ত ঝরাতে প্ররোচিত করে, প্ররোচিত করে চরম শত্রুর সঙ্গে হাত মেলাতে, তার ছোবলে এভাবেই ব্যর্থ হয় মসুলবাসীর প্রচেষ্টা।

মওদুদের ইন্তেকালের পর মোটামুটি এই ছিল মসুলের হালচাল।

[তিন] ইমাদুদ্দিন জিনকি

এই সম্ভাবনাময় তরুণ যোদ্ধা বিভিন্ন যুদ্ধে নিজের দ্যুতি ছড়াতে থাকেন। সবাই তার ব্যতিক্রমী সামরিক দক্ষতার কথা জানতে পারে। অধিকন্তু সকলে উপলব্ধি করে যে, তিনি সেলজুক সুলতানদের পূর্ণ অনুগত এবং দ্বিধাহীন চিত্তে তাদের প্রতিটি আদেশ পালন করেন। এ কারণে বিভিন্ন যুদ্ধে তাকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ সময়ে সংঘটিত যুদ্ধগুলোতে তিনি বিজয়ের কেতন ওড়াতে না পারলেও সকলের মুখেমুখে ছিল ইমাদুদ্দিন জিনকি নামক এক সদ্য উদিত তারকার কীর্তি-আলোচনা।

---

৯৮. দেখুন: আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৫৯, উসামা বিন মুনকিয, *আল-ই'তিবার*, পৃষ্ঠা : ২০ ও Guillaume de Tyr, p. 489.

[চার] দামেশকের আমির তুগতেকিন

আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, মওদুদ-হত্যাকাণ্ডের পর রিজওয়ান প্রচার করেছিলেন, তুগতেকিনই তাকে হত্যা করেছেন। এই প্রচারণার মাধ্যমে রিজওয়ান প্রথমত নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে, দ্বিতীয়ত তুগতেকিনের দিক থেকে আশঙ্কামুক্ত হতে চেয়েছিলেন। রিজওয়ানের অপপ্রচারে আরও অনেকের মতো স্বয়ং সেলজুক সুলতান মুহাম্মাদও প্রভাবিত হয়ে পড়েন। তিনি মওদুদ-হত্যার দায়ভার তুগতেকিনের ওপর চাপান। তা ছাড়া দামেশকের অভ্যন্তরে অবস্থান করা অবস্থায় মওদুদের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব তুগতেকিনের কাঁধেই বর্তায়। এসব কারণে তুগতেকিন অনুভব করেন যে, তার চারপাশ ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসছে এবং সহযোগী মিত্রের সংখ্যা কমে আসছে। এ চিন্তা থেকেই তিনি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এক নিকৃষ্ট অন্যায় করে বসেন। সকলের অনিষ্ট আচরণ থেকে আত্মরক্ষা করতে তিনি এবার হাত মেলান ক্রুসেডারদের সঙ্গে।[৯৯]

দুর্বলতার সময়টুকু পার করার জন্য তিনি যদি বড়োজোর ক্রুসেডারদের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির চুক্তি করতেন, তাও মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু ক্রুসেডারদের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি করে তাদের সঙ্গে একই পরিখায় অবস্থান করে আপন মুসলিম ভাই সেলজুকদের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়া না ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য, না বিবেকের কাঠগড়ায় ক্ষমাযোগ্য।

অবশ্য অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, মওদুদ হত্যাকাণ্ডে তুগতেকিন জড়িত ছিলেন না। কারণ, মওদুদের ছত্রছায়া হারিয়ে ফেলার পরপরই তিনি নতুন আশ্রয়ের আশায় ক্রুসেডারদের সঙ্গে মিত্রতা করেছিলেন। এতে এ ধারণাই দৃঢ়তা লাভ করে যে, তিনি নিজেই নিজের মূল অবলম্বনকে হত্যা করতে পারেন না। এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, দামেশকে মওদুদের আগমনের অব্যবহিত পূর্বেই তিনি ক্রুসেডারদের অধিকৃত বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে এবং ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সুর নগরবাসীকে সহায়তা করে ক্রুসেডারদের উত্তেজিত করেছিলেন।

---

৯৯. Grousset: Hist. des. Croisades 1, pp. 276-277.

যাই হোক, তুগতেকিনের এই অন্যায় অবস্থানের কারণে দামেশকের মতো একটি বৃহৎ নগরী চলমান সংঘাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক পাশে সরে পড়ে। অবশ্য এ তথ্যটিও প্রণিধানযোগ্য যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাতিনি শিয়াদের প্রভাব-নিয়ন্ত্রণ থাকায় এমনিতেও দামেশকের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি কখনোই স্থিতিশীল ছিল না।

[পাঁচ] আলেপ্পো রাজ্য

৫০৭ হিজরি সনে (১১১৩ খ্রিষ্টাব্দে) দুরাচারী রিজওয়ানের মৃত্যুর পর আলেপ্পো রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন তার তরুণ পুত্র আলপ আরসালান। মহান পিতামহ আলপ আরসালানের নামে নাম হলেও তিনি কোনো দিক থেকেই পিতামহের যোগ্য উত্তরসূরি ছিলেন না; বরং পিতার মতো তিনিও ছিলেন চরম হঠকারী, অবিবেচক ও ধর্মীয় চেতনাশূন্য। নিজের একচ্ছত্র ক্ষমতা নিশ্চিত করতে শুরুতেই তিনি তার দুই সহোদর মালিকশাহ ও মুবারকশাহকে হত্যা করেন।[১০০] কিন্তু তিনি ছিলেন ভীরু ও দুর্বল চিত্তের একজন শাসক। দায়িত্ব গ্রহণ করার পরই নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং ক্রুসেডারদের রোষানল থেকে আত্মরক্ষা করতে তিনি এন্টিয়ক শাসক রজারকে জিজিয়া কর প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।[১০১]

অবশ্য তার শাসনামলের শুরুতেই এমন এক ঘটনা ঘটে, যা প্রমাণ করে যে, আলেপ্পোবাসীর মাঝে তখনও সামান্য হলেও কল্যাণ-গুণ অবশিষ্ট আছে। রিজওয়ানের শাসনামলে আলেপ্পোতে বাতিনি গোষ্ঠী অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল। আলপ আরসালানের শাসনামলের শুরুতে জনগণ তাদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং পালের গোদা আবু তাহির আস-সায়িগকে হত্যা করে। এরপর উত্তেজিত জনতা বাতিনিদের ওপর চড়াও হয়ে তাদের হত্যা ও আটক করতে থাকে। কূলকিনারা না পেয়ে অবশিষ্ট বাতিনিরা দ্রুত আলেপ্পো ছেড়ে পালিয়ে যায়।[১০২] আগ্রাসী বাতিনি গোষ্ঠী যদিও সন্ত্রাসকর্মে কুখ্যাত ছিল; কিন্তু এই ব্যতিক্রমী জনতার সহসা উত্থান

---

১০০. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৫১ ও ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১৬৭।

১০১. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১৬৮।

১০২. প্রাগুক্ত : ২/১৬৮-১৬৯।

তাদেরকে ভীত করে তোলে। তারা অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করে যে, দীর্ঘ বিশ বছর বাতিনি-শিয়া আদর্শ-প্রভাবিত শাসনব্যবস্থার অধীনে বসবাস করার পরও আলেপ্পোর জনগণের চেতনা ও মর্যাদাবোধ বিলুপ্ত হয়নি, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি সুন্নাহ ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর প্রতি তাদের হৃদ্যতা ও আকর্ষণ। সম্ভবত এ ঘটনা পরবর্তী বছরগুলোতে আলেপ্পোর জনগণের মেজাজ ও প্রকৃতির ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। নিশ্চিত করেই এ বিষয়টি ভবিষ্যৎ জিহাদি আন্দোলনের অঙ্গনে ব্যাপক প্রভাব রাখতে সক্ষম হবে।

এ তথ্যটিও প্রণিধানযোগ্য যে, এই আলপ আরসালান বেশিদিন আলেপ্পোর ক্ষমতা ভোগ করতে পারেননি। বরং তার আতাবিক বদরউদ্দিন লুলু তাকে হত্যা করে তার ছোট ভাই ছয় বছরের শিশু সুলতান শাহকে ক্ষমতায় বসান। এর মাধ্যমে কার্যত আলেপ্পোর শাসনক্ষমতা চলে যায় বদরউদ্দিন লুলুর হাতে।[১০৩] কোনো সন্দেহ নেই যে, এর ফলে আলেপ্পোর অবস্থান অনেক বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে। আগামীর ঘটনাপ্রবাহে এ বিষয়টিও বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

[ছয়] ইলগাজি বিন উরতুক

ইলগাজি বিন উরতুক এক আজব চরিত্রের ধারক!

ক্রুসেড ইতিহাসে আমি তার মতো বিস্ময়কর চরিত্রের মানুষের দেখা পাইনি!

তিনি মারদিনের আমির। তিনি সেই সুকমান বিন উরতুকের সহোদর, যিনি জিহাদের সফরে ইন্তেকাল করেছিলেন।

তাকে নিয়ে বিস্ময়বোধের কারণ চিন্তা ও কর্মে তার দ্বিমাত্রিক অবস্থান; যা তার ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণকে বেশ কঠিন করে দিয়েছে। আমি বহুবার তার ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়িয়ে দিশেহারা হয়ে থেমে গেছি; উপলব্ধি করতে পারিনি যে, তিনি প্রশংসা-যোগ্য সৎ ব্যক্তি, নাকি নিন্দার পাত্র অসৎ চরিত্র!

---

১০৩. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১৭২-১৭৩ ও ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ১৯০।

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, মওদুদ রহ. যখন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করেছেন, তখন তিনি তাতে সহায়তা করেছেন। আবার আমরা তাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লুট করার লালসায় প্রয়াত মুসলিম আমির সুকমান আল-কুতবির বাহিনীর ওপর হামলা চালাতেও দেখেছি! পূর্বে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, হামাদানের আমির বুরসুক বিন বুরসুকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি ক্রুসেডারদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন।[১০৪] আবার আগামী ঘটনাপ্রবাহে আমরা তাকে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে দেখব; দেখব বিজয় ছিনিয়ে এনে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে।

আমরা এখানে তার আলোচনা আলাদাভাবে এজন্য করেছি যে, মওদুদের শাহাদাতের পর মুষ্টিমেয় যে কজন ব্যক্তি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদের পতাকা সমুন্নত রেখেছিলেন, ইলগাজি ছিলেন তাদের একজন। এরপর তাদের হাত থেকেই এ পতাকা বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন ইসলামি ইতিহাসের এক অনন্যসাধারণ বীরযোদ্ধা। সে ইতিহাস আমরা শীঘ্রই জানতে পারব।

[সাত] বাইতুল মুকাদ্দাস সাম্রাজ্য

মওদুদ হত্যাকাণ্ড ছিল ইসলামি ভূখণ্ডে বাইতুল মুকাদ্দাসের ক্রুসেড সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ প্রচেষ্টার সূচনা-ইঙ্গিত। কারণ, পূর্বের আলোচনায় আমরা জেনেছি, মওদুদ হত্যাকাণ্ড ১ম বল্ডউইনের সামনে থেকে কেবল একজন মহান বীর সেনাপতিকেই সরিয়ে দেয়নি; দামেশকের আমির তুগতেকিনকেও করে দিয়েছিল বল্ডউইনের আজ্ঞাবহ। এর ফলে বল্ডউইন অনেকটাই আশঙ্কামুক্ত হয়ে যান এবং আপন সাম্রাজ্যের অবস্থান শক্তিশালী করার পাশাপাশি রাজ্যপরিধি বিস্তারের পরিকল্পনাও শুরু করেন।

বল্ডউইনের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র সম্পর্কে ধারণা পেতে আমরা এবার তাকে একটু কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করব। পূর্বেও আমরা উল্লেখ করেছি যে, তিনি যখন এডেসায় ক্রুসেড রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তখন তিনি সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ আর্মেনীয় জনগোষ্ঠীর সমর্থন লাভ এবং তাদেরকে নিয়ন্ত্রণের

---

১০৪. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৫৯।

উদ্দেশ্যে আরডা নামক এক আর্মেনীয় নারীকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু এখন তো তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসক। বাইতুল মুকাদ্দাসে আর্মেনীয় জনগোষ্ঠীর লোকজন ছিল না। আর তাই আর্মেনীয় আরডা এখন তার কাছে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়! এ কারণেই বল্ডউইন এ সময় আরডাকে পরিত্যাগ করে অন্য কোনো নারীকে বিয়ে করার মাধ্যমে নতুন কোনো স্বার্থ উদ্ধারের পরিকল্পনা করেন! কিন্তু খ্রিষ্টান ক্যাথলিক মতাদর্শে বিবাহবিচ্ছেদ ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ!

বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজা ১ম বল্ডউইন এ সমস্যারও সমাধান খুঁজে বের করেন। তিনি আরডার বিরুদ্ধে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনেন। এ সময় বাইতুল মুকাদ্দাসের গির্জাধ্যক্ষ ছিলেন বল্ডউইনের কাছের মানুষ আরনাল্ফ মালকোরন! বন্ধুর যোগসাজশে অভিযোগ প্রমাণিত হয়, বিবাহবিচ্ছেদও কার্যকর হয়। পরিত্যক্তা আরডাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কনস্টান্টিনোপলে।

অনুকূল পরিবেশ পেয়ে এরপর ১ম বল্ডউইন আরেকটি 'রাজনৈতিক বিয়ে' সম্পন্ন করেন। মওদুদের মৃত্যুর বছর তিনি বিয়ে করেন সিসিলির প্রশাসক ১ম রজারের বিধবা স্ত্রীকে।[১০৫] তিনি আশা করছিলেন এর মাধ্যমে তিনি বড় দুটি স্বার্থ হাসিল করবেন। একদিকে বিরাট সামরিক শক্তির অধিকারী ইতালিয়ান নরম্যানদের সঙ্গে বাইতুল মুকাদ্দাস সাম্রাজ্যের সম্পর্ক মজবুত হবে, অপরদিকে প্রচুর বিত্ত-বৈভবের অধিকারী বিধবা নারী অ্যাডেলেইড (Adelaide)-এর অঢেল সম্পদ কাজে লাগিয়ে অব্যাহত যুদ্ধ পরিস্থিতিতে শূন্য হয়ে পড়া বাইতুল মুকাদ্দাসের কোষাগার পূর্ণ করা যাবে।[১০৬]

এভাবে দৃশ্যপট থেকে মওদুদ ও তুগতেকিনের প্রস্থান এবং বল্ডউইনের সামরিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি একই সময়ে সংঘটিত হওয়ায় বল্ডউইনের সামনে সাম্রাজ্যবাদী লালসা বাস্তবায়নের অবারিত সুযোগ সৃষ্টি হয়। ৫০৯ হিজরি সনে (১১১৫ খ্রিষ্টাব্দে) মৃতসাগরের দক্ষিণে অবস্থিত ওয়াদি আরাবা (Wadi Araba) অঞ্চল দখল করার মধ্য দিয়ে তার এই লালসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। শাম অঞ্চল থেকে মিশর বা হিজাযগামী কাফেলাসমূহের

---

১০৫. Guillaume de Tyr, pp. 473 -474 & Setton: op.cot.,1 p.102.

১০৬. Cam. Med. Hist. Vol. 5,p. 184.

ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে তিনি সেখানে 'শোবাক' (Shoubak/ Montréal castle) নামে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন।[১০৭]

পরের বছর অর্থাৎ ৫১০ হিজরি সনে (১১১৬ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি পুরো নেগেভ মরুঅঞ্চল পাড়ি দিয়ে আকাবা উপসাগরের তীরবর্তী আয়লা (Ayla) অঞ্চল দখল করেন এবং শাম বা মিশর থেকে হিজাযগামী কাফেলাসহ এ অঞ্চলে চলাচলকারী অন্যান্য কাফেলাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সেখানেও একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেন।[১০৮] আকাবা উপসাগরের অভ্যন্তরে ফেরাউন দ্বীপে (Pharaoh's Island) তিনি নির্মাণ করেন আরেকটি দুর্গ। এ অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি ফিলিস্তিন-মিশর সীমান্তে সরাসরি নজরদারি করার সক্ষমতা অর্জন করেন, পাশাপাশি লাভ করেন লোহিত সাগরমুখী গুরুত্বপূর্ণ এক করিডোর।[১০৯]

এভাবে মুসলমানদের জিহাদি তৎপরতা বন্ধ থাকার সুযোগ কাজে লাগিয়ে বল্ডউইন আসকালান ব্যতীত পুরো ফিলিস্তিন অঞ্চল এবং সুর নগরী ব্যতীত লেবাবনের অর্ধেক (দক্ষিণাঞ্চল) নিজের অধিকারে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। পরবর্তী সময়ে এটিই বাইতুল মুকাদ্দাস সাম্রাজ্যের সীমানা বিবেচিত হয়।[১১০]

বরং মুসলমানদের লাঞ্ছনাকর নীরবতায় বল্ডউইন আরও দুঃসাহসী হয়ে ওঠেন। তিনি তার বাহিনীর ক্ষুদ্র একটি অংশ নিয়েই মিশরে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেন! সিনাই অঞ্চল অতিক্রম করে প্রথমেই তিনি অতি সহজে আরিশ নগরী দখল করে নেন। এরপর অভিযান অব্যাহত রেখে তিনি (বর্তমান পোর্ট সাইদের নিকটবর্তী) ফারামা (Pelusium) অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।[১১১] বল্ডউইন সেখানকার মসজিদ ও জনবসতি জ্বালিয়ে দেন।[১১২] এ সময় কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে না পড়লে তিনি হয়তো তার এ অভিযান পূর্ণ করেই ছাড়তেন। প্রচণ্ড অসুস্থতার কারণে

---

১০৭. Grousset: L'Empire du Levant, p. 213 & Runciman: op. cit., II, pp. 97-98.

১০৮. Setton: op.cit.,1 p.406.

১০৯. Albert d' Aix, p. 703.

১১০. Grousset: Hist. des. Croisades 1,pp. 283.

১১১. Albert d' Aix, p. 706.

১১২. আবুল মাহাসিন, *আন-নুজুমুয যাহিরা*, ৫/১৭১।

তিনি এরপর অভিযান মুলতবি করে প্রত্যাবর্তনের মনস্থ করেন। এসব ঘটনা ঘটে ৫১২ হিজরি সনে (১১১৮ খ্রিষ্টাব্দে)।[১১৩]

[আট] এডেসা রাজ্য

মওদুদের মৃত্যুর পর এবং বিশেষ করে সামরিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে তুলনামূলক অদক্ষ ও অযোগ্য নেতারা বিভিন্ন মুসলিম রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণের পর এডেসা রাজ্য নতুন করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে সক্ষম হয়। এ সুযোগে এডেসা রাজ্য আশেপাশের অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন শুরু করে। এডেসা নৃপতি বল্ডউইন ডি বুর্গ ৫১০ হিজরি সনে (১১১৬ খ্রিষ্টাব্দে) কায়সুম ও রাবান নগরী দখল করে নেন।[১১৪] এরপর ৫১১ হিজরি সনে (১১১৭ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি দখল করেন আলবেরা (Birecik) নগরী।[১১৫] সবশেষে একই বছর তিনি পতন ঘটান আলেপ্পোর উত্তরে অবস্থিত অতি গুরুত্বপূর্ণ কোরিস (Coris) দুর্গের। এর মাধ্যমে তিনি সরাসরি আলেপ্পোর ওপর নজর রাখার এবং প্রথম সুযোগেই নগরীটির পতন ঘটানোর সক্ষমতা অর্জন করেন। আলেপ্পো এবার একই সঙ্গে এডেসা ও এন্টিয়ক দুই ক্রুসেড রাজ্যের সম্ভাব্য শিকারে পরিণত হয়।[১১৬]

[নয়] এন্টিয়ক ও ত্রিপোলি রাজ্য

আলোচ্য সময়ে রাজ্যদুটিতে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। তবে পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে রাজ্যদুটি এ সময় নিজেদের সমরশক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে এবং নতুন নতুন দুর্গ ও নগরপ্রাচীর নির্মাণ করে। পাশাপাশি রাজ্যদুটি প্রত্যাশিত সম্প্রসারণের প্রস্তুতি হিসেবে নিজেদের সামরিক জনবল বৃদ্ধিতেও সচেষ্ট হয়। এ সময়ে রজার যেমন এন্টিয়কের শাসক পদে বহাল ছিলেন, পন্সও তেমনই বহাল ছিলেন ত্রিপোলির শাসক পদে।

[দশ] উত্তরাঞ্চলের আর্মেনীয় জনগোষ্ঠী

মওদুদের মৃত্যুর পর এডেসার শাসক বল্ডউইন ডি বুর্গ নিজেকে অনেকটা নিরাপদ ভাবতে থাকেন। এ সময় তিনি অনুভব করেন যে,

---

১১৩. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৭৮।
১১৪. Matthieu d' Edesse, pp. 116, 117.
১১৫. Setton: op. cit., 1 p. 405.
১১৬. Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 301.

এডেসা নগরীর মূল চালিকাশক্তি আর্মেনীয়দের হত্যা ও বিতাড়নের কারণে নগরীটির সামগ্রিক পরিস্থিতি অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। যেহেতু ইতিমধ্যে 'মওদুদ সমস্যা'র সমাধান হয়ে গেছে, তাই তার দৃষ্টিতে আর্মেনীয়দের পুনরায় এডেসায় ফিরিয়ে আনাতে কোনো সমস্যা ছিল না। আর্মেনীয়রাও বল্ডউইনের আহ্বানে দ্বিধাহীন চিত্তে সাড়া দিয়ে নিজেদের বাড়িঘর ও কৃষিক্ষেত্র ফিরে পাওয়ার সুযোগ কাজে লাগায়। অবশ্য এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মনে ক্রুসেডারদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা ও বিদ্বেষ সুপ্ত রেখেই তারা এডেসায় ফিরে আসে। এ আশঙ্কাও তাদের মনে ছিল যে, ক্রুসেডাররা ভবিষ্যতেও তাদের ওপর দমননীতি চালাতে পারে; আবারও ফিরে আসতে পারে গণহত্যা ও গণবিতাড়নের মতো বিয়োগান্ত ঘটনা।[১১৭]

এডেসার অধিবাসী আর্মেনীয়রা বাহ্যত ক্রুসেডারদের সঙ্গে সহাবস্থান মেনে নিলেও এডেসার বাইরের আর্মেনীয়দের অবস্থান ছিল ভিন্ন। তারা ক্রুসেডারদের সঙ্গে সহযোগিতা বিনিময়ের আহ্বান পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে। বরং ৫০৬ হিজরি সনে (১১১২ খ্রিষ্টাব্দে) মৃত্যুবরণকারী আর্মেনীয় নেতা কোগ বাসিলের বিধবা স্ত্রী ৫০৮ হিজরি সনে (১১১৪ খ্রিষ্টাব্দে) কোনো প্রকার দ্বিধা ছাড়া মসুলের প্রশাসক আক সুনকুরের কাছে তাকে ও তার জনগণকে মসুলের অধীনস্থ করে নেওয়ার জন্য সুস্পষ্ট ভাষায় আবেদন জানান এবং আনুগত্যের নিদর্শন হিসেবে জিজিয়া কর প্রদানের অঙ্গীকার করেন।[১১৮]

এভাবেই একের পর এক ঘটনা এ বিষয়টি প্রমাণ করে যে, আর্মেনীয় খ্রিষ্টানরা তাদের স্বধর্মীয় ক্রুসেডারদের চেয়ে মুসলমানদের উদারতা ও ন্যায়বিচারের প্রতি হাজার গুণ বেশি আস্থা রাখত।

সারকথা এই দাঁড়াল যে, মহান মুজাহিদ মওদুদের মৃত্যুপরবর্তী পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে এ অঞ্চলে বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়, যার সিংহভাগই ছিল ক্রুসেডারদের অবস্থান দৃঢ়করণে সহায়ক। পাশাপাশি মুসলিম রাজ্যগুলোতেও বেশ কিছু রাজনৈতিক রদবদল ঘটে, যার বেশিরভাগই ইতিবাচক ছিল না। একমাত্র ইতিবাচক

---

১১৭. Grousset: Hist. des. Croisades 1, pp. 491.

১১৮. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ২/১৫৩-১৫৪।

পরিবর্তন হিসেবে চিহ্নিত করা যায় আলেপ্পোর শাসক রিজওয়ান বিন তুতুশের মৃত্যুকে, যার মাধ্যমে মুসলমানরা এক দাম্ভিক অত্যাচারীর অপশাসন থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বিয়োগ ঘটনা

এরপর ৫১১ হিজরি সনের শেষভাগে, ৫১২ হিজরি সনে এবং ৫১৩ হিজরি সনের শুরুতে (১১১৭ ও ১১১৮ খ্রিষ্টাব্দে) হিলাল-ছালিব উভয় শিবিরে বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির বিয়োগ ঘটনা ঘটে, যা উভয় শিবিরের চলমান সংঘাতে মৌলিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

[এক] সেলজুক সুলতান মুহাম্মাদ

সুলতান মুহাম্মাদ মাত্র সাইত্রিশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি পুরো সেলজুকশক্তিকে একীভূত করে এক বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা আব্বাসি খিলাফত ও সমকালীন মুসলিম জনসাধারণের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযান প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে মওদুদের আমলে কিছু অভিযান সফলতার মুখ দেখে, আবার আক সুনকুর ও বুরসুক বিন বুরসুকের আমলে প্রেরিত অভিযানসমূহ ব্যর্থ হয়। ইবনুল আছির রহ. তার সম্পর্কে বলেছেন, 'তিনি ন্যায়পরায়ণ, সচ্চরিত্র ও সাহসী ছিলেন।' তবে তার অন্যতম বড় বিচ্যুতি ছিল নিজ পুত্র মাহমুদকে পরবর্তী সুলতান নির্বাচন। অথচ তখন মাহমুদের বয়স ছিল মাত্র চৌদ্দ বছর![১১৮]

পরিতাপের বিষয় হলো, বয়সে যত ছোটই হোক, নিজের বংশীয় উত্তরাধিকারীকে পরবর্তী শাসক নিযুক্ত করে যাওয়া যেন সে সময়ের রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই অপ্রাপ্তবয়স্ক শাসক হতেন কাগজে-কলমেই ক্ষমতাবান, প্রকৃত ক্ষমতা চলে যেত তার অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়কের হাতে এবং রাজ্য পরিচালিত হতো তত্ত্বাবধায়কের মর্জিমতো।

সুলতান মুহাম্মাদের মৃত্যু ও সুলতান মাহমুদের দায়িত্বগ্রহণের ফলে সেলজুক সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বিবাদ-বিসংবাদ ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়,

---

১১৮. প্রাগুক্ত, ৩/১৬৭-১৬৮।

সেলজুকরা হারিয়ে ফেলে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি। বিবাদ একপর্যায়ে সশস্ত্র লড়াইয়ে রূপ নেয়; সুলতান মাহমুদ তার দুই ভাই মাসউদ ও তুগরল এবং চাচা সানজারের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন।[১২০] এসব অন্তঃকলহ হিলাল-ছালিব সংঘাতে অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ক্রুসেডারদের কথা ভুলে মুসলিম শিবির ব্যস্ত হয়ে পড়ে নিজেদের নিয়ে!

[দুই] আলেপ্পোর শাসক বদরউদ্দিন লুলু

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আলেপ্পোর শাসক পদে সুলতান শাহ অধিষ্ঠিত থাকলেও কার্যনির্বাহী ক্ষমতা মূলত তার আতাবিক বদরউদ্দিন লুলুর হাতেই ছিল। বদরউদ্দিন লুলুকে তার জনৈক সহযোগী হত্যা করে। রিজওয়ানের মৃত্যু ও তার পুত্র আলপ আরসালানের হত্যাকাণ্ডের পর বিগত কয়েক বছর আলেপ্পো-পরিস্থিতি এমনিতেই বেশ অশান্ত ছিল, আর এর পরপরই ঘটে বদরউদ্দিন লুলুর নিহত হওয়ার ঘটনা। তাই রাজ্যের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এ সময় পরিস্থিতির পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়। তারা আশেপাশের অঞ্চলসমূহের বিবেচনায় তুলনামূলক শ্রেষ্ঠতম শাসক ইলগাজি বিন উরতুকের কাছে গিয়ে তার হাতে আলেপ্পোর শাসনভার অর্পণ করে। ফলে হঠাৎ করেই ইলগাজি মারদিন ও আলেপ্পো উভয় অঞ্চলের শাসকে পরিণত হন। ইলগাজির জন্য এটি অবশ্য নির্ভেজাল উপহার ছিল না! আলেপ্পোর দায়িত্ব গ্রহণ করার পরই তিনি বিভিন্ন রকম সমস্যার মুখোমুখি হন। রিজওয়ানের জমানো অবৈধ সম্পদের পুরোটাই বদরউদ্দিন খরচ করে ফেলায় রাজ্যের কোষাগার ছিল কার্যত শূন্য। এভাবে এ অঞ্চলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও আলেপ্পো এ সময় পরিণত হয় করুণা ও অনুকম্পার পাত্রে।[১২১]

[তিন] আব্বাসি খলিফা মুসতাযহির বিল্লাহ

আটাশতম আব্বাসি খলিফা মুসতাযহির বিল্লাহ ৪৮৭ হিজরি থেকে ৫১২ হিজরি সন (১০৯৪-১১১৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।[১২২] এরপর খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন তার পুত্র মুসতারশিদ বিল্লাহ। নতুন খলিফা পূর্ববর্তী খলিফাদের মতো ছিলেন না। তিনি ছিলেন

---

১২০. প্রাগুক্ত, ৯/১৮১-১৮৫, ১৯১-১৯২।

১২১. প্রাগুক্ত।

১২২. প্রাগুক্ত, ৯/১৭৩।

উচ্চাভিলাষী, উন্নত মনোবল ও কঠোর ব্যক্তিত্বের অধিকারী, নির্ভীক ও সাহসী। তিনি ফকিহ আলিম ছিলেন। হাদিসশাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম ইবনুস সালাহ রহ. শাফিয়ি মাজহাবের শ্রেষ্ঠতম আলিমদের তালিকায় তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনুস সালাহ-এর ন্যায় একজন বিদগ্ধ শাস্ত্রজ্ঞের এই স্বীকৃতিকে নিঃসন্দেহে খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করা যায়। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে আমরা লক্ষ করব যে, খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহর খিলাফতকাল ইসলামি অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখে যেতে সক্ষম হবে। কারণ বিগত দুই শতাব্দীর অন্যান্য খলিফার ন্যায় তিনি কাগুজে খলিফা হওয়াকে মেনে নেবেন না; বরং খলিফা পদ ও খলিফার মতামত যেন সকলের কাছে ওজনদার বিবেচিত হয়, এমন পরিবেশ-পরিস্থিতি তৈরিতে সর্বোচ্চ সচেষ্ট থাকবেন। তার এই প্রচেষ্টা নিশ্চিত করেই এ অঞ্চলে বিভিন্ন সংঘাতের জন্ম দেবে, যা চলমান ঘটনাপ্রবাহে বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে।

[চার] বাইতুল মুকাদ্দাস সাম্রাজ্যের রাজা ১ম বল্ডউইন

১ম বল্ডউইনকেই বাইতুল মুকাদ্দাস সাম্রাজ্যের মূল প্রতিষ্ঠাতা গণ্য করা হয়। তিনি তার শাসনামলে বাইতুল মুকাদ্দাস সাম্রাজ্যকে যে বিস্তৃত সীমানায় পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন, পরবর্তী দশকের পর দশক তা অক্ষত ছিল। তিনি আসকালান ব্যতীত ফিলিস্তিন অঞ্চলের সকল নগরীর পতন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন, অধিকার করেছিলেন সুর নগরী বাদে লেবানন অঞ্চলের পুরো দক্ষিণার্ধ। তিনি মিশরের ফারামা অঞ্চল দখল করার পর সেখান থেকে ফেরার পথে ৫১১ হিজরি সনে (১১১৮ খ্রিষ্টাব্দে) আরিশ অঞ্চলে ইহধাম ত্যাগ করেন।[১২৩] তার মৃত্যুর পর ক্রুসেডারদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে তার চাচাতো ভাই ও এডেসার শাসক বল্ডউইন ডি বুর্গ বাইতুল মুকাদ্দাস সাম্রাজ্যের নতুন রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হন।[১২৪] নিঃসন্দেহে এই মনোনয়ন ছিল বল্ডউইন ডি বুর্গের জন্য অভাবনীয় উন্নতির নিদর্শন। কারণ, আল-কুদস নগরীর অত্যুচ্চ মর্যাদা ও বাইতুল মুকাদ্দাস সাম্রাজ্যের বিস্তৃত আয়তনের কারণে বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসকই অন্য ক্রুসেড রাজ্যগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। তা ছাড়া ক্রুসেডারদের প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য

---

১২৩. প্রাগুক্ত, ৯/১৭৮।

১২৪. Guillaume de Tyr,1, p.. 519 & Runciman: op. cit., II, pp. 143 -144.

রাষ্ট্র ইমারত বা রাজ্য পর্যায়ের হলেও বাইতুল মুকাদ্দাস ছিল একটি পরিপূর্ণ রাষ্ট্র।

এরপর থেকে বল্ডউইন ডি বুর্গ '২য় বল্ডউইন' নামে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে চলে আসার সময় তার ফুফাতো ভাই জোসেলিন ডি কার্টেনিকে এডেসা রাজ্যের শাসক নির্বাচিত করেন।[১২৫] যদিও ইতিপূর্বে তিনি জোসেলিনকে তিল-বাশিরের প্রশাসক পদ থেকে বরখাস্ত করেছিলেন; কিন্তু ততদিনে উভয়ের মধ্যকার বিরোধের অবসান ঘটেছিল। ২য় বল্ডউইন এক্ষেত্রে এ বিষয়টিও বিবেচনা করেন যে, এডেসাসহ শামের উত্তরাঞ্চল সম্পর্কে জোসেলিনের বেশ ভালো জানা-শোনা আছে।

[পাঁচ] ১ম বল্ডউইনের দ্বিতীয় স্ত্রী অ্যাডেলেইড

এখানে এ তথ্যটি প্রণিধানযোগ্য যে, ১ম বল্ডউইন যখন অ্যাডেলেইডকে বিয়ে করেন, তখন ক্রুসেডারদের মধ্যে যারা তার বিরুদ্ধাচারী ছিল, তারা এর সমালোচনায় মেতে ওঠে। তারা প্রচার করে যে, বল্ডউইনের প্রথম স্ত্রী আরডাকে পরিত্যাগ করার কার্যকারণ ছিল জাল ও বানোয়াট। সুতরাং অ্যাডেলেইড তার একমাত্র স্ত্রী নন; বরং দ্বিতীয় স্ত্রী। আর খ্রিষ্ট ধর্মমতে একসঙ্গে দুই স্ত্রী গ্রহণ অবৈধ। এ সময় পোপ ২য় পাসকাল বিষয়টির তদন্ত করার জন্য গির্জার প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। তদন্তে এ বিষয়ে বল্ডউইনের প্রতারণা প্রমাণিত হয় এবং দ্বিতীয় বিয়েকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। ফলে দীর্ঘ চার বছর বল্ডউইনের সঙ্গে বাস করার পর অ্যাডেলেইড এবার সিসিলিতে ফিরে যেতে বাধ্য হন! এর ফলে বাইতুল মুকাদ্দাস সাম্রাজ্য ইতালিয়ান নরম্যানদের শক্তি ও অ্যাডেলেইডের সম্পত্তি হাতছাড়া করে ফেলে। এর অল্প কিছুদিন পর অ্যাডেলেইড সিসিলিতেই মারা যান,[১২৬] এদিকে আরিশে মারা যান রাজা ১ম বল্ডউইন।

---

১২৫. Stevenson: op. cit., p. 106.

১২৬. Runciman: op. cit., II, pp. 105-106.

[ছয়] আল-কুদসের গির্জাধ্যক্ষ আরনাল্ফ মালকোরন

পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আরনাল্ফ মালকোরন দুশ্চরিত্র হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।[১২৭] ১ম বল্ডউইনের সঙ্গে আঁতাঁত করে তিনি খ্রিষ্টধর্ম-বিরোধী বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেন। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে আরডার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ ও অ্যাডেলেইডকে বিয়ে করার ক্ষেত্রে ১ম বল্ডউইনকে অন্যায় সহায়তার বিষয়টি। আরনাল্ফ মালকোরনের মৃত্যুর পর বাইতুল মুকাদ্দাসের গির্জাধ্যক্ষের দায়িত্ব লাভ করেন জেরমন্ড (Germond)।[১২৮]

[সাত] রোমের পোপ ২য় পাসকাল

পোপ ২য় পাসকালের মৃত্যুর পর নতুন পোপ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ২য় জেলাসিউস (Pope Gelasius II)। অবশ্য ক্রুসেড ইতিহাসের বিচারে এটি গুরুত্বপূর্ণ কোনো পরিবর্তন ছিল না। কারণ, ক্রুসেড রাজ্যগুলো ততদিনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠায় ইউরোপ থেকে নতুন করে সৈন্য সংগ্রহের কোনো প্রয়োজন ছিল না। আর তাই চলমান ঘটনাপ্রবাহে পোপের নাম ও পদক্ষেপ তেমন একটা প্রতিভাত হতো না।

[আট] বাইজান্টাইন সম্রাট ১ম অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোস

ধূর্ত বাইজান্টাইন সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোস ছিলেন ক্রুসেড আগ্রাসনের অন্যতম নেপথ্য নায়ক। তিনি অভিযানের জন্য ক্রুসেডারদের আহ্বান জানানো হতে শুরু করে রসদপত্র, যুদ্ধাস্ত্র, প্রয়োজনীয় তথ্য, পথপ্রদর্শক ও সীমিত পরিসরের জনবল জোগান দিয়ে ইসলামি ভূখণ্ডে তাদের প্রবেশের পথ সুগম করেছিলেন। যদিও ক্রুসেডাররা পরবর্তী সময়ে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং চুক্তি অনুযায়ী অধিকৃত বিভিন্ন অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ তাকে প্রদান করতে অস্বীকার করেছিল; কিন্তু তারপরও ক্রুসেড অভিযান থেকে তার প্রাপ্তির খাতা একেবারে শূন্য ছিল না। তিনি এশিয়া মাইনরের পশ্চিমাঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে অঞ্চলটিকে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অ্যালেক্সিয়াস

---

১২৭. Runciman: op. cit., II, pp. 105–106.

১২৮. Runciman: op. cit., II, pp. 143-144.

কমনিনোসের মৃত্যুর পর বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের হাল ধরেন তার পুত্র ২য় জন কমনিনোস (John II Komnenos)।[১২৯]

[নয়] এন্টিয়কের শাসক রজার সালের্নো

পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, রজার মূলত এন্টিয়কের অন্তর্বর্তীকালীন শাসক ছিলেন। তিনি মূলত এন্টিয়ক ক্রুসেড রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ১ম বোহেমন্ডের পুত্র ২য় বোহেমন্ডের বয়সে পরিণত হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মৃত্যু-তালিকায় তার নাম সবার শেষে এজন্য আনা হলো যে, তার মৃত্যু হয়েছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ এক যুদ্ধে। সামনে আমরা সে যুদ্ধের আলোচনা করব। সম্ভবত মওদুদ-পরবর্তীকালে এটিই ছিল প্রথম উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ।

বালাতের যুদ্ধ

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, আলেপ্পো-প্রশাসনের মূল নিয়ন্ত্রক বদরউদ্দিন লুলুর মৃত্যুর পর রাজ্যটি নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়ায় রাজ্যটির উলামায়ে কেরাম ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একটি প্রতিনিধিদল মারদিনের আমির ইলগাজি বিন উরতুকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাজ্যের দায়িত্বভার তার হাতে তুলে দেয়। এ সময় এন্টিয়কের শাসক রজার আলেপ্পোতে সৃষ্ট প্রচণ্ড দুর্বল পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করে নগরীটিকে নিজ রাজ্যভুক্ত করার প্রচেষ্টা চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। ক্রুসেডারদের যুদ্ধপ্রস্তুতির সংবাদ জানতে পেরে ইলগাজিও তৎপর হয়ে ওঠেন। তিনি আলেপ্পো নগরীর প্রতিরক্ষার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থান থেকে সেনাসংগ্রহ শুরু করেন। দামেশকের আমির তুগতেকিন এ সময় ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সম্মতি প্রকাশ করায় তিনি তার সঙ্গে মিলে একটি শক্তিশালী জোট গড়তে সক্ষম হন। তুগতেকিনের এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে, মওদুদ রহ.-এর মৃত্যুর পর তিনি হৃদ্যতাবশত ক্রুসেডারদের সঙ্গে মিত্রতা করেননি; বরং পরিস্থিতির নাজুকতায় অসহায় হয়েই এমন ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মুসলিম জোটে আরও যোগ দেন শাইজারের আমির সুলতান বিন মুনকিয, যিনি মওদুদের আমলেও বেশ কয়েকটি ক্রুসেডবিরোধী অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

---

১২৯. Runciman: op. cit., II, pp. 143-144.

সকলের সহযোগিতায় একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠন করার পর ইলগাজি এন্টিয়ক অভিমুখে যাত্রা করেন। আরতাহ-এর নিকটবর্তী বিস্তৃত সমতল ভূমিতে মুসলিম বাহিনী অতর্কিতে এন্টিয়কের ক্রুসেডার বাহিনীর ওপর আপতিত হয় এবং তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে।

মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল বিশ হাজার। অপরদিকে এন্টিয়কের বাহিনীতে পদাতিক ও অশ্বারোহী যোদ্ধা মিলিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার সৈন্য ছিল।[১৩০] রজার ইতিমধ্যে বাইতুল মুকাদ্দাসের নতুন শাসক ২য় বল্ডউইনের কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করে বার্তা প্রেরণ করেছিলেন। বল্ডউইনও ত্রিপোলির শাসক পন্সকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত আগমনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।[১৩১] কিন্তু আল্লাহর তাআলার অনুগ্রহে সহায়ক ক্রুসেডার বাহিনী আগমনের পূর্বেই মুসলিম বাহিনী অতর্কিতে তাদের ওপর আক্রমণ চালাতে সক্ষম হয়।

সমতল প্রান্তরটিতে সংঘটিত হয় ক্রুসেড ইতিহাসের এক ঐতিহাসিক যুদ্ধ। ইতিহাসে যুদ্ধটি 'বালাতের যুদ্ধ' নামে খ্যাত। ৫১৩ হিজরি সনের ১৬ রবিউল আউয়াল (১১১৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ জুন) সংঘটিত এ যুদ্ধে ক্রুসেডার বাহিনী সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়। এন্টিয়ক অধিপতি রজারও নিহত হন।[১৩২] প্রচুর সৈন্য নিহত হওয়ায় পরবর্তী সময়ে ক্রুসেডাররা ল্যাটিন ভাষায় জায়গাটির নামকরণ করে ager sanguinis (রক্তের প্রান্তর)![১৩৩]

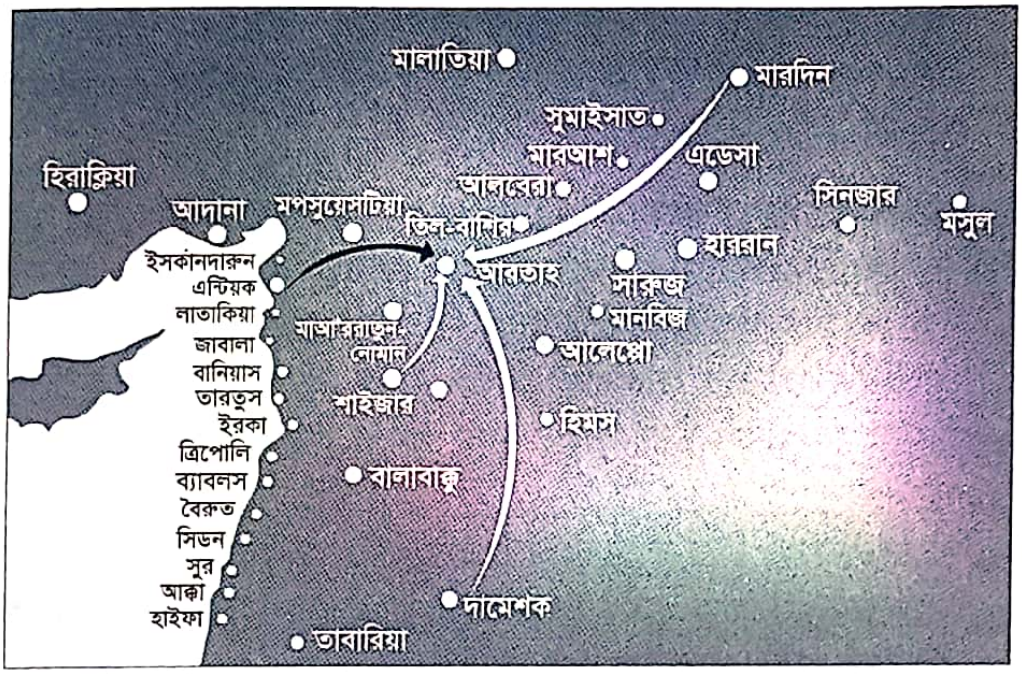
---

১৩০. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/ ১৮৫।

১৩১. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ২০০-২০১।

১৩২. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১৮৮ ও Guillaume de Tyr, 1,pp. 525 -526.

১৩৩ সাইদ আস্তর, *আল-হারাকাতুস সালীবিয়্যা*, ১/৪০৫।



মানচিত্র নং-২৫

বালাতের যুদ্ধ

সর্ববিচারেই এটি ছিল এক ঐতিহাসিক ও মহিমান্বিত বিজয়। বালাতের বিজয় চলমান পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। যেমন :

১. এ যুদ্ধ মুসলমানদের প্রভাব পুনরুদ্ধারে এবং হতাশায় আচ্ছন্নদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে ভূমিকা রাখে। মুসলমানরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, জাতির ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন এখনো শেষ হয়ে যায়নি।

২. ক্রুসেডাররা বিরাট মনস্তাত্ত্বিক পরাজয়ের শিকার হয়, যা পরবর্তী বছরগুলোতে তাদের তৎপরতায় ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

৩. এ যুদ্ধের পর আলেপ্পো নিয়মতান্ত্রিকভাবে উরতুকিদের শাসনে চলে যায়, যা বহাল ছিল পরবর্তী পূর্ণ ছয় বছর।

৪. এন্টিয়ক এমন একসময় শাসকহারা হয়ে পড়ে, যখন দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত বিকল্প কোনো নেতা বা প্রয়াত শাসক রজারের কোনো উত্তরাধিকারী ছিল না। অপ্রাপ্তবয়স্ক ২য় বোহেমন্ড তখনও ইতালিতেই ছিল। এ কারণে বাইতুল মুকাদ্দাস সাম্রাজ্যের রাজা ২য় বল্ডউইন

এন্টিয়কের তত্ত্বাবধান করতে থাকেন এবং এন্টিয়কের গির্জাধ্যক্ষ বার্নার্ড ডি ফালিস-এর সহায়তায় নতুন করে রাজ্যটির প্রশাসনিক বিন্যাস শুরু করেন।[১৩৪]

৫. ক্রুসেডবিরোধী সমরাঙ্গনে নতুন তারকা হিসেবে আবির্ভূত হন ইলগাজি বিন উরতুক। নতুন আব্বাসি খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহর পক্ষ থেকে ইলগাজিকে সম্মানসূচক উপহার প্রেরণ করা হয়। কবি-সাহিত্যিকগণ তার প্রশংসায় কবিতা রচনা করে। অনেক মুসলিম জনসাধারণ তাকে নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনতে শুরু করে। এতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইলগাজি নতুন করে আরও কয়েকটি যুদ্ধে ক্রুসেডারদের মুখোমুখি হন। কিছু যুদ্ধে তিনি বিজয়ী হন, পরাজয়ও ভাগ্যে জোটে কিছু যুদ্ধে। অবশ্য এসব যুদ্ধ গুরুত্ব ও প্রভাব বিচারে ঐতিহাসিক বালাতের যুদ্ধের সমস্তরের ছিল না।[১৩৫]

মওদুদ রহ.-এর শাহাদাতের ছয় বছর পর ৫১৩ হিজরি সনে (১১১৯ খ্রিষ্টাব্দে) এসে সার্বিক পরিস্থিতি যে রূপ ধারণ করে, তা আমরা সংক্ষেপে নিম্নোক্ত কয়েকটি পয়েন্টে তুলে ধরতে পারি।

১. বাইতুল মুকাদ্দাস সাম্রাজ্য এখন '২য় বল্ডউইন' উপাধিধারী বল্ডউইন ডি বুর্গের শাসনাধীন।

২. এডেসা রাজ্যের শাসক পদে আছেন জোসেলিন।

৩. এন্টিয়ক রাজ্য আপাতত ২য় বল্ডউইনই দেখাশোনা করছেন। ২য় বোহেমন্ড পরিণত বয়সে উপনীত হয়ে ইতালি থেকে আগমন করলে তিনি তার হাতে এন্টিয়কের শাসনভার তুলে দেবেন।

---

১৩৪. Stevenson: op. cit., p.104.

১৩৫. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৯৪, ১৮৬। ইলগাজিকে নিয়ে যেসব কবিতা রচিত হয়েছিল, তার একটি হলো—

قل ما تشاء فقولك المقبول　　وعليك بعد الخالق التعويل

واستبشر القرآن حين نصرته　　وبكى لفقد رجاله الإنجيل

আপনি যা ইচ্ছা বলুন; গৃহীত হবে আপনারই কথা। স্রষ্টার পর আপনিই আমাদের ভরসা।

আপনি যখন কুরআনের সহায়তা করছিলেন, কুরআন তখন পুলকিত হচ্ছিল। ওদিকে ইঞ্জিল তো তার অনুসারীদের বিয়োগ-বেদনায় কাঁদছে।

৪. ত্রিপোলি রাজ্যের শাসক পদে বারট্রামের পুত্র পন্স অধিষ্ঠিত আছেন।

৫. মুসলিম রাজ্য আলেপ্পো এখন ইলগাজি বিন উরতুকের কর্তৃত্বাধীন। এ সময় তিনিই ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।

৬. দামেশকের শাসনক্ষমতা তুগতেকিনের হাতেই আছে। তিনি নতুন করে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছেন। কেবল এন্টিয়ক রাজ্যের বিরুদ্ধেই নয়; ইতিমধ্যে তিনি দক্ষিণে বাইতুল মুকাদ্দাস সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধেও লড়াই শুরু করেছেন।

৭. মসুলের প্রশাসক পদে অধিষ্ঠিত আছেন বাহ্যত সুলতান মাহমুদের অনুগত জুয়ুশ বেগ। অবশ্য সুলতান মাহমুদের ভাই মাসউদ এ সময় মসুলেই অবস্থান করছিলেন। মাসউদ মসুল নগরীকে সুলতান মাহমুদের কর্তৃত্বাধীন সেলজুক সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের অধীনে আনার লক্ষ্যে জুয়ুশ বেগের সহায়তায় ভাই মাহমুদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন।

৮. আইনগত ও আনুষ্ঠানিকভাবে সুলতান মাহমুদই ছিলেন সেলজুকদের প্রধান নেতা। কিন্তু অভ্যন্তরীণ সংঘাতের কারণে এ সময় সেলজুক সাম্রাজ্য কার্যত বিভক্ত ছিল।

৯. আব্বাসি খিলাফতের লাগাম এখন খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহর হাতে। তিনি সেলজুক সুলতানের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে এসে খিলাফতের হারানো প্রভাব ও ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তৎপর আছেন।

১০. বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য এখন নতুন সম্রাট ২য় জন কমনিনোসের শাসনাধীন। তিনি তার পিতা প্রয়াত সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোসের রাজনৈতিক আদর্শই অনুসরণ করছিলেন। এ কারণেই এ সময় হিলাল-ছালিব সংঘাতে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যকে উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা রাখতে দেখা যায়নি।

এই সংক্ষিপ্ত চিত্র সামনে রেখে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, এ সময় সামগ্রিক চিত্র তুলনামূলক ইতিবাচক ছিল। অবশ্য ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াই করে ইসলামি ভূখণ্ড মুক্ত করার চেতনা ও সংকল্প তখনও সুস্পষ্টরূপে দৃশ্যমান হয়নি। এর জন্য আমাদের প্রতীক্ষা করতে হবে আরও আটটি বছর! তখন দৃশ্যপটে আবির্ভূত হবেন এক মহান ব্যক্তি,

যিনি এই চেতনা ও সংকল্প লালন করে ইসলামি ভূখণ্ডের স্বাধীনতা অর্জনকে আপন জীবনের মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করে নেবেন।

ইলগাজির অক্ষমতা

এবার জানা যাক, কী ঘটেছিল পরবর্তী আট বছরে অর্থাৎ ৫১৩ হিজরি সন হতে ৫২১ হিজরি সন পর্যন্ত সময়ে?

এ সময় ইলগাজি বিন উরতুক উরতুক পরিবারের জন্য একটি বৃহৎ রাজ্য গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। তিনি সুবিস্তৃত দিয়ারে বকর অঞ্চলের প্রায় পুরোটাই নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন। ফলে উত্তরে সিলভান (Silvan) এবং দক্ষিণে মারদিন ও হাসানকেইফসহ দিয়ারে বকর অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন নগরী উরতুক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। দিয়ারে বকর অঞ্চলের বাইরে দক্ষিণের হাররান নগরীতেও তিনি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। আর পুরো আলেপ্পো রাজ্য তো পূর্বেই তার কর্তৃত্বে চলে এসেছিল।

স্বাভাবিকভাবেই এ সুবিশাল রাজ্য ক্রুসেডারদের বিরাট শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারা দ্রুত ইলগাজি ও তুগতেকিনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় এবং বালাতের যুদ্ধে পরাজয়ের দুই মাসেরও কম সময় পর ১১১৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ আগস্ট সংঘটিত এক যুদ্ধে ইলগাজি ও তুগতেকিনের সম্মিলিত মুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করে।[১৩৬] অবশ্য ফলাফলের বিচারে একে চূড়ান্ত ও নিষ্পত্তিমূলক বিজয় বলা যায় না। ইলগাজি এ পরাজয়ে হতোদ্যম না হয়ে নতুন করে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন এবং বিশেষ করে উরতুক রাজ্যের নিকটবর্তী এডেসা অঞ্চলে হামলা চালান। ১১২০ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে তিনি আযায (Azaz) নগরীতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।[১৩৭] অবশ্য এ বছরই ইলগাজি নিশ্চিন্তে তার সুবিস্তৃত রাজ্যের পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করতে অনেকটা বাধ্য হয়ে ২য় বল্ডউইনের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করেন।[১৩৮]

ইলগাজি যখন সুবিস্তৃত উরতুক রাজ্যের পুনর্গঠনে ব্যস্ত, ইরাক ও মসুলের পরিস্থিতি তখন প্রচণ্ড রকম অশান্ত হয়ে ওঠে। এর ফলে তিনি আব্বাসি

---

১৩৬. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১৯১-১৯২।

১৩৭. Foucher de Chartres, pp. 445-446.

১৩৮. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১৯১-১৯২ ও Foucher de Chartres, p. 446.

খিলাফত বা সেলজুক সালতানাতের যেকোনো ধরনের হস্তক্ষেপের আশঙ্কা থেকে মুক্ত হয়ে নিশ্চিন্তে নিজের রাজ্য গোছাতে থাকেন। সে বছরই অর্থাৎ ৫১৪ হিজরি সনে (১১২০ খ্রিষ্টাব্দে) সেলজুক সুলতান মাহমুদ ও (মসুলের আমির জুয়ুশ বেগের সমর্থনপুষ্ট) তার ভাই মাসউদের মধ্যে কঠিন সংঘাত ও লড়াইয়ের ঘটনা ঘটে। সুলতান মাহমুদের বিজয় ও পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণে আসার মধ্য দিয়ে এই বেদনাদায়ক বিরোধের সমাপ্তি ঘটে।[১৩৯]

অবশ্য ইরাকবাসীর দুর্যোগ দুই সেলজুক সুলতানের সংঘাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আরব বনু মাজিদ গোত্রের দুবাইস বিন সাদাকা নামক জনৈক শিয়া এ সময় ইরাকে বিদ্রোহের ডাক দেয়। সে তার অনুসারীদের নিয়ে বাগদাদে পৌঁছে খলিফার প্রাসাদ ঘেরাও করে। নিরুপায় খলিফা সুলতান মাহমুদের কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করলে তিনি তার বাহিনী নিয়ে রওনা হন। পরিস্থিতি নাজুক বুঝে দুবাইস পালিয়ে ক্রুসেড রাজ্য এডেসা-সংলগ্ন জাযিরা অঞ্চলের উত্তরে আশ্রয় নেয়। অবশ্য এর পূর্বেই সে বাগদাদে ব্যাপক নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এরপর দুবাইস তার সামরিক শক্তি ক্রুসেডারদের সেবায় ব্যয় করতে শুরু করে। তার আশা ছিল, এর বিনিময়ে ক্রুসেডাররা তাকে তার নিজস্ব রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে![১৪০]

এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে ইতিপূর্বে ক্রুসেডার-বিরোধী লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী মসুল চলমান ইসলাম-খ্রিষ্টবাদ সংঘাতের ক্ষেত্র হতে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সন্দেহ নেই, এ কারণে ক্রুসেডাররা অনেকটা স্বস্তিবোধ করছিল। কারণ, মসুল যদি তার পূর্ণ শক্তি নিয়ে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ইলগাজির সঙ্গে শরিক হতো, তাহলে নিশ্চিত করেই ক্রুসেডারদের দুর্যোগ বহুগুণে বেড়ে যেত।

এ সময় বাইতুল মুকাদ্দাস সাম্রাজ্যের ক্রুসেড শক্তি বিরাট বিপাকে পড়ে যায়। কারণ, নিজেদের সাম্রাজ্যের পাশাপাশি তখন তাদের এন্টিয়ক রাজ্যের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করতে হচ্ছিল এবং এর ফলে তাদের সামরিক শক্তি বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তা ছাড়া তাদের শত্রুও তখন অনেক। এদিকে উরতুক পরিবার, ওদিকে তুগতেকিন, আরও আছে তুগতেকিনের

---

১৩৯. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৯১-১৯২।

১৪০. প্রাগুক্ত, ৯/২১৯-২২১।

শাসনাধীন সুর নগরী। এ ছাড়াও আছে উবায়দি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন আসকালান। অধিকন্তু মিশরের উবায়দি প্রশাসন যদিও তখন অনেকটা নিশ্চুপ ছিল; কিন্তু ফিলিস্তিন অঞ্চলে নিজেদের কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারের জন্য তারাও উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষায় ওত পেতে ছিল।

ক্রুসেডার মিলিশিয়া বাহিনী

সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে বাইতুল মুকাদ্দাসের ক্রুসেডাররা এসব সংকটের মধ্যেই সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি শক্তিশালী ও চরম উগ্র সামরিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালায়। ফলে গড়ে ওঠে নাইট হসপিটালার ও নাইট টেম্পলার নামক দুটি সংগঠন। সংগঠনদুটিকে ক্রুসেডারদের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ ও ভয়ংকর সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

নাইট হসপিটালার (Knights Hospitaller) সংগঠনটি মূলত ক্রুসেড অভিযান শুরু হওয়ার কয়েক বছর পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাইতুল মুকাদ্দাসে আগত দরিদ্র তীর্থযাত্রীদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইউরোপীয় কিছু খ্রিষ্টান বণিকের তত্ত্বাবধানে একটি দাতব্যসংস্থা হিসেবে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সংগঠনটির কার্যালয় ছিল বাইতুল মুকাদ্দাসের কিয়ামা গির্জা (The Church of the Holy Sepulchre)-এর পাশে। ক্রুসেডাররা আল-কুদসে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার উনত্রিশ বছর পূর্বে ১০৭০ খ্রিষ্টাব্দ হতে সংগঠনটি কাজ শুরু করে। সংস্থার সদস্য ও কর্মীদের Hospitallers (চিকিৎসাসেবাকর্মী) বলে অভিহিত করা হতো, যা পরবর্তী সময়ে আরবিতে উচ্চারণ বিকৃত হয়ে 'আল-ইসবিতারিয়া' রূপ ধারণ করে।[১৪১]

নাইট হসপিটালার সংস্থার সদস্যগণ সরাসরি রোমের পোপের নির্দেশনা মেনে চলত বলে কর্মক্ষেত্রে ব্যাপক স্বাধীনতা ভোগ করত। ক্রুসেডারদের আল-কুদস দখলকালে তারা বিভিন্ন তথ্য দিয়ে তাদেরকে সহায়তা করেছিল। ক্রুসেডাররাও তাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে তাদেরকে খুশি রাখত। আল-কুদসসহ ফিলিস্তিনের বিভিন্ন অঞ্চলে এমনকি পুরো ইউরোপজুড়ে সংস্থাটির প্রচুর

১৪১. Delaville Le Roulx : Les Hospitallers.en Terre Saint et en Chypre, p. 29.

দাতা ছিল। ফলে দিনে দিনে সংস্থাটি অঢেল বিত্ত-বৈভব ও ভূসম্পত্তির মালিক হয়ে যায়।

২য় বল্ডউইন তার শাসনামলের শুরুতেই বিভিন্ন জটিলতা ও কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ায় হসপিটালার সংস্থাটিকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করার উদ্যোগ নেন। এর ফলে সংস্থাটির প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে যায় এবং সংস্থার সদস্যরা প্রতিষ্ঠাকালীন লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত সামরিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডেও ভূমিকা রাখতে শুরু করে। অবশ্য কর্মধারা সম্পূর্ণ বদলে গেলেও এরপরও তাদের পুরোনো নাম 'হসপিটালারস' বহাল ছিল।[১৪২]

নাইট হসপিটালারের পাশাপাশি আরেকটি ভয়ংকর সংগঠন গড়ে ওঠে নাইট টেম্পলার (Knights Templar) নামে। নাইট টেম্পলার শুরু থেকেই ছিল আগা-গোড়া সামরিক সংগঠন। হুগো ডি পায়েন্স (Hugue de payens) নামক জনৈক ফরাসি যোদ্ধা সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। মসজিদুল আকসার যে অংশটিকে ইহুদিরা সুলায়মানি মন্দির (Solomon's Temple/ First Temple)-এর স্থান বলে দাবি করে থাকে, হুগো সে জায়গাটিকেই তার সামরিক সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচিত করেন। এ কারণেই সংস্থাটির সদস্যগণ দাউদের উপাসনালয়ের প্রতি সম্বন্ধিত হয়ে Knights Templar বা উপাসনালয়ের যোদ্ধা নামে পরিচিতি লাভ করে। আরবিতে তাদেরকে দাউদ আলাইহিস সালামের প্রতি সম্বন্ধ করে 'দাওয়িয়া' বলা হতো। প্রতিষ্ঠাতা হুগো শুরুতে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে সফর করে বাইতুল মুকাদ্দাসের ধর্মীয়-সামরিক সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে আগ্রহী যোদ্ধাপুরুষদের সংগ্রহ করেন। প্রথমদিকে সংগঠনটির কর্মতৎপরতা খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তাদানে সীমাবদ্ধ থাকলেও কিছুদিন পরই সংগঠনটি শাম অঞ্চলে বিভিন্ন সামরিক তৎপরতার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে।

এভাবে একদিকে পুরোপুরি সামরিক সংগঠন নাইট টেম্পলার প্রতিষ্ঠা এবং অপরদিকে সেবাসংস্থা নাইট হসপিটালারের সামরিক সংগঠনে রূপান্তরের কারণে বাইতুল মুকাদ্দাস সাম্রাজ্য লাভ করে একটি সার্বক্ষণিক সামরিক

---

১৪২. KIng : The Kinghts Hospitallers in the Holy land, p. 1 & Runciman : op. cit. II , pp. 163-164.

শক্তি। সংস্থাদুটির ক্ষমতা ও প্রভাব এত বেশি ছিল যে, অনেক সময় তারা খোদ বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজা ও গীর্জাধ্যক্ষেরও নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকত। এ তথ্যটিও প্রণিধানযোগ্য যে, বিভিন্ন যুদ্ধে এ সংস্থাদুটি ক্রুসেডার বাহিনীর সবচেয়ে দুর্ধর্ষ ও হিংস্র ইউনিট হিসেবে বিবেচিত হতো। তাদের যুদ্ধনীতিতে নীতি-নৈতিকতা বা অঙ্গীকার রক্ষা বলে কিছু ছিল না। অথচ নামে মনে হবে একটি সংস্থার কাজ ধর্মীয় সেবাদান, আরেকটির কাজ চিকিৎসাসেবা প্রদান![১৪৩]

কিছু জটিল ঘটনা ও ইলগাজির মৃত্যু

আবারও ইলগাজির আলোচনায় ফিরে আসছি। তিনি যদিও তার রাজ্যের পুনর্গঠনে সচেষ্ট ছিলেন; কিন্তু কিছুতেই সন্তোষজনক পরিস্থিতি তৈরি করতে পারছিলেন না। অনেক সময় তার সৈন্যরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত এবং তার বিরোধিতা করত। ৫১৫ হিজরি সনে (১১২১ খ্রিষ্টাব্দে) তার পুত্র পর্যন্ত তার সঙ্গে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দিয়ে আলেপ্পোতে নিজের জন্য স্বতন্ত্র রাজ্যপ্রতিষ্ঠার দাবি করে। এমনকি সে ক্রুসেডারদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করে এবং চুক্তির শর্ত অনুযায়ী যারদানা ও আসারিব দুর্গের নিয়ন্ত্রণ ক্রুসেডারদের হাতে তুলে দেয়।[১৪৪] উদ্বিগ্ন ইলগাজি দ্রুত আলেপ্পোতে ছুটে এসে ছেলেকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন এবং আলেপ্পোর শাসনভার নিজের হাতে নিয়ে নেন। এরপর তিনি তার বাহিনী নিয়ে রওনা হন যারদানা দুর্গ পুনরুদ্ধার করতে। সংবাদ পেয়ে এন্টিয়ক রাজ্যের অধীনস্থ দুর্গটির প্রতিরক্ষার জন্য ২য় বল্ডউইন বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে বেরিয়ে আসেন। মুসলিম বাহিনী যারদানা দুর্গের সন্নিকটে ক্রুসেডার বাহিনীর মুখোমুখি হয়। অবশ্য যুদ্ধের পরিবর্তে উভয় পক্ষের মধ্যে নতুন করে যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সমাপ্তি ঘটে। দুঃখের বিষয় চুক্তিতে ইলগাজি যারদানার অধিকার ছেড়ে দিতে সম্মত হন![১৪৫]

---

১৪৩. King : The Kinghts Hospitallers in the Holy land, p. 31-32 Guillaume de Tyr,1, pp. 520 – 521.

১৪৪. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২০৯ ও ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১৯৯।

১৪৫. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১৯৯।

ইলগাজির যুদ্ধ ইতিহাস ও জীবনচরিত দেখলে আশ্চর্য হতে হয় যে, তিনি সব সময়ই ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অর্জিত বিজয়ের সুবিধাকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি লড়াই, অবরোধ ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মতৎপরতায় ধৈর্য ধরে বেশিক্ষণ অবিচল থাকতে পারতেন না। আমার বিশ্বাস, এর জন্য দায়ী তিনি নন; বরং তার সৈন্যগণ! তার বাহিনী ছিল মওদুদ রহ.-এর বাহিনীর তুলনায় সম্পূর্ণই ভিন্ন প্রকৃতির। মূলত ইলগাজির বাহিনী ছিল বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগ্রহ করা ভাড়াটে সৈন্যদের সমন্বয়ে গঠিত। তিনি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ প্রদানের লোভ দেখিয়ে তাদেরকে সংগ্রহ করতেন। স্বভাবতই এসব ভাড়াটে যোদ্ধাদের মাঝে আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের সময় ও জীবন উৎসর্গ করার মতো মুজাহিদসুলভ অবিচলতা থাকত না। তা ছাড়া ঐতিহাসিক ইবনুল আছিরের ভাষ্যমতে সৈন্যদের প্রদানের মতো পর্যাপ্ত অর্থসম্পদও ইলগাজির হাতে ছিল না।[১৪৬] আর তাই ইলগাজি যদিও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বেশ কিছু বিজয় অর্জন করেছিলেন এবং কিছু কিছু বিজয় ছিল সামগ্রিক বিচারে অত্যন্ত মহান ও গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু তিনি ও তার বাহিনী প্রকৃত জিহাদের ঝান্ডা উত্তোলন এবং অবিচল থেকে তা বহন করার মতো উপযুক্ত ছিলেন না।

উত্তরাঞ্চলের এই পরিস্থিতির মধ্যেই এমন দুটি ঘটনা ঘটে; যা পরবর্তী সময়ের ঘটনাপ্রবাহের পট পরিবর্তনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

প্রথম ঘটনা হলো, সেলজুক সুলতান মাহমুদ আক সুনকুর আল-বুরসুকিকে পুনরায় মসুলের প্রশাসক পদে নিযুক্ত করেন। আক সুনকুর ইতিপূর্বে ৫০৭ থেকে ৫০৯ হিজরি সন পর্যন্ত মসুলের প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। অপসারণের ছয় বছর পর তিনি পুনরায় পূর্বের দায়িত্ব লাভ করেন। আক সুনকুরের নতুন করে দায়িত্ব লাভের পেছনে যে বিষয়টি বিশেষভাবে ভূমিকা রেখেছিল, তা হলো—মাঝের এই পুরো সময়টি তিনি সুলতান মাহমুদের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করেন। সুলতান মাহমুদ ও তার ভাই মাসউদের পারস্পরিক সংঘাতের সময় তিনি সুলতানের পাশে ছিলেন। বরং দুই ভাইয়ের সমঝোতা ও পরিস্থিতি শান্তকরণেও আক সুনকুরের দৃশ্যমান ভূমিকা ছিল। এর মাধ্যমে তিনি

১৪৬. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৯৫।

সুলতান মাহমুদের অন্তরে বিশেষ অবস্থান লাভ করতে সক্ষম হন। আর আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, তিনি একজন সৎ ও খোদাভীরু ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং মসুলের প্রশাসক পদে তার পুনঃনিয়োগ নিশ্চিত করেই আগামীর ঘটনাপ্রবাহে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা যায়।[১৪৭]

দ্বিতীয় ঘটনা হলো, ৫১৫ হিজরি সনে (১১২১ খ্রিষ্টাব্দে) জনৈক ইসমাইলি বাতিনি গুপ্তঘাতকের হাতে মিশরের উবায়দি সাম্রাজ্যের প্রধান উজির আফজাল বিন বদর আল-জামালি নিহত হন।[১৪৮] পাঠক হয়তো একজন ইসমাইলি শিয়ার হাতে একজন ইসমাইলি শিয়া নেতার হত্যার ঘটনায় আশ্চর্যান্বিত হবেন। বিষয় হলো, আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, ইসমাইলিরা পরস্পর প্রচণ্ড শত্রুভাবাপন্ন দুটি দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। উজির আফজাল ছিলেন প্রথম দল অর্থাৎ মুসতালিয়া ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত আর ঘাতক ছিল হাশশাশিন বা বাতিনিয়া নামে পরিচিত দ্বিতীয় দল নিযারিয়া ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। মিশরের ক্ষমতাসীন উবায়দি প্রশাসনের প্রধান ব্যক্তি উজির আফজালকে হত্যার মাধ্যমে বাতিনিরা মূলত মুসতালিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিয়েছিল। কারণ, উজিরদের একচ্ছত্র আধিপত্যের সেই যুগে উজির আফজালই ছিলেন উবায়দি প্রশাসনের মূল হর্তাকর্তা; খলিফা 'আমির বি আহকামিল্লাহ' ছিলেন নামেই খলিফা।

আফজাল হত্যাকাণ্ডের কারণে মিশরের উবায়দি প্রশাসনের ভিত আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। যদিও এর ফলে বাইতুল মুকাদ্দাসের ক্রুসেড সাম্রাজ্যের পৃষ্ঠদেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছিল; কিন্তু ভবিষ্যতে সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ ও সালাহুদ্দিন আইয়ুবির আমলে শাম অঞ্চল একত্রীকরণ প্রচেষ্টায় নিশ্চিত করেই এ বিষয়টি ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

মুজাহিদ বালক বিন বাহরাম বিন উরতুক

৫১৫ হিজরি সনের শেষাংশ এবং ৫১৬ হিজরি সনের প্রথমাংশ (১১২২ খ্রিষ্টাব্দ) ছিল অম্লমধুর ঘটনাপ্রবাহের যুগপৎ ধারক!

---

১৪৭. প্রাগুক্ত, ৯/২০৭।

১৪৮. প্রাগুক্ত, ৯/২০৭-২০৮।

এ সময় ইলগাজির ভ্রাতুষ্পুত্র বাল্‌ক বিন বাহরাম বিন উরতুক এডেসা রাজ্য অবরোধ করেন। বাল্‌ক তখন এডেসা রাজ্যের নিকটবর্তী খারতাবির্‌ত নগরীর প্রশাসক ছিলেন। বাল্‌ক অবরোধের মাধ্যমে এডেসার পতন ঘটাতে ব্যর্থ হয়ে সেখান থেকে সসৈন্যে প্রত্যাবর্তন করলে এডেসার শাসক জোসেলিন তার বাহিনীর একটি অংশ নিয়ে তাদের পিছু নেন। এডেসা-দুর্গ থেকে দূরবর্তী এক স্থানে দু-পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। বাল্‌ক তার চারশ সৈন্য নিয়েই প্রতিপক্ষকে পুরোপুরি নিঃশেষ করে ফেলেন এবং জোসেলিনকে বন্দি করতে সক্ষম হন। ৫১৬ হিজরি সনে (১১২২ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ ডিসেম্বর) এই আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা সংঘটিত হয়।[১৪৯]

এ ঘটনা ছিল একেবারেই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত। বাল্‌কের বাহিনী ছিল প্রতিপক্ষ ক্রুসেডার বাহিনীর তুলনায় অনেক গুণ দুর্বল।

যদিও এ সংবাদ ছিল মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত আনন্দদায়ক; কিন্তু জোসেলিনকে বন্দি করার দুই মাসেরও কম সময় পরই আসে ইলগাজি বিন উরতুকের মৃত্যুসংবাদ। তার মৃত্যুর পর সে যুগের রীতি মেনে প্রত্যাশামতোই তার সুবিস্তৃত রাজ্য বিভক্ত হয়ে যায়! এই ভাঙনের কারণ কেবল এই ছিল না যে, রাজ্যটির বয়স একেবারেই অল্প; বরং এর মূল কারণ ছিল, রাজ্যটি এমন একদল সৈন্যের ওপর নির্ভর করত, যাদের লক্ষ্য ছিল অর্থসম্পদ; জিহাদ ও জান্নাত নয়! আর তাই শক্তিশালী শাসক ইলগাজির মৃত্যুর পর স্বভাবতই তারা তার রেখে যাওয়া মূল্যবান সম্পদের ভাগাভাগি নিয়ে পরস্পরে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে।

ইলগাজির মৃত্যুর পর তার এক পুত্র শামসুদ্দৌলা সুলায়মান গ্রহণ করেন দিয়ারে বকর অঞ্চলের উত্তর অংশ সিলভানের দায়িত্ব। আরেক পুত্র হুসামুদ্দিন তামারতাশ দায়িত্ব নেন মারদিন ও দিয়ারে বকরের দক্ষিণ অংশের। আর তার ভ্রাতুষ্পুত্র বাল্‌ক ধরে রাখেন খারতাবির্‌ত নগরীর কর্তৃত্ব। দামি শিকার জোসেলিনও ছিল তার হাতে। আর আলেপ্পোর নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন ইলগাজির আরেক ভ্রাতুষ্পুত্র বদরুদ্দৌলা সুলায়মান বিন আবদুল জাব্বার বিন উরতুক।[১৫০]

---

১৪৯. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২০৬ ও Matthieu d' Edesse, p. 131.

১৫০. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২০৯।

এই দুঃখজনক বিভাজনের সংবাদ পেয়ে সুযোগ কাজে লাগাতে বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজা ২য় বল্ডউইন ছুটে আসেন। তিনি তখন এন্টিয়কের পাশাপাশি এডেসা রাজ্যেরও তত্ত্বাবধান করছিলেন। বল্ডউইন প্রথমে আলেপ্পো রাজ্যে হামলা চালান এবং আলেপ্পো নগরীর পূর্বে অবস্থিত আলবেরা নগরী দখল করে নেওয়ার পাশাপাশি উত্তর ও দক্ষিণের গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু এলাকায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে আলেপ্পো নগরীর নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে যায়।[১৫১] বল্ডউইন জানতেন যে, তার বর্তমান শক্তি ব্যবহার করে আলেপ্পোর মতো সুরক্ষিত নগরীর পতন ঘটানো কার্যত সম্ভব নয়। তিনি মূলত আলেপ্পোর দুর্বল আমির সুলায়মান বিন আবদুল জাব্বারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে তার সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করতে এবং তার দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে ইতিমধ্যে ক্রুসেডারদের সামনে মূর্তিমান আতঙ্ক হিসেবে আবির্ভূত হওয়া বাল্‌ক বিন বাহরামের মুখোমুখি হতে চাচ্ছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এডেসার ক্রুসেডারদের পরাজিত করে এবং খোদ জোসেলিনকে বন্দি করে বাল্‌ক ততদিনে নিজের দক্ষতার কথা জানান দিয়েছিলেন। দুষ্ট বল্ডউইনের পরিকল্পনা সফল হয়; সুলায়মান তার কাছে সন্ধি প্রার্থনা করেন এবং আসারিব দুর্গের নিয়ন্ত্রণ তার হাতে তুলে দেন।[১৫২]

আলেপ্পোর দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে ২য় বল্ডউইন এবার বাল্‌ক বিন বাহরামের মোকাবিলার লক্ষ্যে রওনা হন। বাল্‌ক তখন এডেসা রাজ্যের অধীনস্থ একটি দুর্গের অবরোধে ব্যস্ত।

৫১৭ হিজরি সনের ১৯ সফর (১১২৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ এপ্রিল) ২য় বল্ডউইন তার বাহিনী নিয়ে উরশ (Gargar) নামক একটি স্থানে বাল্‌কের বাহিনীর মুখোমুখি হন। সবাইকে হতবাক করে দিয়ে এ যুদ্ধেও বাল্‌ক বিন বাহরাম ক্রুসেডারদের পরাজিত করেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজা ২য় বল্ডউইনকে বন্দি করতে সক্ষম হন।[১৫৩]

---

১৫১. Setton: op. cit., 1,p. 418.

১৫২. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২২১ ও ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ২০৯।

১৫৩. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২১১।

এভাবে মাত্র সাত মাসের মধ্যে বালক বিন বাহরাম একই সঙ্গে বাইতুল মুকাদ্দাস সাম্রাজ্যের রাজা ও এডেসা রাজ্যের শাসককে বন্দি করতে সক্ষম হন।

এ ঘটনায় ক্রুসেডাররা বিরাট ধাক্কা খায়। বলা চলে, ইসলামি ভূখণ্ডে পা রাখার পর তারা কখনোই এরূপ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়নি। আমাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, ২য় বল্ডউইন রজার ডি সালের্নোর মৃত্যুর পর থেকে এন্টিয়কের এবং জোসেলিন বন্দি হওয়ার পর থেকে এডেসারও তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। সুতরাং তিনি বন্দি হওয়ায় একই সঙ্গে তিনটি রাজ্য নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়ে।

হঠাৎ করেই চারদিকে বালক বিন বাহরামের বীরত্বের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সর্বত্র তার নামে ধন্য ধন্য রব ওঠে। এ সুযোগে তার জন্য নিজ রাজ্য সম্প্রসারণ ও উরতুক রাজপরিবারকে ঐক্যবদ্ধকরণ সহজ ছিল। তিনি এ লক্ষ্যে অগ্রসর হন এবং পর্যায়ক্রমে হাররান ও আলেপ্পোকে নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হন। এরপর তিনি আলেপ্পোতে নিজের নতুন অবস্থানস্থল থেকে এন্টিয়ক রাজ্যে অভিযান পরিচালনা শুরু করেন।

২য় বল্ডউইনের অনুপস্থিতিতে বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসনভার গ্রহণ করেন সিডন ও কায়সারিয়ার প্রশাসক ইস্টাচ গার্নিয়ার (Eustache Garnier)। কিন্তু দায়িত্ব গ্রহণের মাসখানেক পরই তিনি মারা যান। এরপর সাম্রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন উইলিয়াম ডি বোর (William de Boer) নামক জনৈক সেনাপতি। ওদিকে এন্টিয়কের শাসনভার গ্রহণ করেন রাজ্যটির গির্জাধ্যক্ষ বার্নার্ড ডি ফালিঙ্গ।[১৫৪]

বালক বিন বাহরাম মূল্যবান দুই শিকারকে তার মূল ঘাঁটি খারতাবির্তের একটি সুরক্ষিত দুর্গে বন্দি করে রাখেন। তিনি এবার ক্রুসেডারদের দুর্বলতা ও হঠাৎ সৃষ্ট ভারসাম্যহীনতাকে কাজে লাগিয়ে আলেপ্পোর আশপাশের ক্রুসেডার অধিকৃত অঞ্চলে অভিযান শুরু করেন। তিনি এ সময় মাআররাতুন-নোমানের পশ্চিমে অবস্থিত বারা অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন, এরপর কাফারতাব অঞ্চল অবরোধের লক্ষ্যে অগ্রসর হন।[১৫৫]

---

১৫৪. Matthieu d' Edesse, p. 133 ; Foucher de Chartres, p. 540.

১৫৫. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২১৩।

কাফারতাব অবরোধ চলাকালে বাল্‌ক বিন বাহরামের কাছে এক আকস্মিক দুঃখজনক সংবাদ পৌঁছায়। তিনি জানতে পারেন যে, তার অনুপস্থিতি ও মুসলিম বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যের আলেপ্পো অঞ্চলে লাগাতার যুদ্ধব্যস্ততার সুযোগ কাজে লাগিয়ে খারতাবির্‌তের খ্রিষ্টান অধিবাসীরা গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে একই সঙ্গে বন্দি দুই ক্রুসেডার নেতাকে মুক্ত করে ফেলতে সক্ষম হয়েছে।[১৫৬] বাল্‌ক বিন বাহরাম তৎক্ষণাৎ খারতাবির্‌তে ফিরে আসেন এবং সদ্য মুক্ত শাসকদ্বয়কে নিয়ে রওনা হওয়া কাফেলার ওপর আকস্মিক হামলা চালান। তিনি ২য় বল্ডউইনকে পুনরায় বন্দি করতে সক্ষম হন। জোসেলিন অবশ্য পূর্ণ এক বছর বন্দিজীবন শেষে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।[১৫৭]

একই ধরনের ষড়যন্ত্রের পুনরাবৃত্তির আশঙ্কায় বাল্‌ক বিন বাহরাম এবার বল্ডউইনকে ক্রুসেডার বাহিনীর নিকটবর্তী ও খ্রিষ্টান নাগরিক অধ্যুষিত খারতাবির্‌ত থেকে সরিয়ে হাররানের একটি সুরক্ষিত দুর্গে আটকে রাখেন। কিছুদিন পর তিনি তাকে সেখান থেকেও সরিয়ে নেন এবং আলেপ্পোতে অবস্থিত আরও অধিক সুরক্ষিত একটি দুর্গে বন্দি করে রাখেন।[১৫৮]

এরপর বাল্‌ক বিন বাহরাম আবারও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। তিনি আলেপ্পোর উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত মানবিজ নামক স্থানে ক্রুসেডার বাহিনীর মোকাবিলা করে তাদেরকে পরাজিত করেন। কিন্তু হঠাৎ অজ্ঞাত উৎস হতে নিক্ষিপ্ত লক্ষ্যহীন একটি তির তার শরীরে বিদ্ধ হলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।[১৫৯]

দুঃখজনক এ ঘটনাটি ঘটে ৫১৮ হিজরি সনের রবিউল আউয়াল মাসে (১১২৪ খ্রিষ্টাব্দের ৬ মে)। ক্রুসেড যুদ্ধের এ স্তরে এসে মুসলমানরা হারায় জিহাদের ঝান্ডাবাহী এক বরেণ্য মুজাহিদকে। ইলগাজির মৃত্যুর পর যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল, এবারও তার পুনরাবৃত্তি ঘটে; বাল্‌ক বিন বাহরামের বিস্তৃত রাজ্য তার উত্তরাধিকারীদের মাঝে বিভক্ত হয়ে যায়!

---

১৫৬. Runciman : op. cit. II , pp. 163-164.

১৫৭. Foucher de Chartres, p. 540.

১৫৮. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২১৩।

১৫৯. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২২৭।

২য় বল্ডউইনের মুক্তি

বালক বিন বাহরামের শাহাদাতের পর আলেপ্পোর কর্তৃত্ব চলে যায় ইলগাজির পুত্র হুসামুদ্দিন তামারতাশের হাতে। তিনি আলেপ্পোকে তার রাজ্য মারদিনের সঙ্গে মিলিয়ে নেন। অবশ্য ক্রুসেডারদের সঙ্গে অব্যাহত সংঘাতের কেন্দ্র উত্তপ্ত শাম অঞ্চল থেকে দূরে থাকার উদ্দেশ্যে তিনি বসবাসের জন্য মারদিনকেই বেছে নেন। ঐতিহাসিক ইবনুল আছির রহ.-এর ভাষ্য অনুসারে হুসামুদ্দিন ছিলেন বিলাসী ও আরামপ্রিয় একজন শাসক।[১৬০]

তবে বসবাসের জন্য আলেপ্পোকে এড়াতে পারলেও আরও বড় একটি সমস্যাকে পাশ কাটানোর সুযোগ তামারতাশের ছিল না। ২য় বল্ডউইন যেহেতু আলেপ্পোতে বন্দি ছিলেন, তাই তার ব্যাপারে কর্তৃত্ব তখন তামারতাশেরই হাতে। সুতরাং এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্বও ছিল তার কাঁধে।

অবশেষে উভয় পক্ষের মধ্যে রাজনৈতিক মধ্যস্থতার উদ্যোগ গৃহীত হয়। শাইজারের আমির সুলতান বিন মুনকিয মধ্যস্থতাকারীর দায়িত্ব পালন করেন। দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পর উভয় পক্ষ কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে ২য় বল্ডউইনের মুক্তির বিষয়ে সম্মত হয়। শর্তগুলো হলো—

১. মুক্তিপণ হিসেবে ২য় বল্ডউইন আশি হাজার দিনার পরিশোধ করবেন। এর মধ্যে বিশ হাজার দিনার অগ্রীম প্রদান করতে হবে, বাকিটা পরিশোধ করতে হবে বন্দিমুক্তির পর।[১৬১]

২. এন্টিয়ক রাজ্যের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে ২য় বল্ডউইন আযায, আসারিব, যারদানা, জাযার ও কাফারতাব দুর্গের নিয়ন্ত্রণ আলেপ্পো রাজ্যের হাতে ফিরিয়ে দেবেন।

৩. রাজা ২য় বল্ডউইন আরব বংশোদ্ভূত শিয়া নেতা দুবাইস বিন সাদাকাকে দমনের বিষয়ে তামারতাশকে সহযোগিতা করবেন।

---

১৬০. প্রাগুক্ত, ৯/২২৭।

১৬১. উসামা বিন মুনকিয, *আল-ই'তিবার*, পৃষ্ঠা : ১২০।

দুবাইস ইরাকের আব্বাসি খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পর পালিয়ে জাযিরা অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিল।[১৬২]

৪. শর্ত পূরণের নিশ্চয়তা হিসেবে বল্ডউইন কিছু লোককে মুসলমানদের কাছে জিম্মি রাখবেন। তিনি যতদিন না প্রতিশ্রুত অর্থ ও দুর্গসমূহের নিয়ন্ত্রণ মুসলমানদের বুঝিয়ে দেবেন, ততদিন তারা মুসলমানদের কাছে জিম্মি থাকবে।

জিম্মি হিসেবে ক্রুসেডারদের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল রাজা ২য় বল্ডউইনের পাঁচ বছর বয়সী এক কন্যা এবং এডেসার শাসক জোসেলিনের পুত্র ২য় জোসেলিন। শর্ত ছিল, দাবি পূরণের আগ পর্যন্ত এরা মধ্যস্থতাকারী শাইজারের আমির সুলতান বিন মুনকিযের হেফাজতে থাকবে।

এক বছরেরও অধিক সময় বন্দি থাকার পর অবশেষে ২য় বল্ডউইন মুক্তি লাভ করেন। ছাড়া পেয়ে প্রথমে তিনি এন্টিয়কে গমন করেন এবং সেখানে পৌঁছে এন্টিয়কের গির্জাধ্যক্ষ বার্নার্ড ডি ফালিঙ্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পারস্পরিক আলোচনার পর তারা সিদ্ধান্ত নেন যে, আলেপ্পোর হাতে বিভিন্ন দুর্গ সমর্পণের শর্তটি তারা পালন করবেন না। এরপর বিষয়টি তারা পত্রের মাধ্যমে তামারতাশকে জানিয়ে দেন![১৬৩]

বাল্‌ক বিন বাহরামের মোকাবিলায় ২য় বল্ডউইনের উত্তরে আগমন, বাহরামের হাতে পাকড়াও, কারাগারে বন্দি জীবনযাপন—এই পুরোটা সময় ক্রুসেডারদের একটি বাহিনী ভেনিস থেকে আগত একটি বিশাল নৌবহরের সহায়তায় লেবাননের সুর নগরী অবরোধ করে রেখেছিল।[১৬৪]

পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুর ছিল ভূমধ্যসাগরের শাম উপকূলের সেই দুই ইসলামি নগরীর একটি, যা তখনও মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। অপর নগরীটি হলো আসকালান। এভাবেও বলা চলে যে, সাগরপথে অবশিষ্ট ইসলামি বিশ্ব হতে প্রেরিত যাবতীয় সহায়তা এ অঞ্চলে পৌঁছার মাত্র দুটি করিডোর তখনও খোলা ছিল, সুর ছিল তার একটি। আর তাই

---

[১৬২]. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২২১।

[১৬৩]. উসামা বিন মুনকিয, *আল-ই'তিবার*, পৃষ্ঠা : ১০৩।

[১৬৪]. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২২৭।

কেবল দুর্ভেদ্য নিরাপত্তাব্যবস্থার কারণেই নয়; এ বিবেচনায়ও মুসলমানদের কাছে সুর নগরীর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

সুর নগরীর পতন

৫০৬ হিজরি সন (১১১২ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে সুর নগরী দামেশকের আমির তুগতেকিনের তত্ত্বাবধানে ছিল। কিন্তু মিশরের নিকৃষ্ট উবায়দি প্রশাসন এ সময় শাম অঞ্চলে মুসলমানদের দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে বারবার সুর দখলের চেষ্টা চালায়। তারা ষড়যন্ত্র করে তুগতেকিন নিযুক্ত সুরের আমির মাসউদকে সরিয়ে দেয়। অথচ উন্নত সামরিক দক্ষতা ও জিহাদি চেতনার অধিকারী মাসউদ দীর্ঘ এগারো বছর বীরত্বের সঙ্গে ক্রুসেডারদের প্রতিটি আক্রমণ প্রতিহত করে নগরীটির নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছিলেন। উবায়দি শিয়ারা নগরীটি অধিকার করার পর এর নিরাপত্তা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়। ক্রুসেডাররা সুর নগরী ঘিরে কঠিন অবরোধ আরোপ করে। পানাহারদ্রব্য ফুরিয়ে যেতে থাকায় নগরীটি পতনোন্মুখ হয়ে পড়ে। সংবাদ পেয়ে তুগতেকিন দ্রুত অগ্রসর হলে ত্রিপোলির শাসক পন্স তার বাহিনী নিয়ে তুগতেকিনের পথরোধ করেন। অবশ্য তুগতেকিন শেষ পর্যন্ত ক্রুসেডারদের সঙ্গে সমঝোতা করতে সক্ষম হন। সিদ্ধান্ত হয় নগরীটির নিয়ন্ত্রণ ক্রুসেডারদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে; বিনিময়ে নগরীটির সকল নাগরিককে নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। চুক্তি সম্পন্ন হলে ক্রুসেডাররা সুর নগরীতে প্রবেশ করে নগরবাসীকে বের করে দেয়।[১৬৫] ক্রুসেডাররা শাম অঞ্চলে আগমনের দীর্ঘ পঁচিশ বছরেরও অধিক সময় পর ৫১৮ হিজরির ২৩ জুমাদাল উলা মাসে (১১২৪ খ্রিষ্টাব্দের জুলাইয়ের শুরুতে) মুসলমানদের বেদখল হয়ে যায় সুরক্ষিত সুর নগরী![১৬৬]

মুসলমানদের জন্য এটি ছিল অনেক বড় এক আঘাত। এদিকে বল্ডউইনের মুক্তি-চুক্তির শর্তপূরণে গড়িমসি আর ওদিকে সুরক্ষিত সুর নগরীর পতন একই সময়ে সংঘটিত দুটি ঘটনায় আঘাত আরও গভীর হয়। মুসলমানরা হেলায় হারিয়ে ফেলে হাতে থাকা অতি মূল্যবান এক সুযোগ!

---

১৬৫. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ২১১।

১৬৬. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২২৮-২২৯।

সুর নগরীর পতনে বল্ডউইনের মনোবল অনেক বেড়ে যায়। তিনি এবার মুসলমানদেরকে প্রদত্ত দুর্গ হস্তান্তরের অঙ্গীকার ভঙ্গ করার পাশাপাশি পুরো চুক্তিই প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত নেন। বল্ডউইন এ সময় তামারতাশের প্রতিপক্ষ দুবাইস বিন সাদাকার সঙ্গে মিত্রতা করেন। অথচ চুক্তিতে তিনি দুবাইসকে দমনে তামারতাশকে সহযোগিতা করার অঙ্গীকার করেছিলেন। এরপর বল্ডউইন বাইতুল মুকাদ্দাস ও এন্টিয়কের বাহিনীকে একসঙ্গে জড়ো করেন। জোসেলিনের নেতৃত্বে এডেসার বাহিনী তাদের সঙ্গে যোগ দেয়, যুক্ত হয় দুবাইস বিন সাদাকার শিয়া বাহিনীও। এই সম্মিলিত বাহিনী আলেপ্পো অবরোধের লক্ষ্যে অগ্রসর হয়। আলেপ্পোর শাসক হুসামুদ্দিন তামারতাশ তখন সম্ভাব্য সংঘাতকেন্দ্র থেকে বহু দূরে মারদিনে অবস্থান করছেন![১৬৭]

নিশ্চিত করেই বলা যায়, বল্ডউইন এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, তার প্রতিপক্ষ মুসলিম নেতা ভুলেও জিম্মিদের হত্যা করবেন না। এর কারণ শুধু এই নয় যে, তামারতাশ শক্তির দিক থেকে দুর্বল ছিলেন কিংবা তিনি জানেন যে, ইসলামি শরিয়তে শিশুহত্যা বৈধ নয়; বরং বল্ডউইন জানতেন যে, তামারতাশ প্রতিপক্ষের ওপর চাপ প্রয়োগের এমন মূল্যবান ঘুঁটি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হাতে রাখতে চেষ্টা করবেন। আর তাই বল্ডউইন পরিকল্পনা করেন, তিনি উল্টো তামারতাশের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করবেন এবং চাপ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য শেষ পর্যন্ত তাকে জিম্মিদের ছেড়ে দিতে বাধ্য করবেন।

আলেপ্পোবাসীর অবস্থা তখন চরম শোচনীয়। ২য় বল্ডউইন, জোসেলিন ও দুবাইস বিন সাদাকার সম্মিলিত বাহিনী যখন আলেপ্পোকে ঘিরে ফেলেছে, আলেপ্পোতে তখন এমন কোনো নেতা নেই, যিনি এই বিরাট বাহিনীর মোকাবিলা করে নগরীটির প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করবেন।

সত্যিই আলেপ্পো তখন এক কঠিন সংকটের মুখোমুখি!

শেষের কয়েক দশক ধরে আলেপ্পোর সংকট কেবলই ঘনীভূত হয়েছে। প্রথমে রিজওয়ান বিন তুতুশের শাসনামলে, তারপর রিজওয়ান-পুত্র আলপ আরসালান ও ভৃত্য বদরুদ্দিন লুলুর শাসনামলে এবং শেষে

---

[১৬৭]. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৩০, ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২২১ ও Setton: op. cit., 1,p. 423-424.

ইলগাজি, বাল্‌ক বিন বাহরাম ও হুসামুদ্দিন তামারতাশের ন্যায় উরতুক শাসকদের আমলে—এই পুরোটা সময়ের মধ্যে আলেপ্পোবাসী কখনোই শান্ত-স্থিতিশীল পরিস্থিতির দেখা পায়নি।

অত্যাচারী শাসক রিজওয়ান, তার পুত্র আলপ আরসালান ও বদরউদ্দিন লুলুর আমলের বেদনাদায়ক পরিস্থিতি তো যৌক্তিক ও বোধগম্যই ছিল; প্রশ্ন থেকে যায়—উরতুক পরিবারের শাসকদের রাজত্বকালে আলেপ্পো কেন স্থিতিশীলতার দেখা পায়নি? অথচ আমরা দেখেছি, উরতুক পরিবারের শাসকগণ ছিলেন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জিহাদ-প্রীতি ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের অধিকারী।

জনসাধারণের পরিচর্যা

বাস্তবতা হলো, ক্রুসেড ইতিহাসে সুকমান বিন উরতুক থেকে শুরু করে ইলগাজি বিন উরতুক হয়ে বাল্‌ক বিন বাহরাম পর্যন্ত আমরা উরতুক পরিবারের যেসব 'দুর্ভাগা' মুজাহিদ নেতার পদচারণা প্রত্যক্ষ করেছি, তারা সকলেই ছিলেন অযোগ্য-ব্যর্থ জাতির যোগ্য-সফল নেতা!

একজন মহান ও সফল নেতারও ভরাডুবি হতে পারে, যদি তার অধীনস্থ সেনাদল বা জনগণ হয় পরাজিত মানসের অধিকারী। উরতুকি শাসকদের যোদ্ধাবাহিনী বরং জনসাধারণও এসব যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল যুদ্ধলব্ধ সম্পদসহ বিভিন্ন প্রাপ্তির লালসায়, জীবনযাত্রার মান আরও উন্নত ও বিলাসী করার তাড়নায় এবং ছোট ছোট নগর-জনপদ ছেড়ে হাররান ও আলেপ্পোর মতো বৃহৎ নগরীতে বসবাসের লক্ষ্যে। এ জাতীয় মানসিকতা লালনকারী সেনাদল কালেভদ্রে দু-একবার হয়তো সাময়িক বিজয়ের দেখা পায়; কিন্তু চূড়ান্ত ও স্থায়ী বিজয় তাদের ভাগ্যে জোটে না। কোনো ভূখণ্ড বা নগরীতে হয়তো সাময়িক দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়; স্থায়ী কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব কখনোই অর্জিত হয় না। কারণ, বিজয় ও দখলদারিত্বের অব্যবহিত পরেই যখন জান-মালের ওপর কোনো ধরনের হুমকি সৃষ্টি হয়, এ জাতীয় যোদ্ধাবাহিনী তখন কালবিলম্ব না করে বিক্ষিপ্ত ছুটে পালায়।

আর তাই মুসলমানরা যদি স্থায়ী সফলতা, টেকসই কর্তৃত্ব, স্থিতিশীল রাজত্ব ও দুর্যোগকালে দৃঢ় প্রভাবশক্তির অধিকারী হতে চায়, তাহলে প্রথম কর্তব্য হলো, জনসাধারণকে ধর্মীয় অনুরাগ ও জিহাদি চেতনার দীক্ষায় গড়ে তোলা। তখন সুশিক্ষিত-উজ্জীবিত জনগণই এমন

বুদ্ধিদীপ্ত সেনাবাহিনী ও দূরদর্শী নেতা গড়ে তুলবে, যারা পারবে জিহাদের কণ্টকাকীর্ণ পথে পদচারণা অব্যাহত রেখে দুর্গম গিরি কান্তার মরু পাড়ি দিতে।

আমরা যদি খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি., সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাযি., তারিক বিন যিয়াদ, সালাহুদ্দিন আইয়ুবি, সাইফুদ্দিন কুতুজ ও মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের ন্যায় মহান বিজেতাগণের বিজয় ও বিজয়াভিযানের ইতিহাস অধ্যয়ন করি, পর্যালোচনা করি তাদের দিগ্‌বিজয়ের দাস্তান, তাহলে অবশ্যই প্রত্যক্ষ করব যে, তাদের সমর্থনে ছিল একদল মহৎপ্রাণ জনসাধারণ; যারা লাভ করেছিল উন্নত দীক্ষা ও সমুন্নত পরিচর্যা, যাদের ছিল অনন্যসাধারণ ঈমানি চেতনা ও চারিত্রিক কুশলতা এবং উন্নত সামরিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দক্ষতা।

মূলত সমাজ ও সমাজব্যবস্থার এরূপ পূর্ণাঙ্গ ও বিন্যস্ত কাঠামোই চূড়ান্ত বিজয় নিশ্চিত করতে পারে। এক-দুজন চেতনাদীপ্ত বীর সেনাপতি বা আত্মোৎসর্গে উজ্জীবিত ব্যক্তির উত্থানে কখনোই স্থায়ী ও পূর্ণাঙ্গ বিজয় অর্জন করা সম্ভব নয়।

এটিই নির্মম বাস্তবতা যে, ক্রুসেড যুদ্ধ ইতিহাসে এখনো পর্যন্ত আমরা এমন কোনো নেতার দেখা পাইনি, যিনি বিষয়টিকে এভাবে বিবেচনা করেছেন। এ পর্যন্ত আমরা যেসব সত্যনিষ্ঠ মহান নেতাকে প্রত্যক্ষ করেছি, তারা সকলেই আপতিত সংকটের সাময়িক সমাধান নিয়ে চিন্তা করেছেন, জরুরি অবস্থার জরুরি সমাধান বাস্তবায়নে সচেষ্ট থেকেছেন। সন্দেহ নেই, এ ধরনের কর্মপন্থায় আপতিত সংকট থেকে উত্তরণের একনিষ্ঠ ও সর্বোচ্চ প্রচেষ্টাই থাকে; কিন্তু তাতে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে গঠনমূলক কোনো পরিকল্পনা থাকে না, থাকে না সুদীর্ঘকাল রাষ্ট্রকে এ জাতীয় সমস্যা হতে নিরাপদ রাখার নিশ্চয়তাদানকারী কোনো সুস্পষ্ট ও দীর্ঘমেয়াদি রোডম্যাপ।

আমাদের যাপিত কালেও আমরা মুসলিম উম্মাহ এই একই সমস্যায় আক্রান্ত। বর্তমানে আমরা যাদেরকে ফিলিস্তিন, ইরাক বা অধিকৃত অন্যান্য ইসলামি ভূখণ্ডের বিষয়ে উদ্যোগী হতে দেখি, তারাও তাদের চিন্তা-পরিকল্পনা ও কর্মতৎপরতা মজলুম ভাইদের কাছে অর্থ, খাদ্য ও চিকিৎসা-সহায়তা পৌঁছানো কিংবা সর্বোচ্চ আক্রান্ত অঞ্চলে গিয়ে লড়াই

ও শাহাদাতের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণে সীমাবদ্ধ রাখেন। নিঃসন্দেহে এসব কর্মতৎপরতাও কাম্য ও প্রশংসনীয়; কিন্তু কেবল এতটুকুকেই যথেষ্ট মনে করা উচিত নয়। বরং এর পাশাপাশি প্রয়োজন এমন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা প্রণয়ন, যার মাধ্যমে আমরা জাতির জাগরণ ও প্রজন্মের পুনর্গঠনের নিশ্চয়তা লাভ করব। দীক্ষিত সেই প্রজন্মই পারবে স্বপ্ন ও বাস্তবতার মিলন ঘটাতে। মনে রাখতে হবে, কেবল অধিকৃত ভূখণ্ডের স্বাধিকার পুনরুদ্ধার করাই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন প্রতিটি অর্জনকে ধরে রাখার অব্যাহত প্রচেষ্টা এবং স্থায়ী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার টেকসই পরিকল্পনা; প্রয়োজন পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দ্বীন প্রচারের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা।

দেখুন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কি জীবনে কত গভীর ও মর্মসমৃদ্ধ শব্দে মুষ্টিমেয় সাহাবায়ে কেরামের জামাতকে উজ্জীবিত করেছেন, শাণিত করেছেন তাদের সাহসের ধার, সমুন্নত করেছেন তাদের আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্প! নবীজি তাদেরকে কেবল মক্কাবাসীর নিপীড়ন থেকে নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনার আশা শুনিয়েই ক্ষান্ত হননি; বরং এ বিষয়ে তাদেরকে নিশ্চিন্ত করেছেন এবং আরও অগ্রসর হয়ে তাদেরকে চমৎকার স্বপ্নের কথা শুনিয়েছেন। নবীজি তাদেরকে বলেছেন—

> «وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ هٰذَا الأَمْرَ، حَتّٰى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلٰى حَضْرَمَوْتَ، لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ، أَوِ الذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهِ، وَلٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ»
>
> আল্লাহর শপথ, তিনি অবশ্যই এ দ্বীনকে পূর্ণতা দান করবেন। তখন একজন মুসাফির সানআ থেকে হাজরামাউত পর্যন্ত (নিরাপদে) সফর করবে। পথিমধ্যে সে তার মেষপালে নেকড়ের আক্রমণের আশঙ্কা ছাড়া (কোনো মানুষের) অন্য কোনো অনিষ্টতার আশঙ্কা করবে না এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা (ওই সময়ের জন্য প্রতীক্ষা না করে) তাড়াহুড়া করছ।[১৬৮]

১৬৮. ইমাম বুখারি, *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৪১৬, ইমাম আহমাদ, *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ২১১১০, ইমাম আবু দাউদ, *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ২৬৪৯, ইমাম ইবনে হিব্বান আল-বুসতি, *সহিহ ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ২৮৯৭।

এমনকি নবীজি তাদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، تُفْلِحُوا»

লোকসকল, বলো—আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; নিশ্চিত সফলতা লাভ করবে।[১৬৯]

প্রিয়নবী তার চাচা আবু তালিবকে বলেছিলেন, 'আমি তাদের কাছে কেবল একটি কালিমার স্বীকৃতি দাবি করছি। তারা আমার আহ্বানে সাড়া দিলে পুরো আরবজাতি তাদের বশীভূত হয়ে যাবে আর অনারবরা তাদেরকে জিজিয়া প্রদান করবে।'

আবু তালিব অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেন, 'মাত্র একটি বাক্য?!'

—হ্যাঁ, একটি বাক্য। চাচা! আপনারা কেবল বলুন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' নবীজি নিষ্কম্প কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন।[১৭০]

আল্লাহর নবী কখন এই নিশ্চিত ঘোষণা করেছিলেন?! যখন তিনি ও তার গুটিকয়েক সঙ্গী ছিলেন মক্কায় অবরুদ্ধ; বিজয় ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার যাবতীয় বাহ্যিক উপায় ও বস্তু-উপকরণশূন্য!

সুতরাং জাতিগঠনে ও প্রজন্মের বিনির্মাণে এমন কিছু নেতা, সংস্কারক, পথপ্রদর্শক ও আলিমের প্রয়োজন, যারা বিশ্বাসীদের স্বপ্নের পরিধি বিস্তৃত করবেন এবং সুদৃঢ় ভিত্তির আলোকে জনসাধারণের দীক্ষা ও পরিচর্যায় উদ্যোগী হবেন। তারা নিজেদের কর্মপদ্ধতি আহরণ করবেন প্রিয় নবীজির সিরাত এবং উম্মাহর ইতিহাসের মহান সংস্কারক ও সংগ্রামী যোদ্ধাদের জীবনাদর্শ হতে। তারাই পারবেন পৃথিবীতে ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে।

তবে স্বীকার করতেই হবে যে, চলমান সংকটকালে উরতুকিরা যতটুকু অবদান রেখেছে, তারও প্রয়োজন ছিল। তাদের কর্মপ্রচেষ্টা সাময়িক ও অপূর্ণ হলেও নিঃসন্দেহে প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা লাভের উপযুক্ত। অন্য

---

১৬৯. ইমাম আহমাদ, *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ১৬০৬৬, হাকিম, *মুসতাদরাকে হাকিম*, হাদিস নং ৪২১৯, ইবনে খুযায়মা, *সহিহ ইবনে খুযায়মা*, হাদিস নং ১৫৯ ও ইমাম ইবনে হিব্বান আল-বুসতি, *সহিহ ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৬৫৬২।

১৭০. ইমাম তিরমিজি, *সুনানে তিরমিজি*, হাদিস নং ৩২৩২। তিরমিজি রহ. হাদিসটিকে 'হাসান' বলেছেন।

অনেকে যখন দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করেছিল, উরতুক পরিবারের মহান নেতৃবৃন্দ তখন প্রতিরোধের ঝান্ডা উড্ডীন করেছেন এবং শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও জিহাদের বন্ধুর পথে পদচারণা অব্যাহত রেখেছেন। তারা বিভিন্ন যুদ্ধে ক্রুসেডারদের পরাজিত করে ইসলামি ভূখণ্ডে ক্রুসেডারদের আগ্রাসী সম্প্রসারণ প্রচেষ্টায় কিছুটা হলেও বাধা সৃষ্টি করতে পেরেছেন। মহান উরতুকি নেতৃবৃন্দ নিজেরা যদিও মনজিলে পৌঁছতে পারেননি; কিন্তু পরবর্তীদের জন্য মনজিলে পৌঁছার পথ সুগম করেছেন। তাদের এ অবদানও অনস্বীকার্য যে, ক্রুসেড আগ্রাসনের শিকার হতে পারত এমন হাজারো প্রাণ তাদের ওসিলায় বেঁচে গেছে এবং বিভিন্ন জনপদ সম্ভাব্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। জাতির শিক্ষা-দীক্ষা ও পরিচর্যায় কোনো সচেতন নেতার নিষ্ঠাপূর্ণ কর্মপ্রচেষ্টার পরবর্তীকালে যদি উরতুকিদের আবির্ভাব ঘটত, তাহলে হয়তো তাদের কর্ম-অবদান আরও ব্যাপক-বিস্তৃত হতো এবং তাদের ইতিহাসও ভিন্নভাবে লেখা হতো। কিন্তু পৃথিবীর সবকিছু তো সুনির্ধারিত নিয়তির অদৃশ্য মায়াজালে আবদ্ধ!

মসুল-আলেপ্পো একক রাজ্য!

ফিরে যাই আলেপ্পোবাসীর কাছে!

শত্রুবাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ আলেপ্পোবাসী নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে। তারা স্পষ্টতই অনুভব করে যে, তাদের না আছে শক্তিশালী কোনো নেতা, না আছে নির্ভরযোগ্য বহিঃসংযোগ। শাসক হিসেবে যিনি তাদের ওপর চেপে বসেছেন, সেই হুসামুদ্দিন তামারতাশ শাসনকাজে যথেষ্ট দুর্বল। তিনি অবস্থান করছেন আক্রান্ত এলাকা থেকে নিরাপদ দূরত্বে। আর যদি তিনি তার বাহিনী নিয়ে বেরিয়েও আসেন, তবুও তার দুর্বল শক্তি নিয়ে কিছুতেই প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ করতে পারবেন না। আর বাস্তব কথা হলো, তার ক্রুসেডারদের মোকাবিলা করার কোনো আগ্রহই নেই। অথচ জিহাদ এক কঠিন সংগ্রামের নাম; এ পথে কেবল সে-ই অবিচল থাকতে পারে, যার শুধু আগ্রহ নয়; আছে জিহাদ-অনুরাগ ও শাহাদাতের দুর্নিবার আকর্ষণ।

সবকিছু বিবেচনা করে আলেপ্পোবাসী বাইরের এমন কোনো নেতার কাছে সাহায্যপ্রার্থনার সিদ্ধান্ত নেয়, যিনি আলেপ্পো রাজ্যের লাগাম হাতে তুলে

নিলে শত্রুপক্ষ সুরক্ষিত আলেপ্পো হতে অবরোধ প্রত্যাহার করে প্রস্থান করতে বাধ্য হবে।

প্রশ্ন হলো—তারা সাহায্যপ্রার্থনা করবে কার কাছে?!

চারপাশের অধিকাংশ নেতাই যে ভীরু-উদাসীন, নিতান্তই দুর্বল!

আলেপ্পোবাসীর সামনে তুলনামূলক উপযুক্ত দুটি বিকল্প ছিল। এক. দামেশকের অধিপতি তুগতেকিন। দুই. মসুলের প্রশাসক আক সুনকুর আল-বুরসুকি।

তুগতেকিন যদিও উল্লেখযোগ্য সামরিক শক্তির অধিকারী ছিলেন এবং দীর্ঘকাল ধরে দামেশকের শাসনভার আগলে রেখেছিলেন; কিন্তু তাকে কাঙ্ক্ষিত নেতা হিসেবে বিবেচনা করার সুযোগ আলেপ্পোবাসীর ছিল না। কারণ, সব সময়ই তিনি বহিঃসাহায্যের মুখাপেক্ষী থাকতেন। এমনকি ইতিপূর্বে তিনি দুর্বল পরিস্থিতিতে ক্রুসেডারদের সঙ্গেও মিত্রতা করেছিলেন। এখন যে ক্রুসেডার বাহিনী আলেপ্পো অবরোধ করেছে, তারা তো আলেপ্পোর কাছেই অবস্থানকারী তুগতেকিনের সামরিক শক্তিকে গোনায় না ধরেই এখানে এসেছে। এসব দিক বিবেচনা করে আলেপ্পোবাসী উপলব্ধি করে যে, তুগতেকিনের প্রভাব কিছুতেই ক্রুসেডারদের সন্ত্রস্ত করতে পারবে না এবং তাদেরকে বিফল মনোরথে ফিরে যেতে বাধ্য করতেও পারবে না।

সম্ভাব্য দ্বিতীয় বিকল্প আক সুনকুরের অবস্থা ছিল এর বিপরীত। যদিও এ অঞ্চলে তার সমৃদ্ধ অতীত ইতিহাস ছিল না, উল্টো প্রথমবারের প্রশাসক আমলে ক্রুসেডারদের কাছে পরাজিত হওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল; কিন্তু তিনি এমন কিছু ব্যতিক্রমী গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, যা তুগতেকিনের তুলনায় তার পাল্লা ভারী করেছিল। যেমন :

১. সুউচ্চ সততা ও তাকওয়া গুণের অধিকারী হওয়ায় আক সুনকুর জনসাধারণের সঙ্গে ন্যায়, উদার ও অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করতেন। আলেপ্পোর জনসাধারণ তো বিগত কয়েক দশক ধরে তাদের নেতাদের মাঝে এসব গুণের অভাবই অনুভব করে আসছিল।

২. তার অধীনে ছিল মসুলের শক্তিশালী সেনাদল। মসুলবাহিনীর শক্তিমত্তার এটিও অন্যতম প্রমাণ যে, এ বাহিনীর সদস্য ছিলেন

সমকালীন প্রসিদ্ধ সেনাপতি ইমাদুদ্দিন জিনকি, যার বীরত্বের খ্যাতি তৎকালীন মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল।

৩. তার অধীনে ছিল মসুলের জিহাদ-অনুরাগী সচেতন জনসাধারণ। এ কারণেই তার বাহিনী ছিল সমকালীন অন্যান্য বাহিনীর চেয়ে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। মসুলের যোদ্ধারা জানত কীভাবে ক্ষমতা ও অর্থের মোহ উপেক্ষা করে আল্লাহর জন্য লড়াই করতে হয়।

৪. সেলজুক সুলতান মাহমুদের সঙ্গে আক সুনকুরের চমৎকার সম্পর্ক ছিল, ছিল ব্যক্তিগত সম্পর্কও। এদিক থেকে বিবেচনা করলে সমকালীন মুসলিম বিশ্বের সর্ববৃহৎ ও সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের সমর্থন আক সুনকুরের পক্ষে ছিল।

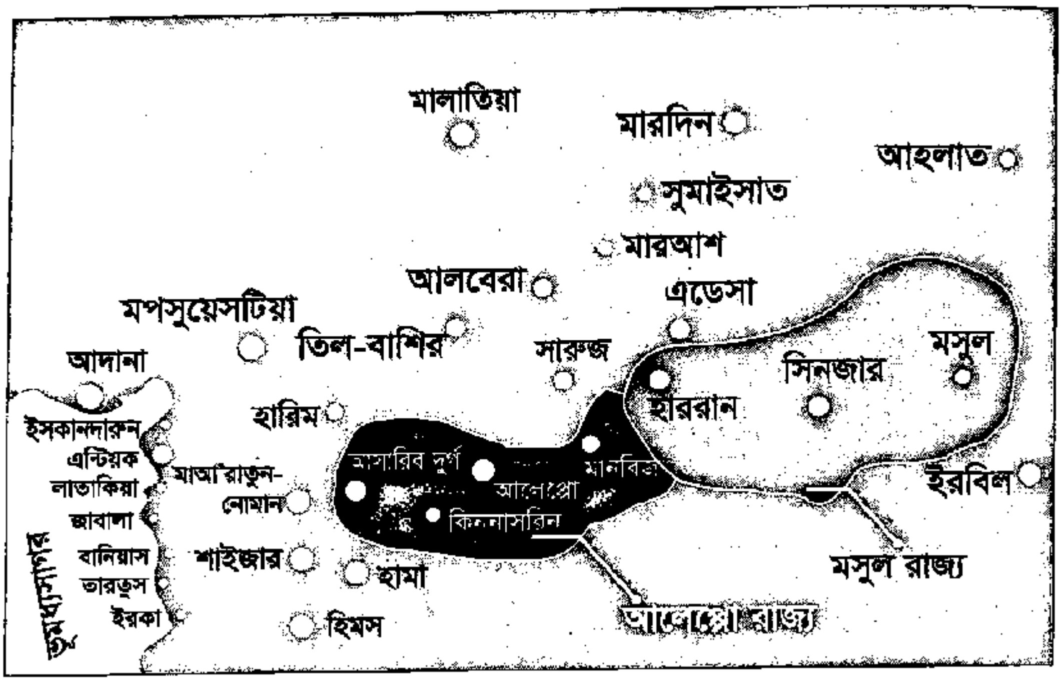
৫. আক সুনকুরের হাতে আলেপ্পোর শাসনভার তুলে দেওয়া হলে তুগতেকিনের সমরশক্তির সঙ্গে নতুন শক্তির সম্মিলনে এ অঞ্চলে মুসলমানদের শক্তি মজবুত হবে। ইতিপূর্বে মওদুদের আমলেও দামেশক-মসুল ঐক্যবদ্ধ সম্পর্কের কারণে এ অঞ্চলে মুসলমানদের মজবুত অবস্থান সৃষ্টি হয়েছিল। আবারও যদি সেই ঐক্যের পুনরাবৃত্তি ঘটে আর তার সঙ্গে যুক্ত হয় আলেপ্পোর সামরিক শক্তি, তাহলে ক্রুসেডাররা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে প্রস্থান করবে এবং এতে মুসলমানদের বিজয় নিশ্চিত হবে বলেই প্রতীয়মান হয়।

সার্বিক বিচারে আক সুনকুরের পাল্লা ভারী হওয়ায় আলেপ্পোবাসী তৎক্ষণাৎ তার কাছে সাহায্যবার্তা পাঠিয়ে তাকে ঐতিহ্যবাহী আলেপ্পো নগরীর শাসনভার গ্রহণে আগমনের আহ্বান জানায়।[১৭১]

আক সুনকুর চিন্তা করে দেখেন যে, এটি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখার এক 'বিনামূল্য' সুযোগ। এদিকে সুলতান মাহমুদও ইতিপূর্বে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাই তিনি আলেপ্পোবাসীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দ্রুত মসুল থেকে রওনা হন এবং ৫১৮ হিজরির জিলহজ মাসে (১১২৫ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে)

১৭১. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/ ২৩০।

আলেপ্পোতে পৌঁছে রাজ্যটিকে মসুলের সঙ্গে যুক্ত করে নেন। বড় দুটি রাজ্য মিলে এবার গঠিত হয় একক বৃহৎ রাজ্য।[১৭২]



মানচিত্র নং-২৬

মসুল-আলেপ্পো একক রাজ্য

মহান মুজাহিদ বালক বিন বাহরামের শাহাদাত, উল্লেখযোগ্য কোনো বিনিময় ছাড়াই ২য় বল্ডউইনের মুক্তি, এরপর বল্ডউইন ও তার সহযোগীদের আলেপ্পো অবরোধ ইত্যাদি দুঃখজনক ঘটনাপ্রবাহ ও অনিষ্টের আড়ালেই নিহিত ছিল এক কল্যাণের বার্তা—গুরুত্বপূর্ণ দুই অঞ্চল আলেপ্পো ও মসুলের ঐক্য। প্রাথমিক পর্যায়ে এ ঐক্য যদিও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল বয়ে আনতে পারেনি; কিন্তু এর মাধ্যমে রাজ্যদুটির ঐক্যের মূল্য ও গুরুত্ব সকলের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যায়। আর তাই এই ঘটনাকে পরবর্তীকালে সংঘটিত উভয় রাজ্যের অতি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত ঐক্যের বীজরূপে বিবেচনা করা যেতে পারে।

---

১৭২. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ২১১-২১২ ও ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/ ২২৮।

যদি প্রশ্ন করা হয়, উভয় রাজ্যের একীভূতকরণকে এতটা গুরুত্বপূর্ণ ভাবার কারণ কী, তাহলে তার উত্তর হচ্ছে—বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেই এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যেমন :

১. যেহেতু মসুল ও আলেপ্পো রাজ্য ভৌগোলিক দিক থেকে পরস্পর সংযুক্ত ছিল এবং মাঝে অন্য কোনো রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল না, তাই এই একীকরণকে অভিহিত করা যায় 'ইরাকের সঙ্গে সামরিক সংযোগ-সেতু' হিসেবে। শুধু ইরাক নয়; এর মাধ্যমে সেলজুকদের মূলকেন্দ্র পারস্যসহ ইসলামি বিশ্বের পুরো প্রাচ্য অংশের সঙ্গে ক্রুসেডারদের বিচরণভূমি শাম অঞ্চলের সংযোগ স্থাপিত হয়।

২. মসুলে জাগ্রত ছিল প্রকৃত জিহাদের আহ্বান। মসুলের সঙ্গে আলেপ্পো যুক্ত হওয়ায় আলেপ্পোতেও জিহাদি চেতনা বিস্তারের আশা তৈরি হয়। শুধু আলেপ্পো নয়; হতে পারে একে কেন্দ্র করে অনেক বছর ধরে এ জাতীয় চেতনাশূন্য পুরো শাম অঞ্চলে এক নতুন জোয়ার সৃষ্টি হবে।

৩. রাজ্যদুটির ছিল প্রচুর জনবল ও সামরিক শক্তি। তাই এ ঐক্যের মাধ্যমে ক্রুসেডারদের মোকাবিলায় একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠিত হওয়া নিশ্চিত হয়।

৪. যেহেতু মসুল ছিল সেলজুক সালতানাত ও আব্বাসি খিলাফতের অধীনস্থ, তাই মসুলের সঙ্গে আলেপ্পোর সংযুক্তির ফলে আলেপ্পোর দায়িত্ব কাগজে-কলমে সেলজুক সালতানাত ও আব্বাসি খিলাফতের ওপরও অর্পিত হয়। কারণ, এটি কেবল সহায়তা চুক্তি বা জিহাদের অঙ্গনে স্বেচ্ছা-সহযোগিতা ছিল না; ছিল পুরোপুরি রাজ্যভুক্তি।

৫. ইরাকের সামরিক শক্তি সব সময়ই শাম অঞ্চলে কোনো অগ্রবর্তী ঘাঁটি না থাকার অভাব বোধ করে আসছিল। আমাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, মওদুদ রহ. যখন এ অঞ্চলে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছিলেন আর আলেপ্পোর শাসক রিজওয়ান তার সামনে নগরদ্বার বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তখন মওদুদ এ অঞ্চলে একটি ঘাঁটির অভাব রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুভব করেছিলেন। এই একীকরণের মাধ্যমে এ সমস্যারও সমাধান হয়।

৬. এর মাধ্যমে আলেপ্পো ও শাম অঞ্চলের জনসাধারণের আকিদা ও চিন্তাগত পরিশুদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ করে মসুল ও বাগদাদসহ পুরো

ইরাক অঞ্চল থেকে উলামায়ে কেরামের আগমনের বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হয়। পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে—শামের দুই বৃহৎ নগরী আলেপ্পো ও দামেশকের বিভিন্ন অঙ্গনে শিয়া বাতিনিদের একচ্ছত্র আধিপত্যের কারণে অঞ্চলদুটির জনসাধারণের চিন্তা-চেতনায় ব্যাপক বিকৃতি সাধিত হয়েছিল।

এই হলো মসুল-আলেপ্পো একীকরণের ইতিবাচক কিছু দিক। আর এ কারণেই সমকালীন নিষ্ঠাবান মুসলমানগণ এই পদক্ষেপকে সাদরে স্বাগত জানায়। অতীত ঐতিহাসিকগণের কলমে যেমন বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে উঠে এসেছে, উঠে এসেছে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত সব যুগের লেখক-ঐতিহাসিকদের বিশ্লেষণেই। ঐক্য যখন যেখানেই হোক, নিঃসন্দেহে তা গুরুত্ব ও উদ্‌যাপনের দাবিদার!

আক সুনকুর আল-বুরসুকির শহিদি মৃত্যু

দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার জন্য আক সুনকুর আলেপ্পোতে প্রবেশ করতেই ক্রুসেডাররা ইরাকি সেলজুক বাহিনীর শক্তিমত্তা এবং ইরাকি বাহিনীর প্রতি আলেপ্পোর জনগণের সমর্থনের বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরে অবরোধ প্রত্যাহার করে প্রস্থান করে। এ কারণে উভয় পক্ষের মধ্যে কোনো সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেনি।[১৭৩]

আক সুনকুর নতুন করে আলেপ্পোর প্রশাসনব্যবস্থা বিন্যস্ত করার পর সেখানে নিজের অনুগত একজন প্রশাসক নিযুক্ত করে মসুলে ফিরে আসেন।[১৭৪] এর কিছুদিন পরই ৫১৯ হিজরি সনের শুরুতে (১১২৫ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে) তিনি পুনরায় এ অঞ্চলে আগমন করেন। এবার তিনি শাইজারে গিয়ে শাইজারের আমির সুলতান বিন মুনকিযের কাছ থেকে জিম্মি ক্রুসেডারদের নিজের দায়িত্বে নিয়ে নেন। কারণ, চুক্তিতে সুস্পষ্ট উল্লেখ ছিল যে, চুক্তির কোনো ধারা অমান্য করা হলে মধ্যস্থতাকারী জিম্মিদেরকে আলেপ্পোর শাসকের হাতে তুলে দিতে বাধ্য থাকবেন।[১৭৫]

---

১৭৩. Guillaume de Tyr,1, p.557.

১৭৪. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৩০।

১৭৫. Runciman:op.cit.,II,p.173

এরপর আক সুনকুর ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সরাসরি রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হন। তিনি যুদ্ধের মাধ্যমে কাফারতাব দুর্গ দখল করে নেন। বল্ডউইনের সঙ্গে কৃত চুক্তিতে এ দুর্গটিও মুসলমানদের হাতে তুলে দেওয়ার কথা ছিল। এরপর তিনি যারদানা দুর্গ অবরোধ করেন।[১৭৬] আক সুনকুরের অব্যাহত অভিযানে উদ্বিগ্ন হয়ে এন্টিয়ক ২য় বল্ডউইনের কাছে সাহায্যবার্তা পাঠালে বল্ডউইন দ্রুত এ অঞ্চলে ছুটে আসেন। আক সুনকুরের হাতে নিজের কন্যা জিম্মি থাকার বিষয়টিও তাকে দ্রুত আগমনে উদ্বুদ্ধ করে। বল্ডউইনের সঙ্গে পন্সের নেতৃত্বে ত্রিপোলির বাহিনী এবং জোসেলিনের নেতৃত্বে এডেসার সেনাদলও যুক্ত হয়। লড়াই অবশ্যম্ভাবী দেখে আক সুনকুর যারদানার অবরোধ প্রত্যাহার করে যুদ্ধের লক্ষ্যে আলেপ্পোর উত্তরে আযায অঞ্চলে চলে আসেন।[১৭৭] আযাযে দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। মুসলিম বাহিনীর সদস্যগণ প্রচণ্ড বিক্রমে লড়াই করলেও দুঃখজনকভাবে পরাজিত হয়।[১৭৮] যদিও কিছু কিছু ইতিহাসগ্রন্থে মুসলমানদের শোচনীয় পরাজয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তবে প্রকৃত বিচারে এ যুদ্ধে নিরঙ্কুশ জয়-পরাজয়ের কোনো ঘটনা ঘটেনি। ঐতিহাসিক ইবনুল আছিরের ভাষ্য অনুসারে এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর নিহতের সংখ্যা ছিল মাত্র এক হাজার।[১৭৯] তা ছাড়া যুদ্ধের পর উভয় পক্ষের সমঝোতা বৈঠকে মিলিত হওয়ার ঘটনাও দু-পক্ষের তুলনামূলক শক্তি-ভারসাম্য বজায় থাকার বিষয়টি প্রমাণ করে।

সমঝোতা বৈঠকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

১. আক সুনকুর জিম্মি ক্রুসেডারদের ২য় বল্ডউইনের কাছে হস্তান্তর করবেন।[১৮০]

২. কাফারতাব দুর্গের নিয়ন্ত্রণ মুসলমানদের হাতে থাকবে।

৩. নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর থাকবে।

---

১৭৬. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৩১ ও Foucher de Chartres, p. 471.

১৭৭. Guillaume de Tyr,1, p. 580.

১৭৮. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৩১।

১৭৯. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৩৪।

১৮০. Guillaume de Tyr,1,p.580.

ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহে যুদ্ধবিরতির সময়সীমার সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না। অবশ্য এটি নিশ্চিত যে, চুক্তিতে অতি সামান্য সময়ের জন্যই যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কারণ, এর পরপরই আক সুনকুর তার পুত্র ইযযুদ্দিন মাসউদকে আলেপ্পোর দায়িত্ব দিয়ে নিজে দ্রুত মসুলে ফিরে যান এবং নতুন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বাহিনীর বিন্যাস ও সেনাসমাবেশ শুরু করেন।[১৮১]

আযাযের যুদ্ধে পরাজয় এবং তৎপরবর্তী সমঝোতা-চুক্তি যদিও আপাতদৃষ্টিতে আক সুনকুরের ব্যর্থতা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছিল; কিন্তু এ ঘটনা তার নেতৃত্বে কোনো প্রভাব ফেলেনি, এতে তার অবস্থানও সামান্য দুর্বল হয়নি। এ কারণে তার প্রতি সুলতান মাহমুদের আস্থাও নষ্ট হয়নি, জনসাধারণের মনেও তার নিষ্ঠা ও যোগ্যতা নিয়ে কোনো দ্বিধা তৈরি হয়নি। আর তাই এ ঘটনার পরও ক্রুসেডারদের অপবিত্র নখর থেকে ইসলামি ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারের অভিযানে তিনি আপামর মুসলিম জনগণের আশার প্রদীপ হয়ে ছিলেন।

যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হলে নতুন যুদ্ধ শুরু করার জন্য আক সুনকুর যখন পূর্বপ্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন শাম অঞ্চল থেকে সংবাদ আসে যে, ত্রিপোলির শাসক পন্স মুসলমানদের কাছ থেকে রাফানিয়া (Raphanea) দুর্গ ছিনিয়ে নিয়েছেন। যেহেতু দুর্গটি ছিল হিমস রাজ্যভুক্ত আর হিমস তখন দামেশকের অধিপতি তুগতেকিনের অধিকারে ছিল, তাই প্রকারান্তরে এ ঘটনা ছিল তুগতেকিনের ওপর আঘাত।[১৮২] মৌলিক দুটি কারণে রাফানিয়া দুর্গের নিয়ন্ত্রণ ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত দুর্গটি থেকে ত্রিপোলি নগরীর ওপর নজর রাখা যেত। তাই মুসলমানদের কর্তৃত্বে থাকা দুর্গটিকে ক্রুসেড রাজ্য ত্রিপোলির নিরাপত্তার জন্য হুমকি বিবেচনা করা হতো। দ্বিতীয়ত দুর্গটির অবস্থান ছিল এন্টিয়ক-বাইতুল বাইতুল মুকাদ্দাস যোগাযোগপথের সন্নিকটে। আর তাই দুর্গটির ওপর ক্রুসেডারদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে এন্টিয়কে প্রেরিত যেকোনো সহায়তার নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। এ বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য যে, রাফানিয়া দুর্গের পতনে রাজা ২য় বল্ডউইনও পন্সের সঙ্গে শরিক ছিলেন, যা ছিল

---

১৮১. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৩১-২৩২।

১৮২. Grousset: Hist, des Croisades 1, p. 641.

তার ও আক সুনকুরের মধ্যে সম্পাদিত যুদ্ধবিরতি চুক্তির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। ফলে উভয়ের মধ্যকার চুক্তিও কার্যত বাতিল হয়ে যায়।[১৮৩] এটি ৫২০ হিজরি সনের মধ্যভাগের (১১২৬ খ্রিষ্টাব্দের) ঘটনা।

তুগতেকিন আক সুনকুরের কাছে সহায়তা কামনা করলে তিনি তৎক্ষণাৎ তার বাহিনী নিয়ে ছুটে আসেন। আক সুনকুর তার পুত্র ইযযুদ্দিন মাসউদকে রাফানিয়ায় ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রেরণ করেন আর নিজে রওনা হন এন্টিয়কের অধিভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ আসারিব দুর্গের অবরোধে।

বল্ডউইনও দ্রুত এডেসার শাসক জোসেলিনকে নিয়ে ছুটে আসেন। সন্দেহ নেই, আক সুনকুরের ক্রমবর্ধমান শক্তি, অব্যাহত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প ও দৃঢ়তা, তার প্রতি মুসলিম জনসাধারণের সহানুভূতি ও শাম অঞ্চলের নেতৃবর্গের সমর্থন বল্ডউইনের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। এ কারণেই তিনি নতুন করে যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রস্তাব দেন। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে নতুন চুক্তি সম্পন্ন হয়। তবে এবার তো তার মূল্য চুকানোর পালা! চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তিনি গুরুত্বপূর্ণ রাফানিয়া দুর্গের নিয়ন্ত্রণ মুসলমানদের হাতে সমর্পণ করেন![১৮৪]

নিঃসন্দেহে এ ফলাফল ছিল আক সুনকুরের জন্য অত্যন্ত সন্তোষজনক। কারণ, বিনা যুদ্ধে কোনো প্রকার শক্তি ক্ষয় না করেই অতি গুরুত্বপূর্ণ রাফানিয়া দুর্গের নিয়ন্ত্রণ মুসলমানদের হাতে ফিরে আসছে। তা ছাড়া যুদ্ধবিরতিকে কাজে লাগিয়ে মুসলমানরা এ সময় নিজেদের পুনঃসেনাবিন্যাস ও অন্যান্য সংস্কারকর্মের সুযোগ পাবে। আর তাই আক সুনকুর বল্ডউইনের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে রাফানিয়া দুর্গ গ্রহণ করে নেন। এরপর তিনি পুত্র ইযযুদ্দিন মাসউদকে আলেপ্পোতে রেখে নিজে মসুলে ফিরে যান।[১৮৫]

সমকালীন মুসলিম জনসাধারণের প্রত্যাশার দৃষ্টি তখন আক সুনকুরের দিকেই নিবদ্ধ। তিনিই সেই কাঙ্ক্ষিত নেতা, যিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে

---

[১৮৩]. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ২১৬, ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৩২ ও Foucher de Chartres, p.480.

[১৮৪]. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৩৩।

[১৮৫]. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ২১৪।

যুদ্ধে বুক চিতিয়ে টিকে আছেন। নিঃসন্দেহে তার এ ভূমিকা মুসলমানদের হৃদয়ে অনেক বেশি সুখকর অনুভূতি সৃষ্টি করেছিল। তবে ঘটনাপ্রবাহে চোখ-রাখা সকলের হৃদয়েই কিন্তু সুখকর অনুভূতি ছিল না।

বিষে-ভরা কিছু দৃষ্টিও তাকে অনুসরণ করছিল। তার প্রতিটি পদক্ষেপে জ্বলেপুড়ে ছারখার হচ্ছিল বিদ্বেষে পূর্ণ কিছু অন্তর। মহান মুজাহিদ আক সুনকুরের প্রতি ক্রমবর্ধমান জনসমর্থন এবং তাকে ঘিরে মুসলমানদের বুকবাঁধা আশার জোয়ার সবই তারা লক্ষ করছিল।

নিষ্ঠাবান মুসলমানদের উন্নতি ও অগ্রগতিতে কাদের দৃষ্টি ও অন্তর জ্বলতে পারে?! তারা ছিল দুষ্ট বাতিনি শিয়াগোষ্ঠী!

উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠা, জিহাদের ঝান্ডা উত্তোলন ও ক্রুসেডারদের বিতাড়নের লক্ষ্যে সুন্নি মুসলমানদের নিষ্ঠাপূর্ণ প্রচেষ্টায় বাতিনি নামক ইসমাইলি শিয়াদের এই সশস্ত্র গোষ্ঠীটি কখনোই সুস্থির বা আনন্দিত হতে পারেনি। তাই দুষ্ট হৃদয় ও কুটিল মানসিকতার অধিকারী বাতিনিরা এবার জাতির এই নব-আদর্শকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ইতিপূর্বে যেমন তারা সরিয়ে দিয়েছিল আক সুনকুরেরই পূর্বসূরি মওদুদ রহ.-কে, থামিয়ে দিয়েছিল মহান আলিম উজির নিজামুল মুলকের অগ্রযাত্রা!

৫২০ হিজরি সনের ৮ জিলকদ (১১২৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ নভেম্বর) শুক্রবার আক সুনকুর মসুলে ফিরে আসেন। মসুলে ফিরেই তিনি জুমার নামাজ আদায়ের জন্য জামে মসজিদে উপস্থিত হন। আক সুনকুর রহ. সাধারণ জনগণের সঙ্গে প্রথম কাতারে নামাজ পড়ছিলেন। হঠাৎ করেই দশের অধিক বাতিনি ঘাতক একযোগে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ছুরি ও খঞ্জর দ্বারা তাকে উপর্যুপরি আঘাত করতে থাকে। উম্মাহর এই ক্ষণজন্মা বীরপুরুষ তখনই শাহাদাত বরণ করেন। অথচ প্রত্যাশা ছিল মুসলমানরা সেদিন রাফানিয়া দুর্গ পুনরুদ্ধারের আনন্দ উদ্‌যাপন করবে![১৮৬]

এ তো জিহাদের পথ! যেমন দুর্গম, তেমনই সুদীর্ঘ! এ পথে পদে পদে হাজারো বাধা, বাধার হিমাদ্রি যেন! কষ্ট ও ক্লেশে ভরা এ পথের দুর্যোগ

---

১৮৬. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৩৬ ও শিহাবুদ্দিন আহমাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নুওয়াইরি, *নিহায়াতুল আরাব ফী ফুনূনিল আদাব*, ২৭/২৬।

কখনো শেষ হওয়ার নয়! কিন্তু তারপরও এ জিহাদই চিরদিন ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া ও শ্রেষ্ঠতম আমল হিসেবে বহাল থাকবে।[১৮৭]

যে জাতি অন্বেষণ করে সম্মান ও মর্যাদা এবং পুরো পৃথিবীর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব, তাদের কর্তব্য এ জাতীয় দুর্যোগ ও বিপর্যয়ে অভ্যস্ত হওয়া এবং সংগ্রামী অঙ্গনের কোনো প্রবাদপুরুষের বিয়োগে হতাশ না হয়ে অটল-অবিচল থাকা। কারণ, আল্লাহ তাআলা যখন মুসলমানদের হৃদয়ে সততা-নিষ্ঠা ও নির্ভেজাল জিহাদি স্পৃহা প্রত্যক্ষ করেন, তখন তিনি ঝান্ডা বহনের উপযুক্ত বিকল্প তৈরি করে দেন। অনেক সময় এই নতুন ঝান্ডাবাহী হয়ে থাকেন প্রয়াত মহান ব্যক্তির চেয়ে হাজার গুণ মহান ও প্রভাবশালী। এ তো সেই মহান সত্তার নিখুঁত ব্যবস্থাপনা, যিনি যাবতীয় ত্রুটি হতে পবিত্র; তন্দ্রা-উদাসীনতা কিছুই তাকে আচ্ছন্ন করতে পারে না!

অবশ্য এরপরও জিহাদ ও পুণ্যের অঙ্গনের মহান কোনো প্রতীক-পুরুষের অন্তর্ধানের পর সাময়িক সংকট সৃষ্টি হতেই পারে। আক সুনকুর রহ.-এর শাহাদাতের প্রায় কাছাকাছি সময়ে এমন আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়, যা মুসলিম বিশ্বের অস্থিরতা ও সংকট আরও ঘনীভূত করে তোলে।

উদাহরণস্বরূপ আক সুনকুরের মৃত্যুর দু-মাসেরও কম সময় পর খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহ ও সুলতান মাহমুদের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ সৃষ্টি হয়। বিরোধরত দু-পক্ষ একসময় যুদ্ধের জন্য মুখোমুখি অবস্থানে চলে যায়। আল্লাহ তাআলা যদি এ ফিতনার মূলোৎপাটন না করতেন, নিশ্চিত করেই উভয় পক্ষে প্রচুর হতাহতের ঘটনা ঘটত। শেষ পর্যন্ত খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহ শক্তিশালী সুলতান মাহমুদের কাছে নতি স্বীকার করলে পরিস্থিতি তুলনামূলক শান্ত হয়ে আসে।[১৮৮]

---

১৮৭. আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সবকিছুর মূল হলো ইসলাম। ইসলামের খুঁটি হলো নামাজ আর সর্বোচ্চ চূড়া হলো জিহাদ।' *সুনানে তিরমিজি*, হাদিস নং ২৬১৬, *আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসায়ি*, হাদিস নং ১১৩৯৪ ও *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ২২০৬৯। [অনুবাদক]

১৮৮. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৩৭-২৩৯ ও *আত-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ২৯-৩০।

দুয়ারে এসেছে নবপ্রভাত!

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো, এন্টিয়ক ক্রুসেড রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত বোহেমন্ডের পুত্র ২য় বোহেমন্ড পরিণত বয়সে উপনীত হয়ে ৫২১ হিজরি সনের শাওয়াল মাসে (১১২৭ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে) এন্টিয়কে পৌঁছান।[১৮৯] বর্বরতা ও নৃশংসতায় তিনি ছিলেন যোগ্য পিতার যোগ্য উত্তরসূরি। এমনকি ঐতিহাসিক উসামা বিন মুনকিয তাকে মুসলমানদের জন্য এক 'দুর্যোগ-আতঙ্ক' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১৯০]

২য় বোহেমন্ডের আগমনে ক্রুসেডাররা অনেকটা স্থিতিশীলতা ফিরে পায়। বাইতুল মুকাদ্দাসে ২য় বল্ডউইন, এডেসায় জোসেলিন, ত্রিপোলিতে পন্স আর এন্টিয়কে সদ্য আগত ২য় বোহেমন্ড; প্রতিটি রাজ্যেই এখন আলাদা আলাদা শাসক।

২য় বল্ডউইন এ সময় এন্টিয়ক রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক আরও দৃঢ়করণে উদ্যোগী হন। তিনি ২য় বোহেমন্ডকে উষ্ণ সংবর্ধনা প্রদান করেন এবং তাকে নিজের দ্বিতীয় কন্যা এলিস (Alice)-কে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। বোহেমন্ড এ প্রস্তাব গ্রহণ করে নিলে বাইতুল মুকাদ্দাস ও এন্টিয়ক রাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ়তা লাভ করে।[১৯১]

প্রায় একই সময়ে সংঘটিত এক বিস্ময়কর ঘটনা মুসলমানদের অস্থিরতা আরও বাড়িয়ে তোলে। আক সুনকুরের শাহাদাতের পর সুলতান মাহমুদ আলেপ্পো ও মসুলের শাসনভার আক সুনকুরের পুত্র ইযযুদ্দিন মাসউদকে প্রদান করেছিলেন। পিতার মতো তিনিও বীর, সাহসী ও খোদাভীরু ছিলেন এবং জিহাদের পথে পূর্ণতায় পৌঁছতে দৃঢ়প্রত্যয়ী ছিলেন। দায়িত্বলাভের পর তিনি আলেপ্পোর পার্শ্ববর্তী একটি দুর্গ অধিকারের চেষ্টা চালান। কিন্তু অবরোধ চলাকালে হঠাৎ কোনো আঘাত ছাড়াই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তরুণ এই শাসকের আকস্মিক প্রয়াণে নতুন করে ব্যাপক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। জাওলি নামক জনৈক মামলুক এ সময় ইযযুদ্দিনের অল্প বয়সী ভাইকে মসনদে বসাতে উঠে পড়ে লাগেন। জাওলি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুটির

---

১৮৯. Foucher de Chartres,pp. 481-483.

১৯০. উসামা বিন মুনকিয, *আল-ই'তিবার*, পৃষ্ঠা : ১২১।

১৯১. Foucher de Chartres,pp. ৪৮৫.

তত্ত্বাবধায়ক সেজে নিজেই ক্ষমতার কলকাঠি নাড়ার পরিকল্পনা করছিলেন। নিজের মনোবাঞ্ছা বাস্তবায়ন করার জন্য জাওলি সুলতান মাহমুদের কাছে দুজন দূত প্রেরণ করেন। জনমনে আতঙ্ক নেমে আসে—না জানি সুলতান তার প্রস্তাব মেনে নেন। তাহলে তো রাজ্য ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাবে। পরিস্থিতি বড় গুরুতর। সুবিস্তৃত আলেপ্পোকে গ্রাস করে নিতে ক্রুসেডাররা দরজায় কড়া নাড়ছে। এ সময় মুসলমানদের প্রয়োজন এমন কোনো অপরিণত শিশু-শাসক দ্বারা পূর্ণ হবে না, যাকে একজন উচ্চাভিলাষী ধূর্ত ব্যক্তি পরিচালিত করবে; বরং প্রয়োজন একজন শক্তিশালী-অবিচল মুজাহিদ নেতা।

জাওলি যে দুজন দূতকে সুলতানের কাছে প্রেরণ করেন তারা হলেন আলেপ্পোর কাজি বাহাউদ্দিন শাহরাযুরি[১৯২] ও ইযযুদ্দিন মাসউদের হাজিব[১৯৩] সালাহুদ্দিন মুহাম্মাদ[১৯৪]। উদ্দেশ্য সাধনে সুলতানকে রাজি করাতে পারলে জাওলি তাদেরকে ক্ষমতা ও আরও উচ্চ পদ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন।[১৯৫]

যদিও দূতদ্বয়কে প্রলুব্ধকর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু আল্লাহ তাআলা তো আপন বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু! আর তাই আল্লাহর ইচ্ছায় জাওলি এমন দুজন সৎ ব্যক্তিকে দূত হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন, যাদের হৃদয়ে ছিল উম্মাহ-দরদ এবং আল্লাহ, রাসুল ও মুমিনদের প্রতি কল্যাণকামিতার গুণ। আর তাই দূতদ্বয় জাওলির পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার পরিবর্তে পদ ও ক্ষমতার লোভ বিসর্জন দিয়ে সুলতানকে দ্বীন ও শরিয়তের আলোকে সদুপদেশ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন।

---

১৯২. বাহাউদ্দিন আবুল হাসান আলি ইবনুল কাসিম শাহরাযুরি। জিনকি সাম্রাজ্যের অন্যতম মর্যাদাবান কাজি। তিনি ছিলেন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ, উন্নত, অভিজাত এক জাগ্রত পুরুষ। ৫৩২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন, সিফফিনে তাকে সমাহিত করা হয়। [অনুবাদক]

১৯৩. তৎকালে প্রধান রাজপ্রহরীকে 'হাজিব' বলা হতো। হাজিব পদধারী ব্যক্তি শাসকের মূল পরামর্শক ও উপদেষ্টা বিবেচিত হতেন। হাজিবের পদমর্যাদা ছিল অনেকটা বর্তমান সময়ের (প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির রাষ্ট্রব্যবস্থার) প্রধানমন্ত্রীর সমপর্যায়ের। [সম্পাদক]

১৯৪. সালাহুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আইয়ুব ইয়াগিসিয়ানি। ইমাদুদ্দিন জিনকির প্রশাসনের অন্যতম সেনাপতি। প্রচণ্ড কৌশলী ও কূটনীতিবিদ ছিলেন। কিছুদিন তিনি হামা নগরীর প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। [অনুবাদক]

১৯৫. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৪২।

দূতদ্বয় প্রথমে সুলতান মাহমুদের উজির শারফুদ্দিন আনুশেরওয়া বিন খালিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং পূর্ণাঙ্গ বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাকে বলেন—

> "জনাব, আপনি ও সুলতান জানেন যে, শাম ও জাযিরা অঞ্চলে ফিরিঙ্গিরা জেঁকে বসেছে এবং দিন দিন তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়েই চলেছে। ইতিমধ্যে তারা অধিকাংশ ভূখণ্ড দখল করে নিয়েছে। মারদিন-সীমান্ত থেকে মিশরের আরিশ পর্যন্ত তাদের দখলে চলে গেছে। বুরসুকি (আক সুনকুর) আপন বীরত্ব, অভিজ্ঞতা ও অনুগত বাহিনীর মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন প্রচেষ্টায় বাধা দিয়েছিলেন এবং তাদের অনিষ্টের লাগাম কিছুটা হলেও টেনে ধরেছিলেন। তিনি নিহত হওয়ার পর ক্রুসেডারদের লালসা আরও বেড়ে গেছে। তার যে পুত্র আমাদের এখানে আছে, সে নিতান্তই শিশু। এখন রাজ্যের প্রয়োজন পৌরুষদীপ্ত, বীরযোদ্ধা, অভিজ্ঞ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একজন শাসক; যিনি ক্রুসেডারদের তাড়িয়ে দিয়ে রাজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। আমরা সার্বিক পরিস্থিতির সুস্পষ্ট বিবরণ আপনার সামনে তুলে ধরলাম, যেন ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর নতুন কোনো বিপর্যয় নেমে না আসে। তখন তো আমাদের তিরস্কার করে বলা হবে, 'তোমরা কি আমাদেরকে প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করনি?'" [১৯৬]

উজির শারফুদ্দিন এই গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো সুলতানকে জানালে তিনি অত্যন্ত খুশি হন। সুলতান দূতদ্বয়কে ডেকে এনে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এরপর তিনি তাদের কাছে জানতে চান, তারা কাকে এই গুরুত্বপূর্ণ পদের উপযুক্ত মনে করছেন। দূতদ্বয় সম্ভাব্য কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলেও বিশেষভাবে একটি নাম প্রশংসাবাক্যসহ উল্লেখ করেন এবং তাকে নির্বাচনের বিষয়ে সুলতানকে উদ্বুদ্ধ করেন।

সুলতান সানন্দে তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করে নেন। কারণ, তিনি নিজেও উক্ত প্রার্থীর শক্তি ও রণদক্ষতা, বীরত্ব ও যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা এবং নিষ্ঠা ও তাকওয়াগুণ সম্পর্কে অবগত ছিলেন। ফলে সুলতানের অনুমোদনক্রমে

---

১৯৬. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৪৩।

সেই নতুন ব্যক্তিই মসুল ও আলেপ্পোর পরবর্তী শাসক নির্বাচিত হন। নবনির্বাচিত ও প্রতীক্ষিত সেই নেতা হলেন ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ.।[১৯৭]

ইমাদুদ্দিন জিনকি এমন এক মহান নেতা, যার কীর্তি-আলোচনায় প্রয়োজন অনেক অনেক পৃষ্ঠা, প্রচুর গবেষণা ও বিশ্লেষণ। কারণ, তিনি ছিলেন উম্মাহর ইতিহাসে এক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র, জিহাদি অঙ্গনের এক প্রবাদপুরুষ।

তাহলে এখন জানার বিষয়—

কে এই ইমাদুদ্দিন জিনকি?

কী তার ইতিহাস?

কীভাবে এই মহান মুজাহিদের আবির্ভাব এবং কীভাবে খ্যাতির শীর্ষতম চূড়ায় আরোহণ?

কী ছিল জাতির সংস্কার ও সংশোধনে তার পদক্ষেপ এবং কী ছিল পরিবর্তনের লক্ষ্যে তার কর্মপদ্ধতি?

তার কর্মপ্রচেষ্টায় কেমন ছিল জনসাধারণের আচরণ এবং কেমন ছিল তার প্রতি অধীনস্থ প্রশাসক ও রাজন্যবর্গের অবস্থান?

আর ক্রুসেড-বিরোধী সমরাঙ্গনে এই নবতারকার আত্মপ্রকাশে কী ছিল ক্রুসেডারদের প্রতিক্রিয়া?

প্রতিটি বিষয়ের জন্য প্রয়োজন বিস্তৃত গবেষণাধর্মী আলোচনা। আর এটিই আমাদের পরবর্তী পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়।

* * *

১৯৭. প্রাগুক্ত।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ইমাদুদ্দিন জিনকির বংশপরিচয়

ইমাদুদ্দিন জিনকির মতো মহান ব্যক্তিকে ভালো করে জানতে হলে তার বংশ, গোত্র ও পূর্বপুরুষদের জানতে হবে। তার পরিবারের বিশেষত তার পিতা-মাতার জীবনাদর্শের প্রতি দৃষ্টি বোলালে তার জীবনের বহু গভীর ও গূঢ় তত্ত্ব-রহস্য জানা হয়ে যাবে; উপলব্ধি করা যাবে এমন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব গঠনের নেপথ্য রহস্য, যার হাতে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছিলেন।

তাদের পিতা ছিলেন পুণ্যের আকর!

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে মুসা আলাইহিস সালাম ও খিজিরের ঘটনায় উল্লেখিত সন্তানের কল্যাণপ্রাপ্তির কারণ হিসেবে তার পিতার পুণ্যবান হওয়াকে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَ اَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَیْنِ یَتِیْمَیْنِ فِی الْمَدِیْنَةِ وَ كَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَ كَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ یَّبْلُغَاۤ اَشُدَّهُمَا وَ یَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ﴾

> প্রাচীরটি ছিল নগরের দুজন পিতৃহীন বালকের। এর নিচে ছিল তাদের গুপ্তধন আর তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং আপনার প্রতিপালক চাইলেন তারা প্রাপ্তবয়সে উপনীত হোক এবং নিজেদের গুপ্তধন বের করে নিক। এসব আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহেই ঘটেছে। [সুরা কাহাফ: ৮২]

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এ ঘটনায় এক বিস্ময়কর তত্ত্ব ও সূক্ষ্ম মর্ম নিহিত আছে, যা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। একজন ব্যক্তি দুটি শিশু সন্তান রেখে মারা যান। বাচ্চাদুটির শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রতিপালনের

সুযোগ তিনি পাননি। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সন্তানদুটির রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং তাদের ললাটে লিখে দেন বিস্তৃত কল্যাণের বার্তা। কারণ, তাদের পিতা ছিলেন পুণ্যবান।

একই মর্ম ধারণ করে পবিত্র কুরআনে অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾

> তাদের ভয় করা উচিত, যারা নিজেদের পশ্চাতে দুর্বল-অক্ষম সন্তানসন্ততি ছেড়ে গেলে তাদের জীবন শঙ্কাগ্রস্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে। সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সরল-সঠিক কথা বলে। [সুরা নিসা : ০৯]

আমাদের মহান বীর ইমাদুদ্দিন জিনকি যেন কুরআনে বর্ণিত সেই এতিম সন্তানদ্বয়ের প্রতিচ্ছবি। মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি তার পিতাকে হারান। অর্থাৎ তিনি তার শৈশব অতিবাহিত করেন পিতৃহীন অবস্থায়। কিন্তু তার পিতা ছিলেন সৎ ও খোদাভীরু। তিনি সর্বদা সরল-সঠিক কথা বলতেন। আর তাই আল্লাহ তাআলা পিতার সততা ও পুণ্যের ওসিলায় সন্তানের তত্ত্বাবধান করেছেন।

ইসলামি ইতিহাসে এর হাজারো দৃষ্টান্ত আছে। বহু সংস্কারক ও সমাজপ্রবর্তক পিতৃহীন অবস্থায় শৈশব অতিবাহিত করেছেন। শৈশবেই পিতৃবিয়োগ তাদের বরণীয়-মাননীয় ও সমাজ সংস্কারক হওয়ার পথে অন্তরায় হতে পারেনি। হাসান বসরি, শাফিয়ি, আহমাদ বিন হাম্বল, বুখারি, আবদুর রহমান আন-নাসির, সাইফুদ্দিন কুতুজ, উমর মুখতার—এমন উদাহরণ অসংখ্য। এমনকি স্বয়ং আমাদের প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও শৈশবেই পিতাকে হারিয়েছেন এবং পিতৃহীন শৈশব কাটিয়েছেন। এরপর সেই এতিম নবীই পরিণত হয়েছেন সর্বজনস্বীকৃত জগৎসংসারের শ্রেষ্ঠতম মানবে।

তাহলে এখন জানা দরকার, কে সেই মহান পিতা, যার পুণ্য ও সততার কারণে আল্লাহ তাআলা তার ও আমাদের কল্যাণে এই মহান পুত্র ইমাদুদ্দিন জিনকির তত্ত্বাবধান করেছিলেন?!

এমন মহান সন্তানের জনক, আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণে উম্মাহর এই মহিরুহকে জাতির আদর্শ হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন; তিনি হলেন 'হাজিব আক সুনকুর তুর্কমানি'।

নামেই স্পষ্ট যে, তিনি তুর্কি বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি ছিলেন তুর্কি শাখাগোত্র 'সাবয়ু' এর সদস্য। সেলজুক শাসকপরিবারের কাছে 'সাবয়ু' শাখাগোত্রের বিশেষ মর্যাদা-অবস্থান ছিল।[১৯৮]

হাজিব আক সুনকুর মহান সেলজুক সুলতান মালিকশাহর অন্যতম আস্থাভাজন সঙ্গী ছিলেন। পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মালিকশাহর শাসনাধীন সেলজুক সাম্রাজ্যের সীমা পূর্বে চীন হতে পশ্চিমে এশিয়া মাইনর অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[১৯৯] মালিকশাহ ছিলেন সদাচারী ও ন্যায়পরায়ণ। আর তাই কেবল সৎ ও পুণ্যবান লোকেরাই তার আস্থাভাজন হতে পারত। এর প্রমাণ হিসেবে আশা করি এ বিষয়টিই যথেষ্ট যে, তার প্রধান উজির ছিলেন ইসলামি ইতিহাসের অন্যতম মহান উজির নিজামুল মুলক। মালিকশাহর হাজিব আক সুনকুরই ছিলেন ইমাদুদ্দিন জিনকির পিতা। নিঃসন্দেহে এটিও মহান সুলতান মালিকশাহর সততার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, আল্লাহ তাআলা তার প্রশাসন ও একান্ত সঙ্গী হিসেবে সৎ ও পুণ্যবান ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন।

হাজিব আক সুনকুর সুলতান মালিকশাহর এতটা প্রিয়পাত্র ছিলেন যে, সুলতান তাকে এক বিস্ময়কর উপাধি প্রদান করেন। সুলতান আক সুনকুরকে 'কাসিমুদ্দৌলা' (সাম্রাজ্যের অংশীদার) উপাধি দেন। অর্থাৎ সুলতান মালিকশাহ মনে করতেন, সাম্রাজ্য পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আক সুনকুরও তার সঙ্গে শরিক আছেন। নিঃসন্দেহে এ উপাধি প্রদান ছিল আক সুনকুরের অনন্যসাধারণ মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ।[২০০]

সে সময় শাম অঞ্চলের পরিস্থিতি ছিল কঠিন দুর্যোগপূর্ণ। রাজনীতির ভয়ানক সংঘাত শামকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলেছিল। বিশেষ করে আলেপ্পোর নিয়ন্ত্রণ লাভের লড়াইয়ে এ সময় তিনটি শক্তিশালী পক্ষ বিবাদমান ছিল। এক. আলেপ্পো ও মসুলের তৎকালীন শাসক মুসলিম বিন

---

১৯৮. ইবনুল আদিম, *বুগইয়াতুত-তালাব ফী তারীখি হালাব*, ৮/৩৮৪৪।

১৯৯. ইবনুল ইবরি, *তারীখু মুখতাসারিদ দুওয়াল*, পৃষ্ঠা : ১৮৬।

২০০. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ৪।

কুরাইশ আল-উকায়লি।(২০১) দুই. দামেশকের আমির ও সুলতান মালিকশাহর ভাই তুতুশ বিন আলপ আরসালান। আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, মালিকশাহর ভাই হলেও তুতুশ ছিলেন চূড়ান্ত অসৎ ও দুরাচারী এক শাসক। তুতুশের দুই পুত্র রিজওয়ান ও দাক্কাকও ছিলেন পিতার মতোই দুরাচারী। তিন. রোমান সেলজুক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সুলায়মান বিন কুতুলমিশ। সুলায়মান ছিলেন ক্রুসেড ইতিহাসের শুরুর দিকে আলোচিত ১ম কিলিজ আরসালানের পিতা।

ত্রিমুখী সংঘাতের দুঃখজনক পরিণতির শিকার হয়ে সুলায়মান বিন কুতুলমিশের হাতে মুসলিম বিন কুরাইশ নিহত হন। এর ফলে সুলায়মানের জন্য আলেপ্পোর দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু আলেপ্পোবাসী তার হাতে নগরীর শাসনভার তুলে দিতে অসম্মতি জানায় এবং ন্যায়পরায়ণ সুলতান মালিকশাহর কাছে নগরীটির দায়িত্ব গ্রহণের আবেদনবার্তা পাঠায়। মালিকশাহ এতে সম্মত হয়ে তার বাহিনী নিয়ে আলেপ্পো অভিমুখে রওনা হন।(২০২) কিন্তু এরই মধ্যে সুলায়মান বিন কুতুলমিশ আলেপ্পোর আরেক দাবিদার তুতুশ বিন আলপ আরসালানের হাতে নিহত হন।(২০৩) সুলায়মানকে হত্যা করে তুতুশ আলেপ্পো দখলের উদ্দেশ্যে রওনা হন। মালিকশাহ ও তুতুশ দুই ভাই একই সময় আলেপ্পোতে পৌঁছান। কিন্তু তুতুশ অনুভব করেন যে, তার পক্ষে ভাইয়ের বিশালকায় বাহিনীর মোকাবিলা করার সামর্থ্য নেই। তাই তিনি মালিকশাহর জন্য আলেপ্পোর কর্তৃত্ব ছেড়ে দিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করেন।(২০৪)

আলেপ্পোর নতুন দিন

বিগত দিনের রক্তক্ষয়ী সংঘাতের কারণে আলেপ্পোর পরিস্থিতি ছিল চূড়ান্ত বিপর্যস্ত। আর তাই নগরীটির সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্য সুলতান মালিকশাহ একটি সমাধানই দেখতে পান। তিনি আলেপ্পোর প্রশাসনিক

---

২০১. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/ ৯১-৯২।

২০২. প্রাগুক্ত, ২/৯৯-১০০।

২০৩. শিহাবুদ্দিন আহমাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নুওয়াইরি, *নিহায়াতুল আরাব ফী ফুনূনিল আদাব*, ২৭/ ৯৩।

২০৪. ইবনে ওয়াসিল, *মুফাররিজুল কুরূব*, ১/১৮।

দায়িত্ব প্রদান করেন এমন এক ব্যক্তিকে, যার শক্তি ও দক্ষতা এবং চারিত্রিক কুশলতা ও তাকওয়া-গুণের প্রতি তার পূর্ণ আস্থা আছে। তিনি আর কেউ নন, মালিকশাহর বিশ্বস্ত হাজিব কাসিমুদ্দৌলা আক সুনকুর তুর্কমানি। ৪৭৯ হিজরির শাওয়াল মাসে (১০৮৭ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে) আক সুনকুরের দায়িত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে আলেপ্পোতে সেলজুক শাসনের সূচনা হয়। সুলতান তাকে আলেপ্পোর পাশাপাশি হামা, মানবিজ ও লাতাকিয়াসহ এ অঞ্চলের আরও কিছু নগরীর শাসনক্ষমতা প্রদান করেন।[২০৫]

হাজিব আক সুনকুর তুর্কমানি এমন এক সময়ে আলেপ্পোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যখন এ অঞ্চলের রাজন্যবর্গের অব্যাহত লড়াই-সংঘাতে নগরীটির পরিস্থিতি ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের অস্থির ও গোলযোগপূর্ণ। এ কারণে যারাই আলেপ্পোর শাসনভার গ্রহণ করত, তারা এর অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি মোটেও নজর দিত না। ফলে আলেপ্পোর আয়-উৎপাদন আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছিল। জনসাধারণের ওপর কঠিন করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দ্রব্যমূল্যের চরম ঊর্ধ্বগতির কারণে চোর-ডাকাতের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল এবং শান্তি-নিরাপত্তাব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়েছিল। এ কারণে বাণিজ্য ও কৃষিখাতসহ সর্বক্ষেত্রেই ব্যাপক ধস নেমেছিল। আর স্বাভাবিকভাবেই এসব বিষয় সমাজের প্রতিটি অঙ্গনে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করেছিল।[২০৬]

সমাজজীবনের প্রতিটি শাখায় এমন ভয়াবহ অবনতি সত্ত্বেও নতুন প্রশাসক আক সুনকুর পূর্ণোদ্যমে তার কাজ শুরু করেন। তিনি রাজ্যের প্রতিটি অঙ্গনের সংস্কার ও পুনর্গঠনে সর্বোচ্চ সচেষ্ট হন। তার ভাবনাজুড়ে ছিল রাজ্যের প্রতিটি অঙ্গন। এক দিক উপেক্ষা করে অন্য দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার পরিবর্তে তিনি একই সঙ্গে প্রতিটি অঙ্গনের সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

আক সুনকুর প্রথমেই আলেপ্পো নগরীর বিধ্বস্তপ্রায় নিরাপত্তাব্যবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করেন। তিনি আলেপ্পোতে শরয়ি দণ্ডবিধান কার্যকর করেন এবং চোর-ডাকাত, উগ্র ও চরমপন্থীদের বিতাড়িত বা আটক করেন।

---

২০৫. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৮/৪৪৩।

২০৬. মুসতাফা শাকির, *দুখুলুত-তুর্ক আল-গায ইলাশ-শাম*, পৃষ্ঠা : ৩০৭, ৩১৪-৩১৫।

যেহেতু এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য এমন শক্তিশালী নিরাপত্তাবাহিনী প্রয়োজন, যা জনসাধারণের ওপর জুলুম-নিপীড়নের পরিবর্তে জননিরাপত্তা ও জন-অধিকার রক্ষায় কাজ করবে, তাই আক সুনকুর একটি জনবান্ধব নিরাপত্তাবাহিনী গড়ে তোলেন।

শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তিনি এর পাশাপাশি একটি যুগান্তকারী নীতি অবলম্বন করেন। তিনি প্রতিটি পাড়া-মহল্লা ও গ্রামে 'সমষ্টিগত জবাবদিহিতা'র নীতি চালু করেন। অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি বা কাফেলা কোথাও আক্রান্ত হলে পুরো গ্রামবাসী তার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব বহন করবে; তার সম্পদ চুরি হলে সকলে মিলে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। তার গৃহীত এ নীতি স্বল্প সময়ে অভিনব ফল বয়ে আনে। শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা সামাজিক ও সমষ্টিগত দায়িত্বে পরিণত হয়।[২০৭] এ নীতির কারণে সমষ্টিগত যাচাই ছাড়া কাউকে অপরাধী সন্দেহ করার সুযোগ ছিল না। কারণ, জবাবদিহিতা এখন ব্যক্তিগত নয় বরং সমষ্টিগত দায়িত্ব।

আক সুনকুর তুর্কমানির গৃহীত এ নীতির প্রমাণ-উৎস শরিয়তে রয়েছে। ইসলামি দণ্ডবিধির একটি সুপ্রসিদ্ধ বিধান হলো 'আকিলা' নীতি; অর্থাৎ হত্যাকারীর পরিবার, গোত্র বা গ্রামের সকলে মিলে নিহত ব্যক্তির রক্তপণ পরিশোধের নীতি। এ নীতির ফলে রক্তপণ যত অধিকই হোক, তা অধিকারীর হাতে পৌঁছা নিশ্চিত হয়।

এমন অভিনব নীতি প্রণয়ন, যথার্থ প্রয়োগ ও নিরাপত্তাবাহিনীর সঠিক ব্যবহারের ফলে অল্প কয়েক মাসের মধ্যে আলেপ্পোর প্রতিটি প্রান্তে শান্তি ও নিরাপত্তা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। স্বভাবতই বাণিজ্য ও কৃষিক্ষেত্রে এর প্রভাব প্রতিফলিত হয় এবং লেনদেনের প্রতিটি অঙ্গনে নতুন জোয়ার সৃষ্টি হয়। ফলে রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি লক্ষণীয় মাত্রায় উন্নতি লাভ করে, দ্রব্যমূল্য কমে আসে এবং পর্যাপ্ত উৎপাদন ও জোগান নিশ্চিত হয়। পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোর তুলনায় আলেপ্পো সামগ্রিকভাবে অনেক এগিয়ে যায়।[২০৮]

এখানে আমরা নিশ্চিতভাবে এ কথা বলতে পারি যে, আক সুনকুর রহ. শরিয়ত-নির্ধারিত দণ্ডবিধি বাস্তবায়নে পূর্ণ সচেষ্ট ছিলেন। অথচ অনেকে

---

২০৭. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ১৫।

২০৮. সিবতু ইবনিল জাওযি, *মিরআতুয-যামান*, ৮/২৪৪।

মনে করে, চুরির শাস্তি হাত কাটা, হত্যার বদলে হত্যা, বিবাহিত ব্যাভিচারীকে প্রস্তারাঘাত, অবিবাহিত ব্যাভিচারীকে বেত্রাঘাত ও মদপানকারীকে বেত্রাঘাত ইত্যাদি ইসলামি দণ্ডবিধি কার্যকর করা হলে সমাজ বিকৃত ও কুৎসিত হয়ে পড়বে। অনেকে ভেবেছিল, আলেপ্পোতে সন্ত্রাসী-অপরাধীদের সংখ্যা যেহেতু বেশি, তাই সেখানে ইসলামি দণ্ডবিধি কার্যকর করায় সমাজব্যবস্থা বিকৃত হয়ে গেছে! কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। বরং গুটিকয়েক অপরাধীকে নির্ধারিত শাস্তি প্রদান করায় অন্যরা সতর্ক হয়ে গেছে। ইতিহাসগ্রন্থগুলোতে এমন তথ্য নেই যে, সে সময় অসংখ্য অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল; বরং এ তথ্যই পাওয়া যায় যে, অধিকাংশ অপরাধী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে অন্যায়-অপরাধ ছেড়ে দিয়েছিল। নিঃসন্দেহে পবিত্র কুরআনের এ ঘোষণা সত্য—

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ﴾

> হে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়, কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্যে জীবন রয়েছে। আশা করা যায়, তোমরা (কিসাসের ভয়ে হত্যাকাণ্ড) পরিহার করবে। [সুরা বাকারা: ১৭৯]

হ্যাঁ, কিসাস বিধান প্রয়োগ, ইসলামি দণ্ডবিধির যথার্থ অনুসরণ ও কুরআন-সুন্নাহর পূর্ণ বাস্তবায়নের ফলেই আলেপ্পোতে ফিরে এসেছিল জীবনের স্পন্দন এবং শান্তি, সম্মান, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও বিশেষ মর্যাদাকর অবস্থান।

এমন অত্যুচ্চ শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আক সুনকুর আলেপ্পোতে এক অতি বিস্ময়কর নির্দেশ প্রচার করেন। তিনি ঘোষণা করেন—কেউ যদি দূরে কোথাও সফর করে আবার ফিরে আসার মনস্থ করে, অনুপস্থিতির সময়ে চুরি হওয়ার আশঙ্কায় তার মালসামানা সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই। সে প্রহরার ব্যবস্থা করা ছাড়াই নিশ্চিন্তে মাল রেখে সফরে চলে যাবে। তার মালের নিরাপত্তার দায়িত্ব আক সুনকুরের!

নিঃসন্দেহে এটি ইতিহাসের এক বিস্ময়কর নিরাপত্তার ঘটনা! মানুষের মুখেমুখে বিষয়টি আলোচিত হতে থাকে।

ইতিহাসগ্রন্থসমূহে এ সংক্রান্ত এক অবাক করা ঘটনা পাওয়া যায়। আক সুনকুর একবার আলেপ্পোর এক গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে

তিনি দেখতে পেলেন, জনৈক কৃষক সারাদিনের কাজ শেষে বাড়ি ফেরার সময় চাষাবাদের উপকরণ গুছিয়ে বাহনের পিঠে ওঠাচ্ছে। কৃষি-উপকরণগুলো চামড়া-আচ্ছাদিত ছিল। আক সুনকুর তাকে বললেন, 'আপনি কি কাসিমুদ্দৌলার নির্দেশ শোনেননি? তিনি তো সামানপত্র জায়গা থেকে উঠিয়ে নিতে নিষেধ করেছেন।' কৃষক আক সুনকুরকে চিনত না। সে উত্তর দিল, 'আল্লাহ কাসিমুদ্দৌলাকে রক্ষা করুন। তার শাসনামলে আমরা যথেষ্ট নিরাপদে আছি। আমি চুরি হওয়ার ভয়ে এসব সামানা নিয়ে যাচ্ছি না। আমাদের এদিকে শিয়ালের উপদ্রব খুব বেশি। শিয়াল এসে এগুলোর ওপরের চামড়া খেয়ে ফেলে। এজন্যই আমরা সামানাগুলো রাতে বাড়িতে নিয়ে যাই।'

এরপর আক সুনকুর আলেপ্পোতে ফিরে এসে শিকারিদের নির্দেশ দিলে শিকারিরা খুঁজে খুঁজে চামড়াখেকো এসব প্রাণীকে ধরে ফেললে একসময় প্রাণীগুলো নিঃশেষ হয়ে যায়।[২০৯]

আক সুনকুরের শাসনামলে আলেপ্পোতে এরূপ অকল্পনীয় জননিরাপত্তাই ছিল!

কেবল নিরাপত্তাবিধানে নয়; স্থাপত্যশিল্পেও আক সুনকুরের এমন অবদান আছে যা প্রমাণ করে যে, তিনি রাজ্যের প্রতিটি বিষয়ে গুরুত্বদানকারী একজন ভারসাম্যপূর্ণ শাসক ছিলেন। তিনি তার শাসনামলে আলেপ্পো মসজিদের মিনার পুনর্নির্মাণ করেন। মিনারটিতে আজও তার নাম খোদাই করা আছে।[২১০]

কাসিমুদ্দৌলা রহ. সামরিক অঙ্গনেও চূড়ান্ত স্তরের বিন্যাস সাধন করেন। নিয়মিত বাহিনীর পাশাপাশি তিনি একটি সংরক্ষিত বাহিনীও গঠন করেন। সংরক্ষিত বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল বিশ হাজার। নিয়মিত বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য ছিল তুর্কমেন বংশোদ্ভূত আর সংরক্ষিত বাহিনীতে ছিল আরব ও তুর্কমেন উভয় ধরনের সৈন্য।[২১১]

---

[২০৯]. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১০৪।

[২১০]. প্রাগুক্ত, ২/১০৫।

[২১১]. প্রাগুক্ত, ২/১০৪।

কাসিমুদ্দৌলা আক সুনকুর হত্যাকাণ্ড

আপন কর্মগুণে আক সুনকুর সকল মানুষের আলোচনায় পরিণত হন। তিনি আলেপ্পোবাসীর অগাধ ভালোবাসা লাভ করেন; বরং লাভ করেন পুরো মুসলিম বিশ্বের জনসাধারণের অন্তরে শ্রদ্ধার আসন।

ইবনুল কালানিসি আক সুনকুর সম্পর্কে বলেন, 'তিনি জনসাধারণের সঙ্গে সদাচরণ করেন। পুরো রাজ্যে ছড়িয়ে দেন ন্যায়বিচার। শঙ্কিত পথিকের পথযাত্রা নিরাপদ করেন। সামাজিক মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনেন। জনতার প্রতি সুবিচার করেন। অন্যায়কারীদের খুঁজে খুঁজে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করেন। অনিষ্টকারীদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করেন। এতে দ্রুত তার সুনাম, সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে; প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা বাড়তে থাকে। ফলে পথিকরা নিশ্চিন্তে সফর করে; সর্বদিক থেকে পণ্যের আমদানি বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটে।'[২১২]

ইবনুল আছির তার সম্পর্কে বলেন, 'কাসিমুদ্দৌলা ছিলেন প্রজার প্রতি সদাচরণ ও জন-অধিকার রক্ষার বিবেচনায় শ্রেষ্ঠতম রাজন্য। তার রাজ্যে ছিল পণ্যের সহজলভ্যতা, পূর্ণ ন্যায়বিচার ও বিস্তৃত নিরাপত্তা।'[২১৩]

ইবনে কাছির বলেন, 'কাসিমুদ্দৌলা ছিলেন শ্রেষ্ঠতম সদাচারী, নিষ্কলুষ ও সত্যনিষ্ঠ শাসক। তার আমলে জনজীবনে ছিল নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও পণ্যের সুলভ ব্যবস্থা।'[২১৪]

প্রখ্যাত ঐতিহাসিকগণ এভাবেই কাসিমুদ্দৌলা আক সুনকুর রহ.-এর জীবনকে তুলে ধরেছেন।

কিন্তু এই বর্ণাঢ্য ও সৌন্দর্যমণ্ডিত জীবনও সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। কিছু লোক তার এ কল্যাণকামিতা পছন্দ করছিল না; রাষ্ট্র ও সমাজ বিনির্মাণে তার এ অসামান্য অবদান তাদের সহ্য হচ্ছিল না। তার সততা ও খোদাভীতি তাদের মনে হিংসার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

এ জাতীয় ব্যক্তিদের সর্বশীর্ষে ছিলেন সুলতান মালিকশাহর ভাই তুতুশ বিন আলপ আরসালান। তুতুশ পুরো শাম অঞ্চলে তার আধিপত্য বিস্তার

---

২১২. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ১৯৬।

২১৩. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৮/৪৯৫।

২১৪. ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১২/১৪৭।

করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু আলেপ্পোতে এমন ন্যায়বান শাসকের উপস্থিতি তার লক্ষ্য পূরণ জটিল করে তুলেছিল। কারণ, এ অঞ্চলের জনগণ যেমন আক সুনকুরকে অসম্ভব ভালোবাসে, তেমনই তার প্রতি হৃদ্যতা রাখেন সুলতান মালিকশাহ। তাহলে তুতুশের সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন কীভাবে বাস্তবায়িত হবে?!

তুতুশ ছিলেন ধূর্ততায় অতি সেয়ানা! তিনি জানতেন সুলতান মালিকশাহ আক সুনকুরকে পছন্দ করেন। সুতরাং তার বিরুদ্ধে সুলতানকে বিক্ষুব্ধ করার কোনো পথ খোলা নেই। তাই তিনি আলেপ্পো বাদে শামের অন্যান্য রাজ্যকে কর্তৃত্বভুক্ত করতে সচেষ্ট হন। এরপর তিনি সুলতান মালিকশাহকে জানান যে, শাম অঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্য উবায়দিদের হুমকির মুখে আছে। তাই উবায়দিদের প্রতিরোধ করার জন্য তার সুলতানের সহায়তা প্রয়োজন। তখন সুলতান মালিকশাহ আক সুনকুরসহ শাম অঞ্চলের সকল প্রশাসককে শিয়া উবায়দিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তুতুশকে সহায়তা করতে নির্দেশ দেন।(২১৫)

কাসিমুদ্দৌলা ভালোভাবেই উপলব্ধি করেন যে, তুতুশের মতলব উবায়দিদের প্রতিরোধ নয়; বরং নিজের একচ্ছত্র ক্ষমতার লালসা বাস্তবায়ন করা। এদিকে তিনি তো সুলতান মালিকশাহর পূর্ণ অনুগত। আবার তুতুশ সুলতান মালিকশাহর সহোদর হওয়ায় সরাসরি তিনি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতেও পারছিলেন না। সবদিক বিবেচনা করে তিনি তুতুশকে সহায়তা করেন; তবে কোনোমতে দায়সারাভাবে।(২১৬) এতে তুতুশ তার প্রতি আরও বেশি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং ভাই মালিকশাহর কাছে বার্তা পাঠিয়ে কাসিমুদ্দৌলার বিরুদ্ধে সেলজুক পরিবারের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনেন।

সুলতান মালিকশাহ যেহেতু কোনো পক্ষকেই বিক্ষুব্ধ করতে চাচ্ছিলেন না, তাই তিনি কোমল পন্থায় পরিস্থিতির সমাধান করার মনস্থ করেন। তিনি পারস্পরিক আলোচনার জন্য আক সুনকুর ও তুতুশসহ শাম অঞ্চলের সকল রাজন্যকে পারস্যে তার বাসভবনে আহ্বান করেন। আলোচনাসভায় তুতুশ সুস্পষ্ট ভাষায় আক সুনকুরের বিরুদ্ধে সেলজুক

---

২১৫. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৮/ ৪৭৭।

২১৬. সুহাইল যাক্কার, *মাদখালুন ইলা তারীখিল হুরূবিস-সালিবিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ২১৬।

পরিবারের প্রতি আনুগত্যে অবহেলার অভিযান উত্থাপন করেন। বাধ্য হয়ে আক সুনকুর আত্মপক্ষ সমর্থন করেন এবং তুতুশকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দেন। সবাইকে অবাক করে দিয়ে সুলতান মালিকশাহ আক সুনকুরের কথা মেনে নেন এবং তাকে অপসারণে তুতুশের আবেদন নাকচ করে দেন। এরপর তিনি ভাই তুতুশকে আক সুনকুরের পেছনে না লাগার নির্দেশ দেন![২১৭]

আক সুনকুর আলেপ্পোর দায়িত্ব গ্রহণ করার পাঁচ বছর পর ৪৮৪ হিজরি সনের রমজান মাসে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এর পরের বছরই এক বেদনাদায়ক ঘটনা সংঘটিত হয়; ৪৮৫ হিজরি সনের শাওয়াল মাসে (১০৯২ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে) সুলতান মালিকশাহ ইন্তেকাল করেন। মালিকশাহর মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র বারকিয়ারুক সুবিশাল সেলজুক সাম্রাজ্যের সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হন।[২১৮] যেহেতু তুতুশ এই সর্বোচ্চ পদের প্রতি লালায়িত ছিলেন, তাই তিনি এতে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হন এবং ভ্রাতুষ্পুত্র বারকিয়ারুকের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালিয়ে জোরপূর্বক সালতানাতের অধিকার অর্জনের সিদ্ধান্ত নেন।

তুতুশ জানতেন, তিনি যদি বারকিয়ারুকের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন, আক সুনকুর পেছন থেকে তার ওপর হামলে পড়তে পারেন। তাই তিনি এক ঢিলে দুই পাখি শিকারের মনস্থ করেন। তিনি বারকিয়ারুকের বিরুদ্ধে অভিযানে তাকে সহায়তা করার জন্য আক সুনকুরকে তার বাহিনী নিয়ে যোগ দিতে নির্দেশ দেন। এর ফলে একদিকে যেমন আক সুনকুরের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকা যাবে, অপরদিকে আক সুনকুরের বিরাট সামরিক শক্তিকে বারকিয়ারুকের পতনে কাজে লাগানো যাবে।

কাসিমুদ্দৌলা আক সুনকুর কঠিন বিপাকে পড়ে যান। তিনি জানতেন, তুতুশের সামরিক শক্তির তুলনায় তার শক্তি ও সামর্থ্য অনেক কম। তা ছাড়া যত কিছু হোক, তুতুশ প্রয়াত সুলতান মালিকশাহর সহোদর এবং বর্তমান সুলতান বারকিয়ারুকের চাচা। তার আদেশ তিনি অমান্য করেন কীভাবে। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি তো প্রয়াত মহান সুলতান মালিকশাহর

২১৭. ইবনুল আদিম, *বুগইয়াতুত-তালাব ফী তারীখি হালাব*, ৪/ ১৯৫৬।
২১৮. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৮/৪৮৪।

পূর্ণ বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি তো সুলতানের অবর্তমানে তার পুত্র বারকিয়ারুকের যথার্থ তত্ত্বাবধান ও কল্যাণ কামনা করেন। অধিকন্তু তিনি তুতুশের উগ্র লালসা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। তিনি জানতেন, তুতুশ মুসলমানদের শাসক হওয়ার মতো উপযুক্ত ব্যক্তি নন। অতএব, এখন তিনি কী করবেন?

অনেক ভেবে-চিন্তে আক সুনকুর এমন এক ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের পরিকল্পনা করেন যে, হয়তো একদিন তাকে জীবন দিয়ে এর মূল্য চুকাতে হবে। কিন্তু সেই মুহূর্তে তিনি এ ছাড়া ভিন্ন কোনো সমাধানও দেখছিলেন না।

কাসিমুদ্দৌলা সিদ্ধান্ত নেন, তিনি তার বাহিনী নিয়ে তুতুশের সঙ্গে বের হবেন এবং তাকে বোঝাবেন যে, তিনি তুতুশের পক্ষে যুদ্ধ করবেন। কিন্তু দু-পক্ষ মুখোমুখি হলে তিনি তুতুশকে ছেড়ে বারকিয়ারুকের বাহিনীতে যোগ দেবেন![২১৯]

নিঃসন্দেহে এটি ছিল অতি বিপজ্জনক এক পরিকল্পনা। যুদ্ধে তুতুশ জয়লাভ করলে আক সুনকুরের সব শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তার চিন্তাধারা ছিল সুস্পষ্ট। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, চলমান সংঘাতে বারকিয়ারুকই ন্যায়ের পক্ষে আছেন। এর কারণ কেবল এই নয় যে, বারকিয়ারুক এ পদের বৈধ উত্তরাধিকারী; বরং এটিও আক সুনকুরের বিবেচনায় ছিল যে, সততা ও খোদাভীতির গুণে বারকিয়ারুক তুতুশের চেয়ে হাজার গুণ বেশি উপযুক্ত। আর তাই আক সুনকুর তুর্কমানি রহ. নিজের জীবন ও নিরাপত্তা উৎসর্গ করে ন্যায়ের পক্ষে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালনের সিদ্ধান্ত নেন।

নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন মুসলিম উম্মাহর এক দৃষ্টান্ত-বিরল মহান পুরুষ!

৪৮৬ হিজরি সনে তুতুশ ও বারকিয়ারুকের বাহিনী পারস্যের রায় নগরীতে পরস্পর মুখোমুখি হয়। আক সুনকুর তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন এবং তার বাহিনী নিয়ে সটকে পড়ে বারকিয়ারুকের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হন। এডেসার তৎকালীন মুসলিম আমির বুজানও একই কাজ করেন। তিনিও প্রয়াত সুলতান মালিকশাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ত ছিলেন।

---

২১৯. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৮/৪৮৮।

আলেপ্পো ও এডেসার বাহিনী সরে যাওয়ায় তুতুশের বাহিনীর শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং রায় থেকে পরাজিত হয়ে প্রস্থান করে। তুতুশ বিফল মনোরথে শামে ফিরে আসেন। এ ঘটনায় আক সুনকুরের প্রতি তার বিদ্বেষ ও ক্ষোভ আরও প্রকট আকার ধারণ করে।[২২০]

নতুন সুলতান বারকিয়ারুক আক সুনকুরকে আলেপ্পোর প্রশাসক পদে বহাল রাখেন। পাশাপাশি তিনি আক সুনকুরের সহায়তায় অতিরিক্ত সামরিক সাহায্যও প্রেরণ করেন। তিনি তুতুশের পক্ষ থেকে আক সুনকুরের ওপর ত্বরিত প্রতিশোধ-আঘাতের আশঙ্কা করছিলেন। এটি ৪৮৬ হিজরি সনের জিলকদ মাসের ঘটনা।

দ্রুতই এ আশঙ্কা বাস্তবে রূপ নেয়। তুতুশ বিভিন্ন বাহিনীকে সমবেত করে আলেপ্পো দখলের উদ্দেশে রওনা হন। আক সুনকুর এ সময় বারকিয়ারুকের অনুগত বিভিন্ন রাজন্যের কাছে সাহায্যবার্তা প্রেরণ করেন। কিন্তু তাদের আগমনে দেরি হওয়ায় আক সুনকুর একাই তার বাহিনী নিয়ে তুতুশের মোকাবিলায় বেরিয়ে পড়েন। অসম লড়াই শেষে আক সুনকুর পরাজিত ও বন্দি হন। দুরাচারী তুতুশ তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করেন।[২২১]

৪৮৭ হিজরি সনের ৯ জুমাদাল উলা (১০৯৪ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে) শনিবার এই হৃদয়বিদারক ঘটনা সংঘটিত হয়। এর মধ্য দিয়ে আক সুনকুরের আট বছরের আলেপ্পো শাসনের অবসান ঘটে। সম্মিলিত সাক্ষ্যমতে এই আটটি বছর ছিল আলেপ্পোর ইতিহাসের অন্যতম উন্নত ও সমৃদ্ধ কাল।

এই হলো ইসলামি ইতিহাসের এক মহান পুরুষ কাসিমুদ্দৌলা আক সুনকুরের দাস্তান!

তাহলে কেমন হতে পারে এই মহান ব্যক্তির গৃহে তারই প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত ইমাদুদ্দিন জিনকির গল্প!

---

২২০. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৮/৪৮৮-৪৮৯ ও ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১০৯-১১০।

২২১. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৮/৪৯৪ ও ইবনে ওয়াসিল, *মুফাররিজুল কুরূব*, ১/২৭।

আক সুনকুর মুসলমানদের দৃষ্টিতে

আক সুনকুর যখন ইন্তেকাল করেন তখনও তার পুত্র ইমাদুদ্দিনের বয়স দশ পেরোয়নি![222] নিতান্ত শিশুকালেই তিনি তার পিতাকে হারান। নিশ্চয়ই সমকালীন অনেকেই এই পিতৃহারা শিশুটির নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করেছিল। পিতৃহারা কত শিশুই তো সুষ্ঠু প্রতিপালনের অভাবে নষ্ট হয়ে গেছে! হারিয়ে যাবে আরও কত শিশু! কিন্তু ইমাদুদ্দিন জিনকি কালের গর্ভে হারিয়ে যাননি। বরং মহান আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছেন, তাকে মর্যাদার অধিকারী করেছেন। আর তাই তিনি যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তিনি এক বিস্তৃত রাজ্যের শাসক; জনহৃদয়ের প্রিয়তম ব্যক্তি।

কাসিমুদ্দৌলা আক সুনকুর যদিও তার পুত্রের জন্য অঢেল সম্পদ বা অত্যুচ্চ কোনো পদ রেখে যাননি; কিন্তু তিনি পুত্রের জন্য এমন কিছু অমূল্য সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন, যা পদ ও সম্পদের চেয়ে বহুগুণ মূল্যবান।

১. সন্তানের জন্য তিনি রেখে গিয়েছিলেন আল্লাহ পাকের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ। নিঃসন্দেহে এ বড় উত্তম মিরাস! কাসিমুদ্দৌলা ছিলেন মুত্তাকি-খোদাভীরু এবং সর্বদা ন্যায় ও সঠিক বক্তব্য প্রদানকারী। ঐতিহাসিক ইবনুল আদিম তার সম্পর্কে বলেন, 'কাসিমুদ্দৌলা ছিলেন অগাধ তাকওয়া ও সুগভীর ঈমানের অধিকারী।'[223] পিতার এই তাকওয়াই দুর্বল শিশুপুত্রের সর্বাঙ্গীন হিফাজত করেছে। আল্লাহ তাআলা তো প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—

﴿وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا﴾

তাদের ভয় করা উচিত, যারা নিজেদের পশ্চাতে দুর্বল অক্ষম সন্তানসন্ততি ছেড়ে গেলে তাদের জীবন শঙ্কাগ্রস্ত হয়ে যাওয়ার

---

222. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ১৫।
223. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১০৫।

আশঙ্কা করে; সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সরল-সঠিক কথা বলে। [সুরা নিসা : ০৯]

২. পুত্রের জন্য তিনি রেখে গিয়েছিলেন শরিয়ত ও নীতি-নৈতিকতার প্রতি অগাধ ভক্তি ও অনুরাগ এবং শরিয়তের বিধিবিধান ও আদেশ-নিষেধের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাবোধ। শৈশবে ইমাদুদ্দিন জিনকি স্বচক্ষে শরিয়ত বাস্তবায়নের অভাবনীয় বরকত ও কল্যাণ প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই জীবনে কখনোই তিনি একে ত্যাগ করেননি।

৩. কাসিমুদ্দৌলা তার পুত্রের জন্য আরও রেখে গিয়েছিলেন ন্যায়বিচারের সুউচ্চ মূল্যমানের উপলব্ধি। আর তাই ইমাদুদ্দিন জিনকির হৃদয় ও মানসে গেঁথে গিয়েছিল ন্যায়-ইনসাফের গুণ। তিনি যেকোনো ধরনের অন্যায় ও জুলুম অপছন্দ করতেন। এ কারণেই পরবর্তী সময়ে ইমাদুদ্দিন জিনকি পিতার মতো মুসলিম ইতিহাসের অন্যতম ন্যায়বিচারক শাসকে পরিণত হন।

৪. তিনি পুত্রের জন্য রেখে গিয়েছিলেন জনগণের প্রতি স্বভাবসুলভ নমনীয়তার গুণ। তাই তো ইমাদুদ্দিন জিনকি নিজের স্বার্থের ওপর জনস্বার্থকে প্রাধান্য দিতেন, কেউ তার অধিকার আদায়ে ত্রুটি করলে তাকে ক্ষমা করে এড়িয়ে যেতেন, দুর্বল ও দরিদ্রদের প্রতি দয়া করতেন এবং বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন ছাড়া প্রত্যেকের প্রাপ্য তাকে পৌঁছিয়ে দিতেন।

৫. পুত্রের জন্য আক সুনকুর সম্পদ হিসেবে রেখে গিয়েছিলেন অত্যুচ্চ বিনয় গুণ। আর তাই ইমাদুদ্দিন সুলতানের চাকচিক্য বা মসনদের ক্ষমতায় সামান্য প্রভাবিত না হয়ে সর্বদা আল্লাহর সামনে বিনয়ী ছিলেন। তিনি নিজের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ অনুভব করতেন বলে কারও প্রতি উদ্ধত আচরণ করতেন না এবং নিজের বিজয় ও ক্ষমতায় আত্মমুগ্ধ হতেন না।

৬. তিনি পুত্রের জন্য রেখে গিয়েছিলেন প্রশাসনিক যোগ্যতা ও সহজাত নেতৃত্ব-দক্ষতা। এ কারণেই ইমাদুদ্দিন জিনকি জনগণকে তার প্রতি অনুগত বানাতে এবং প্রয়োজনে তাদেরকে আন্দোলিত করতে সক্ষম হন। আর একই কারণে তিনি ছিলেন ঐক্য-চিন্তা ও সকলকে এক পতাকাতলে সমবেত করার প্রতি অনুরাগী।

৭. পুত্রের জন্য তিনি রেখে গিয়েছিলেন জিহাদ-অনুরাগ ও জিহাদের মর্যাদাবোধ। আক সুনকুরের পুরো জীবনই ছিল জিহাদময়। তার রেখে যাওয়া আদর্শে অনুপ্রাণিত পুত্র ইমাদুদ্দিন জিনকির জীবনও ছিল সংগ্রাম ও জিহাদমুখর। আক সুনকুর তার পুত্রকে শিখিয়েছিলেন কীভাবে সম্পদ ও ক্ষমতার লালসা উপেক্ষা করে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় লড়াই করতে হয়। পুত্রকে তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন অশ্বারোহণ, অশ্বচালনা ও যুদ্ধবিদ্যার অভিনব নানা কলা-কৌশল। কারণ, কাসিমুদ্দৌলা নিজে ছিলেন সমকালীন শ্রেষ্ঠতম যোদ্ধা ও কুশলী মুজাহিদ।

৮. আক সুনকুর তুর্কমানি তার পুত্রের জন্য রেখে গিয়েছিলেন আলেপ্পোবাসীর হৃদয়ভরা ভালোবাসা। রাজ্যের প্রতিটি মানুষ তাদের এই ন্যায়বান-দয়ালু শাসককে ভালোবাসত। ঐতিহাসিক ইবনুল আছির আক সুনকুরের প্রতি আলেপ্পোবাসীর ভালোবাসার বিবরণ এক আশ্চর্য বাক্যে তুলে ধরেছেন—'শেষ সময় পর্যন্ত আলেপ্পোবাসী উত্তরাধিকার সূত্রে তার প্রতি হৃদ্যতা ও অনুরাগ পোষণ করে গেছে!' অর্থাৎ প্রত্যেক পিতা তার সন্তানদের কাসিমুদ্দৌলার প্রতি অনুরাগী ও অনুগত থাকার অসিয়ত করে যেত। এভাবেই চলেছে তার শাসনামলের শেষ পর্যন্ত! মুগ্ধতা ও ভালোবাসা কত গভীর স্তরের হলে এমনটি হতে পারে! নিঃসন্দেহে এ বিষয়টিও ইমাদুদ্দিন জিনকির জীবনে অন্যতম প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

৯. কাসিমুদ্দৌলা আক সুনকুর তার পুত্রের জন্য আরও রেখে গিয়েছিলেন সেলজুক সাম্রাজ্যের ন্যায়পরায়ণ ও শক্তিশালী সুলতানদের প্রতি সুস্পষ্ট হৃদ্যতার অনুভূতি। তিনি নিজে প্রথমে মালিকশাহ ও পরে তার পুত্র বারকিয়ারুকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ত ও অনুগত ছিলেন। পিতার এই নীতি ইমাদুদ্দিন জিনকির জন্য সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে দিয়েছিল। জীবনে কখনোই তিনি কোনো উপাধি লাভ বা স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করেননি; বরং ন্যায়পরায়ণ সুলতানের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে গেছেন এবং শক্তি দেখে ভক্তি বদল না করে সর্বদা এক নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছেন। এ গুণটি ইমাদুদ্দিন জিনকির জীবনে প্রভূত কল্যাণ নিশ্চিত করেছিল।

১০. আক সুনকুর তার এতিম সন্তানের জন্য সর্বশেষ যে সম্পদটি রেখে গিয়েছিলেন, তা হলো—বিশ্বস্ত-অনুগত একদল বন্ধু ও সুহৃদ, যারা তাকে একমাত্র আল্লাহর জন্য ভালোবাসত; যারা তার পদ বা ক্ষমতাকে নয়; ব্যক্তিত্বকে ভালোবাসত। আক সুনকুরের মৃত্যুর পর তারা তার এতিম পুত্রের তত্ত্বাবধান করে। আক সুনকুরও এমন করেই সুলতান মালিকশাহর মৃত্যুর পর তার পুত্র বারকিয়ারুকের তত্ত্বাবধান করেছিলেন। কারণ, তিনিও সুলতানকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসতেন। পৃথিবীর বিধিবদ্ধ রীতিমতে সর্বদা এমনটিই ঘটে থাকে; সৎকর্মের প্রতিদান সমজাতীয়ই হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿هَلْ جَزَآءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾

সৎ কাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কী হতে পারে?

[সুরা আর-রাহমান: ৬০]

এই হলো পূর্ণ দশ!

এই দশটি অমূল্য সম্পদ কাসিমুদ্দৌলা তার শিশুপুত্র ইমাদুদ্দিন জিনকির জন্য রেখে গিয়েছিলেন। মুসলিম সমাজে এমন পিতা কয়জন আছে, যারা কাসিমুদ্দৌলার মতো করে সন্তানের জন্য এমন অমূল্য সম্পদ রেখে যেতে পেরেছে?!

মানুষ সারা জীবন সন্তানের জন্য কাড়ি কাড়ি অর্থসম্পদ রেখে যেতে, প্লট-ফ্লাট ও গাড়ি-বাড়ির বীমা করে যেতে এবং একে-ওকে সন্তানের প্রতি লক্ষ রাখার অসিয়ত করে যেতে চেষ্টা করে। কাসিমুদ্দৌলা রহ. তার পুত্রের জন্য যেমন আদর্শ সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন, তেমনটি খুব কম মানুষই করে থাকে। অবশ্য খুব কম সন্তানও তো পরবর্তীকালে একজন ইমামুদ্দিন জিনকি হয়ে ওঠে!

সুতরাং হে বিবেকবান, একটু ভাবুন এবং শিক্ষা গ্রহণ করুন।

* * *

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ইমাদুদ্দিন জিনকি যেভাবে সর্বোচ্চ শিখরে

কেউ যেন এ কথা মনে না করেন যে, কাসিমুদ্দৌলা আক সুনকুরের এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য ছোট্ট শিশু ইমাদুদ্দিন জিনকির কাছে অস্পষ্ট ও অজানা ছিল! প্রকৃতপক্ষে শিশুদের বোধশক্তি আমাদের কল্পনার চেয়েও তীক্ষ্ণ ও বিস্তৃত হয়ে থাকে। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতি সংবেদনশীল ও গভীর মর্মসমৃদ্ধ বিভিন্ন বিষয়ও শিশুদের সামনে উপস্থাপন করতেন। ছোট্ট শিশু আলি বিন আবু তালিবকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান, শিশু আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের সামনে বিশদ আকারে আকিদাসংক্রান্ত মাসআলার ব্যাখ্যাদান কিংবা আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা রাযি.-কে তালাক প্রদান করা না-করার বিষয়ে কিশোর উসামা বিন যায়দের সঙ্গে পরামর্শ—নবীজীবনের এসব ঘটনা আমাদের এ দাবির উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

শিশুমস্তিষ্ক অতি অল্প বয়স হতেই পিতার প্রতিটি আচরণ-উচ্চারণ নিখুঁতভাবে ধারণ করে থাকে। বিশেষত আমরা যে যুগের আলোচনা করছি, ইসলামের সেই সোনালি যুগে তো শিশুরা সাত বছর বয়সেই কুরআন হিফজ শেষ করত, দশ বছর না হতেই ফিকহ ও হাদিসের গ্রন্থাদি মুখস্থ করে ফেলত, বয়স পনেরো বছর হওয়ার পূর্বেই চলে যেত জিহাদের ময়দানে আর আঠারো পূর্ণ হওয়ার আগেই বাহিনীর নেতৃত্ব দিত! তখন বিশ বছরের যুবককে দেখা যেত রাষ্ট্রশাসনের মতো গুরুদায়িত্ব পালন করতে!

যে জীবনব্যবস্থায় এভাবে শিশু-কিশোরদের যোগ্যতা, সম্ভাবনা ও ক্রমবিকাশকে কাজে লাগানো হয়, সেটিই তো উত্তম জীবনব্যবস্থা। এর ফলে একটি শিশু তার 'এক' জীবনে উপহার দিতে পারে দশ জীবনের কর্ম-অবদান! বিপরীতে আমাদের যাপিত জীবনব্যবস্থা দেখুন।

অবহেলায়-উদাসীনতায় কেটে যায় জীবনের অতি মূল্যবান এক-একটি বসন্ত; বয়স ত্রিশ পেরিয়ে গেলেও তৈরি হয় না প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মতো যোগ্যতা-অভিজ্ঞতা; এমনকি আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা।

আল্লাহপ্রদত্ত তত্ত্বাবধান

আক সুনকুর তুর্কমানি রহ. পুত্র ইমাদুদ্দিন জিনকিকে শরিয়ত ও জিহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ, দ্বীন ও মুসলিম জাতির সহায়তার অদম্য আগ্রহ, উম্মাহর সমস্যা-সংকটের পূর্ণ অনুভূতি ইত্যাদি গুণে সমৃদ্ধ করে ইন্তেকাল করেন। আর তাই ইমাদুদ্দিন জিনকি শৈশবের সেই সূচনা বয়সেই জিহাদ ও সংগ্রামের জটিল ও রাশভারী জীবন বেছে নেন।

ইমাদুদ্দিন জিনকি তার পিতা নিহত হওয়ার পর আলেপ্পো ত্যাগ করেন। যদিও আলেপ্পোবাসী তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসত; কিন্তু পিতার খুনী তুতুশের কর্তৃত্বাধীন এলাকায় বসবাস করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া তুতুশ ছিলেন একজন অনিষ্টকারী জালিম শাসক; উম্মাহর কল্যাণ ও উন্নতি তার চিন্তায় বিলকুল ছিল না। তার সময় ও সাধনা কেবল নিজের স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যয় হতো।

স্বাভাবিক প্রশ্ন—আলেপ্পো ছেড়ে ইমাদুদ্দিন জিনকি কোথায় গমন করেন?

উত্তর সহজ—তিনি সোজা চলে যান মসুলে!

সম্ভবত তার মসুলে গমনের মূল কারণ ছিল তখন মসুলের প্রশাসক-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন কারবুগা। তুর্কমেন আমির কারবুগার আলোচনা আমরা ক্রুসেড যুদ্ধ ইতিহাসের শুরু অংশে করে এসেছি। তিনি আক সুনকুরের একান্ত বন্ধু ছিলেন। বন্ধুর মৃত্যুর কিছুদিন পর ৪৮৯ হিজরি সনে কারবুগা বন্ধু-পুত্র ইমাদুদ্দিন জিনকিকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন এবং তাকে নিজ বাহিনীর সদস্য বানিয়ে নেন। ইমাদুদ্দিন জিনকির বয়স তখন বারো চলছে।[২২৪]

কারবুগার তত্ত্বাবধানে ইমাদুদ্দিন জিনকি যুদ্ধবিদ্যা, রণকৌশল ও সেনাপরিচালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে থাকেন। এভাবেই আল্লাহ তাআলা ইমাদুদ্দিন জিনকির প্রতিপালনে এমন ব্যক্তিকে নিয়োজিত করে দেন, যার

[২২৪]. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ১৬।

নিবিড় তত্ত্বাবধানে তার ব্যক্তিত্ব শানিত হতে থাকে এবং প্রতিভার বিকাশ ঘটতে থাকে।

কারবুগা যখন পার্শ্ববর্তী কয়েকটি রাজ্যকে সুলতান বারকিয়ারুকের বশীভূত করার জন্য অভিযান পরিচালনা করেন, তখন ইমাদুদ্দিন জিনকি তাতে অংশ নিয়ে প্রথমবারের মতো সম্মুখ সমরের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তখনও তার বয়স চৌদ্দ পূর্ণ হয়নি।[২২৫]

কারবুগার জীবদ্দশায়ই বরং সুনির্দিষ্ট করে বললে ৪৯১ হিজরি সনে (১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দে) ক্রুসেডাররা এন্টিয়ক দখল করে নেয়। এ সময় ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সুলতান বারকিয়ারুক কারবুগার নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। অবশ্য পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাহিনীটি পরাজিত হয় এবং এন্টিয়কে ক্রুসেড রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।[২২৬] কিশোর ইমাদুদ্দিন জিনকি এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন কি না, তা যদিও জানা যায় না; কিন্তু এটি নিশ্চিত যে, ক্রুসেড আগ্রাসনের একেবারে শুরু সময় থেকেই বিষয়টি তার মনোজগতে জায়গা করে নিয়েছিল। কারণ, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কারবুগার প্রাসাদে প্রতিপালিত ইমাদুদ্দিন জিনকি এ সময় সেখানে যেসব কথাবার্তা শুনতেন, তা ক্রুসেড ও ক্রুসেডারকেন্দ্রিকই হতো।

নিঃসন্দেহে এই মহান পুরুষ জীবনের শুরু ভাগ থেকেই লালন করেছিলেন ক্রুসেড-প্রতিরোধ চেতনা!

৪৯৫ হিজরি সনে (১১০২ খ্রিষ্টাব্দে) কারবুগা যখন ইন্তেকাল করেন ইমাদুদ্দিন জিনকির বয়স তখন আঠারো বছর।[২২৭] আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে এরপর মসুলের প্রশাসক নির্বাচিত হন আমির জাকারমিশ।[২২৮] কারবুগার মতো তিনিও কাসিমুদ্দৌলা আক সুনকুরের একান্ত নিষ্ঠাবান বন্ধু ছিলেন। জাকারমিশ কারবুগার অসমাপ্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে ইমাদুদ্দিনের যথার্থ প্রতিপালন করতে থাকেন। তিনি তাকে নেতৃত্ব ও

---

২২৫. প্রাগুক্ত।

২২৬. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৫-১৬।

২২৭. প্রাগুক্ত, ৯/৫৪।

২২৮. প্রাগুক্ত, ৯/৫৫।

পরিচালনার সব ধরনের কলাকৌশল শিক্ষা দেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাকে অন্যদের তুলনায় যোগ্য ও অগ্রগামী করে গড়ে তোলেন।

আমরা সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করছি যে, আল্লাহ তাআলা ইমাদুদ্দিন জিনকির জীবনগঠনের সময়ে এমন ব্যক্তিদের নিয়োজিত করেছিলেন, যারা তার আগামীর পদযাত্রায় সঠিক পথচলা নিশ্চিত করেছেন এবং তাকে সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের দিকে পরিচালিত করেছেন।

সেলজুক পরিবারের প্রতি ইমাদুদ্দিনের পূর্ণ বিশ্বস্ততা

৫০০ হিজরি সনে (১১০৬ খ্রিষ্টাব্দে) জাকারমিশকে বরখাস্ত করে জাওলি সাকাউকে মসুলের প্রশাসক নির্বাচিত করা হয়। কিন্তু পূর্ববর্তী প্রশাসকদের তুলনায় বিপরীত প্রকৃতির জাওলি ছিলেন অত্যাচারী ও দুরাচারী। তিনি কেবল ব্যক্তিস্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন।[২২৯] দায়িত্ব গ্রহণের এক বছর পরই ৫০১ হিজরি সনে (১১০৭ খ্রিষ্টাব্দে) জাওলি সেলজুক সুলতান মুহাম্মাদের অধীনতা প্রত্যাখ্যান করে মসুলে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন। ৪৯৪ হিজরি সনে (১১০০ খ্রিষ্টাব্দে) ভাই বারকিয়ারুকের মৃত্যুর পর সুলতান মুহাম্মাদ সেলজুক সাম্রাজ্যের হাল ধরেছিলেন। এ সময় ইমাদুদ্দিন জিনকি এক বিস্ময়কর অবস্থান গ্রহণ করেন। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সী যুবক ইমাদুদ্দিন তখন সেলজুক সুলতান মুহাম্মাদের পক্ষাবলম্বন করে তার সরাসরি উপরস্থ নেতা জাওলির বাহিনী থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেন।[২৩০] যদিও এ পদক্ষেপ ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ; কিন্তু পনেরো বছর পূর্বে তার পিতা যেমনটি করেছিলেন, তিনিও নির্দ্বিধায় একই কাজ করেন। ইমাদুদ্দিন জিনকির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একেবারে সুস্পষ্ট। তিনি মৌলিকভাবে ন্যায়বান সেলজুক সুলতান মুহাম্মাদের অনুগত; অত্যাচারী প্রশাসক জাওলির নয়। আর তাই নিজের পদ বা নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে হলেও তিনি সেই আনুগত্যের ঘোষণা জরুরি মনে করেছিলেন।

অবশ্য আল্লাহ তাআলা ইমাদুদ্দিন জিনকিকে রক্ষা করেন। জাওলির বিদ্রোহ-প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে সুলতান

---

২২৯. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১০৩।

২৩০. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আত-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ১৭ ওআবু শামা আল-মাকদিসি, *আর-রাওযাতাইন ফি তারীখিদ দাওলাতাইন আন-নূরিয়া ওয়াস-সালাহিয়া*, ১/৬৮।

মুহাম্মাদ তার পিতা সুলতান মালিকশাহর প্রিয়পাত্র কাসিমুদ্দৌলা আক সুনকুরের সুপুত্র নতুন এই তরুণ সেনাপতির সাহসিকতা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে অবগত হন। সুলতান মুহাম্মাদ তার সৎসাহসের প্রশংসা করেন। এর ফলে সকলের মাঝে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

এরপর আসে ইমাদুদ্দিন জিনকির জীবনের টার্নিং পয়েন্ট ও বাঁক পরিবর্তনের মুহূর্ত; মসুলের প্রশাসক পদে অধিষ্ঠিত হন ইসলামি ইতিহাসের অন্যতম মহান পুরুষ মওদুদ বিন তুনতেকিন রহ.। তার সমৃদ্ধ জীবনের কীর্তি-অবদানের কিয়দাংশ আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। মসুলে তার শাসনকাল ছিল ছয় বছর। এই পুরোটা সময় ইমাদুদ্দিন জিনকি ছিলেন তার একান্ত নিকটজন।

পাঠক! আপনার কি মনে আছে মওদুদ বিন তুনতেকিনের পরিচয়!

আমরা পূর্বে যেমন উল্লেখ করেছি, মওদুদ বিন তুনতেকিন ছিলেন ইসলামি ইতিহাসের অন্যতম পুণ্যবান শাসক। তার সত্তাজুড়ে ছিল আল্লাহ-ভীতি ও ইবাদত-প্রীতি। জনসাধারণের জন্য তিনি ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ শাসক, জিহাদের ময়দানে ছিলেন নিষ্ঠাবান শক্তিশালী সেনাপতি। তিনি ছিলেন মুসলিম ঐক্যের একান্ত অনুরাগী এবং ক্রুসেডারদের প্রতি প্রচণ্ড বিরাগী। ইমাদুদ্দিন জিনকি তার জীবনের শ্রেষ্ঠতম সময়ে যৌবনের প্রারম্ভে মওদুদ রহ.-এর সাহচর্য লাভ করেন। মওদুদ যখন মসুলে আগমন করেন, তখন তার বয়স চব্বিশ বছর আর মওদুদ যখন নিহত হন, তখন তার বয়স ত্রিশ বছর।

নিঃসন্দেহে এই ছয়টি বছর ছিল মহান মুজাহিদ ইমাদুদ্দিন জিনকির জীবনের প্রকৃত পরিপক্বতা ও পূর্ণতাপ্রাপ্তির সময়। এ সময়ই তার অস্থিমজ্জায় মিশে যায় শরিয়তের পূর্ণ মূল্যায়ন ও মর্যাদাবোধ।

এ সময়ই তার হৃদয়ে-মননে গেঁথে যায়, কীভাবে পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীনের কালিমা সমুন্নত করার জন্য আপন জান-মাল, সময় ও সাধনা ব্যয় করতে হয়।

এ সময়ই তিনি আয়ত্ত করে নেন মওদুদ রহ.-এর যাবতীয় সামরিক, প্রশাসনিক ও শাস্ত্রীয় কলা-কৌশল এবং নেতৃত্বদক্ষতা।

তিনি গ্রহণ করেন বীরত্ব, দুঃসাহস ও সুসংহত সমর পরিকল্পনার পাঠ।

এ সময়ই তার মনমানসে প্রচণ্ড ঘৃণা বদ্ধমূল হয়ে যায় ক্রুসেডারদের প্রতি, যারা নির্বিচারে ইসলামি ভূখণ্ডে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছিল; ঘৃণা তৈরি হয় বাতিনি শিয়াদের প্রতি, যারা মওদুদের ন্যায় মহান শাসককে হত্যা করেছিল; তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন সেসব অথর্ব নেতার ওপর, যারা মওদুদকে কঠিন সংকটে ফেলে রণাঙ্গন ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল; বরং তাকে হত্যা করার জন্য শত্রুদের প্ররোচিত করেছিল।

৫০৭ হিজরি সনে (১১১৩ খ্রিষ্টাব্দে) ইমাদুদ্দিন জিনকি মওদুদের সঙ্গে সিন্নাবরার যুদ্ধে অংশ নেন।[২৩১] এ যুদ্ধে তিনি শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে বিজয় ও মর্যাদার স্বাদ আস্বাদন করেন। বরং এ যুদ্ধেই তিনি অপূর্ব বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন এবং অনন্য রণদক্ষতা ও বিরল সাহসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটান।[২৩২] ফলে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি জনমানুষের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন। ইতিপূর্বে এমন করেই ঘরে ঘরে আলোচিত ছিল তার পিতা কাসিমুদ্দৌলা আক সুনকুরের কীর্তিগাথা!

এর কদিন পরই নিহত হন মওদুদ বিন তুনতেকিন রহ.।

মওদুদের বিয়োগ ছিল ইমাদুদ্দিন জিনকির জন্য প্রচণ্ড আঘাত। কারণ, তিনি তাকে হৃদয়ের গভীর থেকে ভালোবাসতেন। আঘাত আরও গভীরতর হয় যখন তার সামনে মুসলিম বিশ্বে চলমান ঘৃণ্য চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের রূপ ও প্রকৃতি এবং গভীরতা ও ভয়াবহতা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে উপলব্ধি করেন, এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখা কার্যত অসম্ভব এবং বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই অভ্যন্তরীণ সংস্কারের আশু পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি।

এরপর মসুলের প্রশাসক পদে অধিষ্ঠিত হন আক সুনকুর আল-বুরসুকি। তার প্রথম মেয়াদের শাসনকাল ছিল ৫০৭ হিজরি থেকে ৫০৯ হিজরি সন (১১১৩-১১১৫ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত দুই বছর ব্যাপ্ত। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে আক

---

২৩১. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৪৯-১৫০।

২৩২. ঐতিহাসিক ইবনুর আছির এই যুদ্ধের পর তার সম্পর্কে বলেন, 'এ যুদ্ধে তিনি চূড়ান্ত সাহসিকতা প্রদর্শন করেন।' আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৫৩।

সুনকুর আল-বুরসুকির পরিচালিত অভিযানগুলোতে ইমাদুদ্দিন জিনকি পূর্ণ উদ্যমে অংশগ্রহণ করেন এবং এডেসা, সুমাইসাত ও সারুজ অবরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এতে সকলের কাছে জিনকি আরও বেশি পরিচিত ও প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন।[২৩৩]

৫০৯ হিজরি সনে (১১১৫ খ্রিষ্টাব্দে) আক সুনকুর আল বুরসুকিকে অপসারণ করে জুয়ুশ বেগকে মসুলের প্রশাসক পদে নিয়োগ দেওয়া হলে ইমাদুদ্দিন জিনকির জীবনেও নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটে। ৫১৪ হিজরি সনে (১১২১ খ্রিষ্টাব্দে) জুয়ুশ বেগ সেলজুক সুলতান মাহমুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচেষ্টা চালালে ইমাদুদ্দিন জিনকি তার নিকটতম নেতার নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করে সর্বোচ্চ নেতা সুলতান মাহমুদের আনুগত্যে অটল থাকেন। জুয়ুশ বেগের বিদ্রোহ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং এর ফলে সুলতান মাহমুদের কাছে ইমাদুদ্দিন জিনকির মর্যাদা ও গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়।[২৩৪]

৫১৫ হিজরি সনে আক সুনকুর আল-বুরসুকিকে মসুলের প্রশাসক পদে পুনঃবহাল করা হলে ইমাদুদ্দিন জিনকি আবারও তার অধীনে চলে আসেন। ৫১৬ হিজরি সনে (১১২২ খ্রিষ্টাব্দে) শিয়া দুরাচারী দুবাইস বিন সাদাকা বাগদাদে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিদ্রোহের ডাক দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আক সুনকুর আল-বুরসুকিকে বাগদাদে আহ্বান করা হয়। ইমাদুদ্দিন জিনকির সামরিক-প্রশাসনিক দক্ষতার প্রতি পূর্ণ আস্থা থাকায় তিনি এ সময় তাকেও সঙ্গে নিয়ে যান। এমনকি এর অব্যবহিত পরেই তিনি দুবাইস বিন সাদাকার সরাসরি মোকাবিলা করার জন্য ইমাদুদ্দিন জিনকিকে দুবাইসের মূল ঘাঁটি ওয়াসিত অঞ্চলের দায়িত্ব প্রদান করেন। এটি ছিল মহান সেনাপতি ইমাদুদ্দিন জিনকির প্রতি আক সুনকুরের অগাধ আস্থার সুস্পষ্ট প্রকাশ। ইমাদুদ্দিন জিনকিও তার আস্থার মর্যাদা দিতে সক্ষম হন এবং দুবাইস বিন সাদাকাকে পরাজিত করে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনেন।

এ সময় বেদুইনদের উপর্যুপরি আক্রমণে বসরা নগরীর পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়ে পড়লে আক সুনকুর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ইমাদুদ্দিন

---

[২৩৩]. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ১৯-২০।

[২৩৪]. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ২৪।

জিনকিকে বসরার প্রশাসকের দায়িত্ব প্রদান করেন। ইমাদুদ্দিন জিনকি দায়িত্ব গ্রহণের পর স্বল্পতম সময়ের মধ্যে আগ্রাসী বেদুইনদের নিয়ন্ত্রণে আনেন। এভাবে একের পর এক সফল দায়িত্ব পালন করে ইমাদুদ্দিন জিনকি সেলজুক সাম্রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হন।[২৩৫]

ইমাদুদ্দিন জিনকির অবস্থান

এই পুরো সময়ে ইমাদুদ্দিন জিনকি সেলজুক সুলতান ও সুলতান-নির্ধারিত রাজন্যদের আনুগত্য করেছেন; আব্বাসি খিলাফতের নয়। তিনি বাগদাদে খলিফার বিরুদ্ধে সংঘটিত বিদ্রোহ দমনে অংশ নিয়েছিলেন, কারণ সেক্ষেত্রে সালতানাত ও খিলাফতের স্বার্থ এককেন্দ্রিক ছিল। কিন্তু যখন খিলাফত ও সালতানাতের স্বার্থে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে, যেমন ৫১৯ হিজরি সনে সুলতান মাহমুদ ও খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহর মধ্যকার সংঘাতের সময় তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে সুলতানের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন।[২৩৬] এ কারণে কখনো কখনো তাকে নিজ বাহিনী নিয়ে খলিফার মুখোমুখিও হতে হয়েছে।

বাহ্যত তার এই অবস্থানের তাৎপর্য অনুধাবন জটিল মনে হলেও আমার মতে এটিই ছিল স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত অবস্থান। শান্তভাবে বিষয়টির তাৎপর্য অনুধাবন করা হলে আশা করা যায়, আগামীর বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের সঠিক মর্ম উপলব্ধি সহজতর হবে।

আব্বাসি খলিফাগণ বিগত দুই শতাব্দীরও অধিক সময় ধরে অন্যদের সামরিক প্রভাব-নিয়ন্ত্রিত ছিলেন। প্রথমে তাদের ওপর কর্তৃত্ব বিস্তার করে তুর্কি মামলুকগণ, এরপর শিয়া বুওয়াইহি পরিবার এবং সবশেষে সেলজুক পরিবার। এ সময়ে খিলাফত শব্দটি কার্যত তার দাবি ও প্রভাব হারিয়ে ফেলেছিল এবং খলিফা পদ নিছক আনুষ্ঠানিক সম্মানজনক পদে পরিণত হয়েছিল। (সুলতান পদবিধারী) সামরিক শাসকই যাবতীয় ক্ষমতার অধিকারী হতেন; সেনাবাহিনী, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, রাষ্ট্রীয় কোষাগার, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, নিয়োগ-বিয়োগ, আন্তঃরাষ্ট্র চুক্তি সম্পাদন, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় তিনিই নিয়ন্ত্রণ করতেন। খলিফাগণ বংশানুক্রমে কেবল খলিফা উপাধি ও ব্যক্তিগত সম্পদের অধিকারী

---

২৩৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ২৬-২৮।

২৩৬. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৩৮-১৩৯।

হতেন। প্রত্যেক খলিফার স্বপ্নের পরিধি সর্বোচ্চ এত দূর বিস্তৃত হতো যে, কোনোক্রমে যদি বাগদাদে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যায়। হ্যাঁ, জ্ঞাতসারেই ইরাকের পরিবর্তে বাগদাদ বলা হয়েছে! অর্থাৎ নিজের সুবর্ণ সময়ে একজন খলিফা কেবল বাগদাদের প্রহরী হতে পারতেন। অপরদিকে প্রকৃত ক্ষমতা যার হাতে থাকত, সেই সুলতান শাসন করতেন চীন থেকে শাম অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্য; বাগদাদসহ ইরাকও যার অন্তর্ভুক্ত থাকত। অবশ্য বিশেষ করে সেলজুক সুলতানগণ মুসলিম উম্মাহকে এক পরিচয়ে ঐক্যবদ্ধ করতে এবং উম্মাহর মনমস্তিষ্কে 'এক উম্মাহ'র চেতনা সদা জাগ্রত রাখতে প্রতীকীরূপে হলেও খলিফা ও খিলাফতের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে যত্নবান ছিলেন। তৎকালীন ইসলামি সাম্রাজ্যের খলিফা পদ ছিল অনেকটা বর্তমান ইংল্যান্ড, স্পেন, কানাডা ও হল্যান্ডসহ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় পরিচালিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজা-রানির পদের ন্যায় নিছক প্রতীকী পদ, যা জনসাধারণকে কিছু শুভ বার্তা উপহার দিতে পারে; কিন্তু প্রশাসন, শাসনব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনো প্রভাব রাখতে পারে না।

তবে মাঝেমধ্যে কোনো খলিফা কিছুটা শক্তির অধিকারী হলে খলিফা পদের হৃত শৌর্য পুনরুদ্ধারে উদ্যোগী হয়ে উঠতেন। তিনি বাগদাদ ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে একটি বাহিনী তৈরি করতেন এবং সুলতানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে তার ওপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতেন। এমনটি আমরা খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহর ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু এটি তো সম্পূর্ণই বাস্তবতা-বিবর্জিত প্রচেষ্টা। কারণ, কার উপাধি কী, তা এক্ষেত্রে মুখ্য নয়; মুখ্য হলো—সালতানাত ও খিলাফতের এই সংঘাতের কারণে সকলের কাছে আনুগত্যের আবেদন কমে যেত এবং রাজ্যজুড়ে অনাকাঙ্ক্ষিত গোলযোগ-অস্থিরতা সৃষ্টি হতো। তা ছাড়া খলিফা-অনুগত বাহিনী যদিও ক্ষেত্রবিশেষে আঞ্চলিকভাবে শক্তিশালী হতো এবং বাগদাদ বা আশপাশের এলাকায় স্থানীয় সুলতান-বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করত; কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই প্রাধান্য ও জয়ের প্রভাব নির্দিষ্ট এলাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকত। এসব দিক বিবেচনা করে খিলাফত-সালতানাত সংঘাতে ইমাদুদ্দিন জিনকি সর্বদা সালতানাতের পক্ষে ও খিলাফতের বিপক্ষে শক্ত অবস্থান নিতেন।

এরপর ইমাদুদ্দিন জিনকির একের পর এক ধারাবাহিক সাফল্যে প্রীত হয়ে পারস্যকেন্দ্রিক বৃহৎ সেলজুক সাম্রাজ্যের প্রধান সুলতান মাহমুদ তাকে ইস্পাহানে ডেকে নেন এবং তার বিশ্বস্ততার মূল্যায়ন করে তাকে নিকটভাজন করে নেন। সুলতান মাহমুদ সেলজুক প্রশাসনের অন্যতম মহান আমির প্রয়াত 'কুনদুগদি'র বিধবা স্ত্রীকে ইমাদুদ্দিন জিনকির কাছে বিয়ে দেন। এরপর তিনি ৫১৮ হিজরি সনে ইমাদুদ্দিনকে বসরার প্রশাসক পদে অধিষ্ঠিত করেন।[২৩৭] ৫২১ হিজরি সনে সুলতান তাকে আরও গুরুত্বপূর্ণ এক দায়িত্ব প্রদান করেন। ইমাদুদ্দিন জিনকি এবার নির্বাচিত হন 'শিহনাতুল ইরাক' বা পুরো ইরাক অঞ্চলের নিরাপত্তা-প্রধান।[২৩৮] বরং একই সময় সুলতান তাকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করেন। ইরাকের নিরাপত্তা-প্রধানের পদের পাশাপাশি ইমাদুদ্দিনকে তিনি নিজের দুই পুত্র আলপ আরসালান ও ফররুখশাহ-এর আতাবিক (রাজকীয় শিক্ষক) হিসেবে নিয়োগ দেন। ফলে ইমাদুদ্দিন জিনকি 'আতাবিক ইমাদুদ্দিন জিনকি' নামে পরিচিতি লাভ করেন[২৩৯] এবং সুলতানের পুত্রদ্বয়ের বিশেষ সামরিক, প্রশাসনিক ও ধর্মীয় শিক্ষার তত্ত্বাবধায়কে পরিণত হন।

নিঃসন্দেহে এ এক দীর্ঘ দুর্গম পথ। ইমাদুদ্দিন জিনকি এ পথ পাড়ি দেওয়া শুরু করেছেন শৈশবের একেবারে প্রারম্ভে। তার পুরো জীবন ছিল কর্মমুখর-সংগ্রামী জীবন। অন্যান্য কিশোর-তরুণের মতো খেল-তামাশায় তার জীবনের কোনো অংশ কাটেনি। তিনি প্রকৃতার্থেই একজন শৌর্যপুরুষ ছিলেন। তার জীবনজুড়ে ছিল উম্মাহর দরদ। উম্মাহর কল্যাণে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। পরিস্থিতির জটিলতা তাকে দমাতে পারত না। তাই আল্লাহ তাআলা তার হাতে প্রভূত কল্যাণ সাধিত করেন এবং তার মাধ্যমে নিশ্চিত করেন উম্মাহর বহু সফলতা। আর এ সবকিছুই ছিল তার আগামীর প্রস্তুতপ্রক্রিয়া। কারণ, অচিরেই যে তাকে গ্রহণ করতে হবে অতি কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ এক দায়িত্বভার। ত্রিশ বছর

---

২৩৭. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ২৭।

২৩৮. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৪১ ও ইবনে খাল্লিকান, *ওফায়াতুল আ'য়ান*, ২/৩২৭।

২৩৯. আল-বুনদারি, *তারীখু দাওলাতি আলি-সালজুক*, পৃষ্ঠা : ১৮৮ ও ইবনে খাল্লিকান, *ওফায়াতুল আ'য়ান*, ২/৩২৮।

ধরে ইসলামি ভূখণ্ডে শিকড় গেড়ে বসা ক্রুসেডার শক্তির মোকাবিলা তাকেই করতে হবে। এ সময়ে দখলদার ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করার প্রতিটি প্রচেষ্টা কার্যত ব্যর্থ হয়েছে। আর তাই এই দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন ছিল ইমাদুদ্দিন জিনকির মতো কোনো বীরপুরুষের!

আল্লাহর কী কুদরত! জোরপূর্বক আলেপ্পোর ওপর চেপে বসা জাওলির পাঠানো দুই দূতকে তিনি সেই প্রয়োজন পূরণেই কাজে লাগান। দূতদ্বয় সুলতান মাহমুদের কাছে মসুল ও আলেপ্পোর নেতৃত্বের জন্য; ভিন্নভাবে বললে আপন রণদক্ষতার মাধ্যমে ক্রুসেডারদের মোকাবিলা করার জন্য ইমাদুদ্দিন জিনকির নাম প্রস্তাব করেন। সুলতান মাহমুদও বিনা দ্বিধায় তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সুলতান ৫২১ হিজরি সনের ৩ রমজান (১১২৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর) ইমাদুদ্দিন জিনকিকে মসুল, জাযিরা (উত্তর ইরাক) ও শামের বিজিত অঞ্চলের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেন।[২৪০] এর মাধ্যমে ইমাদুদ্দিন জিনকির হাতে সূচিত হয় ইসলামি ইতিহাসের সুপরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায় 'জিনকি রাজ্য'। একইসঙ্গে সূচিত হয় ক্রুসেড যুদ্ধ ইতিহাসে 'হিলাল-ছালিব' সংঘাতের এক নব-অধ্যায়।

মসুলের আতাবিক ইমাদুদ্দিন জিনকি

ইমাদুদ্দিন জিনকি ইসলামি ইতিহাসের এক বিরল ও অনন্য ব্যক্তি। পূর্বের আলোচনায় আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, তার বংশমূল কতটা উৎকৃষ্ট ও অভিজাত। পিতা হাজিব আক সুনকুর তার জন্য উত্তরাধিকার সম্পদ হিসেবে রেখে গিয়েছিলেন সমূহ কল্যাণ-গুণ। এরপর আমরা দেখেছি, তিনি একে একে বিভিন্ন পদ ও দায়িত্বে পূর্ণ সফলতা লাভ করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত মসুলের প্রশাসক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এটি যদিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন একটি পদ; তবে তার পূর্বেও তো অনেকে এই পদে সমাসীন হয়েছেন; কিন্তু ইতিহাসের পট পরিবর্তনে তারা কোনো ভূমিকা রাখতে পারেননি। কিন্তু ইমাদুদ্দিন জিনকি তো আর দশজন রাজন্যের মতো নন; তিনি তো অনন্য, অসাধারণ ও আপন কর্মগুণে সমুজ্জ্বল। তিনি তো তার চারপাশের সবাইকে প্রভাবিত করতে পারেন। তিনি তো সেই মহান পুরুষ, যার হাত ধরে পুরো মুসলিম উম্মাহর এমন

২৪০. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ৩২-৩৪।

কায়িক পরিবর্তন সাধিত হবে, যার প্রভাব পরবর্তী কয়েক দশকেও ফুরাবে না!

ইমাদুদ্দিন ইস্পাহানি কত চমৎকার মন্তব্য করেছেন! ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ.-এর পরিচয়-বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

> "তিনি ছিলেন সেই কেন্দ্রবিন্দু; যাকে ঘিরে আবর্তিত ছিল উম্মাহর কক্ষপথ!" (২৪১)

অর্থাৎ ইমাদুদ্দিন জিনকি ছিলেন সমকালীন মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মের মূলকেন্দ্র। সে সময় প্রতিটি ইসলামি বিষয় হতো তার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক এবং তার পদক্ষেপ দ্বারা প্রভাবিত। নিঃসন্দেহে যুগে যুগে এমন অত্যুচ্চ স্তরে কেবল মহান ও জগদ্বিখ্যাত সংস্কারকগণই পৌঁছতে পারেন।

আমি তাকে বলি, 'সময়ের বিপ্লবী পুরুষ'। উম্মাহর সেই ঘনঘোর দুর্যোগকালে সর্বময় মুক্তির লক্ষ্যে উম্মাহর নেতৃত্ব তুলে নেওয়ার সার্বিক যোগ্যতার সন্নিবেশ তার মাঝে ঘটেছিল। এটা ছিল তার ও মুসলমানদের ওপর মহান আল্লাহর সবিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ। আল্লাহ তাআলা উম্মাহর ইতিহাসের প্রতিটি স্তরে নেতা হিসেবে এমন কাউকে দাঁড় করিয়ে দেন, যিনি সেই সুনির্দিষ্ট স্তরের যাবতীয় দুর্যোগ ও বিপর্যয় পাড়ি দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে থাকেন।

ইমাদুদ্দিন জিনকি এমন সব গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, যা তাকে একজন আদর্শ মুসলিম শাসকের যথার্থ নমুনা হিসেবে গড়ে তুলেছিল। তার কথা-কাজ, আচরণ-উচ্চারণ, চরিত্রগুণ ও সিদ্ধান্ত-যোগ্যতা এমন অত্যুচ্চ স্তরের ছিল যে, একে একজন শাসকের সততা-অসততা ও সাফল্য-ব্যর্থতার মাপকাঠি নির্ধারণ করা যায়। এটি মোটেও অত্যুক্তি বা অতিরঞ্জন নয়; বরং তার অত্যুচ্চ ব্যক্তিত্বের যৎসামান্য মূল্যায়ন! মসুলের প্রশাসক হিসেবে তার কীর্তি-ইতিহাস এবং বিরাজমান দুঃসহ পরিস্থিতির পরিবর্তনে তার কর্মপন্থা সংক্রান্ত আলোচনায় প্রবেশ করার পূর্বে আমাদের কর্তব্য ব্যক্তি ইমাদুদ্দিন জিনকিকে আরও কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করা এবং তার চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও অনন্যতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবগত

---

[২৪১]. আল-বুনদারি, *তারীখু দাওলাতি আলি-সালজুক*, পৃষ্ঠা : ১৮৫।

হওয়া। এই ব্যক্তিত্ব-দর্শন আমাদেরকে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ গুণ-বৈশিষ্ট্যের সন্ধান দেবে, যা অর্জনে উম্মাহর সংস্কার দায়িত্ব পালনে আগ্রহী প্রত্যেকের সচেষ্ট হওয়া উচিত। আর তাই এটি ক্রুসেড যুদ্ধ ইতিহাসের এই বিশেষ অধ্যায়ের অতি গুরুত্বপূর্ণ এক আলোচনা।

ইমাদুদ্দিন জিনকির মাঝে সমূহ কল্যাণগুণের সন্নিবেশ ঘটেছিল। তবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো—

[এক] আল্লাহর জন্য একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা

এই গুণটি তার পুরো জীবনজুড়ে জড়িয়ে ছিল। এর ওপর নির্ভর করেই তিনি বিজয় ও কর্তৃত্ব লাভ করতেন। পাঠক হয়তো ইমাদুদ্দিন জিনকির জীবনের একটি সুস্পষ্ট গুণ হিসেবে ইখলাস ও একনিষ্ঠতার উল্লেখে আশ্চর্য হয়েছেন। ইখলাস ও নিষ্ঠা তো একটি আত্মিক গুণ; যার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানেন কেবল আল্লাহ ও গুণের অধিকারী ব্যক্তি। অন্যরা তো নিষ্ঠাবান ব্যক্তির হৃদয়-নিষ্ঠা সম্পর্কে অবগত হতে পারে না!

এর উত্তর হলো—নিষ্ঠা যদিও একান্ত আত্মিক বিষয়; কিন্তু এর কিছু বাহ্যিক লক্ষণ ও নিদর্শন আছে; যেগুলো একজন ব্যক্তির মুখলিস ও নিষ্ঠাবান হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করে। সেসব লক্ষণ ও নিদর্শনের সবগুলোই আমরা ইমাদুদ্দিন জিনকির জীবন ও কর্মে প্রত্যক্ষ করেছি বলে তার নিষ্ঠার সাক্ষ্য প্রদান করছি। আল্লাহ তাআলা তার সমস্ত সৎকর্ম কবুল করে নিন।

তার জীবনে নিষ্ঠার একটি নিদর্শন হলো, সারাজীবন আপন নীতিতে অটল থাকা। ইসলামি ভূখণ্ড থেকে ক্রুসেডার বিতাড়ন সংগ্রামকে তিনি জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছিলেন। যে বিশ বছর তিনি মুসলমানদের শাসক ছিলেন, পুরোটা সময় তিনি এ লক্ষ্যে অবিচল সংগ্রাম করে গেছেন। কেবল এ বিশ বছরই নয়; প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বেও তিনি বিভিন্ন শাসকের অধীনে ক্রুসেডবিরোধী জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন।

একজন ব্যক্তির হৃদয়জগৎ যখন নিষ্ঠা ও ব্যক্তিচিন্তার মাঝে দোদুল্যমান থাকে, তখন অনেক সময়ই সে পরিস্থিতির অনুগামী হয়ে নিজের নীতি ও লক্ষ্য থেকে ছিটকে পড়ে। ইমাদুদ্দিন জিনকির বছরের পর বছর আপন

লক্ষ্য ও কর্তব্যে অবিচল থাকাই প্রমাণ করে যে, তিনি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কাজ করতেন।

তার ইখলাস ও একনিষ্ঠতার আরেকটি লক্ষণ হলো, তিনি সব সময় জাতিস্বার্থকে ব্যক্তিস্বার্থের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। মুসলিম উম্মাহর বিজয়ের স্বার্থে তিনি বহুবার ব্যক্তিস্বার্থ ও ব্যক্তিক্ষমতাকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছেন। তার এরূপ মহত্ত্ব ও আত্মত্যাগের অনন্য দৃষ্টান্ত হলো, ৫৩২ হিজরি সনে (১১৩৭ খ্রিষ্টাব্দে) ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে তিনি যখন সামরিক সংকটের মুখোমুখি হন, তখন সেলজুক সুলতান মাসউদের বাহিনীর সাহায্য গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় তার জনৈক উপদেষ্টা তাকে বলেন, 'এ সিদ্ধান্ত সুলতান মাসউদকে আলেপ্পো দখলে প্ররোচিত করতে পারে, যা জিনকি রাষ্ট্রের পতন ত্বরান্বিত করবে।' উত্তরে ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ. বলেন, 'শত্রু ক্রুসেডাররা রাজ্য দখলে লালায়িত হয়ে উঠেছে। তারা আলেপ্পো দখল করে নিলে শাম অঞ্চলে ইসলামের অস্তিত্বই থাকবে না। আর শাম অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ কাফিরদের হাতে না থেকে যেকোনোভাবে মুসলমানদের হাতে থাকা আমার কাম্য।'[২৪২]

ক্রুসেড ইতিহাসে আমরা ইতিপূর্বে যেসব মুসলিম রাজন্যকে প্রত্যক্ষ করেছি, তাদের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় ইমাদুদ্দিন জিনকির এই সমুন্নত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণই ব্যতিক্রম। পেছনের ইতিহাসে আমরা দেখেছি, একজন আমির অন্য আমিরের সাহায্য কামনা করতে ভয় পেতেন; পাছে তার রাজ্য বেদখল হয়ে যায়। বরং কোনো কোনো রাজন্য তো নিজের রাজক্ষমতা রক্ষা করতে ক্রুসেডারদের সাহায্য কামনা করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। এমনকি কোনো কোনো অথর্ব মুসলিম শাসক নিজের রাজ্য কোনো মুজাহিদ নেতার কর্তৃত্বে চলে যাবে—এই আশঙ্কায় তাকে হত্যা করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নেও দ্বিধা করেনি। মওদুদ রহ.-এর হত্যাকাণ্ড তো বেশি আগের কথা নয়!

ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ.-এর ইখলাস ও আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতার আরেকটি নিদর্শন হলো, তিনি রণাঙ্গনে জীবন বাজি রেখে লড়াই করতেন। তিনি কখনো পেছনের সারিতে থাকতেন না, থাকতেন না রক্তক্ষয়ী সংঘাতের কেন্দ্র হতে নিরাপদ দূরত্বে; বরং সব সময় তিনি সবার

---

২৪২. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩০৩।

সামনে থাকতেন। এমনকি অনেক সময় তিনি চলে যেতেন শত্রুপক্ষের একেবারে সন্নিকটে। একবার তিনি এডেসা অবরোধকালে রাতের বেলা বিরাট দস্তরখান বিছিয়ে তাতে খাবার সাজান; এরপর সৈন্যদের মাঝে ঘোষণা করেন, 'আমার এই দস্তরখানে আজ কেবল সে-ই শরিক হতে পারবে, যে আগামীকাল আমার সঙ্গে এডেসার নগরদ্বারে আক্রমণ চালাতে শরিক থাকবে!' অর্থাৎ পরদিন তিনি যুদ্ধ করতে করতে দুর্গের একেবারে নিকটতম স্থানে চলে যাবেন এবং নিজেই সরাসরি নগরদ্বার ভেঙে ফেলার চেষ্টা করবেন। নিশ্চিত করেই এতে তিনি শত্রুপক্ষের তিরের লক্ষ্যে পরিণত হবেন; এমনকি এতে তার জীবনও বিপন্ন হতে পারে। কিন্তু তিনি এমন ঝুঁকিই নিতেন।

তার এমন দীপ্ত আহ্বানে সে রাতে একজন আমির ও অচেনা একটি শিশু ছাড়া কেউ সাড়া দেয়নি। কারণ, ইমাদুদ্দিন জিনকির দুঃসাহসিকতা ও শাহাদাতের নিষ্ঠাপূর্ণ আগ্রহের কথা সকলের জানা ছিল, জানা ছিল তিনি কতটা ঝুঁকি নিতে পারেন। সেই আমির বাচ্চাটিকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি বাছা এখানে কেন?!' ছোট বলে তিনি তার দৃঢ়তা নিয়ে সন্দেহ করছিলেন। ইমাদুদ্দিন জিনকি তাকে বলেন, 'ওকে থাকতে দিন। আল্লাহর শপথ, আমি ওর চেহারার ভাষা পড়তে পারছি; ও পিছপা হবে না।' বাস্তবেও তা-ই ঘটে। পরদিন সত্যিই ছেলেটি অবিচল চিত্তে তাকে সঙ্গ দিয়ে যায়।[২৪৩]

মহান আল্লাহর প্রতি তার একনিষ্ঠতার আরেকটি প্রমাণ তার প্রতি জনসাধারণের সম্মিলিত ভালোবাসা। মানবহৃদয় তো আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণাধীন। ইতিহাসের পাতায় আমরা দেখেছি, বিভিন্ন রাজ্য ও রাষ্ট্রের অধিবাসীরা নির্বিশেষে তাকে ভালোবাসত। সমকালীন উজির, কাজি, আলিমসমাজ সকলে তার প্রতি হৃদ্যতা পোষণ করত। এভাবে কারও প্রতি সকলের সম্মিলিত ভালোবাসা সৃষ্টি মূলত তার প্রতি আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা থাকার প্রমাণ। আর আল্লাহ কেবল মুখলিস ও নিষ্ঠাবান বান্দাদেরকেই ভালোবাসেন।

---

২৪৩. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩৩১।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيْلَ : إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبِبْهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ، فَيُنَادِيْ جِبْرِيْلُ فِيْ أَهْلِ السَّمَاءِ : إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوْهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِي الْأَرْضِ»

আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তিনি জিবরাইলকে ডেকে বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন; তুমিও তাকে ভালোবাসো।' তখন জিবরাইলও তাকে ভালোবাসেন। এরপর জিবরাইল আকাশবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করেন, 'আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন; তোমরাও তাকে ভালোবাসো।' তখন আকাশের অধিবাসীরা তাকে ভালোবাসতে থাকে। এরপর জমিনে তার জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করে দেওয়া হয়।[২৪৪]

সুতরাং কোনো শাসক যদি পৃথিবীতে জনপ্রিয় ও বরণীয় হয়; জনসাধারণ নির্বিশেষে তাকে ভালোবাসে, তাহলে নিঃসন্দেহে তা উক্ত শাসকের নিষ্ঠা ও আল্লাহর ভালোবাসা প্রাপ্তির নিদর্শন।

তার ইখলাস ও নিষ্ঠার আরেকটি লক্ষণ হলো, আল্লাহ তাআলা তাকে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অধিকাংশ যুদ্ধে বিজয় দান করেছেন। আর আল্লাহ কেবল তাদেরকেই বিজয় দান করেন, যারা তার প্রিয়, তার দ্বীনের সহযোগী এবং তার প্রতি একনিষ্ঠ। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এর ঘোষণা রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করছি।

﴿وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ﴾

যে আল্লাহর (দ্বীনের) সহযোগী হয়, তিনিও নিশ্চিত তার সহযোগী হন। [সুরা হাজ্জ: ৪০]

﴿إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ﴾

আল্লাহ তোমাদের বিজয়ী করলে কেউ তোমাদের হারাতে পারবে না। [সুরা আলে-ইমরান: ১৬০]

---

২৪৪. ইমাম বুখারি, *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩০৩৭ ও ইমাম মুসলিম, *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২৬৩৭ ও ইমাম নাসায়ি, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদিস নং ৭৭৪৭।

﴿وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾

আর যারা আল্লাহ, তার রাসুল ও বিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল; তারাই বিজয়ী। [সুরা মায়িদা: ৫৬]

ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ.-এর সততা ও নিষ্ঠার সর্বশেষ নিদর্শন তার সুপরিণতি, সুন্দরতম মৃত্যু! সামনের আলোচনায় আমরা প্রত্যক্ষ করব; তিনি জিহাদের ময়দানে শহিদি মৃত্যুর অধিকারী হবেন। আর রণাঙ্গনের মৃত্যুই হলো মানবজীবনের পরম সৌভাগ্যজনক সমাপ্তি। শহিদি মৃত্যু তো প্রত্যেক পুণ্যবান মুমিনের হৃদয়ের তামান্না।

উমর আল-জুমায়ি হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ যখন কোনো বান্দার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে তার জীবনের শেষ মুহূর্তে কাজে লাগান।' উপস্থিত জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, 'কী কাজে লাগান?' নবীজি উত্তর দেন, 'আল্লাহ তাকে সৎকর্মের প্রতি পরিচালিত করেন; এরপর সে অবস্থায় তাকে তুলে নেন।'[২৪৫]

এগুলো তার ইখলাস ও নিষ্ঠার কিছু নিদর্শন এবং এগুলোই তার মহান ও অনন্য হয়ে ওঠার মূল রহস্য। তার প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহ তার সঙ্গে ছিলেন। তিনি যখন পিতৃহারা ও নিঃস্ব হয়ে পড়েন, তখন আল্লাহই তার তত্ত্বাবধান ও প্রতিপালনের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়োজিত করে দেন এবং এমন উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন, যার ফলাফল উম্মাহর ইতিহাসের পাতায় আজও সমুজ্জ্বল।

[দুই] দ্বীন ও শরিয়তের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাবোধ

এ গুণটি তার জীবনে ভোরের সূর্যের মতো প্রোজ্জ্বল। তিনি তার শাসনাধীন প্রতিটি অঞ্চলে শরিয়ত নির্ধারিত দণ্ডবিধি চালুকরণে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি নিজে শরিয়তের বিধিবিধান কঠোরভাবে মেনে চলতেন, জনগণকেও মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করতেন। জীবনে কতবার তিনি বিভিন্ন মাসআলার সমাধানের জন্য আলিম-ফকিহদের সমবেত করেছেন! তিনি তার রাজ্যে আলিমসমাজের সমুন্নত মর্যাদা প্রদান করতেন। ঐতিহাসিক

---

২৪৫. ইমাম তিরমিজি, *সুনানে তিরমিজি*, হাদিস নং ২১৪২, ইমাম আহমাদ, *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ১৭২৫৬ ও ইমাম ইবনে হিব্বান আল-বুসতি, *সহিহ ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৩৪১।

ইবনুল আছির কাজি বাহাউদ্দিন শাহরাযুরি সম্পর্কে বলেন, 'ইমাদুদ্দিন জিনকি তার মতামত না নিয়ে কোনো আইন জারি করতেন না'।[২৪৬] একই ধরনের মন্তব্য ইমাদুদ্দিন জিনকির সমসাময়িক অন্যান্য আলিমের ক্ষেত্রেও পাওয়া যায়। ইমাদুদ্দিন জিনকি বিভিন্ন স্থান থেকে আলিমদের সমবেত করে তাদেরকে জনসাধারণের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিতেন; এমনকি নিজের সন্তানদের প্রতিপালনের দায়িত্বও তিনি আলিমদের হাতে ন্যস্ত করেছিলেন।[২৪৭] এ কারণেই তার পুত্ররা তার মতোই যোগ্য বরং আরও অধিক যোগ্য হয়ে গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে বিশেষ করে উল্লেখ করা যেতে পারে তার দুই পুত্র নুরুদ্দিন মাহমুদ ও সাইফুদ্দিন গাজির কথা।

দ্বীনের প্রতি তার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধের এটিও একটি প্রমাণ যে, তিনি তার সব পুত্রের নামের সঙ্গে 'দ্বীন' শব্দটি জুড়ে দিয়েছিলেন। তার পুত্রদের নাম ছিল যথাক্রমে সাইফুদ্দিন, নুরুদ্দিন, কুতুবুদ্দিন ও নুসরাতুদ্দিন। আল্লাহর শোকর, এটি সেই প্রজন্মের ব্যাপক রীতিতে পরিণত হয়েছিল। হয়তো দ্বীনের প্রতি এমন অনুরাগের ফলেই আল্লাহ তার জন্য বিজয়ভাগ্য লিখে দিয়েছিলেন। আক সুনকুর তার পুত্রের নাম রাখেন ইমাদুদ্দিন। একই যুগে জন্ম নেন সালাহুদ্দিন আইয়ুবি। ইমাদুদ্দিন জিনকির কাজি ছিলেন বাহাউদ্দিন; নায়েব ছিলেন নাসিরুদ্দিন। এভাবে চলে দ্বীনের প্রতি সম্বন্ধিত নামের ধারা। অথচ উক্ত প্রজন্মের পূর্বে এমনটি ছিল না। বরং এর পূর্বে শাসক ও রাজন্যবর্গ শারফুদ্দৌলা, জানাহুদ্দৌলা, আযদুদ্দৌলা, বাহাউদ্দৌলা, তাজুল-মুলুক, শামসুল-মুলুক ইত্যাদি 'দৌলা' ও 'মুলুক' শব্দযুক্ত নাম পছন্দ করত। এ জাতীয় নাম দ্বীনের প্রতি সম্পৃক্তি নয়, বরং রাজত্ব ও ক্ষমতার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করত।

ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ. আলিমসমাজের প্রতি এই অত্যুচ্চ ভক্তি-শ্রদ্ধার পাশাপাশি তাদেরকে যথাসাধ্য সদুপদেশ ও নির্দেশনা প্রদানে কার্পণ্য করতেন না। বিদগ্ধ আলিম হিবাতুল্লাহ বিন আবু জারাদাকে আলেপ্পোর বিচারক পদে অধিষ্ঠিত করার সময় তিনি কী চমৎকার উক্তি করেছিলেন! তিনি এ সময় তাকে বলেন, 'এই গুরুভার আমি নিজের কাঁধ থেকে

---

[২৪৬]. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৪৩।

[২৪৭]. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ৯৭।

নামিয়ে আপনার কাঁধে তুলে দিলাম। আপনার কর্তব্য আল্লাহকে ভয় করে দায়িত্ব পালন করা।'[(২৪৮)]

দ্বীন ও শরিয়তের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধাবোধের কারণেই তিনি আলিমসমাজকেও খোদাভীতির নসিহত করতেন।

[তিন] বীরত্ব ও সাহসিকতা

সামরিক ও প্রশাসনিক অঙ্গনে নেতৃত্বপিয়াসী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বীরত্ব একটি অত্যাবশ্যকীয় গুণ। জাতির লাগাম যদি ভীরু-কাপুরুষ কোনো ব্যক্তির হাতে চলে যায়, তখন পুরো জাতিই দুর্দশা ও দুর্ভাগ্যের শিকার হয়।

বীরত্ব ও সাহসিকতা কেবল যুদ্ধের ময়দানেই প্রয়োজন হয় না; সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও বীরত্বের প্রয়োজন হয়। অনেক শাসক ও রাষ্ট্রনেতা এতটা ভীরু-কাপুরুষ হয় যে, জিহাদ শুরু করবে কী, জিহাদের সিদ্ধান্তই নিতে পারে না। নিজেদের কাপুরুষতাকে আড়াল করার জন্য তারা অজুহাত দেখায়, 'আমরা চাই না জাতি যুদ্ধের ভয়াবহতার শিকার হোক।' অথচ জাতির 'কল্যাণকামী' এসব নেতার রাষ্ট্র অধিকৃত হয়ে গেছে, জাতির মর্যাদা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, জন-অধিকার বিলীন হয়ে গেছে, সেদিকে তাদের ভ্রুক্ষেপই নেই।

ইমাদুদ্দিন জিনকি ছিলেন সর্বাবস্থায় সর্বক্ষেত্রে বীরত্ব ও সাহসিকতার অধিকারী। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, গুরুতর পরিস্থিতি ও রণাঙ্গনের সঙ্গিনতম মুহূর্ত—সব ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন বীর-সাহসী। শুরু জীবন থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বীরত্ব ছিল তার অনন্য ভূষণ।

প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে যখন তিনি মসুলের আমির কারবুগা, জাকারমিশ, মওদুদ ও আক সুনকুরের সঙ্গে ছিলেন; তখনও আমরা তার বীরত্বের বিভিন্ন বহিঃপ্রকাশ দেখেছি। এরপর যখন তিনি প্রশাসক পদে অধিষ্ঠিত হন, তখনও তিনি ছিলেন পূর্বের ন্যায় বীরত্বে সমুজ্জ্বল; বরং পূর্বের চেয়েও উজ্জ্বল। ঐতিহাসিক আবু শামা কী চমৎকার ভাষায় ইমাদুদ্দিন জিনকির বীরত্বের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'ইমাদুদ্দিন জিনকির বীরত্ব ও নির্ভীকতা এত উচ্চ স্তরের ছিল যে, এই দুটি গুণ যেন

---

২৪৮. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৭৪-২৭৫।

তার কাছে এসেই চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছেছিল। আর তাই বীরত্বের দৃষ্টান্ত হিসেবে তার নাম উচ্চারিত হতো।'[২৪৯]

ইবনে কাছির তার সম্পর্কে বলেন, 'তিনি ছিলেন চূড়ান্ত স্তরের সাহসিকতার অধিকারী।'[২৫০] আরেক স্থানে তিনি বলেন, 'তিনি ছিলেন সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠতম বীর!'[২৫১]

এমনটিই ছিল তার পুরো জীবনের দাস্তান; যা প্রমাণ করে যে, তিনি পরিস্থিতির দাবিতে বা ক্ষেত্রবিশেষে সাময়িক সাহসিকতা প্রদর্শনকারী ছিলেন না; বীরত্ব ছিল তার স্বভাবজাত গুণ।

[চার] ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা

যেকোনো সৎ শাসকের জন্য ন্যায়পরায়ণতা একটি অপরিহার্য গুণ। কারণ, একজন শাসক তার ইচ্ছেমতো শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা রাখেন। তিনি যদি জুলুম-অবিচার করতে চান, তাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কারও নেই। পক্ষান্তরে তিনি যদি ন্যায়প্রত্যাশী হন, তবে জনগণ সুখী হয়; বরং পৃথিবীজুড়ে সৌভাগ্য ছড়িয়ে পড়ে।

ন্যায়পরায়ণতা ছিল ইমাদুদ্দিন জিনকির অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। তার শাসনামলের বিবরণ দিতে গিয়ে ইবনুল আছির বলেন, '(তার শাসনামলে) শক্তিশালী দুর্বলের ওপর জুলুম করতে পারত না।'[২৫২] তিনি তার অধীনস্থ রাজন্যবর্গকে সর্বদা জনসাধারণের সঙ্গে কঠোরতা পরিহার করে কোমল আচরণ করার নির্দেশ দিতেন। এ নীতির ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত অটল ছিলেন। জনগণের সম্পদে অন্যায় হস্তক্ষেপ করার অপরাধে তিনি তার উজির আবুল মাহাসিন আল-আজমিকে বন্দি করেন। এক্ষেত্রে তিনি তার কোনো কৈফিয়তকে পাত্তা দেননি।[২৫৩] কারণ, তার কাছে জনগণের অধিকার সেনাপতি ও প্রশাসকদের অধিকারের তুলনায় অগ্রবর্তী ছিল। সহজ-সরল সাধারণ কৃষকদের অধিকার রক্ষায়ও তিনি যথেষ্ট

---

২৪৯. আবু শামা আল-মাকদিসি, *আর-রাওযাতাইন ফি তারীখিদ দাওলাতাইন আন-নূরিয়া ওয়াস-সালাহিয়া*, ১/১৬০।
২৫০. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৫৩।
২৫১. প্রাগুক্ত, ৯/৩৪০।
২৫২. প্রাগুক্ত, ৯/৩৪০।
২৫৩. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ২৬৩।

যত্নবান ছিলেন। পথ চলাকালে কেউ যেন কোনো কৃষকের ফসল মাড়িয়ে না যায়, এজন্য তিনি তার সৈন্যদের কৃষিক্ষেতের মাঝ দিয়ে চলার সময় পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিতেন। তার শাসনামলে কোনো সৈন্য নিজের ঘোড়ার জন্য কৃষকের ক্ষেত থেকে একটি খড়ও বিনামূল্যে নেওয়ার সাহস করত না। যদিও এসব খড়কুটা পরবর্তী সময়ে যুদ্ধে ব্যবহৃত ঘোড়ার খাদ্য হিসেবেই নেওয়া হবে; তবে অবশ্যই সেটা হতে হবে মূল্যের বিনিময়ে।[২৫৪]

বিনামূল্যে সামান্য খড়কুটা গ্রহণের ক্ষেত্রেও যিনি এতটা সতর্ক ছিলেন, তার সৈন্যরা কি তাহলে কারও ঘরবাড়ি, ভূ-সম্পদ বা অর্থসম্পদে হাত দেওয়ার কথা কল্পনা করতে পারত?!

তার পূর্বের শাসকদের নীতি ছিল, তারা যখন অন্যের অধিকারে থাকা কোনো নগর-জনপদে বিজয়ীবেশে প্রবেশ করতেন, তখন পুরো এলাকাটির কর্তৃত্ব গ্রহণ করে তা সৈন্যদের মাঝে বন্টন করে দিতেন। এর ফলে জমির মূল মালিকের মালিকানা শেষ হয়ে যেত। কিন্তু ইমাদুদ্দিন জিনকি শাসক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর মালিকানা প্রথা বাতিল করে জায়গির প্রথা চালু করেন। অর্থাৎ তিনি রাজন্য ও সৈন্যদেরকে বিজিত অঞ্চলের নির্দিষ্ট কিছু জমির জায়গির দায়িত্ব প্রদান করতেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি জমির মালিক হতো না; বরং তত্ত্বাবধান ও নিরাপত্তার দায়িত্ব লাভ করত। মালিকানা থেকে যেত মূল মালিকের হাতেই। মূল মালিক তার জমির নিরাপত্তা ও তত্ত্বাবধানের বিনিময়ে সরকারকে যৎসামান্য সুনির্দিষ্ট কর প্রদান করত। সেই করের কিছু অংশ জায়গিরপ্রাপ্ত আমির বা সৈন্য লাভ করত। জমির মালিকানা মূল মালিকের হাতেই থাকত এবং বংশানুক্রমে তার সন্তানরাই এর উত্তরাধিকারী হতো।

একবার কয়েকজন রাজন্য ও উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তা ইমাদুদ্দিন জিনকিকে পূর্বের শাসকদের ন্যায় ভূ-মালিকানা প্রদানের অনুরোধ জানালে তিনি তাদেরকে এক চমৎকার উত্তর প্রদান করেন। তিনি তাদেরকে বলেন, 'দেশ যদি আমাদের হাতেই থাকে (আমরাই শাসন করি), তাহলে আলাদা করে তোমাদের ভূ-মালিকানার কী প্রয়োজন? জায়গির অধিকার দিয়েই তো তোমাদের প্রয়োজন পূরণ হয়ে যাচ্ছে। আর

---

২৫৪. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৮৩-২৮৪।

যদি দেশের শাসনাধিকার আমাদের হাত থেকে ছুটে যায়, তখন তো ভূ-মালিকানাও চলে যাবে (অর্থাৎ ক্রুসেডাররা ইসলামি ভূখণ্ড দখল করে নিলে তখনও তো তোমাদের দাবিকৃত ভূ-মালিকানা দিয়ে কোনো লাভ হবে না)।' এরপর তিনি তার বক্তব্য এই বলে শেষ করেন, 'ভূ-মালিকানা প্রশাসন ও ক্ষমতাবানদের হাতে চলে এলে তারা জনগণের ওপর অত্যাচার করে, সীমালঙ্ঘন করে এবং জনগণের জায়গা-জমি অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেয়।'[২৫৫]

ইমাদুদ্দিন জিনকির এই ন্যায়ানুগ নীতিতে সাধারণ জনগণ, দরিদ্র, অসহায়, দুর্বল ও দিনমজুর শ্রেণির স্বার্থকে রাজন্য, সেনাপতি ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়েছিল। তবে একই সঙ্গে তিনি জায়গির অধিকার বা মূল তত্ত্বাবধান অধিকার প্রদানের মাধ্যমে রাজন্যদের মনও খুশি রেখেছিলেন। এর ফলে জায়গিরের আয়তন অনুপাতে তারা ভারসাম্যপূর্ণ কর্তৃত্ব-অধিকার লাভ করত এবং জনতার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা ছাড়াই প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে পারত। এমনকি তিনি জায়গিরের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার নীতিও চালু করেছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি কোনো রাজন্যের মৃত্যুর পর তার পুত্রকে সেই জায়গিরের তত্ত্বাবধায়ক পদে স্থলাভিষিক্ত করতেন। এর ফলে রাজন্যবর্গ তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকত এবং জীবদ্দশায় সন্তানদের ভবিষ্যৎ চিন্তায় জনগণের সম্পদে অন্যায় হস্তক্ষেপ করত না।

মালিকানা ও জায়গির নীতির ক্ষেত্রে ইমাদুদ্দিন জিনকির অনন্যসাধারণ অবস্থানের চমৎকার দৃষ্টান্ত হতে পারে মাআররা বিজয়পরবর্তী ঘটনা। দীর্ঘ কয়েক বছর ক্রুসেডারদের দখলে থাকার পর তিনি মাআররা নগরী পুনরুদ্ধার করেন।

ইমাদুদ্দিন জিনকি হানাফি মতাদর্শী ছিলেন। হানাফি মাজহাব মতে কোনো ভূখণ্ড অমুসলিম শত্রুপক্ষের দখলে চলে গেলে তা 'দারুল হারব' ও শত্রুভূমিতে পরিণত হয়। পরবর্তী সময়ে মুসলমানরা ভূখণ্ডটি পুনরুদ্ধার করলে তা রাষ্ট্রীয় সম্পদে পরিণত হয় এবং বাইতুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) উক্ত ভূখণ্ডের অধিকার গ্রহণ করে সুবিবেচনা অনুযায়ী

---

২৫৫. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ৭৭।

যাদেরকে ইচ্ছা বণ্টন করে দিতে পারে। এক্ষেত্রে উক্ত ভূখণ্ডের সাবেক মালিকদের কোনো অধিকার থাকে না।

মাআ'ররা বিজিত হলে নগরীটির সাবেক অধিবাসীরা বিভিন্ন স্থান থেকে ছুটে এসে নিজেদের পুরোনো ভূ-অধিকার দাবি করে। তখন ইমাদুদ্দিন জিনকি রাজ্যের উলামায়ে কেরামকে সমবেত করে এ বিষয়ে তাদের মতামত জানতে চান। যেহেতু তারা সকলে ছিলেন ইরাক অঞ্চলের আলিম আর ইরাকে হানাফি মাজহাব অনুসৃত ছিল, তাই তারা সকলে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতানুযায়ী সমাধান প্রদান করেন এবং বলেন, 'ভূ-মালিকানা সাবেক মালিকরা পাবে না; বরং পুরোটাই এখন বাইতুল মালের (অর্থাৎ রাষ্ট্রের) সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে।'

ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ. কী করেছিলেন?

তিনি সুগভীর দ্বীনি প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে উত্তর দেন, 'ফিরিঙ্গিরা (ক্রুসেডাররা) তাদের ভূমি-অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছিল; এখন আমরাও তাদের ভূমি-অধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছি। তাহলে আমাদের ও ফিরিঙ্গিদের মধ্যে পার্থক্য থাকল কোথায়?! যারাই ভূমির মালিকানা প্রমাণে উপযুক্ত কাগজপত্র নিয়ে আসবে, তারা মালিকানা ফিরে পাবে।'

এভাবে তিনি সামান্য ভূমির অধিকারও না রেখে প্রত্যেককে আপন আপন ভূ-মালিকানা ফিরিয়ে দেন।[২৫৬]

ইমাদুদ্দিন জিনকির নীতি ছিল সমাজে কোনো অরাজকতা বা নৈরাজ্য টিকে থাকতে না দেওয়া। তিনি সব স্থানে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিলেন বলে রাজ্যের সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ. দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে এ অঞ্চলের পরিস্থিতি ছিল চরম বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। নিরাপত্তাপ্রহরা ছাড়া মানুষ দীর্ঘ পথের সফরে বের হতে পারত না। এমনকি নিরাপত্তাপ্রহরা ব্যতীত চলাচলে আশঙ্কা থাকায় খোদ মসুলবাসী মূল নগরীর বাইরে নির্মিত জামে মসজিদে জুমার দিন ব্যতীত যেতে পারত না। কিন্তু ইমাদুদ্দিন জিনকি দায়িত্ব গ্রহণের পর সামগ্রিক চিত্র বদলে যায় এবং সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। শুধু তা-ই নয়;

২৫৬. ইবনে ওয়াসিল, *মুফাররিজুল কুরুব*, ১/৭৫।

তার শাসনামলে নগরায়ণ, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি ব্যাপকতর হয় এবং জনসাধারণের বাড়িঘর নির্মাণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পায়।[২৫৭]

এভাবেই ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ. নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সর্বোচ্চ সচেষ্ট ছিলেন। ফলে তার প্রত্যাশা পূরণের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলা তাকে ও তার জনগণকে অকল্পনীয় বরকত ও কল্যাণ দান করেন।

ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ.-এর ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা কেবল মুসলিম প্রজাদের সঙ্গেই ছিল না; ইহুদি-খ্রিষ্টানসহ নির্বিশেষে সকল প্রজা তার ন্যায়ানুগ বিচার লাভ করত। একবার তিনি সসৈন্য জাযিরা ইবনে উমরে[২৫৮] অবস্থান করছিলেন। এ সময় স্থানীয় এক ইহুদি নাগরিক তার কাছে উপস্থিত হয়ে তার প্রশাসনের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আমির ইযযুদ্দিন আবু বকর আদ-দুবাইসির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করল যে, মুসলিম বাহিনী যতদিন উক্ত এলাকায় অবস্থান করবে, ইযযুদ্দিন নিজে বসবাসের উদ্দেশ্যে ততদিনের জন্য তার বাড়িটি দখল করে নিয়েছেন। অভিযোগ শুনে ইমাদুদ্দিন জিনকি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ইযযুদ্দিনের দিকে তাকালেন; মুখে কিছু বললেন না। দরবারে উপস্থিত প্রচণ্ড ভীত ইযযুদ্দিনের উল্টো দিকে ফেরারও সাহস ছিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ দরজার দিকে পিঠ করে বের হয়ে গেলেন এবং তুমুল বৃষ্টি উপেক্ষা করে শহরে ফিরে তার তাঁবু নিয়ে শহরের বাইরে স্থাপন করলেন। ইহুদির প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে এক রাত বিলম্ব করার সাহসও তার ছিল না।[২৫৯]

---

২৫৭. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ৭৭।

২৫৮. জাযিরা ইবনে উমর : আধুনিক তুরস্কের শিরনাক প্রদেশ (Şırnak Province)-এর একটি নগরী। তুরস্ক, ইরাক ও সিরিয়া তিন দেশের সীমান্তরেখার নিকটে অবস্থিত নগরীটির আশেপাশে যদিও কোনো সাগর বা দ্বীপের অস্তিত্ব নেই; কিন্তু উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব তিন দিক থেকে দজলা নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত বলে নগরীটি রূপকার্থে 'জাযিরা' নামে পরিচিতি লাভ করে। নগরীটির আধুনিক নাম কিজরা (Cizre)। [সম্পাদক]

২৫৯. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ৭৭।

[পাঁচ] হৃদয়-কোমলতা ও সংবেদনশীলতা

হয়তো অনেকেই ইমাদুদ্দিন জিনকির স্বভাবে এই গুণটির উপস্থিতিতে আশ্চর্য হবেন; চমকে উঠবেন ইমাদুদ্দিন জিনকিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য করে একজন মুসলিম শাসকের গুণ ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয়-শীর্ষক আমাদের এ আলোচনায় এই গুণটির উপস্থাপনে।

বিস্ময়ের কারণ হলো, সামরিক অঙ্গনে নেতৃত্বদানকারী শাসকগণ সাধারণত রূঢ়তা, রুক্ষতা, স্বভাবজাত কঠোরতা ইত্যাদি গুণে প্রসিদ্ধ হয়ে থাকেন। যেহেতু দায়িত্ব পালনের খাতিরে তাদের শরিয়তের বিভিন্ন দণ্ডবিধান কার্যকর করতে হয় এবং কখনো কখনো শাস্তিদানের বিভিন্ন মাধ্যম গ্রহণ করতে হয়, তাই তাদের কোমলতাবিবর্জিত চিত্রই সাধারণত আমাদের সামনে ফুটে ওঠে।

আফসোসের বিষয়, স্বয়ং ইমাদুদ্দিন জিনকিকে নিয়ে রচিত কিছু ঐতিহাসিক গ্রন্থে তাকে কঠোর, নির্দয় ও রুক্ষ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাস্তবতা হলো, দয়ার্দ্রতা, হৃদয়-কোমলতা ইত্যাদি একজন মুসলিম শাসকের অত্যাবশ্যকীয় গুণ। স্বয়ং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন সর্বোচ্চ স্তরের শাসক, সেনাপতি ও মুজাহিদ ছিলেন, ছিলেন মানবজগতের শ্রেষ্ঠতম কোমল-দয়ালু মানব।[২৬০] সৎ শাসকদের অপরিহার্য এই গুণটি ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ.-এর মাঝেও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু কর্মমুখর সংগ্রামী জীবন, আজীবন বিভিন্ন কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মব্যস্ততা, দখলদার ক্রুসেডারদের হাত থেকে ইসলামি ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারের অব্যাহত প্রচেষ্টা ইত্যাদি কারণে তার প্রকৃত স্বভাবের বিপরীত রুক্ষ ও কঠোর একটি চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

আমরা ইতিপূর্বে কৃষকদের প্রতি তার মহানুভবতা প্রত্যক্ষ করেছি। দেখেছি কৃষকের ফসল, সম্পদ, ক্ষেত-খামার এমনকি তুচ্ছ খড়-কুটার বিষয়ে তার সতর্কতা ও সংবেদনশীলতা। এমনটি একজন সহৃদয় ও অতিমাত্রায় সংবেদনশীল ব্যক্তি ছাড়া কারও পক্ষেই করা সম্ভব নয়।

---

২৬০. নবী-চরিত্রের অনুপম দয়া-অনুগ্রহ সম্পর্কে জানতে পাঠ করতে পারেন মাকতাবাতুল হাসান থেকে প্রকাশিতব্য ড. রাগিব সারজানির *'আর-রাহমাহ ফি-হায়াতির রাসুল'*।

তিনি একবার ভুল করলেই কাউকে পাকড়াও করতেন না; বরং বারবার ক্ষমা করতেন, যথাসম্ভব শেষ সীমা পর্যন্ত ছাড় দিতেন। তিনি তার প্রশাসনের এমন কোনো দায়িত্বশীলকেই কেবল বরখাস্ত করতেন, যে বারবার ভুল করত বা ক্ষমার অযোগ্য বড় কোনো অন্যায় করত। এ কারণেই তিনি যাদেরকে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন, তাদের অধিকাংশই আমৃত্যু বা খোদ ইমাদুদ্দিন জিনকির মৃত্যু পর্যন্ত নিজ পদে বহাল ছিল। এর কারণ একটাই; ইমাদুদ্দিন সর্বদা যথাসম্ভব তাদের ভুলত্রুটি উপেক্ষা করে চলতেন।

প্রতি শুক্রবার প্রকাশ্যে একশ দিনার দান করা ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ.-এর স্বভাব-রীতি ছিল।[২৬১] দরিদ্র-অসহায়দের প্রতি দয়ার অনুভূতি থেকে তিনি এ দান করতেন। প্রকাশ্যে দান করতেন, যেন সমাজের ধনী ব্যক্তিরা তার অনুকরণে দান করতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং দানের কল্যাণচর্চা ব্যাপকতর হয়। এর বাইরে তিনি প্রতিদিন গোপনে বড় অঙ্কের দান করতেন, যা তার উজির ছাড়া কেউ জানত না। এ সম্পর্কিত একটি চমকপ্রদ ঘটনা ইতিহাসগ্রন্থে পাওয়া যায়।

ইমাদুদ্দিন জিনকি একদিন ঘোড়ায় চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ঘোড়াটি লাফিয়ে উঠলে তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলেন। এ সময় তিনি তার সঙ্গে থাকা জনৈক আমিরকে ডেকে বিষণ্ন বা ক্রোধান্বিত স্বরে কিছু বললেন। লোকটি তার কথা বুঝতে পারল না; তবে এতটুকু অনুভব করতে পারল যে, ইমাদুদ্দিন জিনকি মনঃক্ষুণ্ন হয়ে আছেন। সে মনে করল, ইমাদুদ্দিন তার ওপরই রাগ করেছেন। কিন্তু ইমাদুদ্দিন জিনকিকে প্রশ্ন করে অসন্তুষ্টির কারণ জিজ্ঞেস করার সাহস তার হলো না। লোকটি ত্রস্তপদে বাড়িতে ফিরে স্ত্রীকে নিজের ভয়ের কথা জানাল যে, তার হয়তো কোনো ভুল হয়ে গেছে। স্ত্রী তাকে বলল, 'আপনি ইমাদুদ্দিন জিনকির নায়েব (সহকারী) নাসিরুদ্দিন জাকারের সঙ্গে কথা বলুন; তিনি হয়তো আপনাকে কোনো সমাধান বাতলে দেবেন।' উক্ত আমির কালবিলম্ব না করে নাসিরুদ্দিনের কাছে গিয়ে ঘটনাটি জানাল। নাসিরুদ্দিন তাকে বললেন, 'তিনি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হননি; তিনি আসলে তোমার কাছে এই থলেটি চাচ্ছিলেন!' এ কথা বলে

---

২৬১. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ৮১।

নাসিরুদ্দিন জাকার একটি থলে বের করে লোকটিকে দিলেন। লোকটি তা ইমাদুদ্দিন জিনকির কাছে নিয়ে গেলে তিনি খুশি মনে তা গ্রহণ করলেন। এরপর লোকটি পুনরায় নাসিরুদ্দিন জাকারের কাছে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কী করে বুঝলেন যে, তিনি এই থলেটিই চাচ্ছিলেন?' নাসিরুদ্দিন উত্তর দিলেন, 'তিনি প্রতিদিন এই পরিমাণ সম্পদ দান করেন এবং রাতেই লোক পাঠিয়ে আমার কাছ থেকে তা নিয়ে নেন। আজ তিনি কাউকে পাঠাননি। এরই মধ্যে খবর পেলাম যে, ঘোড়া হঠাৎ লাফিয়ে ওঠায় তিনি পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলেন। এরপরই তিনি তোমাকে আমার কাছে পাঠালেন। বুঝতে পারলাম যে, তিনি তোমাকে দানের কথাই বলেছেন।'[২৬২]

ইমাদুদ্দিন জিনকি দানে বিলম্ব বা বিস্মৃতির সঙ্গে ঘোড়ার হোঁচট খাওয়ার যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে এটি তার তীব্র সংবেদনশীলতা, অনুভূতির কোমলতা এবং ঘটনা-দুর্ঘটনায় শিক্ষাগ্রহণে মনোযোগী হওয়ার দলিল। আর এ সবকিছু হৃদয় কোমল ও নমনীয় হলেই হয়ে থাকে। এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, তিনি অব্যাহত যুদ্ধ, যুদ্ধ-পরিকল্পনা ও একটি রাষ্ট্রের পূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্বের ব্যস্ততা সত্ত্বেও প্রতিদিন গরিব-অসহায়দের দান করতে ভুলতেন না।

নিঃসন্দেহে দয়া ও দানদক্ষিণা তার কৃত্রিম গুণ নয়; বরং হৃদয়ে প্রোথিত গুণ ছিল।

ইমাদুদ্দিন জিনকির দয়ার্দ্রচিত্ততার আরেকটি নিদর্শন হলো, তিনি দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও তার প্রতি কারও অনুগ্রহপূর্ণ আচরণের কথা ভুলে যেতেন না। নাজমুদ্দিন আইয়ুবের[২৬৩] সঙ্গে তার এ সংক্রান্ত ঘটনা তো অতি প্রসিদ্ধ।

---

২৬২. ইবনে ওয়াসিল, *মুফাররিজুল কুরূব*, ১/১০৫।

২৬৩. নাজমুদ্দিন আইয়ুব বিন শাযি হলেন মহাবীর সালাহুদ্দিন আইয়ুবির পিতা। তিনি নিজেও ছিলেন ইসলামি ইতিহাসের অন্যতম মহান বীরযোদ্ধা। প্রথমে তিনি সেলজুক সুলতান মুহাম্মাদ বিন মালিকশাহর সেবক ছিলেন। তার সততা, বিশ্বস্ততা, বীরত্ব ও সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়ে সুলতান মুহাম্মাদ তাকে তিকরিত দুর্গের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। নাজমুদ্দিন সেখানে ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ই একদিন সুলতান ইমাদুদ্দিন জিনকি এক যুদ্ধে শত্রুবাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে তিকরিতে আগমন করেন। নাজমুদ্দিন তাকে আশ্রয় দেন, তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং তার=

নাজমুদ্দিন আইয়ুব ৫২৬ হিজরি সনে (১১৩১ খ্রিষ্টাব্দে) ইমাদুদ্দিন জিনকির একটি উপকার করেছিলেন। এ সময় ইমাদুদ্দিন জিনকি এক যুদ্ধে পরাজিত হলে নাজমুদ্দিন আইয়ুব তাকে তিকরিত দুর্গে আশ্রয় দেন।[২৬৪] দীর্ঘ আট বছর পর ৫৩৪ হিজরি সনে (১১৩৯ খ্রিষ্টাব্দে) বালাবাক্কু নগরী বিজয়ের পর ইমাদুদ্দিন নাজমুদ্দিনকে নগরীটির প্রশাসক পদে অধিষ্ঠিত করে এই সদাচরণের প্রতিদান দেন।[২৬৫] যে ব্যক্তি দীর্ঘ আট বছর পরও তার প্রতি কারও অনুগ্রহপূর্ণ আচরণের কথা স্মরণ রাখেন, তিনি যে একজন বিশ্বস্ত ও মহানুভব ব্যক্তি, তা কারও কাছে অস্পষ্ট থাকার কথা নয়।

ইমাদুদ্দিন জিনকি তার প্রতি মসুলের সাবেক প্রশাসক জাকারমিশের অনুগ্রহের কথাও ভুলেননি। জাকারমিশের সযত্ন তত্ত্বাবধানের প্রতিদানে তিনি এর পঁচিশ বছরেরও অধিক সময় পর তার পুত্র নাসিরুদ্দিন কুরিকে একটি জায়গির-দায়িত্ব প্রদান করেন।[২৬৬]

ইমাদুদ্দিন জিনকি ছিলেন একজন বিশ্বস্ত, মহানুভব ও কোমল হৃদয়-বিশিষ্ট মানুষ। তবে তার সারা জীবনের কর্মমুখর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সংগ্রামী পদচারণার কারণে অনেকেই ভুলবশত মনে করে যে, তিনি কঠোর ও রুক্ষ স্বভাবের মানুষ ছিলেন। বাস্তবে তিনি ছিলেন এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা সামনে তার যে গুণ-বৈশিষ্ট্যটি আলোচনা করব, তার মাধ্যমে কতিপয় ঐতিহাসিকের এই মতভিন্নতার কার্যকারণ আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হবে বলে আশা করা যায়।

=পূর্ণ সেবা-শুশ্রূষা করেন। পনেরো দিন তার কাছে অবস্থান করার পর ইমাদুদ্দিন মসুলে ফিরে যান। পরবর্তী সময়ে সেলজুক সুলতান গিয়াসুদ্দিন মাসউদ বিন মুহাম্মাদ তাকে সরিয়ে ইরাকের পুলিশ বিভাগের প্রধান মুজাহিদুদ্দিন নাহরুযকে তিকরিত দুর্গের দায়িত্ব প্রদান করেন। নাজমুদ্দিনও তিকরিতেই বসবাস করতে থাকেন। এর কিছুদিন পর কোনো কারণে নাহরুয নাজমুদ্দিনের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে দুর্গ থেকে বের করে দেন। তখন নাজমুদ্দিন আইয়ুব ও তার ভাই আসাদুদ্দিন শিরকুহ তিকরিত ছেড়ে মসুলে সুলতান ইমাদুদ্দিনের খেদমতে হাজির হন এবং নিজেদের যোগ্যতা ও নিষ্ঠাপূর্ণ কর্মদক্ষতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে জিনকি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হন। [সম্পাদক]

২৬৪. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৬৩।

২৬৫. প্রাগুক্ত, ১০/১৬।

২৬৬. ইমাদুদ্দিন খলিল, *ইমাদুদ্দিন জিনকি*, পৃষ্ঠা : ২২০।

[ছয়] গাম্ভীর্য ও রাশভারিত্ব

যে সময়ে, যে পরিস্থিতিতে ইমাদুদ্দিন জিনকির জন্ম ও বেড়ে ওঠা—সার্বিক বিচারে সে সময়টা ছিল সংগ্রামের। পরিস্থিতিই তাকে গম্ভীর ও রাশভারী করে তুলেছিল। তিনি জন্মগ্রহণ করেন চরম দুর্যোগপূর্ণ এক পরিস্থিতিতে। সে সময় মুসলিম নেতাদের পারস্পরিক বিরোধ ছিল একান্ত স্বাভাবিক বিষয়! তার পিতাও এমনই এক সংঘাতের নির্মম শিকার হয়ে নিহত হন। ফলে ইমাদুদ্দিন জিনকি বেড়ে ওঠেন পিতৃহীন-নিঃসঙ্গ অবস্থায়। তার কোনো সহোদর ভাই ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর তিনি শৈশব-ভূমি আলেপ্পো থেকে মসুলে চলে যান। শৈশবের কচি বয়সেই তিনি বেছে নেন সৈনিকজীবন। শৈশবেই তিনি দেখেন, ক্রুসেডাররা একের পর এক ইসলামি ভূখণ্ড জবরদখল করে নিচ্ছে। ফলে সে বয়স থেকেই তিনি ক্রুসেড আগ্রাসনের গতিপ্রকৃতি ও প্রতিটি বাঁকের প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে থাকেন। তিনি মুহূর্তের জন্যও ভুলে যাননি যে, মসজিদুল আকসা ক্রুসেডারদের দখলে আছে; এন্টিয়ক, এডেসা, বৈরুত, আক্কা ও ত্রিপোলিসহ ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন মুসলিম নগরী তাদের আগ্রাসনে রক্তাক্ত হয়েছে, রাতদিন মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে; অব্যাহত মুসলমানদের মানসম্মান ও ধনসম্পদ লুণ্ঠন করা হচ্ছে।

এ সকল পরিস্থিতি তাকে পুরোদস্তুর গম্ভীর ও সংগ্রামী করে তোলে। এমন বিপর্যস্ত পরিস্থিতিও যাকে গম্ভীর করতে পারে না; সে তো প্রকৃতপক্ষে মানবতাহীন, দ্বীন ও আকিদার চূড়ান্ত মিসকিন!

এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংগ্রামী মনোভাব তাকে কখনোই নিশ্চিন্ত হতে দেয়নি। এ কারণেই তিনি বিশ্রাম ও বিলাসী জীবন খুঁজতেন না। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি কখনো মৃদু হাসতেনও না। আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন পৃথিবীর সর্বাধিক সহাস্য-বদন ছিলেন,[২৬৭] তেমনই ছিলেন সবচেয়ে গম্ভীর মানুষ। নবীজি ছিলেন অধিক কৌতুক-হাস্যরস পরিহারকারী সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। নবীজীবনে যৎসামান্য যে নির্দোষ-নির্মল হাস্যরসের বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে মিথ্যা ও অতিরঞ্জনের

---

২৬৭. আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস রাযি. বলেন, 'রাসুলের চেয়ে সহাস্যবদন কোনো মানুষ আমি দেখিনি।' ইমাম তিরমিজি, *সুনানে তিরমিজি*, হাদিস নং ৩৬৪১ ও ইমাম আহমাদ, *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ১৭৭৪০। [অনুবাদক]

লেশমাত্র ছিল না। ইমাদুদ্দিন জিনকির জীবনাদর্শও এমনই ছিল। তিনি ছিলেন সদা-ভাবুক ও অতি নিশ্চুপ। তার মনমস্তিষ্ক সর্বদা উম্মাহর কল্যাণচিন্তা ও গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের পরিকল্পনায় ব্যস্ত থাকত বলে তিনি মানুষের সঙ্গে কথা খুব কম বলতেন। এই সদা-চিন্তাই তার ব্যক্তিত্বকে সকলের সামনে রাশভারী করে তুলেছিল। ঠিক একই বিষয় ঘটেছিল ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর রাযি.-এর ক্ষেত্রেও। যেহেতু এই গাম্ভীর্যে কোনো জুলুম-অবিচার, অনাচার বা অহংকার নেই, তাই এটি মোটেও আপত্তিকর নয়।

মহান ব্যক্তিগণ সব সময় রাশভারী, গম্ভীর ও প্রভাবসম্পন্নই হয়ে থাকেন। নবীজীবনের এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা বিশ্লেষণ করলে আমরা উপলব্ধি করতে পারব যে, ধর্মীয় নীতিমালার আলোকে এ জাতীয় গাম্ভীর্য মোটেও অপছন্দনীয় কিছু নয়।

ইমাম ইবনে মাজা রহ. আবু মাসউদ রাযি.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি নবীজির দরবারে উপস্থিত হলে নবীজি তার সঙ্গে কথা বললেন। এ সময় (ভয়ে) লোকটির কাঁধের গোশত কাঁপছিল। নবীজি তাকে অভয় দিয়ে বললেন, 'শান্ত হও; আমি তো রাজা-বাদশা নই। আমি সাধারণ শুকনো গোশত আহার করে জীবন অতিবাহিত করা এক মায়ের সন্তান!'[২৬৮]

লক্ষ করুন! নবীজিকে দেখে লোকটি ভয়ে কাঁপছিল। যদিও নবীজি ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে কোমল ও দয়ালু মানুষ; কিন্তু নবীজির ব্যক্তিত্ব, গাম্ভীর্য ও তার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ লোকটিকে প্রকম্পিত করে তুলেছিল। আর তাই নবীজি তাকে স্বাভাবিক হতে বলে তার অন্তর প্রশান্ত করেন।

আমাদের মহানায়ক ইমাদুদ্দিন জিনকিও এমনই ছিলেন।

একদিন তিনি দুর্গ থেকে বের হলেন। এ সময় দুর্গের দ্বাররক্ষী ঘুমাচ্ছিল। ইমাদুদ্দিন জিনকির ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীরা তাকে ঘুম থেকে জাগাল। চোখ খুলেই ইমাদুদ্দিন জিনকিকে দাঁড়ানো দেখে বেচারা ভয়ে ভূপাতিত

---

২৬৮. ইমাম ইবনে মাজা, *সুনানে ইবনে মাজা*, হাদিস নং ৩৩১২।

হলো! তাকে ধরাধরি করে ওঠালে দেখা গেল, প্রচণ্ড ভয়ের কারণে সে তৎক্ষণাৎ মারা গেছে![২৬৯]

এর অর্থ এই নয় যে, ইমাদুদ্দিন জিনকি বদরাগী, কঠোর বা রুক্ষ স্বভাববিশিষ্ট ছিলেন। প্রজা ও সাধারণ জনতার সঙ্গে কখনোই কোনো বিষয়ে তাকে ক্রুদ্ধ হতে বা সীমালঙ্ঘন করতে দেখা যায়নি। কিন্তু তার স্বভাব-গাম্ভীর্যই জনমানুষের হৃদয়ে তার জন্য বিশেষ শ্রদ্ধাপূর্ণ অবস্থান তৈরি করে দিয়েছিল।

ইমাদুদ্দিন জিনকির জীবন ছিল লৌকিকতামুক্ত সংগ্রামমুখর জীবন। নিজেকে তিনি সংগ্রাম ও কর্মমুখর জীবনে জোর করে বাধ্য করেননি; বরং এ জীবন তিনি উপভোগ করতেন। এমনকি ইবনুল আছির তার সম্পর্কে বলেন, 'তার কাছে গায়িকার গানের চেয়ে অস্ত্রের ঝনঝনানি বেশি মধুময় মনে হতো।[২৭০] অন্যরা যেখানে গীত-সংগীতে মনের শান্তি খুঁজে বেড়াত, তিনি সেখানে মনের প্রশান্তি খুঁজে পেতেন রণাঙ্গনে বা অনুশীলনের ময়দানে যুদ্ধাস্ত্রের ঘর্ষণধ্বনিতে।

গাম্ভীর্য ও সংগ্রামী জীবন তার ব্যক্তিত্ব ও শখেও প্রভাব ফেলেছিল। মাঝেমধ্যে সুকঠিন ব্যস্ত জীবনের ক্লান্তি হ্রাস করতে তিনি যখন একটু প্রশান্তি খুঁজতেন, তখন তিনটি কাজের যেকোনো একটি বেছে নিতেন।

১. পাখি বা বন্য প্রাণী শিকারে বের হতেন। স্বভাবতই এর দ্বারা তির চালনা, আক্রমণ পরিচালনা ও নিজেকে আড়াল করার অনুশীলন হয়ে যেত।[২৭১] এর মাধ্যমে তিনি নিজের রণদক্ষতা আরও শানিত করতেন, যা রণাঙ্গনে কাজে লাগত। তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় উপহার ছিল শিকারকৃত প্রাণী। তিনি নিজেও শাসক ও রাজন্যবর্গকে চিতা, ইগলসহ নিজের শিকার করা বিভিন্ন প্রাণী উপহার পাঠাতেন।[২৭২]

২. অশ্বচালনার অনুশীলন করতেন এবং ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন। তিনি নিজে একজন সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ অশ্বারোহী ছিলেন।

---

২৬৯. ইবনে ওয়াসিল, *মুফাররিজুল কুরুব*, ১/১০৫।

২৭০. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ১৮।

২৭১. দেখুন: উসামা বিন মুনকিয, *আল-ই'তিবার*, পৃষ্ঠা : ১৯২-১৯৩।

২৭২. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৬৩।

৩. নৌকায় চড়ে একাকী দজলার বুকে বিচরণ করতেন এবং মহান আল্লাহর সৃষ্টি-রহস্য নিয়ে ভাবতেন; আসমান-জমিন ও সৃষ্টিজগৎ নিয়ে চিন্তা করতেন কিংবা সমকালীন ঘটনা, দুর্যোগ ও বিপর্যয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন। নির্জনের এই চিন্তামগ্নতা তাকে দান করত বিভিন্ন চমৎকার চিন্তা ও পরিকল্পনা, বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল, অন্তরের বিনম্রতা কিংবা দৈহিক প্রশান্তি।[২৭৩]

হ্যাঁ, এই ছিল মহান মুজাহিদ ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ.-এর বিনোদন ও আমোদ-প্রমোদের বিবরণ!

[সাত] দৃঢ় সংকল্প ও স্থির সিদ্ধান্ত

এটি একজন সচেতন শাসকের অতি আবশ্যকীয় গুণ। ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ.-এরও অন্যতম গুণ ছিল এটি। যুগে যুগে শাসক-প্রশাসকদের দ্বিধা ও সিদ্ধান্তহীনতা মুসলমানদের কত সুযোগ নষ্ট করেছে! জাতি-জীবনে দুর্যোগ-বিপর্যয় ত্বরান্বিত করেছে! কিন্তু ইমাদুদ্দিন জিনকি ছিলেন প্রতিটি বিষয়ে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। কোনো কাজ প্রয়োজন ও উপকারী মনে করলে তিনি অবিলম্বে সিদ্ধান্ত নিতেন এবং দ্বিধাহীন চিত্তে বাস্তবায়ন শুরু করতেন।

শাসনামলের শুরুতে তিনি উপলব্ধি করেন যে, যথার্থ প্রস্তুতি গ্রহণের পূর্বে তার পক্ষে এখন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। তাই তিনি তাদের সঙ্গে সাময়িক যুদ্ধবিরতির চুক্তি করেন। সেই সময়কাল শেষ হতেই আমরা দেখেছি তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছেন এবং তা চালিয়ে গেছেন; ক্রুসেডারদের কোনো শান্তিপ্রস্তাবই আর গ্রহণ করেননি। প্রথমে শান্তিচুক্তির প্রস্তাব, এরপর অনবরত লড়াই—উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সংকল্প ও সিদ্ধান্তগ্রহণে স্থির-দ্বিধাহীন। পরিস্থিতি বিবেচনা করে অনেক সময় তিনি শেষে হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নিতেন, আবার কখনো পরিস্থিতি যুদ্ধের অনুকূল না হলে প্রস্থানের সিদ্ধান্ত নিতেন। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তিনি জিদ দেখিয়ে লড়াই করার জন্য গোয়ার্তুমি করতেন না; বরং দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতেন এবং তৎক্ষণাৎ তার বাস্তবায়ন

---

২৭৩. ইমাদুদ্দিন খলিল, *ইমাদুদ্দিন জিনকি*, পৃষ্ঠা : ১৮১।

ঘটাতেন। তার এই স্থিরচিত্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণে সঙ্গীরাও অপ্রয়োজনীয় কষ্টক্লেশ থেকে বেঁচে যেত।

সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধাহীনতার দৃষ্টান্ত তার জীবনে অসংখ্য; বরং তার পুরো জীবনই ছিল এর দৃষ্টান্ত! ইতিহাসের পরবর্তী অংশের ধারাবিবরণীতে আমরা যখন তার প্রশাসনিক ও সামরিক বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করব, তখন বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবে।

[আট] সুশাসন ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা

ঐতিহাসিক ইবনুল আছির বলেন, 'ইমাদুদ্দিন জিনকি মহান-প্রজ্ঞাবান রাজনীতিবিদ ছিলেন।'[২৭৪]

ইবনে আকিল রহ.-এর ভাষ্য অনুযায়ী রাজনীতির সংজ্ঞা হলো—

> যে নীতির বাস্তবায়ন প্রকৃত অর্থেই জনগণকে অন্যায় বিমুখ করে ন্যায়মুখী করে, তা-ই রাজনীতি; এমনকি তা আসমানি ওহির ভাষ্য না হলেও এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রণীত না হলেও।[২৭৫]

ইবনুল কায়্যিম রহ. রাজনীতির এই সংজ্ঞাই গ্রহণ করেছেন। স্বভাবতই এর অর্থ এই নয় যে, ইবনে আকিল শরিয়ত পরিহারের নীতিকে রাজনীতি বলে অভিহিত করেছেন। বরং তার উদ্দেশ্য, সমাজ সংশোধন ও জনগণকে অন্যায়-অপরাধ থেকে বিরত রাখতে যুগ ও পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী উপযোগী উপায়-উপকরণ ও পদ্ধতি উদ্ভাবন।

আধুনিক পরিভাষায় রাজনীতির সংজ্ঞা জানতে গেলে রবার্ট ডিকশনারি বলে, 'মানবসমাজ পরিচালনা সংক্রান্ত শাস্ত্রের নাম রাজনীতি।'[২৭৬]

অপরদিকে 'আল-মুজামুল কানুনি'র ভাষ্য অনুসারে রাজনীতি হলো, 'সামাজিক বিষয়াদি পরিচালনা সংক্রান্ত শাস্ত্র বা নীতিমালা।'[২৭৭]

মৌলিক ইসলামি পরিভাষা হোক বা আধুনিক আইনশাস্ত্রীয় পরিভাষা—সর্ববিচারে ইমাদুদ্দিন জিনকি ছিলেন একজন উচ্চমার্গীয় রাজনীতিবিদ।

---

[২৭৪]. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩৪০।

[২৭৫]. ইবনুল কাইয়্যিম, *বাদাইয়ুল ফাওয়াইদ*, ৩/৬৭৩।

[২৭৬]. The Collins-Robert French Dictionary.

[২৭৭]. *আল-মুজামুল কানুনি*।

ইমাদুদ্দিন জিনকি বেড়ে উঠেছিলেন দুর্যোগ ও ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত এক যুগে। তাকে চলতে হয়েছে বিভিন্ন মানসিকতার নেতা, আমির ও বিক্ষিপ্ত মানসের জনতাকে সঙ্গে নিয়ে। প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কর্ম সম্পাদন ও সম্পর্ক রক্ষায় তিনি ছিলেন প্রজ্ঞাবান ও সু-প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারী। তিনি কারও সুসম্পর্ক হারিয়ে ফেলেছেন বা কোনো আমিরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, এমন ঘটনা একেবারেই বিরল। তিনি আপন সুষম সুসংহত চিন্তা-পরিকল্পনার মাধ্যমে যেকোনো জটিল থেকে জটিলতর সমাজও সফলভাবে পরিচালনা করতেন।

তিনি শক্তি ও কর্তৃত্বের উৎস ও কেন্দ্রসমূহ সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। তিনি প্রতিপক্ষের শক্তিমত্তাও গভীর দৃষ্টিতে অনুমানে সচেষ্ট হতেন। ইমাদুদ্দিন জিনকি শব্দের ধারে ও উপাধির ভারে প্রবঞ্চিত হওয়ার লোক ছিলেন না। শুরু থেকেই তিনি জানতেন, সেলজুক সুলতানগণ খলিফাদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। এ কারণেই তিনি সেলজুকদের প্রতি দৃশ্যমান আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলেন। অবশ্য তিনি খলিফাদের সঙ্গে সদাচরণ এবং তাদের নৈকট্য অর্জনেও উদাসীন ছিলেন না। কিন্তু যখন সুলতান-খলিফা বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে যেত, তখন তিনি তার সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সুলতানের পক্ষ অবলম্বন করতেন।

পরবর্তী সময়ে যখন সেলজুক সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ইমাদুদ্দিন জিনকি নিজেই মুসলিম উম্মাহর প্রধান শক্তিতে পরিণত হন, তখনও তিনি রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে নিজেকে স্বাধীন শাসক ঘোষণা করার পরিবর্তে আলপ আরসালানের[২৭৮] নামে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন।[২৭৯] এর মাধ্যমে তিনি মূলত সম্ভাব্য ফিতনা-বিশৃঙ্খলা ও চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র থেকে আত্মরক্ষা করেছিলেন। অথচ ইমাদুদ্দিন জিনকির সঙ্গে তুলনা করলে সুলতান আলপ আরসালানের কোনো ওজনই ছিল না। কিন্তু এরই নাম রাজনৈতিক প্রজ্ঞা; এর মাধ্যমে তিনি সুলতান আলপ

---

২৭৮. প্রয়াত সেলজুক সুলতান মাহমুদের পুত্র। সুলতান মাহমুদ তার যে দুই পুত্রের প্রতিপালনের দায়িত্ব ইমাদুদ্দিন জিনকিকে দিয়েছিলেন, এই আলপ আরসালান তাদের একজন। [সম্পাদক]

২৭৯. ইবনুল আছির উল্লেখ করেন, ইমাদুদ্দিন জিনকি বার্তা প্রেরণ বা কোনো দূতের সঙ্গে কথা বলার সময় বলতেন, 'সুলতান এরূপ বলেছেন।' *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ৭১।

আরসালান ও তার সমর্থক সেলজুকশক্তিকে শান্ত রেখেছিলেন, শান্ত রেখেছিলেন আমজনতাকেও।[২৮০]

ইমাদুদ্দিন জিনকি আপন বুদ্ধিদীপ্ত নীতি-কৌশলের মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে সৃষ্ট শত্রুপক্ষের ঐক্য ও সমঝোতা বিচ্ছিন্ন করে দিতেন। ক্রুসেডার-বাইজান্টাইন ঐক্য প্রচেষ্টা বিচ্ছিন্নকরণে তার গৃহীত নীতি এর অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।[২৮১] একইভাবে তিনি তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মুসলিম শক্তির মৈত্রীপ্রচেষ্টাকেও কৌশলে বিনষ্ট করে দেন।[২৮২] নিঃসন্দেহে তার এসব প্রজ্ঞাপূর্ণ নীতি-কৌশল রাজনীতির ছাত্রদের বৈষয়িক পাঠ্য হতে পারে।

যথাসম্ভব স্বল্পতম ত্যাগ শিকার করে যুদ্ধজয় সুনিশ্চিতকরণ, শত্রুদুর্গের পতন এবং অধিকৃত ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারে তার কিছু নিজস্ব কৌশলী চিন্তাধারা ছিল। তার কিছু কিছু নীতি-অবস্থানকে অনেকে প্রতারণা বলে অভিযুক্ত করেছেন।[২৮৩] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার সেসব অবস্থান ছিল প্রজ্ঞাপূর্ণ নববি নীতি 'যুদ্ধ হলো কৌশলের নাম'-এর যথার্থ অনুসরণ। মূলত তিনি এর মাধ্যমে বৃহত্তর সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিকে কৌশলে এড়িয়ে যেতেন। সামনে তার বিস্তারিত ইতিহাস আলোচনার সময় আমরা তার গৃহীত এ জাতীয় কিছু নীতি-কৌশল এবং সেগুলো অবলম্বনের যৌক্তিকতা তুলে ধরব।

তিনি তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তিকেও মূল্যায়ন করতেন এবং সে ধূর্ত ও অসৎ হলেও তার থেকে উপকৃত হতে চেষ্টা করতেন। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আক সুনকুর আল-বুরসুকির মৃত্যুর পর জাওলি নামক জনৈক মামলুক মসুলের ক্ষমতা হস্তগত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে ইমাদুদ্দিন জিনকি উক্ত পদ লাভ করেন। দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তিনি জাওলির সঙ্গে আচরণেও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দেন এবং তাকে সবকিছু থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে আলেপ্পোর রাহবা অঞ্চলের জায়গিরের দায়িত্ব প্রদান করেন।[২৮৪] এর

---

২৮০. ইমাদুদ্দিন খলিল, *ইমাদুদ্দিন জিনকি*, পৃষ্ঠা : ২২৭।

২৮১. দেখুন: আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩০২।

২৮২. মুহাম্মাদ সুহাইল তাকূশ, *তারীখুয-যিনকিয়্যীন ফিল-মাওসিলি ওয়াশ-শাম*, পৃষ্ঠা : ১১১।

২৮৩. যারা তাকে প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন, তাদের মাঝে ইবনুল আদিমও আছেন। দেখুন: *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৭৩।

২৮৪. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ৩৪।

মাধ্যমে তিনি একদিকে তাকে প্রশান্ত করে তার অনিষ্ট-আশঙ্কা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেন, অপরদিকে তার যোগ্যতা ও শক্তিকে কাজে লাগান।

দুবাইস বিন সাদাকার বিষয়ে তার গৃহীত নীতি তো আরও বিস্ময়কর। বনু মাজিদ গোত্রের নেতা দুবাইস বিন সাদাকা ছিল কট্টরপন্থী ইসনা আশারিয়া (দ্বাদশ ইমামবাদী) শিয়া মতাদর্শী। পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে, চরম সন্ত্রাসী দুবাইস বাগদাদে ব্যাপক নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিল এবং খলিফাকে পদচ্যুত করার চেষ্টা চালিয়েছিল। সে ক্রুসেডারদের সঙ্গেও সহযোগিতা বিনিময় করত। সর্ববিচারেই সে ছিল একজন ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট লোক। এতৎসত্ত্বেও ইমাদুদ্দিন জিনকি তাকে দামেশকের কারাগার থেকে মুক্ত করে আনেন এবং তাকে খলিফার কাছে সমর্পণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।[২৮৫] বরং তিনি দুবাইসকে একটি জায়গিরের তত্ত্বাবধান-দায়িত্বও প্রদান করেন। ইমাদুদ্দিন জিনকির লক্ষ্য ছিল এর মাধ্যমে বিশাল বনু মাজিদ গোত্রকে নিয়ন্ত্রণ করা। তিনি বিভিন্নজনের সঙ্গে বিদ্যমান দুবাইসের সম্পর্ক ও দুবাইসপ্রদত্ত বিভিন্ন তথ্য দ্বারাও উপকৃত হতেন। সেলজুক সুলতান মাসউদ একবার ইমাদুদ্দিন জিনকির বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র করলে দুবাইস তা ইমাদুদ্দিনকে জানিয়ে দেয়। সুলতান মাসউদ যখন জানতে পারেন যে, দুবাইস বিন সাদাকাই তার গোপন ষড়যন্ত্র প্রকাশ করে দিয়েছে, তখন তিনি দুবাইসকে হত্যার নির্দেশ দিলে তাকে হত্যা করা হয়।[২৮৬] এ সংবাদ জানার পর ইমাদুদ্দিন জিনকি মন্তব্য করেন, 'আমরা তাকে অর্থের বিনিময়ে (বন্দিদশা থেকে) মুক্ত করেছিলাম; আর সে প্রাণের বিনিময়ে আমাদের রক্ষা করল!'[২৮৭]

তিনি তার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনকারী নেতাদের লালসা ও চাহিদা অনুমান করতে পারতেন এবং তাদেরকে তাদের প্রত্যাশিত বস্তু দিয়ে তুষ্ট রাখতেন। এর মাধ্যমে তিনি তাদের আনুগত্য ও বশ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতেন। যদিও অনেক সময়ই এসব সম্পর্ক হতো উত্তেজনাপূর্ণ ও অস্বাভাবিক।

---

২৮৫. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৫৮-২৫৯।

২৮৬. ইবনুল জাওযি, *আল-মুনতাজাম*, ১০/৫৩।

২৮৭. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৫০।

সৈন্যদের সঙ্গে তার আচরণনীতি ছিল কৌশলী ও ফলদায়ক। তিনি এক্ষেত্রে 'উদ্বুদ্ধকরণ-ভীতকরণমূলক যৌথ নীতি'র চমৎকার প্রয়োগ ঘটাতেন। যদিও তিনি তাদের বেতন-ভাতা বাড়িয়ে দিতেন, তাদের সঙ্গে কোমল ও হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করতেন; কিন্তু তার শাস্তিও ছিল কঠিন। তিনি কখনো দায়িত্ব পালনে অবহেলা মেনে নিতেন না। একবার তিনি জানতে পারেন যে, তার জনৈক সেনাপতি নারীদের সঙ্গে অসদাচরণ করেছে। তিনি তখন সসৈন্য দূরের সফরে ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি লোক পাঠিয়ে অভিযুক্ত সেনাপতিকে বরখাস্ত করেন এবং তার যাবতীয় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন। বরং এরপর যখন তিনি জানতে পারেন যে, বিষয়টি সরাসরি উত্ত্যক্ত করা পর্যন্ত গড়িয়েছিল, তখন তিনি তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের নির্দেশ দেন।[(২৮৮)] এরপর তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, 'দূর-দূরান্তের সফরে আমার সেনারা আমার সঙ্গে থাকে; খুব সামান্য সময় তারা পরিবারের সঙ্গে কাটানোর সুযোগ পায়। আমি যদি তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের পরিবারের ওপর কারও অন্যায় হস্তক্ষেপে বাধা প্রদান না করি, তাহলে তো পরিবারগুলো শেষ হয়ে যাবে।'[(২৮৯)]

এমন কঠোর শাস্তি দেখার পর ইমাদুদ্দিন জিনকির পুরো শাসনামলে আর কেউ নারীদের উত্ত্যক্ত করার দুঃসাহস দেখায়নি।

এ ঘটনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, একদিকে তিনি সৈন্যদের পরিবারের প্রতি নিষ্ঠাপূর্ণ দরদ প্রকাশ করে এবং তাদের কল্যাণ বিবেচনায় একজন সেনাপতিকে বরখাস্ত করে সৈন্যদের মন জয় করে নিয়েছেন, অপরদিকে একই সঙ্গে যে তার নির্দেশ অমান্য করবে, শরিয়তের সীমা লঙ্ঘন করবে এবং অন্যায় কাজে জড়াবে, তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের সতর্কবাণীও শুনিয়ে দিয়েছেন।

ইমাদুদ্দিন জিনকির রাজনৈতিক প্রজ্ঞা নিয়ে আলোচনা শেষ হওয়ার নয়। পরিস্থিতি যত নাজুক ও জটিল হোক, আল্লাহ-প্রদত্ত তাওফিকে তিনি তার সর্বোত্তম সমাধান বের করে ফেলতেন। তর্কাতীতভাবেই তিনি ছিলেন উম্মাহর ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ, মহান ও প্রজ্ঞাবান রাজনীতিবিদ।

---

২৮৮. আবু শামা আল-মাকদিসি, *আর-রাওযাতাইন ফি তারীখিদ দাওলাতাইন আন-নূরিয়া ওয়াস-সালাহিয়া*, ১/১৬১।

২৮৯. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ৮৪।

[নয়] ব্যক্তিত্ব নির্ণয় যোগ্যতা

যদিও ব্যক্তিত্ব নির্ণয় ও মানুষ চিনতে পারার যোগ্যতা একজন নেতা ও শাসকের জন্য অন্যতম প্রয়োজনীয় গুণ; কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, এটি অতি বিরল ও সর্বজনকাম্য একটি গুণ। এক্ষেত্রেও ইমাদুদ্দিন জিনকি ছিলেন অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তিনি মানুষের ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতা অনুমান করতে পারতেন; উত্তম গুণাবলি ও বিরল প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিদের চিনে নিয়ে তাদেরকে কাছে টেনে নিতেন এবং দুষ্টচিত্ত ও দুর্বল যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের চিনে নিয়ে তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। এর ফলে তার চারপাশে কিছু সৎ ও যোগ্য সঙ্গী সমবেত হয়েছিল এবং এর প্রভাবে তার রাজ্য ও প্রশাসন শক্তিশালী ও সুসংহত হয়েছিল।

তার ব্যক্তি চেনার উদাহরণ হিসেবে এটাই যথেষ্ট যে, তিনি তার প্রশাসনের জন্য বেছে নিয়েছিলেন জামালুদ্দিন ইস্পাহানি রহ.-এর মতো ব্যক্তিকে। তাকে তিনি নুসায়বিন[২৯০] অঞ্চলের জায়গির প্রদান করেন। জামালুদ্দিন ইস্পাহানি ছিলেন সমকালীন শ্রেষ্ঠতম আলিম। মহত্ত্ব ও অধিক দানশীলতার কারণে তার উপাধি হয়ে গিয়েছিল 'জাওয়াদ' (অতি বদান্য)। জনগণ যখন কোনো দুর্যোগের শিকার হতো, তখন তিনি তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে এত বেশি খরচ করতেন যে, আল্লাহ তাআলা এর ওসিলায় সংকট দূর করে দিতেন।[২৯১] তিনি ছিলেন মহান কল্যাণকামী ও অতি বিশ্বস্ত ব্যক্তি। শুধু ইমাদুদ্দিন জিনকিই নয়; পরবর্তী সময়ে তিনি ইমাদুদ্দিনের পুত্রদের প্রশাসনেও বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করেছেন। পিতার প্রতি আনুগত্যবোধ থেকে পুত্রদের সহযোগিতা করার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন তিনি।[২৯২]

ইমাদুদ্দিন জিনকির প্রশাসনের আরেক উজ্জ্বলতম নক্ষত্র নাসিরুদ্দিন জাকার। নাসিরুদ্দিন জাকার ছিলেন গভীর কূটনীতিজ্ঞান ও সামরিক দক্ষতার অধিকারী। তিনি মসুলে ইমাদুদ্দিন জিনকির নায়েব ছিলেন।[২৯৩]

---

২৯০. আরবি নাম نُصَيْبِيْن (নাসীবীন), ইংরেজি নাম Nusaybin (নুসায়বিন)। [সম্পাদক]

২৯১. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/ ৪৭১ ও ইবনে খাল্লিকান, *ওফায়াতুল আ'য়ান*, ৫/১৪৩-১৪৫।

২৯২. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ৮৪-৮৫।

২৯৩. ইবনে খাল্লিকান, *ওফায়াতুল আ'য়ান*, ১/৩৬৪।

প্রকৃত বিচারেই তিনি ছিলেন 'সঠিক পদে সঠিক ব্যক্তি'র উত্তম দৃষ্টান্ত। ইমাদুদ্দিন জিনকি যখন মসুলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, মসুল তখন অব্যাহত ফিতনায় বিপর্যস্ত। নাসিরুদ্দিন কৌশলে পরিস্থিতির লাগাম টেনে ধরেন, অর্থনীতির চাকা সচল ও বিন্যস্ত করেন, শান্তি ফিরিয়ে আনেন এবং নগরীর নিরাপত্তাব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন। তিনি ছিলেন ইমাদুদ্দিন জিনকির প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ত। বহুবার তিনি নিজেকে ঝুঁকির মুখে ফেলে ইমাদুদ্দিন জিনকির রাজত্ব রক্ষায় ভূমিকা রাখেন। একবার সমকালীন আব্বাসি খলিফা মসুল অবরোধ করলে তিনি পূর্ণ তিন মাস ধৈর্যের সঙ্গে অটল থেকে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন[২৯৪] এবং আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতি জানান। অথচ এ সময় খলিফা মসুলের পতন ঘটাতে পারলে হত্যাই হতো নাসিরুদ্দিনের নিশ্চিত পরিণতি। বরং পরবর্তী সময়ে নাসিরুদ্দিন জাকার জীবন দিয়েই ইমাদুদ্দিন জিনকির প্রতি তার বিশ্বস্ততার মূল্য পরিশোধ করেন। বিদ্রোহীরা ষড়যন্ত্র করে তাকে হত্যা করে এবং মসুলের ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চালায়। অবশ্য আল্লাহ তাআলা ইমাদুদ্দিন জিনকির শাসনক্ষমতা রক্ষার জন্য অন্যদের নিয়োজিত করে দেওয়ায় বিদ্রোহীদের অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়।[২৯৫]

নাসিরুদ্দিন জাকারের জুলুম ও অন্যায় রক্তপাতের যেসব বিবরণ পাওয়া যায়, তা সম্পূর্ণই ভুল বিশ্লেষণ হতে উদ্ভূত। মসুলের তৎকালীন পরিস্থিতি এবং নাসিরুদ্দিন জাকারকে ঘিরে থাকা হাজারো বিপদের প্রতি লক্ষ না করেই এসব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে গৃহীত পদক্ষেপের নাম জুলুম নয়। অপরাধী ঘাতক বা ফিতনার উসকানিদাতাকে শাস্তি হিসেবে কিসাস প্রয়োগ করার নাম অন্যায় রক্তপাত নয়।

ইবনুল কালানিসি *যায়লু তারীখি দিমাশক* গ্রন্থে নাসিরুদ্দিন জাকার সম্পর্কে বলেন, 'তার সদাচরণ ও ন্যায়বিচারের এবং জুলুম-অত্যাচার পরিহারের অনেক বর্ণনা রয়েছে।'[২৯৬] ইবনুল কালানিসি একই মর্মবাহী আরও অনেক মন্তব্য করেছেন, যা থেকে এই ফলাফলই বের হয়ে আসে

২৯৪. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৭০।
২৯৫. ইবনে খাল্লিকান, *ওফায়াতুল আ'য়ান*, ১/৩৬৫।
২৯৬. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ২৭৫।

যে, নাসিরুদ্দিন জাকারের গৃহীত নীতি ও পন্থা ছিল প্রশংসনীয় এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল সরল ও সঠিক।

ইমাদুদ্দিন জিনকির আরেক উজির ছিলেন জিয়াউদ্দিন আবু সাঈদ ইবনুল কাফারতুসি। ঐতিহাসিকদের ভাষ্য অনুসারে তিনি ছিলেন সদাচারী, প্রজ্ঞাবান, মহৎ ও অভিজাত এবং সন্তোষজনক রাজনৈতিক বিবেচনাবোধের অধিকারী। ব্যক্তি ও নেতা হিসেবেও তিনি ছিলেন স্বনামধন্য।[২৯৭]

ইমাদুদ্দিন জিনকির প্রশাসনের আরেক সমুজ্জ্বল ব্যক্তি ছিলেন যায়নুদ্দিন আলি কাজাক বিন বুকতেকিন। দেখুন ঐতিহাসিক ইবনুল আছির তার সম্পর্কে কী মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, 'যায়নুদ্দিন ছিলেন সৎ ও সদাচারী; রণদক্ষতা, বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতায় খ্যাতিমান; দরিদ্র-অসহায়দের প্রতি দয়ার্দ্র্য এবং অসুস্থদের প্রতি সহানুভূতিশীল। অঙ্গীকার ও আমানত রক্ষায় তার প্রসিদ্ধি ছিল। কখনো প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতকতা করতেন না।'[২৯৮]

এভাবে কজনের নাম উল্লেখ করব! এগুলো অনেকজনের মাঝে কয়েকজনের উদাহরণমাত্র। ইমাদুদ্দিন জিনকির প্রশাসনের সকল নায়েব, সেনাপতি ও উজিরের আলোচনা করার মতো বিস্তৃত ক্ষেত্র এটি নয়।

এমনই ছিল ইমাদুদ্দিন জিনকির প্রশাসন! এরাই ছিলেন তার ঘনিষ্ঠজন এবং তার রাজ্যের প্রশাসনিক কর্মকর্তা!

তিনি কখনো সুযোগ হাতছাড়া করতেন না; বরং প্রজ্ঞাপূর্ণ কৌশলে যোগ্য ও উপযুক্ত লোকেদের সংগ্রহ করে নিতেন এবং সুনিপুণ দক্ষতায় তাদের সক্ষমতা কাজে লাগাতেন। তিনি একবার জানতে পারেন যে, দামেশকের জনৈক সেনাপতি পালিয়ে গেছে। দামেশক সব সময়ই ইমাদুদ্দিনের প্রতি চূড়ান্ত শত্রুভাবাপন্ন ছিল। পলাতক সেই সেনাপতি ছিলেন সিওয়ার বিন আবতেকিন। ইমাদুদ্দিন তার যোগ্যতা ও দক্ষতার কথা শুনেছিলেন। তিনি তাকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন এবং আস্থাভাজন করে নেন। যদিও সিওয়ার বিন আবতেকিন তখন অসহায় অবস্থায় ছিলেন; কিন্তু

---

২৯৭. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৭৪ ও ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৫৪।

২৯৮. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ১৩৫।

ইমাদুদ্দিন জিনকি তার মর্যাদা হ্রাস করার পরিবর্তে তাকে সমুন্নত পদমর্যাদা প্রদান করেন। তিনি তাকে অনেকগুলো জায়গির প্রদান করেন; বরং আলেপ্পো ও তৎসংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রশাসনিক দায়িত্ব তার হাতে তুলে দেন। তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সিওয়ার বিন আবতেকিনের ওপর আস্থা রাখতেন।

সিওয়ার বিন আবতেকিনের অত্যুচ্চ সামরিক ও প্রশাসনিক দক্ষতা ছিল।[২৯৯] সিওয়ার বিভিন্ন যুদ্ধে এবং আলেপ্পোর নিরাপত্তা রক্ষায় ইমাদুদ্দিন জিনকির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ৫২৪ হিজরি সনে দামেশক থেকে পালিয়ে আসার পর থেকে ৫৪১ হিজরি সনে ইমাদুদ্দিন জিনকি নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ সতেরো বছর সিওয়ার স্বপদে বহাল ছিলেন।[৩০০]

ইমাদুদ্দিন জিনকি যেমন মানুষ চিনতেন, তেমনই মানুষের যথাযথ মূল্যায়ন করতেন এবং উপযুক্ত ভাতা নির্ধারণ করতেন। তিনি কামালুদ্দিন শাহরাযুরিকে বছরে দশ হাজার দিনারের বিরাট অঙ্কের ভাতা প্রদান করতেন। একবার তাকে বলা হলো, 'কামালুদ্দিনের বার্ষিক আয় দশ হাজার দিনারের উর্ধ্বে। অথচ অন্যরা তো পাঁচশ দিনারেই তুষ্ট থাকে।' তিনি উত্তর দিলেন, 'এই বুদ্ধি নিয়ে তোমরা আমার রাজ্য চালাও?! আরে! কামালুদ্দিনের জন্য তো এটিও অনেক কম আর অন্যদের জন্য পাঁচশ দিনারও বেশি। কামালুদ্দিনের সম্পাদিত একেকটি কাজ এক লক্ষ দিনার হতেও উত্তম।'[৩০১]

ইমাদুদ্দিন জিনকি কারও ব্যক্তিত্ব নির্ণয়ে দ্বিধান্বিত হলে তাকে পরীক্ষা করে দেখতেন, সে নেতৃত্ব ও আমানত রক্ষার যোগ্য কি না। এ সম্পর্কিত একটি চমকপ্রদ ঘটনা হলো, তিনি একবার তার পরিচ্ছদ-কর্মকর্তার বিশ্বস্ততা, কর্মস্বচ্ছতা ও কাজের প্রতি গুরুত্ব যাচাই করার মনস্থ করলেন। তিনি লোকটিকে পেস্তা ও বাদামের তৈরি একটি পিঠা দিয়ে বললেন, 'এটা যত্ন করে রাখবে; আমি যেকোনো সময় চাইতে

২৯৯. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ২৪০-২৪১।

৩০০. ইমাদুদ্দিন খলিল, *ইমাদুদ্দিন জিনকি*, পৃষ্ঠা : ২৪৬।

৩০১. আবু শামা আল-মাকদিসি, *আর-রাওযাতাইন ফি তারীখিদ দাওলাতাইন আন-নুরিয়া ওয়াস-সালাহিয়া*, ১/১৫৯-১৬০।

পারি।' পূর্ণ এক বছর পর তিনি লোকটিকে ডেকে পাঠালেন এবং পিঠাটি চাইলেন। লোকটি তার সঙ্গে থাকা একটি রুমাল থেকে পিঠাটি বের করে দিল। সে বিশেষ এক পদ্ধতিতে এক বছর ধরে পিঠাটি সংরক্ষণ করেছিল। ইমাদুদ্দিন খুশি হয়ে তাকে মসুলের 'কাওয়াশা' দুর্গের দায়িত্ব প্রদান করলেন।[৩০২]

এভাবেই ইমাদুদ্দিন জিনকি তার রাজ্যের বিভিন্ন বিষয় পরিচালনা করতেন। নিঃসন্দেহে যোগ্যতা, দক্ষতা ও কৌশলগত সক্ষমতার এরূপ যুগপৎ সমাবেশ খুব কম লোকের মধ্যেই হয়।

[দশ] সমুন্নত প্রশাসনিক দক্ষতা

দক্ষ জনবল নির্বাচন ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পাশাপাশি এটিও একটি অপরিহার্য গুণ। একজন শাসক অনেক সময় রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবলে দক্ষ কূটনীতির মাধ্যমে শত্রুর মন জয় করে নেন এবং তাদের আনুগত্য সম্পর্কে নিশ্চিত হন; কিন্তু প্রশাসনিক দক্ষতার অভাবে তিনি রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের যথার্থ বিন্যাসে ব্যর্থ হন। রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পাশাপাশি যদি তার প্রশাসনিক দক্ষতাও থাকত, তাহলে তিনি এমন সুদৃঢ় প্রশাসন প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হতেন, যা পরিস্থিতির সাময়িক জটিলতায় প্রভাবিত হতো না এবং সামান্য চেষ্টা ও স্বল্প ক্ষতির বিনিময়ে তার পক্ষে বৃহৎ কল্যাণ বাস্তবায়ন সম্ভব হতো।

ইমাদুদ্দিন জিনকি ছিলেন প্রথম স্তরের প্রশাসনিক ব্যক্তি। যদিও তিনি সিদ্ধান্ত ও শাসনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়করণ নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন; কিন্তু এ নীতি তিনি কেবল রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্পৃক্ত জন-ভাগ্যনির্ধারক বিষয়ের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করতেন। সাচিবিক, প্রাদেশিক ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি অধীনস্থ ও সহকারীদের ব্যাপক কর্মস্বাধীনতা প্রদান করতেন। তিনি তাদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষমতা দিয়েছিলেন। পাশাপাশি তিনি তাদেরকে সমাজ ও জনমানুষের কল্যাণে উদ্ভাবনী চিন্তা-পরিকল্পনা করতেও আস্থা জোগাতেন। তিনি অধীনস্থদের যথাসম্ভব কম তিরস্কার করতেন। ফলে তারা দায়িত্ববোধে অনুপ্রাণিত হতো এবং অনুভব করত যে, এ রাষ্ট্র তাদের

৩০২. ইবনে ওয়াসিল, *মুফাররিজুল কুরূব*, ১/১০৩।

নিজেদের রাষ্ট্র। এ কারণেই তারা রাষ্ট্রের উন্নতির প্রয়োজনে জীবন দিতেও প্রস্তুত থাকত।

ইমাদুদ্দিন জিনকি পারতপক্ষে প্রশাসনে রদবদল ঘটাতেন না। ফলে সকলে নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগ চিত্তে কাজ করতে পারত; প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড ও সামাজিক পরিস্থিতিও স্থিতিশীল থাকত।[৩০৩]

ইমাদুদ্দিন জিনকি তথ্য সংগ্রহে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। তার পক্ষ থেকে রাষ্ট্রের প্রতিটি কেন্দ্রে এমনকি পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতেও প্রতিনিধি ও গুপ্তচর নিয়োজিত থাকত। ফলে ছোট-বড় প্রতিটি তথ্য তার নখদর্পণে থাকত। আর তাই তিনি সময়-সুযোগ শেষ হয়ে যাওয়ার পর আকস্মিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন, এমনটি খুব কমই ঘটেছে। বরং সব সময়ই তিনি কোনো বিষয় জটিল আকার ধারণ করার পূর্বেই তা সম্পর্কে অবগত হয়ে যেতেন এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন।[৩০৪]

ইমাদুদ্দিন জিনকির সূক্ষ্ম নজরদারি ও দক্ষ তথ্যসরবরাহ-ব্যবস্থার কারণে অন্য কোনো রাজ্যের আমির বা শাসকের পক্ষে তার অজ্ঞাতসারে তার রাজ্যসীমায় পা রাখা ছিল কার্যত অসম্ভব। অথচ সে যুগে বর্তমানের মতো রাজ্যসীমা সুস্পষ্ট নির্ধারিত থাকত না। তার অনুমতি ছাড়া কোনো দূত তার রাজ্য অতিক্রমের সাহস করত না। বহিঃরাষ্ট্রের কোনো দূত আগমন করলে সে জিনকি রাষ্ট্রে প্রবেশ করার পর থেকে প্রস্থান করা পর্যন্ত জিনকি প্রশাসনের একদল কর্মকর্তা তার সঙ্গে থাকত। ফলে দূতের পক্ষে স্বাধীনভাবে রাজ্যের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করে গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্য সংগ্রহ ও পাচার করার সুযোগ হতো না।[৩০৫]

ইমাদুদ্দিন জিনকি তার নিজস্ব সম্পদ ও রাষ্ট্রীয় সকল সম্পদ নির্দিষ্ট একটি কেন্দ্রে রাখতেন না; বরং আলেপ্পো, মসুল ও সিনজার এই তিন স্থানে বিভক্ত করে রাখতেন। তিনি বলতেন, 'যদি তিন কেন্দ্রের কোনো

---

৩০৩. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৮৪।

৩০৪. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ৭৮ ও আবু শামা আল-মাকদিসি, *আর-রাওযাতাইন ফি তারীখিদ দাওলাতাইন আন-নূরিয়া ওয়াস-সালাহিয়া*, ১/১১১।

৩০৫. ইমাদুদ্দিন খলিল, *ইমাদুদ্দিন জিনকি*, পৃষ্ঠা : ২০৯।

একটিতে দুর্ঘটনা ঘটে বা আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তখন আমি ক্ষতিপূরণের জন্য অন্য দুটির সহায়তা গ্রহণ করতে পারব।'[৩০৬]

তিনি যোগাযোগ ও ডাকব্যবস্থা সহজ ও নিরাপদ করায় সচেষ্ট ছিলেন। তিনি এ বিষয়টি পূর্ণ উপলব্ধি করতেন যে, দ্রুত তথ্য সরবরাহ অনেক সময় একটি রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে পারে বা যুদ্ধে জয় এনে দিতে পারে।

ইমাদুদ্দিন জিনকি পেশাগত বিশেষজ্ঞতার প্রতিও যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। তিনি সামরিক দক্ষতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তিকে প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রদান করতেন না; কোনো আলিমকে দিতেন না সামরিক পদ। বাইরে থেকে কোনো যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হলে প্রথমে তিনি তাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠাতেন। তারা উপযুক্ত পদে দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বেই লোকটিকে রাজ্য ও জনগণ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানদান করত। উদাহরণস্বরূপ সে যোদ্ধা বা সামরিক বিশেষজ্ঞ হলে তাকে সৈন্যদের কাছে পাঠানো হতো এবং সে জিনকি রাজ্যে অনুসৃত সমরনীতি জেনে নিত। দাপ্তরিক দায়িত্বে উপযুক্ত ব্যক্তিকে পাঠানো হতো সচিবদের কাছে, আলিম হলে পাঠানো হতো কাজিদের কাছে। এভাবে একজন নব-আগন্তুক ব্যক্তিকে সব ধরনের সহায়তা করা হতো। ঐতিহাসিক আবু শামা এ সম্পর্কে বলেন, 'এর ফলে লোকটি যেন নগরবাসীদের একজন হয়ে যেত!'[৩০৭] অর্থাৎ এভাবে গঠনমূলক প্রশিক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের ফলে নব-আগন্তুক অপরিচিত ব্যক্তিও জ্ঞানে-অভিজ্ঞতায় এমন উপযুক্ত হয়ে উঠত, যেন সে এ নগরীরই অধিবাসী; বাইরের কেউ নয়। বলাবাহুল্য, লোকটি সামরিক-প্রশাসনিক বা জ্ঞান-শাস্ত্র যে অঙ্গনেই পারদর্শী হোক, তার কর্মসংস্থান অনেক বেশি সহজ ও লাভজনক হতো। বিশেষত এ তথ্যটিও এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, ইমাদুদ্দিন জিনকির শাসনামলে বেতন-ভাতা ছিল অনেক বেশি।

ইমাদুদ্দিন জিনকি সর্বদা বিকল্প পরিকল্পনা প্রস্তুত রাখতেন। তিনি যেকোনো ক্ষেত্রে সম্ভাব্য মন্দ ফলাফলটি নির্ণয় করে তা প্রতিরোধের

---

[৩০৬]. শাকির আহমাদ আবু যায়দ, *আল-হুরূবুস সালিবিয়্যাহ ওয়াল উসরাতুয যিনকিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ১৬৭।

[৩০৭]. আবু শামা আল-মাকদিসি, *আর-রাওযাতাইন ফি তারীখিদ দাওলাতাইন আন-নুরিয়া ওয়াস-সালাহিয়া*, ১/১৬৩।

প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তিনি মসুলের দায়িত্ব লাভের পর মসুলে প্রবেশের পূর্বে তিকরিত দুর্গের নিকটস্থ বাওয়াজিয জনপদে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেশ্য ছিল, মসুলবাসী যদি কোনো ধরনের বিদ্রোহের প্রচেষ্টা চালায়, তাহলে যেন তাৎক্ষণিক নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণের ব্যবস্থা থাকে।[৩০৮] অথচ মসুলবাসীর বিদ্রোহের সম্ভাবনা ছিল সুদূরপরাহত!

ইমাদুদ্দিন জিনকি প্রশাসনিক স্তর ও ধারাক্রমের প্রতিও পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কেউ যদি নিজের এক ধাপ উপরস্থ কর্মকর্তাকে অতিক্রম করে সর্বোচ্চ স্তরে যোগাযোগের চেষ্টা করত, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করতেন। এ নীতির উপকার ছিল বহুবিধ। এতে অধস্তন কর্মচারীদের ওপর উপরস্থ কর্মকর্তার প্রভাব বজায় থাকত এবং কাজের গতি ও সূক্ষ্মতা বজায় থাকত। কারণ, স্বভাবতই উপরস্থ কর্মকর্তা যেসব তথ্য জানেন, সর্বোচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা তা পুরোপুরি জানেন না। এ নীতি অবলম্বনের কারণে সর্বোচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাকে সব বিষয়ে মাথা ঘামাতে হতো না বলে তার সময়ও অনেক বেঁচে যেত। এই নীতির আরেকটি কল্যাণ হলো, এর ফলে নির্দিষ্ট এক ব্যক্তির ওপর নির্ভর করতে হতো না; বরং সর্বোচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতেও অন্যদের মাধ্যমে সহজে দ্রুত কর্ম সম্পাদনের নিশ্চয়তা থাকত।

এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা হলো, একদিন ইমাদুদ্দিন জিনকি দেখতে পেলেন তার বিশেষ নিরাপত্তাপ্রহরীদের একটি দল একত্র হয়ে এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, যেন তিনি তাদেরকে দেখতে পান। তিনি বুঝতে পারলেন, তারা তার কাছে কোনো বিষয়ে অভিযোগ জানাতে চায়। নিরাপত্তারক্ষীরা জানাল যে, নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হলেও এখনো তাদের ভাতা প্রদান করা হয়নি। ইমাদুদ্দিন জিনকি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা অর্থসচিবের কাছে অভিযোগ জানিয়েছ?' তারা বলল, 'না।' তিনি এবার প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে হাজিব (রাজকীয় নিরাপত্তাবাহিনীর প্রধান)-কে বিষয়টি জানিয়েছ?' তারা এবারও উত্তর দিল, 'না, তাকেও জানাইনি।' তখন তিনি বললেন, 'ছোট-বড় যাবতীয় বিষয় যদি আমাকেই দেখতে হয়, তাহলে অর্থসচিবকে কেন এক লক্ষ দিনার প্রদান করা হচ্ছে?! কেন হাজিবকে আরও বড় অঙ্কের ভাতা প্রদান

৩০৮. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৪৩।

করা হচ্ছে?! তোমাদের উচিত ছিল প্রথমে অর্থসচিবকে জানানো। তিনি গড়িমসি করলে তোমরা হাজিবকে জানাতে পারতে। হাজিবও কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে সবশেষে আমার কাছে আসতে। আমি তাদের অবহেলার যথোপযুক্ত শাস্তি দিতাম। কিন্তু এখন তো তোমরাই অপরাধী!' উপস্থিত জনৈক আমির তাদের জন্য সুপারিশ না করলে তিনি হয়তো প্রশাসনিক ধারাভঙ্গের কারণে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করতেন।

তবে প্রহরীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হলেও তিনি বিষয়টি এভাবেই ছেড়ে দেননি; বরং তৎক্ষণাৎ তিনি অর্থসচিব ও প্রধান প্রহরীকে ডেকে পাঠালেন এবং তাদেরকে বললেন, 'এসব প্রহরী সব সময় আমার সঙ্গে থাকে, সফরে আমার সফরসঙ্গী হয়, রাজ্যে অবস্থানকালেও আমার আশেপাশে থাকে। আর তারা সফরে থাকা অবস্থায় তাদের যে খোরপোষের প্রয়োজন হয়, তাও আপনারা জানেন। তাদের বেতন-ভাতা প্রদানে যদি আপনারা এরূপ অবহেলা করেন, তাহলে যারা আমার কাছে থাকে না, তাদের সঙ্গে আপনাদের আচরণ কেমন?!'

অর্থসচিব ও হাজিব পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধি করতে পারলেন। তখনও সরকারি কোষাগার থেকে প্রহরীদের বেতন-ভাতা তাদের কাছে পৌঁছেনি। তাই হাজিব নিজের সম্পদ থেকেই তাদের পাওনা পরিশোধ করে দিয়ে কোষাগার থেকে ভাতা আসার অপেক্ষায় থাকলেন।

ঐতিহাসিক ইবনুল আছির রহ. ইমাদুদ্দিন জিনকির এই চমৎকার ভূমিকা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, 'এর মাধ্যমে তিনি একদিকে সৈন্যদেরকে অর্থসচিবের আনুগত্যের বিষয়ে সংশোধন করেন, অপরদিকে অর্থসচিবকেও সৈন্যদের স্বার্থের প্রতি খেয়াল রাখার বিষয়ে সংশোধন করেন। পাশাপাশি তার ব্যক্তিত্ব যে এ জাতীয় তুচ্ছ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হতে ঊর্ধ্বে, এ বিষয়টিও তিনি সকলকে বুঝিয়ে দেন।'[৩০৯]

আল্লাহ তাআলা মহান আদর্শপুরুষ ইমাদুদ্দিন জিনকির প্রতি রহম করুন। তিনি একাই এক সম্প্রদায়ের প্রতীক ছিলেন। উম্মাহর ইতিহাসের সেই যুগসন্ধিক্ষণে আল্লাহ তাআলা তাকে নির্বাচন করেছিলেন উম্মাহর হৃত গৌরব ও হারানো প্রভাব ফিরিয়ে আনতে; দ্বীনের পতাকা সমুন্নত করতে

---

৩০৯. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ৮৩।

এবং জাতির মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে। প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন 'প্রজন্মপুরুষ'।

প্রিয় পাঠক, পরবর্তী জানার বিষয়—বিভক্ত জাতিকে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে ঐক্যের শক্তি পুনরুদ্ধার করতে এবং ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ হতে কী ছিল তার কর্মপরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি?

সামনের পরিচ্ছেদে আমরা এ বিষয়ে অবগত হব, ইনশাআল্লাহ!

* * *

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ইমাদুদ্দিন জিনকি ও উম্মাহর বিনির্মাণ

ইমাদুদ্দিন জিনকি তার অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব মসুলের শাসনভার গ্রহণের জন্য রওনা হন। মসুল ছিল সমকালীন মুসলিম বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ, বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ রাজ্য। মসুলের কৌশলগত অবস্থানও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যটির অবস্থান ছিল একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ত্রিভুজের মাঝে। রাজ্যটি ইরাক ও আব্বাসি খিলাফত, বৃহত্তর সেলজুক সাম্রাজ্যের মূলকেন্দ্র পারস্য ও উত্তপ্ত শাম অঞ্চলের মাঝে পার্থক্যরেখা হিসেবে বিবেচিত হতো। তবে কেবল এসব কারণেই ইমাদুদ্দিন জিনকির দায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এর মূল কারণ হলো, মসুল ছিল সামগ্রিকভাবে ক্রুসেড আধিপত্যের ভয়ংকর ও ভীতিপ্রদ দুঃস্বপ্ন থেকে মুসলমানদের মুক্তির আশা ও ভরসার স্থল।

এমতাবস্থায় মসুলের দায়িত্ব কোনো সহজ কাজ ছিল না। সাফল্যের পথে ছিল নানা রকম প্রতিবন্ধকতা। ফলে যিনি এ পদে আসবেন, তার থাকতে হবে মুসলিম বিশ্বের হাল-হাকিকত সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি, জিহাদ, রাজনীতি ও রাষ্ট্রপরিচালনা বিষয়ে অগাধ জ্ঞান এবং আপতিত সকল অপ্রত্যাশিত দুর্যোগ প্রতিরোধের পূর্ণ যোগ্যতা। ইমাদুদ্দিন জিনকিই ছিলেন সেই প্রত্যাশিত পুরুষ।

সমকালীন শক্তিশালী পক্ষসমূহ

ইমাদুদ্দিন জিনকি তার কাজ শুরু করেন। মসুলে পৌঁছার পূর্বেই তিনি চলমান পরিস্থিতি ও ঘটনাপ্রবাহে সামগ্রিকভাবে দৃষ্টি বোলান। বর্তমানের ভাষায় বললে—তিনশ ষাট ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে দর্শনযোগ্য দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তিনি পুরো অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করেন। ফলে পুরো অঞ্চলের ছোট-বড় সবকিছু তার নখদর্পণে এসে যায়।

আসুন, ইমাদুদ্দিন জিনকির সঙ্গে আমরাও নতুন পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা করি এবং অনুমান করার চেষ্টা করি—তার চিন্তাধারা কেমন হতে পারে? তার দৃষ্টিতে অগ্রাধিকারযোগ্য কাজ কী ছিল? কী হতে পারে তার কর্মপরিকল্পনা? আর কেমন ছিল সে সময় এ অঞ্চলে বিদ্যমান শক্তিশালী পক্ষগুলোর শক্তির মাত্রা?

[এক] সেলজুক সুলতান মাহমুদ

সমকালীন মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি তখন সেলজুক সুলতান মাহমুদ। তার নিবাস ছিল ইস্পাহানে। বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ছিল; যার মাঝে ইরান এবং বাগদাদ ও মসুলসহ ইরাকও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আলেপ্পোর ওপরও তার নিয়ন্ত্রণ ছিল। তা ছাড়া তিনিই মূলত ইমাদুদ্দিনকে মসুলের প্রশাসক পদে অধিষ্ঠিত করেছেন। এসব কারণে তার সঙ্গে ইমাদুদ্দিন জিনকির মিত্রতা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক প্রত্যাশিতই ছিল।[৩১০]

ইমাদুদ্দিন জিনকি যখন মসুলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, সুলতান মাহমুদের বয়স তখন তেইশ বছর। তিনি ছিলেন জ্ঞানী, সহনশীল, মহৎ ও সংযমী একজন শাসক।[৩১১] অবশ্য পিতা সুলতান মুহাম্মাদ ও পূর্বপুরুষদের মতো সমুন্নত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা তার ছিল না।

[দুই] আব্বাসি খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহ

আব্বাসি খিলাফতের মসনদে তখন সমাসীন খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহ। তিনি যদি আব্বাসি খিলাফতের প্রতাপকালীন সময়ে আগমন করতেন, নিঃসন্দেহে প্রভূত মর্যাদা ও কীর্তির অধিকারী হতেন। কিন্তু এমন এক আমলে তিনি খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন, যখন আব্বাসি খিলাফত মুমূর্ষু কাল অতিবাহিত করছে। খিলাফত তখন পুরোপুরি সেলজুক পরিবার নিয়ন্ত্রিত ছিল। অবশ্য মুসতারশিদ বিল্লাহ মাঝেমধ্যেই খিলাফতের অধিকার ও প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধারে প্রচেষ্টা চালান। পূর্বেও আমরা উল্লেখ করেছি, ইমাদুদ্দিন মসুলের দায়িত্ব গ্রহণের অল্প কয়েক মাস পূর্বেও তিনি

---

৩১০. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৪২-২৪৩ ও *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা :৩২-৩৪।

৩১১. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৫৯।

সুলতান মাহমুদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়েছিলেন। কিন্তু তখন সুলতান মাহমুদের কাছে পরাজিত হয়ে তার অপারগতা মেনে নিতে হয়। এ ঘটনা স্পষ্টতই ইমাদুদ্দিন জিনকির সঙ্গে খলিফার সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ইমাদুদ্দিন জিনকি যদিও কারও সঙ্গে শত্রুতা বা বিদ্বেষ কামনা করতেন না; কিন্তু এ পর্যায়ে অবশ্যই তিনি সুলতান মাহমুদকে অগ্রাধিকার দেবেন, এরপর খলিফা বা অন্য কাউকে। এ বিষয়টিও ইমাদুদ্দিন জিনকির চিন্তায় ছিল যে, খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহ যেকোনো সুযোগে কোনো একদিন তাকে কষ্ট দিতে পারেন। কারণ, ইমাদুদ্দিন জিনকির সঙ্গে সুলতান মাহমুদের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের কথা খলিফা ভালো করেই জানেন।

[তিন] মসুল নগরী

মসুল তখন তরঙ্গায়িত ফিতনায় অস্থির কাল অতিক্রম করছে। রাজ্যটির নিরাপত্তাব্যবস্থা তখন অত্যন্ত নাজুক। বছরখানেক পূর্বেই সেখানে বলতে গেলে বিনা বাধায় অতি সহজে বাতিনি ঘাতকদের হাতে আক সুনকুর আল-বুরসুকির মতো প্রশাসক নিহত হয়েছেন।[৩১২] এমন চরম নিরাপত্তাহীনতার কারণে বিভিন্ন রকম দুর্যোগ সৃষ্টি হয়েছিল। বাণিজ্যিক গতিময়তা ক্রমশ লোপ পাচ্ছিল। সন্ত্রাসী ও দুশ্চরিত্র লোকেরা ছড়িয়ে পড়েছিল। সাধারণ জনতা চলাফেরা করতে ভয় পেত, শঙ্কিত থাকত সম্পদের নিরাপত্তা নিয়ে। এসব দিক বিবেচনায় ইমাদুদ্দিন জিনকির মসুলে আগমন মোটেও নিরাপদ ছিল না।

[চার] মসুলের জনগণ

একটি নির্দিষ্ট নগরী বা রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হলো তার জনগণ। অথচ এ বিষয়টি অনেক বিশ্লেষকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। আমরা পূর্বেও বারবার বলেছি, তৎকালীন মসুলের জনগণ ছিল জ্ঞানানুরাগী ও জিহাদপ্রিয়। আর তাই মসুল হতে পারত একটি শক্তিশালী ও পরিপূর্ণ রাষ্ট্রের উৎকৃষ্ট বীজ। অধিকন্তু এই উপযুক্ত জনশক্তির কারণেই ভঙ্গুরপ্রায় নিরাপত্তাব্যবস্থা সত্ত্বেও মসুলের ছিল ইমাদুদ্দিন জিনকির শাসনকেন্দ্র ও রাজধানী নগরী হওয়ার যোগ্যতা। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। কারণ,

---

৩১২. প্রাগুক্ত, ৯/২৩৬।

যেসব বিষয় ইমাদুদ্দিন জিনকির কেন্দ্রীয় চিন্তা ও পরিকল্পনায় ছিল, তার অন্যতম হলো রাজধানী নগরী নির্বাচন। বিষয়টি এ কারণেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, এক্ষেত্রে মসুলই একমাত্র প্রার্থী ছিল না; বরং বিভিন্ন কারণে আলেপ্পোও ছিল রাজধানী নগরী হওয়ার অন্যতম প্রার্থী। সামনের পয়েন্টে বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে।

[পাঁচ] আলেপ্পো নগরী

বিভিন্ন কারণেই আলেপ্পো ছিল তৎকালীন সময়ের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি নগরী। সামরিক দিক থেকে নগরীটি ছিল অতি সুরক্ষিত। নগরীটির অবস্থান ছিল ইরাক ও শাম অঞ্চলের যোগাযোগপথের একেবারে সন্নিকটে। তা ছাড়া ক্রুসেডারদের বিভিন্ন শক্তিশালী দুর্গও ছিল আলেপ্পোর অতি নিকটে। আলেপ্পোর উত্তরে ছিল ক্রুসেড রাজ্য এডেসা আর পশ্চিমে ছিল আরেক ক্রুসেড রাজ্য এন্টিয়ক। অর্থনৈতিক দিক থেকেও রাজ্যটির গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ছিল। অধিকন্তু নগরীটি ছিল ঘনবসতিপূর্ণ।[৩১৩]

এসব কারণে ইমাদুদ্দিন জিনকি বিশ্বাস করতেন, এ অঞ্চলে আলেপ্পোর গুরুত্ব অনেক বেশি। তা ছাড়া আলেপ্পোবাসীর হৃদয়ে তখনও তাদের প্রয়াত শাসক ইমাদুদ্দিন জিনকির পিতা কাসিমুদ্দৌলা আক সুনকুরের কল্যাণে ভরপুর স্মৃতি জাগ্রত ছিল। এই যোগসূত্র নিঃসন্দেহে ইমাদুদ্দিনের জন্য এক ব্যাপক জনশক্তি ও গণসমর্থনের সম্ভাবনা তৈরি করেছিল।

কিন্তু একই সঙ্গে এ বিষয়টিও বিবেচনাভুক্ত ছিল যে, আলেপ্পোর জনমানস ছিল মসুলবাসীর চিন্তাধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। তুতুশ বিন আলপ আরসালান ও তার পুত্র রিজওয়ানের আমলসহ দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে আলেপ্পোর জনগণ ছিল অসৎ নেতৃত্ব, দুঃশাসন ও মন্দ পরিচর্যার শিকার। আলেপ্পোর জনসাধারণের মাঝে যদিও কল্যাণ-সম্ভাবনা অবশিষ্ট ছিল; কিন্তু পারিপার্শ্বিক বিচারে তারা ক্রুসেডবিরোধী আন্দোলনের বীজরূপে বিবেচিত হওয়ার উপযুক্ত ছিল না। অধিকন্তু আলেপ্পোর অবস্থান ছিল শক্তিশালী ক্রুসেড ঘাঁটিগুলোর নাগালে। তাই একে শাসনকেন্দ্র হিসেবে নির্বাচন করা ছিল অতি ঝুঁকিপূর্ণ। এসব কারণে ইমাদুদ্দিন জিনকির চিন্তা ও পরিকল্পনায়

---

৩১৩. ইমাদুদ্দিন খলিল, *ইমাদুদ্দিন জিনকি*, পৃষ্ঠা : ৭১।

আলেপ্পোর চেয়ে মসুলের গুরুত্ব বেশি ছিল। অবশ্য তার ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনায় উভয় নগরীরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

এ সময় আলেপ্পোর রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ছিল অত্যন্ত বিপর্যস্ত। আক সুনকুর আল-বুরসুকির পুত্র ইযযুদ্দিন মাসউদ নিহত হওয়ার পর কুতলুগ আবেহ নামক জনৈক তুর্কমেন নেতা দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। শাসক হিসেবে যদিও সে রিজওয়ান বিন তুতুশের পুত্র ইবরাহিমকে মসনদে বসিয়েছিল; কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ছিল তার হাতেই। ইবরাহিম ছিল তার পিতার মতোই দুরাচারী আর কুতলুগ আবেহ ছিল তার চেয়েও বড় দুরাচারী। ফলে দুঃশাসন আর জুলুম-নিপীড়নেই কাটতে থাকে আলেপ্পোর দিনরাত। নগরজুড়ে আতঙ্ক ছড়াতে থাকে। বিশেষ করে এডেসার শাসক জোসেলিন ও এন্টিয়কের অধিপতি ২য় বোহেমন্ডসহ বহিঃশত্রুদের লোলুপ দৃষ্টি এ সময় আলেপ্পোর প্রতি নিবদ্ধ ছিল।[৩১৪]

কুতলুগ আবেহের নিপীড়নে বিপর্যস্ত আলেপ্পোবাসী নিষ্কৃতি লাভের আশায় নতুন এক ব্যক্তির শরণাপন্ন হয়। তিনি হলেন সুলায়মান বিন আবদুল জাব্বার আল-উরতুকি। কিন্তু তিনি ছিলেন অতিশয় দুর্বল। ফলে একের পর এক চক্রান্ত ও ফিতনা ঘটতে থাকে। পরিস্থিতি কোনোভাবেই স্থিতিশীল হচ্ছিল না; অথচ ক্রুসেডাররা দাঁড়িয়ে আছে নগরদ্বারের সন্নিকটে![৩১৫]

[ছয়] জাওলি

তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ শক্তির তালিকায় সেনাপতি জাওলিও ছিলেন। তিনি এ সময় নিজেকে প্রয়াত প্রশাসক আক সুনকুর আল-বুরসুকির শিশুপুত্রের অভিভাবক ঘোষণা করে যেকোনো মূল্যে ক্ষমতা দখলে মরিয়া হয়ে ছিলেন। আমরা পেছনে জেনেছি, তিনি তাকে দায়িত্ব প্রদানের জন্য সুলতান মাহমুদকে রাজি করাতে কাজি বাহাউদ্দিন শাহরাযুরি ও সালাহুদ্দিন মুহাম্মাদ ইয়াগিসিয়ানিকে সুলতানের কাছে পাঠিয়েছিলেন।[৩১৬] কিন্তু বাতাস যে প্রবাহিত হয়েছিল লালসার জাহাজের

৩১৪. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ১/৪৩০-৪৩১।

৩১৫. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২২১।

৩১৬. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ৩৪-৩৫।

প্রতিকূলে! শেষতক মসুলের প্রশাসনিক দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছিল ইমাদুদ্দিন জিনকির কাঁধে।

কিন্তু জাওলি তো তখনও মসুলেই অবস্থান করছেন। তার সঙ্গে আছে প্রয়াত প্রশাসক ইযযুদ্দিন মাসউদের মসুল-বাহিনী। প্রশ্ন থেকে যায়—নতুন প্রশাসক ইমাদুদ্দিন জিনকি যখন মসুলে প্রবেশ করবেন, কী হবে জাওলির ভূমিকা?

[সাত] দামেশক ও অবশিষ্ট শাম অঞ্চল

ক্রুসেড আগ্রাসনের শুরু সময় থেকে চলমান পরিস্থিতি পর্যন্ত পুরোটা সময় দামেশক চলমান জিহাদি আন্দোলনের পথে একটি জটিল সমস্যারূপে বিদ্যমান ছিল। অথচ দামেশক ছিল পুরো শাম অঞ্চলের কেন্দ্রীয় নগরী। এমনকি এ অঞ্চলের অধিবাসীরা 'শাম' বলে অনেক সময় কেবল দামেশককেই বোঝাত! কিন্তু দুঃখের বিষয়, পর্যাপ্ত জনশক্তি এবং অর্থনৈতিক, সামরিক ও কৌশলগত সামর্থ্যের পাশাপাশি দীর্ঘ ইসলামি ইতিহাসের গৌরব থাকা সত্ত্বেও নগরীটি এ সময় কাঙ্ক্ষিত মানের ইসলামি নগরী ছিল না। বরং উল্টো দীর্ঘকাল ধরে নগরীটি জিহাদি আন্দোলনের সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে ছিল!

আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি, এ সমস্যার মূল কারণ হলো, নগরীটি দীর্ঘকাল দুরাচারী, অত্যাচারী ও ইসলামবিরোধী শাসকদের হাতে শাসিত হয়েছিল। এর ফলে ক্রমান্বয়ে এমন একটি প্রজন্ম তৈরি হয়েছিল, যারা ইলমের মর্যাদা অনুধাবন করতে পারত না, জিহাদ পছন্দ করত না এবং বাহ্যিক কিছু আচার-আচরণ ছাড়া দ্বীন সম্পর্কে কিছুই জানত না। বরং একসময় বিভিন্ন নিকৃষ্ট বিদআত-কর্ম তাদের কাছে মূল শরিয়তের মর্যাদা লাভ করেছিল!

পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে, ৩৫৮ হিজরি থেকে ৪৬৮ হিজরি সন (৯৬৮-১০৭৫ খ্রিষ্টাব্দ)[৩১৭] পর্যন্ত দামেশক শিয়া উবায়দি রাষ্ট্রের অধীনস্থ ছিল।[৩১৮] এই দীর্ঘ সময়ে তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, চিন্তা-চেতনা ও জীবনাচারে বিরাট পরিবর্তন ঘটে। প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে যায় বিকৃতি ও

---

৩১৭. দেখুন: আল-মাকরিজি, *ইত্তিআ'জুল হুনাফা বি-আখবারিল আইম্মাতিল ফাতিমিয়ীনাল খুলাফা*, ১/১২০।

৩১৮. দেখুন: ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ১৭৪-১৭৬।

ভারসাম্যহীনতা। নীতি-আদর্শ ও মূল্যবোধ কার্যত বিনষ্ট হয়ে যায়। নগরীটির বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিরা সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি হারিয়ে ফেলে। এ কারণে জ্ঞানীগুণী আলিমসমাজ দামেশক ছেড়ে চলে যায়। দামেশক প্রবেশ করে এক নিকষকালো অন্ধকার যুগে!

উবায়দিদের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার পরও দামেশকের দুর্যোগ কাটেনি। এ সময় প্রথমে নগরীটি ছিল আতসিজ (Atsiz Ibn Uvak) নামক জনৈক সেলজুক সেনাপতির শাসনাধীন।[৩১৯] এরপর পর্যায়ক্রমে দামেশক শাসন করেন তুতুশ বিন আলপ আরসালান[৩২০], দাক্কাক বিন তুতুশ[৩২১] এবং সবশেষে তুগতেকিন তুর্কমানি[৩২২]।

আমাদের আলোচ্য যুগে দামেশকের শাসনক্ষমতা যদিও তুগতেকিনের হাতে ছিল; কিন্তু তিনি যে নির্ভেজাল জিহাদি ব্যক্তি ছিলেন, এমনটি বলার সুযোগ নেই। আর তাই ইমাদুদ্দিন জিনকির জিহাদি পরিকল্পনার সামনে আপাতদৃষ্টিতে তুগতেকিনও প্রতিবন্ধক বিবেচিত হচ্ছিলেন।

সঙ্গে এ তথ্যটি যোগ করুন যে, বিশেষ করে দামেশক ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রাম ও দুর্গসহ পুরো শাম অঞ্চলে ছিল শিয়া বাতিনি গোষ্ঠীর বাধাহীন প্রভাব। তারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনমনে ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছিল। বাতিনিরা এ অঞ্চলে যেকোনো সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ওত পেতে থাকত। এ কারণে দামেশকের জনগণ সংস্কার ও সংশোধনের সম্ভাবনা সম্পর্কেও নিরাশ হয়ে পড়েছিল।

এ সবকিছু মিলে দামেশকের পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছিল। এটি কেবল শাসক-সংকট ছিল না; ছিল জনগণেরও সংকট। সুতরাং নিঃসন্দেহে সংকট বড় জটিল ও ভয়াবহ ছিল।

কিন্তু সামরিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে বিবেচনা করলে দামেশকে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা বা দামেশকের সঙ্গে সহযোগিতা বিনিময় ব্যতীত ইমাদুদ্দিন জিনকির পক্ষে বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছা সম্ভব ছিল না। একই কথা

---

৩১৯. দেখুন: ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ১৭৪-১৭৬।

৩২০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৮২।

৩২১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ২১৩।

৩২২. দেখুন: আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৭৪ ও ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ১৪৮-১৪৯।

প্রযোজ্য আরেক ক্রুসেড রাজ্য ত্রিপোলিতে পৌঁছার ক্ষেত্রেও। আর তাই ত্রিপোলি ও বাইতুল মুকাদ্দাসের ক্রুসেডারদের দফারফা করতে হলে তার পূর্বেই দামেশক-সমস্যার কোনো সমাধান খুঁজে বের করা ইমাদুদ্দিন জিনকির জন্য জরুরি ছিল।

দামেশক বাদে শাম অঞ্চলের অন্যান্য নগরীর অবস্থা ছিল আরও দুর্বল। কিন্তু নগরীগুলো পরস্পর সংযুক্ত থাকায় ক্রুসেডারবিরোধী যুদ্ধপরিকল্পনায় সবগুলোই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হচ্ছিল।

হামা নগরী ছিল দামেশক রাজ্যের অধীনস্থ। হামা থেকে আশেপাশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানের ওপর নজর রাখা যেত। তা ছাড়া হামার অবস্থান ছিল দুই ক্রুসেড রাজ্য এন্টিয়ক ও ত্রিপোলির কাছাকাছি।

হিমস তখন স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য ছিল। এ সময় রাজ্যটির শাসক ছিলেন সামসামুদ্দৌলা খায়র খান বিন কুরাজা নামক জনৈক তুর্কি। তিনি ছিলেন জুলুম-অত্যাচারে প্রসিদ্ধ এক শাসক। অবশ্য এ অঞ্চলে তিনি একজন শক্তিমান ও প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হতেন।

শাম অঞ্চলের আরেক গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য শাইজার। রাজ্যটি ক্ষুদ্র, দুর্বল ও ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে অবস্থিত হলেও দীর্ঘদিন ধরে আরব আমির সুলতান বিন মুনকিয শাইজার রাজ্যটি শাসন করছিলেন। ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ার কারণ হলো, শাইজারের অবস্থান ছিল এন্টিয়কের একেবারে সন্নিকটে।[৩২৩]

[আট] জাযিরা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ

এই অঞ্চলটিও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অঞ্চলটির অবস্থান উত্তর দিক থেকে দজলা ও ফুরাত নদীর মাঝে। আধুনিক রাষ্ট্রসীমায় ইরাক, সিরিয়া ও তুরস্কের বিভিন্ন অংশ মিলে ছিল তৎকালীন জাযিরা অঞ্চল। ক্রুসেড রাজ্য এডেসা এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর এডেসা রাজ্যের অবস্থান ছিল মসুলের অতি নিকটে। বরং মসুলকে জাযিরা অঞ্চলের একটি নগরী হিসেবেই গণ্য করা হতো। আর তাই ইমাদুদ্দিন জিনকির সামগ্রিক চিন্তা-পরিকল্পনায় এ অঞ্চলটির গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ছিল।

---

৩২৩. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ২২৭-২২৮ ও ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৪৫-২৪৬।

অতি দুঃখজনক ব্যাপার হলো, এই গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থান ও ক্রুসেড রাজ্য এডেসার নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও অঞ্চলটি বিভিন্ন আরব, তুর্কমেন ও উরতুকি শাসকের মাঝে বিভক্ত ছিল। এ কথা বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না যে, এই সীমিত পরিসরের অঞ্চলটি তখন গোটা দশেক আলাদা রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কেবল তা-ই নয়; রাজ্যবিস্তারের লালসায় তারা লিপ্ত ছিল পারস্পরিক হানাহানিতে।[৩২৪]

[নয়] কুর্দি গোষ্ঠী

আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, কুর্দিরা ছিল এক মহান সুন্নি সম্প্রদায়। তারা মসুলের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত পাহাড়ি এলাকায় বসবাস করত। ভৌগোলিক দুর্গমতার কারণে কুর্দি অধ্যুষিত অঞ্চলে সেলজুকদের কর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এরই অনিবার্য পরিণতিতে অঞ্চলটিতে আলিমদের সংখ্যা কমে যায়; শান্তি-নিরাপত্তা দুর্বল হয়ে পড়ে, মূর্খতা ও অজ্ঞতা ছড়িয়ে পড়ে এবং অঞ্চলটি পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন নগরীর জন্য দুশ্চিন্তা ও শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[৩২৫]

কুর্দিরা অনেকগুলো শাখাগোত্রে বিভক্ত ছিল আর প্রতিটি শাখাগোত্র ছিল পরস্পর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন। আর তাই কুর্দি অধ্যুষিত অঞ্চলটিকে 'কুর্দি রাজ্য' বলে আখ্যায়িত করার সুযোগ ছিল না। হামিদিয়া, হাকারিয়া, মিহরানিয়া ও বাশনাবিয়া ছিল তৎকালে এ অঞ্চলের কুর্দিদের প্রসিদ্ধ কয়েকটি শাখাগোত্র।[৩২৬]

[দশ] ক্রুসেডার শক্তি

এ অঞ্চলে বিদ্যমান উল্লিখিত জটিলতা ও সমস্যাসমূহের পাশাপাশি সবচেয়ে কঠিন সমস্যা ও দুশ্চিন্তা হিসেবে মুসলমানদের কাঁধে চেপে ছিল এডেসা, এন্টিয়ক, ত্রিপোলি ও বাইতুল মুকাদ্দাস নামক চারটি ক্রুসেড রাজ্যের সম্মিলিত ক্রুসেড কাঠামো।

---

৩২৪. দেখুন: মুহাম্মাদ সুহাইল তাকুশ, *তারীখুয-যিনকিয়্যীন ফিল-মাওসিলি ওয়া বিলাদিশ-শাম*, পৃষ্ঠা : ৯৮-৯৯।

৩২৫. ইমাদুদ্দিন খলিল, *ইমাদুদ্দিন জিনকি*, পৃষ্ঠা : ১০১। (ঈষৎ পরিমার্জিত)

৩২৬. মুহাম্মাদ সুহাইল তাকুশ, *তারীখুয-যিনকিয়্যীন ফিল-মাওসিলি ওয়া বিলাদিশ-শাম*, পৃষ্ঠা : ১০৫।

৫২০ হিজরি সনে (১১২৬ খ্রিষ্টাব্দে) আক সুনকুর আল-বুরসুকির মৃত্যুর পর মসুলে সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ গোলযোগ চলাকালে ক্রুসেড রাজ্যগুলো আরও সুসংহত ও দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। তারা এ সময় রাজ্যগুলোর পাশ দিয়ে পথ অতিক্রমকারী প্রতিটি মুসলিম কাফেলার ওপর হামলা চালাতে শুরু করে এবং নিকটবর্তী ইসলামি নগরীগুলোর ওপর কর আরোপ করতে থাকে। এর ফলে এ অঞ্চলের জনসাধারণের মাঝে এক ধরনের ভীতি-আতঙ্ক তৈরি হয়। এর অন্যতম কারণ এও ছিল যে, নগরীগুলোর দুর্বলচিত্ত মুসলিম শাসকদের মাঝে ক্রুসেডারদের প্রতিরোধ বা কোনো ধরনের লড়াই প্রচেষ্টার আগ্রহ বা পরিকল্পনা ছিল না।[৩২৭]

বিপরীতে ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দের অবস্থান ছিল অনেকটা স্থিতিশীল। এডেসায় জোসেলিন, এন্টিয়কে ২য় বোহেমন্ড, ত্রিপোলিতে বারট্রামের পুত্র পন্স আর বাইতুল মুকাদ্দাসে ২য় বল্ডউইন—প্রতিটি ক্রুসেড রাজ্যেই ছিল আলাদা আলাদা শক্তিশালী শাসক।

ইমাদুদ্দিন জিনকির দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্রুসেড রাজ্য ছিল মসুল ও আলেপ্পোর মাঝে গজালের মতো প্রোথিত এডেসা রাজ্য!

মোটামুটি এই ছিল ইমাদুদ্দিন জিনকির মনমস্তিষ্কে বিদ্যমান তৎকালীন পরিস্থিতির সামগ্রিক চিত্র। নিঃসন্দেহে চিত্রটি ছিল অত্যন্ত জটিল; যাতে দু-চার-দশটি নয়; ছিল শত শত সমস্যা ও বিপত্তি। আর এই জটিল ও যৌগিক সংকট থেকে নিষ্কৃতির উপায় ছিল একটিই। প্রথমে মহান আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠাপূর্ণ বিশ্বাস; এরপর সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি, দূরদর্শী পরিকল্পনা, কর্মনীতিতে অগ্রাধিকার নির্ণয়ে সুষ্ঠু বিন্যাস, নানা মত ও নানা পথের মানুষের সঙ্গে কৌশলী কূটনীতি প্রয়োগ এবং অন্যায় প্রতিরোধ ও অন্যায্যের সংস্কারে পূর্ণ প্রজ্ঞার ব্যবহার।

দায়িত্ব গ্রহণের একেবারে প্রথম দিন থেকেই ইমাদুদ্দিন জিনকির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একেবারে স্বচ্ছ। মূল দায়িত্ব ও লক্ষ্যও ছিল সুস্পষ্ট—ক্রুসেডারদের হাত থেকে ইসলামি বিশ্বকে মুক্ত করা। কিন্তু এটি ছিল অতি কঠিন; বরং

৩২৭. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ৩২-৩৩।

সুকঠিন এক দায়িত্ব। এর জন্য প্রয়োজন ছিল সুস্পষ্ট ও সুগঠিত কর্মনীতি।

ক্রুসেডার বিতাড়নের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ইমাদুদ্দিন জিনকি যে রূপরেখা ও কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেন, তা মূলত মৌলিক দুটি পয়েন্টে কেন্দ্রীভূত ছিল। ১. মুসলমানদের ঐক্য-প্রচেষ্টা ২. ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। আর এ দুটি বিষয়ই তার সারা জীবনের মূল ও অবিচ্ছেদ্য কর্মে পরিণত হয়।

ইমাদুদ্দিন জিনকি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, ক্রুসেডাররা যে ইসলামি বিশ্বের গভীরে প্রবেশ করে সামগ্রিক পরিস্থিতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পেরেছে, এর মূল কারণ হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর পারস্পরিক অনৈক্য ও বিভক্তি। আরও পরিতাপের বিষয়, মুসলমানদের নির্বুদ্ধিতা কেবল পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না; ক্রুসেডাররা তাদেরকে পারস্পরিক হানাহানি-সংঘাতে জড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে ইসলামি বিশ্বের অভ্যন্তরে তৈরি হয়েছিল পরস্পর সংঘাতরত অনেকগুলো ক্ষুদ্র রাজ্য, যা ক্রুসেডারদের দীর্ঘস্থায়ী অবস্থান নিশ্চিতকরণে সহায়তা করছিল।

তিনি এ বিষয়টিও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, মুসলমানদের ভূমি থেকে ক্রুসেডার তাড়ানোর একমাত্র সমাধান হলো জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। সমঝোতা-আলোচনার মাধ্যমে ক্রুসেডারদের বেরিয়ে যেতে সম্মত করার প্রচেষ্টা মূলত অসার ও নিরর্থক চেষ্টা বলেই বিবেচিত হতো। তারা তো চলে যাওয়ার জন্য নয়; বরং নিজেদের পরিবার-পরিজন নিয়ে থেকে যাওয়ার জন্য ইসলামি ভূখণ্ডে এসেছে। ঔপনিবেশিক নীতির ধারক ক্রুসেডাররা এখন অধিকৃত ইসলামি ভূমিকে নিজেদের দেশই মনে করে। ইতিমধ্যে তাদের মাঝে এমন এক প্রজন্মও তৈরি হয়ে গেছে, যাদের জন্ম ও বেড়ে ওঠা এই ভূমিতেই; ইউরোপ তারা চোখেও দেখেনি। কারণ, ইমাদুদ্দিন জিনকি যখন দায়িত্ব গ্রহণ করেন, ততদিনে ইসলামি ভূখণ্ডে ক্রুসেডারদের অবস্থানকাল ত্রিশ বছর হয়ে গেছে।

আর তাই ইমাদুদ্দিন জিনকির কর্মপরিকল্পনায় জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহর পরিকল্পনা ছিল পরিপূর্ণ সুস্পষ্ট। তবে জিহাদ হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য; ব্যক্তিলালসা পূরণ বা সাম্রাজ্যবাদি চিন্তার দাবিতে নয়। আর জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহর জন্য প্রয়োজন ছিল সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও পথ-পদ্ধতির

অনুসরণ; যথাযোগ্য প্রস্তুতি ও সাধনা, শক্তি ও সম্ভাবনা। জিহাদ তো ব্যক্তিপ্রচেষ্টার নাম নয়; জিহাদ হলো জাতীয় প্রচেষ্টার নাম।

মোটামুটি এমনই ছিল ইমাদুদ্দিন জিনকির চিন্তা-পরিকল্পনা।

পরবর্তী জানার বিষয়—

কীভাবে হয়েছিল এই সুবিন্যস্ত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন?

ইমাদুদ্দিন জিনকি কীভাবে উম্মাহর ঐক্যসাধনে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন?

কীভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন জিহাদের?

এবং কীভাবে নিয়মিত পরিচালনা করেছিলেন সংগ্রাম ও লড়াই?

এককথায়—ঐক্য ও জিহাদের পথে কী ছিল তার কর্মপ্রচেষ্টা?

পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা এসব বিষয়ই জানব, ইনশাআল্লাহ।

* * *

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ইমাদুদ্দিন জিনকি : ঐক্য ও জিহাদ

ইমাদুদ্দিন জিনকি তার নতুন পদ গ্রহণ করেন। এ পদ যতটা সম্মানের, তার চেয়ে ঢের কষ্টের ও সাধনার। দায়িত্ব ছিল কঠিন, দায়িত্বভার ছিল সুকঠিন আর সকলের আশা ও প্রত্যাশা ছিল নতুন এই নেতাকে ঘিরে কেন্দ্রীভূত।

মসুলের অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন

ইমাদুদ্দিন জিনকি তার দায়িত্ব পালন শুরু করেন মসুলে পৌঁছার পূর্বেই!

বাগদাদ থেকে মসুল অভিমুখে রওনা হওয়ার সময়ই তিনি জানতেন, আক সুনকুরের শিশুপুত্রের তত্ত্বাবধায়ক সেজে বসা জাওলি হয়তো মসুলের কর্তৃত্ব তার হাতে সমর্পণ করবেন না; বরং আগের বিভিন্ন নেতার মতো সেলজুক সুলতানের আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করে মসুলকে স্বাধীন রাজ্য ঘোষণা করবেন এবং নগরদ্বার বন্ধ রেখে ভেতরে আশ্রয় নেবেন। সেক্ষেত্রে ইমাদুদ্দিন জিনকির প্রয়োজন হবে এমন কোনো নিরাপদ ঘাঁটি, যেখানে আশ্রয় নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে। এ কারণে তিনি বিকল্প পরিকল্পনাও গ্রহণ করেন এবং তার সঙ্গী সৈন্যদের নিয়ে বাওয়াজিয নগরী অভিমুখে রওনা হন। নগরীটির অবস্থান ছিল মসুলের দক্ষিণে তিকরিতের কাছে। ইমাদুদ্দিন জিনকি বাওয়াজিযে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে নগরীটিকে তার সেনাঘাঁটি নির্বাচন করেন। এখন জাওলি যদি মসুলের নিয়ন্ত্রণ সমর্পণে অস্বীকৃতি জানান, তিনি বাওয়াজিয থেকে মসুলে অব্যাহত চাপ প্রয়োগ করতে পারবেন। আর জাওলি যদি স্বেচ্ছায় মসুলের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেন অথবা তিনি যদি শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে মসুলের কর্তৃত্ব লাভ করতে পারেন, তাহলে বাওয়াজিয সেনাঘাঁটি মসুলের দক্ষিণ সীমানার নিরাপত্তায় সহায়তা করবে।

বাওয়াজিযে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার পর তিনি যাত্রা অব্যাহত রেখে জাযিরা ইবনে উমরে পৌঁছে অঞ্চলটিকে তার কর্তৃত্বভুক্ত করে নেন। মসুল থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত জাযিরা ইবনে উমর অঞ্চল ছিল সামরিক ও অর্থনৈতিক বিবেচনায় অতি গুরুত্বপূর্ণ। মসুলের প্রয়াত প্রশাসক আক সুনকুর আল-বুরসুকির জনৈক ক্রীতদাস সেখানে স্বাধীন শাসন পরিচালনা করছিল। আর তাই মসুলের নিরাপত্তার স্বার্থে অঞ্চলটিতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা জরুরি ছিল। এরপর আমাদের বীরপুরুষ ইমাদুদ্দিন জিনকি সরাসরি মসুলের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

জাওলি তখন নিজের অবস্থান নিয়ে চিন্তা করছিলেন। জনসমর্থন বা সেলজুক সালতানাতের স্বীকৃতি কিছুই তার পক্ষে নেই। তাই তিনি ইমাদুদ্দিন জিনকিকে মসুলে প্রবেশে বাধা দিতে দ্বিধায় পড়ে যান। ইমাদুদ্দিন জিনকি জাওলির চিন্তার গতিপ্রকৃতি ধরতে পারছিলেন। তিনি বুঝতে পারেন, জাওলির মসুলে আলাদা রাজ্য প্রতিষ্ঠার মতো যথেষ্ট শক্তি নেই। অবশ্য জাওলি চাইলে তাকে প্রতিরোধের চেষ্টা করে তার সময়, জনবল ও সম্পদের কিছু ক্ষতিসাধন করতে পারবেন। তাই তিনি জাওলিকে নিজের পক্ষে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করে শুরুতেই তার কাছে দূত প্রেরণ করেন এবং তার কর্তৃত্ব মেনে নিলে জাওলিকে রাহবা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জায়গির প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন।[৩২৮] রাহবা ছিল শামের অন্যতম সম্পদশালী অঞ্চল। অঞ্চলটির অবস্থান ছিল ক্রুসেডারদের ঘাঁটিসমূহের কাছে। এর মাধ্যমে ইমাদুদ্দিন জিনকি এক ঢিলে একাধিক পাখি শিকারের পরিকল্পনা করেন। জাওলি তার প্রস্তাব মেনে নিলে তিনি বিনা যুদ্ধে নিরাপদে মসুলে প্রবেশ করতে পারবেন এবং জাওলিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি অঞ্চলের প্রশাসনিক দায়িত্বে কাজে লাগাতে পারবেন। অধিকন্তু জাওলি তার পক্ষের শক্তিতে পরিণত হবেন। শুধু তা-ই নয়; তিনি জাওলির সামরিক শক্তিকে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করতে পারবেন। এটিই ছিল ইমাদুদ্দিনের মূল লক্ষ্য। সবচেয়ে বড় কথা, ইমাদুদ্দিন জিনকির এই আচরণ তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন সবাইকে তার সঙ্গে কাজ করার এবং তার প্রতি আস্থা রাখার সাহস জোগাবে। সবাই প্রত্যক্ষ করবে যে, তিনি তার বিরোধীদের দমন

---

৩২৮. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৪২-২৪৩।

করতে চান না; বরং তাদেরকে দান-অনুদানে ধন্য করেন এবং তার প্রশাসনে মর্যাদাপূর্ণ বিভিন্ন দায়িত্ব প্রদান করেন। নিঃসন্দেহে এর মাধ্যমে তিনি সকলের হৃদয় আকর্ষণ করতে সক্ষম হবেন।

ইমাদুদ্দিন জিনকির এই উদার প্রস্তাবে জাওলি নতুন করে তার ক্ষমতালিপ্সা পূরণের পথ খুঁজে পান। তিনি সহজেই এতে সম্মতি প্রকাশ করেন। ইমাদুদ্দিন জিনকি সম্পূর্ণ বিনা রক্তপাতে মসুলে প্রবেশ করেন। তার সব সময়ের নীতি ছিল যথাসম্ভব রক্তপাত এড়িয়ে কৌশলে উদ্দেশ্য সাধন করা।

মসুলে প্রবেশ করেই ইমাদুদ্দিন জিনকি নগরীটির অভ্যন্তরীণ সংস্কার শুরু করেন। তিনি নাসিরুদ্দিন জাকারকে মসুলের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব প্রদান করেন।[৩২৯] পদটিকে মসুলের গভর্নর পদ হিসেবে অভিহিত করা যায়। নাসিরুদ্দিন ছিলেন শক্তিশালী ও দৃঢ়সংকল্প একজন ব্যক্তি। মসুলের তৎকালীন পতনোন্মুখ নিরাপত্তা পরিস্থিতির সংস্কারের জন্য তিনি ছিলেন যথাযোগ্য ব্যক্তি। ইমাদুদ্দিন জিনকি তাকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করেন। যেমন: মসুলের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; দুর্গ, নগরপ্রাচীর ও পরিখাগুলো মজবুত করা; মসুলের জনপ্রতিনিধি, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন গোত্রপ্রধান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করা; সচিবালয় ও দাফতরিক বিভিন্ন বিভাগের পুনঃবিন্যাস ইত্যাদি। ইমাদুদ্দিন জিনকি মন্ত্রণালয় ও দাফতরিক কর্মকাণ্ডের জন্য বড় অঙ্কের বাজেট নির্ধারণ করেন। ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রে সহজ, গতিশীল ও বিন্যস্ত কর্মসম্পাদন নিশ্চিত হয়। তিনি দাফতরিক দায়িত্বশীলদের জনগণের সঙ্গে সদাচরণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। ঐতিহাসিক আবু শামা ইমাদুদ্দিন জিনকির প্রশাসনে দাফতরিক দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাদের সম্পর্কে বলেন, 'তাদের আচরণে মনে হতো, তারা যেন জনগণের পরিজন!'[৩৩০]

---

[৩২৯]. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ৩৪-৩৫।

[৩৩০]. আবু শামা আল-মাকদিসি, *আর-রাওযাতাইন ফি তারীখিদ দাওলাতাইন আন-নূরিয়া ওয়াস-সালাহিয়া*, ১/ ১৬৩।

তিনি সামরিক বিভাগের দায়িত্ব প্রদান করেন সালাহুদ্দিন মুহাম্মাদ ইয়াগিসিয়ানিকে।[৩৩১] সালাহুদ্দিন মুহাম্মাদ সেই দূতদ্বয়ের একজন, জাওলি যাদেরকে ইতিপূর্বে সুলতান মাহমুদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তার সঙ্গী অপর দূতের সঙ্গে পরামর্শ করে জাওলির প্রত্যাশার বিপরীতে সুলতান মাহমুদের কাছে ইমাদুদ্দিন জিনকির নাম প্রস্তাব করেছিলেন। ইমাদুদ্দিন জিনকির চারিত্রিক প্রশংসা করতে গিয়ে যিনি নিজের পদ ও পদবি বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন, তিনি যে অত্যুচ্চ নিষ্ঠা ও নির্মোহ চেতনার অধিকারী, ইমাদুদ্দিন জিনকি তা যথার্থই অনুভব করেন। তদুপরি সালাহুদ্দিন মুহাম্মাদ ছিলেন ঝানু সমরবিদ ও কুশলী যোদ্ধা।

ইমাদুদ্দিন জিনকি অপর দূত বাহাউদ্দিন শাহরাযুরিকেও তার প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ পদ প্রদান করেন। তিনি তাকে কাজি পদে অধিষ্ঠিত করে বিচারবিভাগের দায়িত্ব প্রদান করেন।[৩৩২] শাহরাযুরির পুরো পরিবার ব্যাপকভাবে অত্যুচ্চ জ্ঞান-যোগ্যতা এবং বিশেষভাবে আইন ও বিচার বিষয়ক যোগ্যতার কারণে প্রসিদ্ধ ছিল। ইমাদুদ্দিন জিনকি তার নিষ্ঠা ও নির্মোহতা সম্পর্কেও নিশ্চিন্ত থাকায় গুরুত্বপূর্ণ এই পদের জন্য অন্যদের বাদ দিয়ে তাকে নির্বাচন করেন। রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অঞ্চলে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বাহাউদ্দিন শাহরাযুরির অধীনস্থ কাজিদের নির্বাচনেও ইমাদুদ্দিন তার মতামতের ওপরই নির্ভর করেন।

এভাবে জনপ্রশাসন, সামরিক বিভাগ ও ধর্মীয় বিভাগ—সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই তিনটি বিভাগে যোগ্য ব্যক্তিদের দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে ইমাদুদ্দিন জিনকি তার রাজ্যের মৌলিক কাঠামোর স্থিতিশীলতার বিষয়ে নির্ভার ও নিশ্চিন্ত হন।

এরপর তিনি মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে যোগ্য ও প্রাজ্ঞ আলিমদের আহ্বান করেন এবং তাদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ এক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দেন। জনগণকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান, জিহাদি চেতনা ও জিহাদের সুমহান দায়িত্ববোধ তৈরিতে ব্যাপক পরিসরে আলোচনা,

---

[৩৩১]. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৪৩ ও ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ২৫৮।

[৩৩২]. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৪৩।

জনসাধারণকে মুসলমানদের অতীত বিজয়ের ইতিহাস শোনানো, আল্লাহ ও পরকালমুখী করা, নতুন প্রজন্মকে ত্যাগ ও সাধনার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদের কর্ম-উদ্দেশ্যকে আল্লাহমুখী করার দায়িত্ব আলিমসমাজের কাঁধে অর্পিত হয়।(৩৩৩) এভাবে ইমাদুদ্দিন জিনকি তার নতুন রাজ্যে শিক্ষা ও সচেতনতার এমন এক জাগরণের সূচনা করেন, যা অনেক রাষ্ট্রনায়কের কর্মনীতিতে উপেক্ষিতই থেকে যায়। তিনি এর মাধ্যমে জনসাধারণের স্বপ্ন ও লক্ষ্যের গতিপথ পরিবর্তন করে তার মূল পরিকল্পনা 'ইসলামি ভূখণ্ড থেকে ক্রুসেডারদের বিতাড়ন' অভিমুখে পরিচালিত করতে শুরু করেন।

এভাবে ইমাদুদ্দিন জিনকি মসুলের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি পুনঃবিন্যাস করেন এবং সুদৃঢ় ভিত্তিনির্ভর একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলেন। মসুলের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে ইমাদুদ্দিন জিনকি এবার ক্রুসেডারদের সামনে ইস্পাতকঠিন প্রাচীরের মতো বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে সক্ষম বৃহৎ পরিসরের একক ইসলামি কাঠামো প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে মসুলের বাইরে দৃষ্টি দিতে শুরু করেন।

যেহেতু ইমাদুদ্দিন জিনকি ছিলেন বাস্তববাদী; নিজের ও শত্রুর শক্তির মাত্রা তিনি অনুমান করতে পারতেন; তাই তিনি অনুধাবন করেন যে, এ মুহূর্তে তিনি নিকটস্থ ক্রুসেড রাজ্য এডেসার সঙ্গে লড়াই করতে সক্ষম নন। তা ছাড়া এ সময় তিনি মসুলের আশপাশের বিক্ষিপ্ত মুসলিম রাজ্যগুলোকে একীভূত করার জন্য অন্যান্য ব্যস্ততামুক্ত থাকতে চাচ্ছিলেন। সার্বিক বিবেচনায় তিনি দুই বছরের জন্য এডেসার সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেন।(৩৩৪) এ বিষয়টি তার চিন্তা-চেতনায় একেবারেই সুস্পষ্ট ছিল যে, ক্রুসেডারদের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি হবে সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য। যে শত্রুপক্ষ মুসলমানদের ভূখণ্ড জবরদখল করে রেখেছে, তাদের সঙ্গে তিনি কোনো অবস্থাতেই স্থায়ী শান্তিচুক্তি করতে পারেন না। ইমাদুদ্দিন জিনকির এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে, তিনি

---

৩৩৩. মুহাম্মাদ সুহাইল তাকূশ, *তারীখুয-যিনকিয়্যীন ফিল-মাওসিলি ওয়া বিলাদিশ-শাম*, পৃষ্ঠা : ১৩৩-১৩৪।

৩৩৪. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৪৪ ও Setton Op.cit 1, p. 429.

যুগপৎ সামরিক প্রজ্ঞা ও ধর্মীয় প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। এ বিষয়টিই তাকে সমকালীন অন্যান্য শাসকের তুলনায় আলাদা করে দিয়েছিল।

জিনকি রাষ্ট্রে আলেপ্পোর অন্তর্ভুক্তি

এডেসার সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদনের পরই ইমাদুদ্দিন জিনকি বৃহৎ নগরী আলেপ্পোকে তার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা করেন। আমরা পূর্বেও আলেপ্পোর সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কৌশলগত ও জনশক্তিগত গুরুত্বের বিষয়ে আলোচনা করেছি। তা ছাড়া ইতিপূর্বে আক সুনকুর আল-বুরসুকি যখন প্রশাসক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখনও আলেপ্পো সেলজুক সুলতান মাহমুদের অধীনে মসুলের সঙ্গে একীভূত ছিল। সুতরাং উভয় নগরীর একীভূতকরণ ছিল সম্পূর্ণই যৌক্তিক ও আইনসংগত। মসুলের সঙ্গে আলেপ্পোর সংযুক্তিতে সেখানে কোনো বিরোধ সৃষ্টির আশঙ্কাও ছিল না। অধিকন্তু আলেপ্পোতে ইমাদুদ্দিন জিনকির জনসমর্থনও ছিল শক্তিশালী। কারণ, আলেপ্পোবাসীর হৃদয়জগতে তখনও তাদের প্রয়াত ন্যায়পরায়ণ প্রশাসক ও ইমাদুদ্দিন জিনকির পিতা কাসিমুদ্দৌলা আক সুনকুরের স্মৃতি জাগ্রত ছিল; যিনি চৌত্রিশ বছর পূর্বে আলেপ্পোর প্রতিরক্ষা করতে গিয়ে তুতুশ বিন আলপ আরসালানের হাতে নিহত হয়েছিলেন।

অবশ্য আলেপ্পোকে মসুলের সঙ্গে একীভূত করার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও ইমাদুদ্দিন জিনকি সেদিকে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে দুটি মৌলিক পদক্ষেপ বাস্তবায়নে উদ্যোগী হন।

প্রথম পদক্ষেপ মসুলের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। ইতিপূর্বে তিনি বাওয়াজিয ও জাযিরা ইবনে উমরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মসুলের দক্ষিণ সীমান্তের নিরাপত্তা জোরদার করেছিলেন। এখন উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা গেলে তিনি নিশ্চিন্তে পশ্চিমে আলেপ্পো অভিমুখে অগ্রসর হতে পারবেন।

মসুলের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে বিভিন্ন কুর্দি গোত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিল। কুর্দি গোত্রগুলোর মধ্যে মসুলের তুলনামূলক নিকটবর্তী এলাকায় ছিল হামিদিয়া ও হাকারিয়া গোত্রের প্রতিপত্তি। তৎকালে গোত্রদুটি বিভিন্ন সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল তৈরি করে মসুলের উত্তর সীমান্তের বিভিন্ন গ্রাম ও ক্ষেত-খামারে হামলা চালাত। এর মাধ্যমে তারা স্থানীয়

কৃষক ও মসুলের জনগণকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল। তাই ইমাদুদ্দিন জিনকি তার বাহিনীর একটি অংশ নিয়ে সেদিকে রওনা হন। যদিও তার নিয়মিত বাহিনী এবং এসব বিচ্ছিন্ন কুর্দি গোত্রের শক্তির মাঝে যোজন যোজন তফাত ছিল; কিন্তু ইমাদুদ্দিন জিনকির সারা জীবনের নীতি ছিল, তিনি তার চারপাশের প্রতিটি শক্তি দ্বারা উপকৃত হতে চেষ্টা করতেন। ইতিপূর্বে যেমন তিনি জাওলিকে তার স্বার্থে কাজে লাগিয়েছেন, এবার তিনি সম্ভব হলে কুর্দিদেরকেও তার নবগঠিত রাজ্যের কল্যাণে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেন। এসব গোত্রের নেতিবাচক অতীত ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও তিনি এ কারণেই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তিনি সর্বদাই ছিলেন সংস্কার ও ঐক্যের পক্ষে সচেষ্ট।

ইমাদুদ্দিন জিনকি কুর্দি হামিদিয়া গোত্রের নেতা ঈসা হামিদির সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে তিনি মসুল রাজ্যের আনুগত্য স্বীকারের বিনিময়ে ঈসা হামিদিকে কুর্দিদের নেতা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং তার ক্ষমতা ও সম্পদ তার হাতেই ছেড়ে দেন।[৩৩৫] আনুগত্য স্বীকারের অনিবার্য দাবি এই ছিল যে, ভবিষ্যতে তার গোত্র আর মসুলে হামলা চালাবে না; বরং জটিলতর পরিস্থিতিতে প্রয়োজন হলে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকবে। ঈসা হামিদি ইমাদুদ্দিন জিনকির শক্তি আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। যদিও এসব গোত্র ছিল অনেকটা মিলিশিয়া বাহিনীর মতো; কিন্তু তারা অনুভব করতে পেরেছিল যে, অন্তত চলমান পরিস্থিতিতে ইমাদুদ্দিন জিনকির ক্ষমতার সামনে নতি স্বীকার করে নেওয়াই তাদের জন্য তুলনামূলক নিরাপদ।
এভাবে হামিদিয়া কুর্দি গোত্রের শক্তিকে মসুলের সঙ্গে মিলিত করা হয় বা নিদেনপক্ষে নিরপেক্ষ করে ফেলা হয়।

হামিদিয়া গোত্রের সঙ্গে সফল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শেষে ইমাদুদ্দিন জিনকি হাকারিয়া গোত্রের বিষয়ে মনোযোগী হন। তিনি গোত্রটির নেতা আবুল হাইজা আল-হাকারির সঙ্গে বৈঠক করে তার সঙ্গেও একই চুক্তি করেন। এর ফলে মসুলের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।[৩৩৬]

---

৩৩৫. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৭৪।

৩৩৬. প্রাগুক্ত ৯/২৭৫।

এভাবে ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ. সফল কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে মসুল ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের পরিস্থিতি স্থিতিশীল করতে সক্ষম হন। এখন তিনি নিশ্চিন্তে আলেপ্পোর বিষয়ে পরিকল্পনা করতে পারবেন।

মসুলের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ছিল ইমাদুদ্দিন জিনকির পশ্চিমে আলেপ্পো অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে বাস্তবায়িত প্রথম পদক্ষেপ।

তার এ সংক্রান্ত দ্বিতীয় পদক্ষেপ ছিল 'আলেপ্পো গমন প্রক্রিয়া সহজতর করার জন্য সামরিক ও প্রচারণা প্রস্তুতি'। তার লক্ষ্য ছিল এর মাধ্যমে সম্ভাব্য সংঘাত পরিস্থিতি ও প্রচুর মুসলমানের জান-মালের ক্ষতি পরিহার করা।

প্রচারণা প্রস্তুতি হিসেবে তিনি তার পক্ষ হতে কয়েকজন দূতকে আলেপ্পোতে প্রেরণ করেন। তারা চুপিসারে আলেপ্পোতে প্রবেশ করে এবং মসজিদ ও বিভিন্ন জনসমাগমের স্থানে উপস্থিত হয়ে জনসাধারণকে গুরুত্বপূর্ণ আলেপ্পো নগরীর শাসক পদে ইমাদুদ্দিন জিনকির প্রয়োজনীয়তা ও অগ্রাধিকার সম্পর্কে বোঝাতে থাকে। তারা জনগণের সামনে যেসব বিষয় যুক্তি হিসেবে তুলে ধরে তা হলো—সমকালীন মুসলিম বিশ্বের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তি সেলজুক সুলতান মাহমুদ ইমাদুদ্দিন জিনকিকেই তাদের শাসক হিসেবে পছন্দ করেছেন। তিনি একজন দৃঢ় চেতনাসম্পন্ন মুজাহিদ নেতা, যিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে পারবেন। তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ কুশলী শাসক, যিনি আলেপ্পোতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন এবং প্রত্যেকের হৃত অধিকার ফিরিয়ে দিতে পারবেন। তিনি সেই হাজিব আক সুনকুরের সুযোগ্য পুত্র, যার প্রতি আলেপ্পোবাসী উত্তরাধিকারসূত্রে হৃদ্যতা ও অনুরাগ পোষণ করে আসছে।(৩৩৭)

এই প্রচারণামূলক প্রস্তুতির পেছনে ইমাদুদ্দিন জিনকির লক্ষ্য ছিল, আলেপ্পোতে তার আগমন যেন গণদাবিতে পরিণত হয়। তিনি জানতেন, কুতলুগ আবেহ ও ইবরাহিম বিন রিজওয়ান দুজনই দুরাচারী আর

---

৩৩৭. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৪৭, ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/৪৩৭ ও সুহাইল জাক্কার, *আল-হুরুবুস সালিবিয়্যাহ*, ২/৬৭৮।

সুলায়মান বিন আবুদল জাব্বার একেবারেই দুর্বল; আলেপ্পোবাসী তাদের কাউকেই নেতা হিসেবে পছন্দ করে না। বিকল্প হিসেবে যদি ইমাদুদ্দিন জিনকির মতো ব্যক্তিকে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, নিঃসন্দেহে তারা একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করবে।

তার এ উদ্যোগ পুরোপুরি সফল হয়। দূত ও আহ্বায়কগণ জনগণের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে সবাইকে সচেতন করে তোলে। আলেপ্পোবাসী অধীর আগ্রহে সেই দিনটির প্রতীক্ষায় থাকে, যেদিন ইমাদুদ্দিন জিনকি তাদের মাঝে আবির্ভূত হবেন।

অপরদিকে সামরিক প্রস্তুতি হিসেবে তিনি তার সেনাপ্রধান সালাহুদ্দিন মুহাম্মাদ ইয়াগিসিয়ানিকে প্রেরণ করেন। সালাহুদ্দিন মুহাম্মাদ আলেপ্পোর আশেপাশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন, পথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন এবং আলেপ্পোর উচ্চপদস্থ কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তার সঙ্গে পত্রবিনিময় করে মহান নেতা ইমাদুদ্দিন জিনকির আগমন-উপযোগী পরিবেশ প্রস্তুত করেন।[৩৩৮]

অবশেষে ইমাদুদ্দিন জিনকি যখন নিশ্চিন্ত হন যে, আলেপ্পোর পরিস্থিতি অনুকূল হয়ে গেছে, তখন তিনি তার বাহিনীর শক্তিশালী একটি রেজিমেন্ট নিয়ে পশ্চিমে আলেপ্পো অভিমুখে রওনা হন। যদি কোনো কারণে আলেপ্পোতে প্রবেশের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তখন প্রত্যাবর্তন পথ নিরাপদ রাখতে তিনি পথে আলেপ্পোর সরাসরি পূর্বে অবস্থিত মানবিজ ও বিজায়া (B'zaah / Bizeaa) নগরীকে তার রাজ্যভুক্ত করে নেন। এরপর তিনি আলেপ্পোর কাছাকাছি পৌঁছান। আর তখনই ঘটে এক আকস্মিক আনন্দঘন ঘটনা।

আলেপ্পোর জনসাধারণ ততক্ষণে নতুন নেতা ইমাদুদ্দিন জিনকিকে উষ্ণ সংবর্ধনার মাধ্যমে বরণ করে নিতে এবং তার প্রতি নিজেদের নিঃশর্ত আনুগত্য ঘোষণা করতে নগরীর বাইরে চলে এসেছে! একদল দুষ্কর্মার দুঃশাসনে তারা সত্যিই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

ইমাদুদ্দিন জিনকির পক্ষে জনতার এমন অভাবনীয় ও স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের পর ইবরাহিম বিন রিজওয়ান ও সুলায়মান বিন আবদুল জাব্বারের সামনে

---

৩৩৮. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৪৭।

বিনা যুদ্ধে পলায়ন ব্যতীত ভিন্ন কোনো পথ খোলা ছিল না। অপরদিকে কুতলুগ আবেহকে বিক্ষুব্ধ জনগণ ধরে ফেলে এবং ক্ষমতার জোরে ইতিপূর্বে আমজনতার রক্ত প্রবাহিত করার যথার্থ শাস্তি হিসেবে সবাই মিলে তাকে মেরে ফেলে।[৩৩৯]

এভাবে সম্পূর্ণ বিনা রক্তপাতে, জনগণের উষ্ণ অভ্যর্থনায় বরিত হয়ে ইমাদুদ্দিন আলেপ্পোতে প্রবেশ করেন। এর মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ দুই নগরী মসুল ও আলেপ্পো একীভূত হয়। এর মাধ্যমে কেবল এ অঞ্চলে ইসলামি শক্তির শক্তিমত্তাই বৃদ্ধি পায়নি; বরং ক্রুসেড রাজ্য এডেসা শাম ও ফিলিস্তিন অঞ্চলের অন্যান্য ক্রুসেড রাজ্য থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।[৩৪০] নিঃসন্দেহে এ বিষয়টি ভবিষ্যতে এডেসার শক্তি ও সামর্থ্যকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করবে। মসুলের দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র নয় মাসের মাথায় ৫২২ হিজরি সনের জুমাদাল উখরা মাসে (১১২৮ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে) ইমাদুদ্দিন জিনকি আলেপ্পোতে প্রবেশ করেন।[৩৪১] অর্থাৎ অভাবনীয় স্বল্পতম সময়ে তার এই লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়।

ইমাদুদ্দিন জিনকি আলেপ্পোতে প্রবেশ করেই এক অভিনব রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি আলেপ্পোর সাবেক শাসক রিজওয়ান বিন তুতুশের কন্যা খাতুনকে বিয়ে করেন।[৩৪২] এ বিয়ের পেছনে মূলত রাজনৈতিক চিন্তাধারা কার্যকর ছিল। কারণ, এর মাধ্যমে তিনি রিজওয়ান-পরিবার ও রিজওয়ান-সংশ্লিষ্টদের ক্রোধ প্রশমিত করতে পারবেন। ভুলে গেলে চলবে না, রিজওয়ান ৪৮৭ হিজরি থেকে ৫০৭ হিজরি সন পর্যন্ত দীর্ঘ বিশ বছর আলেপ্পো শাসন করেছেন। আলেপ্পোতে তার পরিবারের যেমন মজবুত অবস্থান ছিল, তার সম্পর্কের পরিধিও ছিল অতি বিস্তৃত। পাশাপাশি এর মাধ্যমে রিজওয়ান-পুত্র ইবরাহিমকে শান্ত রাখা যাবে, যিনি কদিন আগেও আলেপ্পোর শাসক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ইমাদুদ্দিন জিনকির আগমনে ভীত হয়ে পালিয়ে নুসায়বিনে আশ্রয় নিয়েছিলেন।[৩৪৩]

---

৩৩৯. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৪৭।

৩৪০. মুহাম্মাদ সুহাইল তাকূশ, *তারীখুয-যিনকিয়্যীন ফিল-মাওসিলি ওয়া বিলাদিশ-শাম*, পৃষ্ঠা : ১০১।

৩৪১. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৪২।

৩৪২. প্রাগুক্ত, ২/২৪৪।

৩৪৩. প্রাগুক্ত, ২/২৪৩।

সে যুগে শাসক ও রাজন্যবর্গ নিজেদের ক্ষমতার ভিত্তি মজবুত করতে মিত্রদের সঙ্গে এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে শত্রুদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তুলত। এর ফলে মিত্রতা আরও সুদৃঢ় ও শক্তিশালী হতো কিংবা স্বাভাবিক শত্রুতা দূর হয়ে যেত। ইমাদুদ্দিন জিনকিও এই নীতি অবলম্বন করেন। তার এই পদক্ষেপ বেশ ভালো ফল বয়ে আনে। পরবর্তী সময়ে কখনো আলেপ্পোর মতো গুরুত্বপূর্ণ নগরীতে তার বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহ-প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়নি।

ইমাদুদ্দিনের কূটকৌশল!

ইমাদুদ্দিন জিনকির আলেপ্পো প্রবেশের সময়ই বা এর সামান্য পূর্বে ৫২২ হিজরি সনেই ইন্তেকাল করেন দামেশকের অধিপতি তুগতেকিন। ৪৯৭ হিজরি থেকে ৫২২ হিজরি সন পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় পঁচিশ বছর তিনি দামেশক শাসন করেন। তার অসিয়ত অনুযায়ী এরপর দামেশকের মসনদে আরোহণ করেন তার পুত্র বুরি বিন তুগতেকিন।[৩৪৪]

আসুন, তুগতেকিনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ইমাদুদ্দিন জিনকির সঙ্গে আমরাও নতুন করে নজর বোলাই দামেশকের নথিপত্রে!

নিঃসন্দেহে দামেশক পুরো শাম অঞ্চলের সর্ববৃহৎ নগরী এবং এ অঞ্চলের ঘটনাপ্রবাহে অন্যতম প্রভাবক শক্তি। আপন জনশক্তি, ঐতিহাসিক সমৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক ও সামরিক সামর্থ্যের কারণে নগরীটি মুসলমানদের যেকোনো শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রের ভূমিকা রাখে। সার্বিক পরিস্থিতি শোধিত, সুন্দর ও শক্তিশালী থাকলে দামেশক চলমান সমীকরণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক শক্তি বিবেচিত হয়; বিপরীতে দামেশক-পরিস্থিতি কলুষিত ও দুর্বল হয়ে পড়লে পুরো অঞ্চলে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এ বিষয়টি আমরা মোটেও উপেক্ষা করতে পারি না।

ইমাদুদ্দিন জিনকি যেহেতু ক্রুসেডারদেরকে ইসলামি ভূখণ্ড থেকে পুরোপুরি বিতাড়িত করার ন্যায় একটি বৃহৎ ও সুস্পষ্ট পরিকল্পনা লালন করতেন, তাই স্বভাবতই দামেশকের মতো গুরুত্বপূর্ণ নগরী তার কর্মপরিকল্পনায় বিশাল স্থানজুড়েই ছিল। তা ছাড়া শামের মধ্যবিন্দুতে অবস্থানের কারণে

৩৪৪. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৪৮।

দামেশক হতে পারত এন্টিয়ক, ত্রিপোলি ও বাইতুল মুকাদ্দাসে অভিযানে গমন ও প্রত্যাবর্তনের উপযুক্ত সামরিক ঘাঁটি।

আর তাই ক্রুসেডার বিতাড়ন পরিকল্পনা সফলভাবে আঞ্জাম দিতে হলে এই পুরো অঞ্চলের শক্তিকে একীভূত করার পদক্ষেপে দামেশককেও অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি ছিল। নিঃসন্দেহে এ বিষয়টি ইমাদুদ্দিন জিনকির চিন্তায় ছিল; ছিল তার পরে একই দায়িত্ব পালনকারী নুরুদ্দিন মাহমুদ ও সালাহুদ্দিন আইয়ুবির চিন্তাজগতে; বরং সালাহুদ্দিন-পরবর্তী সময়ে আইয়ুবি ও মামলুক সাম্রাজ্যের অন্যান্য শাসকের চিন্তাজগতেও। এমনকি আমরা মনে করি, আমাদের বর্তমান যুগ পর্যন্ত প্রতিযুগের শাসক-প্রশাসকদের কাছে দামেশকের গুরুত্ব ছিল-আছে-থাকবে। কারণ, দামেশক এমন গুরুত্বপূর্ণ ও উপযুক্ত একটি কেন্দ্র, যাকে উপেক্ষা করা মোটেই সম্ভব নয়।

কিন্তু অতি পরিতাপের বিষয়, এমন নানামাত্রিক গুরুত্ব ও প্রভাবের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও শাম ও ফিলিস্তিনে ক্রুসেডাররা চেপে বসার সেই যুগসন্ধিক্ষণে দামেশক যেকোনো ইসলামি ঐক্য পরিকল্পনার সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দায়িত্ব পালন করত!

এমন ঘনঘোর অমানিশাকালে দামেশকের জনগণের পশ্চাৎপদতার মৌলিক কার্যকারণগুলো আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কেন তারা কোনো মৌলিক কাঠামো দাঁড় করাতে পারেনি, কেন কোনো সংহত ইসলামি জাগরণ তাদের দ্বারা সম্ভব হয়নি—তা-ও আমরা বলেছি। এর নেপথ্য কারণ ছিল এ অঞ্চলে শতাব্দীকালের অধিক সময় উবায়দিদের অপশাসন, তারপর জালিম তুতুশ ও তার পুত্র দাক্কাকের দুঃশাসন। দাক্কাকের পরবর্তী শাসক তুগতেকিন যদিও পূর্বসূরিদের তুলনায় ব্যতিক্রম ছিলেন, কিন্তু তিনিও ব্যক্তিস্বার্থ উপেক্ষা করে উম্মাহর কল্যাণকে অগ্রাধিকার দানকারী মহৎপুরুষ ছিলেন না। এর অন্যতম প্রমাণ, ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য তিনি ক্রুসেডারদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করতেও দ্বিধা করেননি।

দামেশকের একটি বড় সমস্যা এই ছিল যে, যিনিই দামেশকের ক্ষমতা লাভ করতেন, তিনি নিজেকে স্বাধীন-স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবতেন। এর কারণ হলো, দামেশক ছিল বৃহৎ, বিস্তৃত, ঐতিহ্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধ একটি নগরী। সবকিছু মিলে সেখানকার সামাজিক পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছিল যে,

দামেশকের শাসক অন্যের আনুগত্য বা বশ্যতা স্বীকারের চিন্তাও করতেন না। তিনি তো দামেশকের 'সম্রাট'! তিনি কীভাবে অন্যের অধীনস্থ রাজন্য হবেন; তা সেই 'অন্য' যে কেউ হন না কেন! এই চিন্তাগত দীনতা যেমন তুগতেকিনের মধ্যে ছিল; ছিল পরবর্তী সময়ে তার পুত্রদের মধ্যেও।

সঙ্গে এ তথ্যটিও যুক্ত করুন যে, তুগতেকিন ছিলেন এ অঞ্চলের অন্যান্য বৃহৎ শাসকপরিবার হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এক তুর্কি পরিবারের সদস্য। তিনি না সেলজুক ছিলেন, না আব্বাসি; আর না বনু উকায়ল, বনু মিরদাস, বনু মুনকিযের মতো এমন কোনো আরব পরিবারের সদস্য, যাদের এ অঞ্চলে দীর্ঘ শাসন-ইতিহাস আছে। ফলে তুগতেকিন কার্যত দামেশকের পরিসরেই সংকুচিত হয়ে থাকতেন। অন্য কোনো নগরীতে তার কোনো সহযোগী ছিল না। এটি ছিল তুগতেকিনের অন্যতম বৃহৎ সমস্যা। তিনি দামেশকের মতো শক্তিশালী নগরীর অধিকর্তা হয়েও অন্য কোনো নগরীকে আপন রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করতে পারতেন না; পারলেও নিতান্ত সাময়িক সময়ের জন্য। তাই তিনি কেবল দামেশক নিয়েই তুষ্ট ছিলেন। আমরা প্রত্যক্ষ করব, পরবর্তীকালে তার পুত্ররাও একই মানসিকতা লালন করবে। পিতার মতো তারাও দামেশকে নিজেদের শাসনক্ষমতা স্থায়ী করার মানসে উম্মাহর বৃহত্তর কল্যাণচিন্তা মাথা থেকে পুরোপুরি সরিয়ে রাখবে![৩৪৫]

ইমাদুদ্দিন জিনকি এ সবকিছুই জানতেন ও বুঝতেন। তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের লক্ষ্যে যে কাঙ্ক্ষিত ঐক্য প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তাতে দামেশককেও যুক্ত করার পরিকল্পনা করেছিলেন। মসুল ও আলেপ্পোর সঙ্গে দামেশক যুক্ত হলে নিঃসন্দেহে সম্মিলিত এ শক্তিতে ভাঙন ধরানো সহজ হবে না।

একটানা পঁচিশ বছরের শাসন শেষে তুগতেকিনের মৃত্যুর পর দামেশক স্বভাবতই শক্তি ও ক্ষমতার ভারসাম্য হারাতে বসেছিল। নতুন শাসক বুরি বিন তুগতেকিনের দামেশকের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার মতো উপযুক্ত অভিজ্ঞতা ছিল না। আর তাই দামেশককে আপন রাজ্য-পরিসরে যুক্ত

৩৪৫. মুহাম্মাদ সুহাইল তাকুশ, *তারীখুল-ফিরিঙ্কিয়্যীন ফিল-মাওসিলি ওয়া বিলাদিশ-শাম*, পৃষ্ঠা : ১১৬।

করতে চাইলে ইমাদুদ্দিন জিনকির জন্য কালবিলম্ব না করে তখনই চেষ্টা করা জরুরি ছিল।

এর সঙ্গে এ বিষয়টিও যুক্ত করা যেতে পারে যে, দামেশক তখন দুষ্ট বাতিনিদের আস্তানায় পরিণত হয়েছিল। পুরোটা জীবন তুগতেকিন তাদেরকে সমীহ করে চলতেন। নিজের নিয়ন্ত্রণ-রশিও তিনি তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ফলে তাদের হিংস্রতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে; দিন-দিন বেড়েছে আতঙ্ক। এ পরিস্থিতি কেবল দামেশকে নয়; পুরো শাম অঞ্চলেই ছিল। এ বিষয়টি চিন্তা করলে বলতে হয়, অনতিবিলম্বে দামেশকে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারলে হয়তো পুরো শাম অঞ্চলেই নিরাপত্তা ফিরে আসবে, মুসলমানদের চেষ্টা-সাধনা সংস্কারমুখী হবে এবং আলিম-উলামা ও নেতা-শাসকদের জন্য বাতিনি শিয়াদের খঞ্জর-তরবারির আশঙ্কামুক্ত হয়ে আল্লাহর পথে অগ্রসর হওয়ার পথ উন্মুক্ত হবে।

কিন্তু একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ হিসেবে ইমাদুদ্দিন জিনকি অনুভব করেন যে, দামেশক, আলেপ্পো ও মসুলের শান্তিপূর্ণ ঐক্য প্রচেষ্টা কার্যত অসম্ভব। তুগতেকিন নিজে ঐক্যের মনোভাব পোষণকারী ছিলেন না। তার পুত্রও নিঃসন্দেহে দামেশকের ক্ষমতা আঁকড়ে পড়ে থাকবেন। আর তাই দামেশককে নতুন ইসলামি কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করতে হলে ইমাদুদ্দিন জিনকির সামনে মাত্র দুটি পথ খোলা ছিল—কৌশল ও চাতুরির পথ কিংবা শক্তি প্রয়োগ ও রক্তপাতের পথ।

ইমাদুদ্দিন জিনকির নীতি ছিল, তিনি একান্ত নিরুপায় পরিস্থিতির শিকার না হলে রক্তপাত এড়িয়ে চলতেন। সারাজীবন তিনি সামরিক সংঘর্ষ পরিহার করে বিভিন্ন ইসলামি রাজ্য ও নগরী নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাই দামেশকের ক্ষেত্রে তিনি প্রথম পথটিই বেছে নেন এবং অসামরিক পন্থায় কৌশলে বুরি বিন তুগতেকিনের ওপর চাপ প্রয়োগ করে দামেশককে নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেন। উল্লেখ্য, ত্রিপোলির নিকটবর্তী গুরুত্বপূর্ণ আরেক নগরী 'হামা'ও তখন দামেশকের অধীনে ছিল।

ইমাদুদ্দিন জিনকির সেই কৌশলের বিবরণে যাওয়ার পূর্বে এ বিষয়টি জানা দরকার যে, এ অঞ্চলের আরেকটি স্বাধীন রাজ্য ছিল হিমস। এ সময় হিমসের ক্ষমতা ছিল সামসামুদ্দৌলা খায়র খান বিন কুরাজা নামক

জনৈক অত্যাচারী শাসকের হাতে। সামসামুদ্দৌলা হিমসবাসীর ওপর প্রচুর জুলুম-নিপীড়ন চালাতেন। তা ছাড়া হিমসের জনগণও দামেশকের মতো একই পরিস্থিতির শিকার হওয়ায় হুবহু একই মন-মানসিকতা লালন করত। হিমসও শতাব্দীকালের অধিক সময় উবায়দি শিয়াদের হাতে শাসিত ছিল। উবায়দিদের প্রস্থানের পর হিমসের নিয়ন্ত্রণ ছিল পর্যায়ক্রমে তুতুশ বিন আলপ আরসালান ও তার পুত্র দাক্কাকের হাতে। এমনকি দাক্কাকের শাসনকালে দীর্ঘ সময় তুগতেকিন হিমসের গভর্নর ছিলেন।

আমরা যদি এ অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান লক্ষ করি, তাহলে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করব যে, দামেশকে পৌঁছতে হলে এর পূর্বেই আলেপ্পো ও দামেশকের মাঝপথে অবস্থিত হিমস ও হামা নগরীর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প ছিল না।[৩৪৬]

এখন মূল প্রসঙ্গে আসি। এই যখন পরিস্থিতি, তাহলে প্রথমে হিমস ও হামা নগরীর ওপর এবং তারপর দামেশকের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় কী হতে পারে ইমাদুদ্দিন জিনকির কর্মপন্থা?

ইমাদুদ্দিন জিনকি একটি রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বনের পরিকল্পনা করেন। তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে একটি বাহিনী গঠন করার ভাব প্রকাশ করেন, এরপর হিমসের আমির খায়র খান বিন কুরাজা ও দামেশকের শাসক বুরি বিন তুগতেকিনের কাছে আসন্ন অভিযানে সহযোগিতা আহ্বান করেন। ইমাদুদ্দিনের পরিকল্পনা ছিল তারা দুজন তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে আগমন করলে তিনি তাদেরকে বন্দি করে ফেলবেন। এতে নগরীদুটি শাসকহীন ও প্রতিরক্ষাশূন্য হয়ে পড়বে এবং তিনি সহজেই বিনা যুদ্ধে নগরীদুটিতে প্রবেশ করতে পারবেন।

ইমাদুদ্দিন জিনকির পরিকল্পনার প্রথমাংশ সফল হয়। খায়র খান বিন কুরাজা নিজ বাহিনীর একটি অংশ নিয়ে আগমন করেন এবং ফাঁদে আটকা পড়েন। কিন্তু বুরি বিন তুগতেকিন নিজে না এসে তার পুত্র সোনজের নেতৃত্বে পাঁচশ সৈন্যের একটি প্রতীকী বাহিনী প্রেরণ করেন। সোনজ তখন হামা নগরীর আমির ছিলেন।

---

৩৪৬. ইমাদুদ্দিন খলিল, *ইমাদুদ্দিন জিনকি*, পৃষ্ঠা : ১১৯।

ইমাদুদ্দিন জিনকি সঙ্গে সঙ্গে সোনজকে আটক করে দ্রুত হামায় প্রবেশ করেন। শাসক ও নিরাপত্তাবাহিনী না থাকায় নগরীটির প্রতিরক্ষাব্যবস্থা তখন দুর্বল হয়ে আছে। ফলে বিনা রক্তপাতেই হামা নগরী ইমাদুদ্দিন জিনকির রাজ্যভুক্ত হয়ে যায়। হামার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়েই তিনি খায়র খান বিন কুরাজাকে আটক করে হিমসেও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। কিন্তু হিমসে তখনও বিরাট সংখ্যক সৈন্য অবস্থান করছিল। তারা নগরদ্বার উন্মুক্ত করে দিতে অস্বীকৃতি জানালে ইমাদুদ্দিন ভেতরে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হন।[৩৪৭]

ইমাদুদ্দিন জিনকি পুত্রমুক্তির বিনিময়ে দামেশকের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেওয়ার জন্য বুরি বিন তুগতেকিনের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। কিন্তু বুরি নতি স্বীকার না করায় দামেশক ইমাদুদ্দিনের একক ইসলামি রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্নই থেকে যায়।

অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত ইমাদুদ্দিন জিনকির এ কৌশল কেবল হামা নগরীতে সফল হয় আর হিমস ও দামেশকে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। শুধু তা-ই নয়; নগরীদুটির সামনে ইমাদুদ্দিন জিনকির পরিকল্পনা প্রকাশ পেয়ে যায়। দামেশকের শাসক বুরি বিন তুগতেকিন ও হিমসের নতুন আমির (বন্দি আমির খায়র খানের পুত্র) কুরাইশ বিন খায়র খান জেনে যান যে, ভবিষ্যতে ইমাদুদ্দিন জিনকি নগরীদুটিতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনে সামরিক সমাধান গ্রহণেও দ্বিধা করবেন না।

অনেক ঐতিহাসিক ইমাদুদ্দিনের এমন কৌশল অবলম্বন; বুরি ও খায়র খানকে জিহাদের কথা বলে আহ্বান জানানো, এরপর প্রতারণা করে প্রথমজনের পুত্র ও দ্বিতীয়জনকে বন্দি করাকে সুস্পষ্ট প্রতারণা আখ্যা দিয়েছেন। আর গাদ্দারি ও প্রতারণা কোনো মুমিনের চরিত্র হতে পারে না।

ইমাদুদ্দিনের গৃহীত কৌশলের অনুপ্রাণিকা ও কার্যকারণসমূহ

বাস্তবতা হলো, ইমাদুদ্দিন জিনকির এই অবস্থানটির বিশ্লেষণ অতি কঠিন। কারণ, বাস্তবেই প্রতারণা কোনো মুমিনের স্বভাব ও আচরণ হতে পারে

৩৪৭. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ৩৬১-৩৬২।

না। তবে বিষয়টি এমন সাদাসিধা নয়। যারা ইমাদুদ্দিন জিনকিকে প্রতারক বলতে চান, তাদের উচিত ঘটনার সংঘটন-কালের পারিপার্শ্বিক সার্বিক বিষয় বিবেচনায় নেওয়া, সবগুলো পয়েন্ট ও যুক্তি-প্রমাণ পাশাপাশি সাজিয়ে রেখে ঘটনার আদ্যোপান্ত নির্মোহ বিশ্লেষণের চেষ্টা করা। এমনটি করা হলে শেষে ঘটনাটির একটি সঠিক চিত্র বের হয়ে আসবে। এমনটি না করে সরাসরি তার অবস্থানকে সুস্পষ্ট প্রতারণা আখ্যায়িত করা মোটেও উচিত হবে না।

যেহেতু এই সময়ের ঘটনাপ্রবাহের বাঁকে বাঁকে আমরা ইমাদুদ্দিন জিনকির সঙ্গে আছি, তাই এক্ষেত্রে আমাদের কিছু বিষয় জেনে রাখা উচিত।

১. ঘটনা ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে নির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলার আগে আমাদের ইমাদুদ্দিন জিনকির ওপর অর্পিত দায়িত্ব নিয়েও ভাবতে হবে। তিনি সেই ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দায়িত্বভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, যারা দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে ইসলামি ভূখণ্ড জবরদখল করে রেখেছিল, অতীতের ত্রিশ বছরের মতো তখনও মুসলিম জনপদগুলোতে গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছিল। সুতরাং এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে 'সময়' একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকারণ বিবেচিত হচ্ছিল।

২. এসব নেতা ঐক্যপ্রক্রিয়াকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করছিল। সুস্পষ্ট ভাষায় প্রত্যাখ্যান না করলেও তাদের প্রতিটি আচরণ ও উচ্চারণে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যানই প্রকাশ পাচ্ছিল। স্বভাবতই এর ফলে ক্রুসেডারদের মোকাবিলায় একক শক্তিশালী প্লাটফর্মে উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করার সুযোগ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। ইমাদুদ্দিন জিনকির দৃষ্টিতে বৃহৎ পরিসরের ঐক্য ছাড়া মুসলমানদের পক্ষে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সফল হওয়া কার্যত অসম্ভব ছিল। ফলে জিহাদের ন্যায় মহান ওয়াজিব দায়িত্ব বাস্তবায়নের জন্য ঐক্যও ওয়াজিব ও আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। আর শরিয়তের স্বতঃসিদ্ধ বিধান হলো, অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব পালনে যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়, তা-ও ওয়াজিব ও আবশ্যক হয়ে যায়।

৩. এসব নেতা কেবল ঐক্যের বিরোধিতা ও জিহাদের পথে বাধা তৈরি করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং তারা ক্রুসেডারদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা

বিনিময়ও করেছিল। তাদের অতীত ইতিহাসে যেমন এর দৃষ্টান্ত আছে, আছে বর্তমান ঘটনাপ্রবাহেও। আর ভবিষ্যতেও আমরা প্রত্যক্ষ করব হিমস ও দামেশকের প্রতিরক্ষায় ইমাদুদ্দিন জিনকির বাহিনীর মোকাবিলায় ক্রুসেডার বাহিনীর সরব উপস্থিতি।

৪. এই প্রক্রিয়ার বিকল্প পদ্ধতি কী হতে পারত?!

বিকল্প হতে পারত শক্তিপ্রয়োগ করে দখল করে নেওয়া। অর্থাৎ ইমাদুদ্দিন জিনকি নগরদুটিকে সসৈন্য ঘেরাও করতে পারতেন। এরপর ভেতর-বাইরের দুই মুসলিম বাহিনীতে তুমুল লড়াই হতো। দু-পক্ষের মুসলিম সৈন্যদের লাশ পড়ত, ইসলামি দুর্গগুলো ধসে পড়ত; নগরপ্রাচীরগুলো বিধ্বস্ত হতো এবং পরিশেষে দু-পক্ষের বুকে দানা বেঁধে থাকত চরম ক্ষোভ, বিদ্বেষ ও প্রতিশোধস্পৃহা।

এই বিকল্প যদিও বড় কঠিন ও তিক্ত; তবে ফকিহগণ হয়তো একে বৈধ বলে মেনে নিতেন। তবে স্বভাবতই তারা তা মেনে নিতেন একেবারে শেষ পর্যায়ে শান্তিপূর্ণ অন্যান্য সব পন্থার প্রয়োগ ও ব্যর্থতা নিশ্চিত হওয়ার পর। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে অনেক মুজাহিদের জীবনে আমরা এভাবে কোনো ইসলামি নগরীকে নিজ রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সামরিক প্রচেষ্টা চালাতে দেখেছি। বিশেষ করে খিলাফতব্যবস্থা যখন দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তখন যেহেতু শতধা বিভক্ত মুসলিম বিশ্বের বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সুনির্দিষ্ট কোনো সম্পর্কসূত্র ছিল না, তাই সে সময় এ জাতীয় প্রচেষ্টা বেশি দেখা গিয়েছিল।

আমরা যদি এই সামরিক বিকল্প ও তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া ও ফলাফলকে এক পাশে রাখি, আরেক পাশে রাখি এক ফোঁটা রক্তপাত ছাড়া হামা দখল করে নেওয়ার ঘটনাকে, তাহলে সহজেই এ বিষয়ে ইমাদুদ্দিন জিনকির গৃহীত পদক্ষেপের যৌক্তিকতা অনুমান করতে পারব।

৫. বুরি বিন তুগতেকিন ও খায়র খান বিন কুরাজার কাছে ইমাদুদ্দিন জিনকির প্রেরিত বার্তার ভাষ্য আমাদের সামনে নেই। আর তাই তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জিহাদের কথা বলেছিলেন, নাকি দ্ব্যর্থবোধক কোনো ভাষাশৈলী ব্যবহার করেছিলেন, তা আমরা জানি না। এমনও হতে

পারে, তিনি সুস্পষ্ট প্রতারণা এড়িয়ে আপন লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য একাধিক মর্মের সম্ভাবনা রাখে এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করেছিলেন।

৬. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যুদ্ধের মূল ভিত্তি হলো কৌশল'।(৩৪৮) আর এটি ছিল প্রকৃতপক্ষে ক্রুসেডারদের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ, জিহাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের সঙ্গে সুনিষ্ঠ মুজাহিদদের লড়াই। ইমাদুদ্দিন জিনকি একে এক ধরনের যুদ্ধকৌশল হিসেবেই বিবেচনা করেছিলেন। এটা ছিল ইজতিহাদ ও ব্যক্তিগবেষণা, যা কখনো ঠিক হয়, কখনো ভুল।

তা ছাড়া তখন তিনি যুদ্ধপরিস্থিতিতে ছিলেন। আর যুদ্ধের এমন কিছু বিশেষ বিধিবিধান আছে, যা শান্তিকালীন পরিস্থিতির বিধিবিধানের তুলনায় একদমই ভিন্ন হয়ে থাকে।

৭. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাব বিন আশরাফকে হত্যার মনস্থ করেন, তখন মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রাযি. নবীজিকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনি কি চান যে, আমি তাকে হত্যা করি?' নবীজি সম্মতিসূচক উত্তর দিলে তিনি বলেছিলেন, 'তাহলে আমাকে তার সঙ্গে কিছু কথা বলার অনুমতি দিন।' নবীজি তাকে অনুমতি দিয়ে বলেছিলেন, 'বলতে পারো।'(৩৪৯)

এরপর মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ও কাব বিন আশরাফের মধ্যে দীর্ঘ কথোপকথন হয়, যাতে মুহাম্মাদ বিন মাসলামার পক্ষ থেকে বড় ধরনের কৌশল ছিল। উভয়ের কথোপকথন শেষ হয় মুহাম্মাদ বিন মাসলামা কর্তৃক কাব বিন আশরাফকে হত্যার মধ্য দিয়ে।

আমার এ বিষয়টি জানা আছে যে, এক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ কোনো মুসলমান নয়; বরং একজন কাফির ছিল। কিন্তু বিধান তো ব্যাপক। তা ছাড়া এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, এসব নগরীর

---

৩৪৮. ইমাম বুখারি, *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ২৮৬৬, ইমাম মুসলিম, *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৭৩৯, ইমাম তিরমিজি, *সুনানে তিরমিজি*, হাদিস নং ১৬৭৫ ও ইমাম ইবনে মাজা, *সুনানে ইবনে মাজা*, হাদিস নং ২৮৩৩।

৩৪৯. কাব বিন আশরাফের হত্যাঘটনার বিস্তারিত পড়ুন: ইমাম বুখারি, *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৮১১ ও ইমাম মুসলিম, *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৮০১।

নেতৃবৃন্দ কাফির ক্রুসেডারদের সঙ্গে সরাসরি ঘৃণ্য সহযোগিতা বিনিময়ে লিপ্ত ছিল।

৮. ইমাদুদ্দিন জিনকি তার প্রতিটি পদক্ষেপের পূর্বে সমকালীন বিশিষ্ট ফকিহগণের কাছে সে বিষয়ে শরিয়তের বিধান জিজ্ঞেস করে নিতেন। তৎকালীন ফকিহগণ সম্ভবত এই কৌশলটিকে ক্ষতিকর হিসেবে স্বীকার করলেও এবং স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অনাবশ্যক বিবেচনা করলেও চলমান বিশেষ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের পারস্পরিক সংঘাতের চেয়ে কম ক্ষতিকর বিবেচনা করেছিলেন।

এ বিষয়টিও মনে রাখতে হবে যে, কেবল অনুমাননির্ভর হয়ে তৎকালীন ফকিহগণের প্রতি অপবাদ দেওয়াও ন্যায় ও ইনসাফের দাবি নয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক তো সমকালীন ফকিহদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'এমন ফতোয়া দিয়েছে দ্বীনহীন কিছু লোক, যাদের শরিয়ত ও সামাজিকতা সম্বন্ধে সুষ্ঠু জ্ঞান নেই। তারা একটি অবৈধ বিষয়কে বৈধ ঘোষণা করেছিল।'[৩৫০]

বাস্তবতা হলো, এমনটি হতেই পারে না যে, ইমাদুদ্দিন জিনকির মতো ব্যক্তি কোনো ধর্মীয় চেতনাহীন আলিমের কাছ থেকে শরিয়তের সমাধান গ্রহণ করবেন। আর তার রাজ্যের আলিমগণও এমন ছিলেন যে, শরিয়তকে উপেক্ষা করে ইমাদুদ্দিন জিনকির চাহিদার অনুকূলে ফতোয়া দেবেন। বরং সমস্ত ঐতিহাসিকের সাক্ষ্যমতে তার রাজ্যের আলিমগণ ছিলেন সমসাময়িক শ্রেষ্ঠতম আলিম। তাদের ফতোয়া যদি ভুল হয়ে থাকে, সর্বোচ্চ এতটুকু বলা যেতে পারে যে, তারা কল্যাণ ও সত্য অনুসন্ধানের লক্ষ্যেই ইজতিহাদ করেছিলেন; কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্তের পরিবর্তে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

৯. একজন ব্যক্তির অস্পষ্ট কর্মের ভালো-মন্দ বিবেচিত হয় তার জীবনাদর্শের আলোকে। ইমাদুদ্দিন জিনকির জীবনাদর্শ পর্যালোচনার পর আমরা কি এ কথা বলতে পারি যে, তিনি এমন একজন প্রতারক নেতা ছিলেন, যিনি শরিয়তের সিদ্ধান্তের প্রতি অবহেলা করতেন?! বরং আমরা তো এ ঘটনার আগে-পরে তার পুরো জীবনের কর্মবিবরণীতে দেখতে পাই, তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ

---

৩৫০. ইবনে ওয়াসিল, *মুফাররিজুল কুরূব*, ১/৪২।

প্রচেষ্টায় লড়াই করেছেন এবং এ পথে নিজের চেষ্টা-সাধনা, সময় এমনকি পুরো জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। তাই আমরা বলতেই পারি যে, তার এই পদক্ষেপ যদি এমন ভুলও হয়ে থাকে, যার পুনরাবৃত্তি কাম্য নয়; তথাপি তিনি এ কাজ ব্যক্তিস্বার্থে নয়ঃ বরং কেবল মুসলমানদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের চিন্তা থেকেই করেছিলেন।

আমরা এ কথা এজন্য বলছি, যাতে কোনো ক্ষমতালোভী ব্যক্তি ইমাদুদ্দিন জিনকির এ পদক্ষেপকে যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করে যেকোনো স্বার্থে উম্মাহর ঐক্যের দোহাই দিয়ে কোনো ইসলামি অঞ্চলে অভিযান চালাতে না পারে। যারা এভাবে বিভিন্ন জনপদকে নিজের রাজ্যভুক্ত করতে চায়, তাদের জীবনাদর্শ দেখে নির্ণয় করতে হবে যে, তারা কি মহান মুজাহিদ ইমাদুদ্দিন জিনকির মতো ব্যক্তি, না জালিম শাসক তুতুশ বিন আরসালান ও তার পুত্রদের মতো?!

১০. সর্বশেষ কথা হলো, ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ. ৫২১ হিজরি থেকে ৫৪১ হিজরি সন পর্যন্ত দীর্ঘ বিশ বছর মুসলমানদের শাসক ছিলেন। এই দীর্ঘ শাসকজীবনে তিনি কয়টি অন্যায় করেছেন?! যদি আমরা তার এ পদক্ষেপকে নিরেট ভুল হিসেবে মেনেও নিই; স্বীকার করে নিই যে, এমন অন্যায় পদক্ষেপ গ্রহণ তার জন্য মোটেও ঠিক হয়নি; তারপরও আমরা দেখতে পাব যে, তার পুরো জীবনে এরূপ ঘটনার অস্তিত্ব বিরল। আর মানবজাতির মাঝে নিষ্পাপ নবীগণ ছাড়া কে এমন আছে, যার জীবনে কোনো ভুলত্রুটি নেই?!

একজন ব্যক্তির ভুলের সংখ্যা সীমিত হওয়া তার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। ভুলে গেলে চলবে না, সময়টা ছিল ভয়াবহ ফিতনার যুগ। খিলাফতব্যবস্থা ছিল দুর্বল; কোনো বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তদানের ক্ষমতা খলিফার ছিল না। আর তাই নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের স্বতঃস্ফূর্ত ঐক্য প্রচেষ্টায় কিছু সংশয় ও জটিলতার উপস্থিতি অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। কারণ, এক্ষেত্রে বিশেষ কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে কাউকে এ বিষয়ে সকল মুসলমানের দায়িত্ব দেওয়া হতো না। ফলে কেউ কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করলে তা ক্ষেত্রবিশেষে প্রজ্ঞাসুলভ সিদ্ধান্তের বিপরীতও হতো।

এই বিশ্লেষণের পর আমরা ইমাদুদ্দিন জিনকিকে মানবিক পরিসীমা থেকে বের করে দিচ্ছি না। আমরা বলছি না, তিনি ছিলেন অতিমানব, যার কোনো ভুল হতে পারে না! আমরা তার কোনো সুস্পষ্ট ভুল বা অন্যায়কর্মের সাফাইও গাচ্ছি না। আমরা বলতে চাচ্ছি, পরিস্থিতি কঠিন ও জটিল হলে এ জাতীয় বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনেক সময় কঠিন হয়ে যায় এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত সর্বাবস্থায় সুফলদায়ক হয় না।

এ বিষয়টিও মনে রাখতে হবে যে, যিনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তিনি চলমান সুকঠিন ঘটনাপ্রবাহের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তিনি দেখেছেন, ক্রুসেডাররা মুসলমানদের ঘরেঘরে লুটপাট চালাচ্ছে; দেখেছেন, কিছু মুসলিম নেতা ও ক্রুসেডারদের মধ্যে ঘৃণ্য আঁতাঁত ও সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তার মতো পরিস্থিতির জলজ্যান্ত সাক্ষী হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া আর ঘটনার শতাব্দীকাল বা কয়েক শতক পরে এসে নিজের কামরায় শান্ত-সুস্থির বসে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও আলোচনা-সমালোচনা করা, ভুল-শুদ্ধ নির্ণয় করা এবং নির্লিপ্তচিত্তে বলে দেওয়া যে, এটি বৈধ আর সেটি অবৈধ; দুয়ের মধ্যে যোজন যোজন তফাত!

কাজেই যিনি বিশ্লেষণ করতে চান, এসব প্রেক্ষাপট সামনে রেখে তারপর বিশ্লেষণ করুন। সঠিক বিশ্লেষণ তো তিনিই করতে পারবেন, মহান আল্লাহ যাকে তাওফিক দেবেন!

কঠিন সংকট!

ইতিহাসের ধারাবর্ণনায় ফিরে আসি। দায়িত্ব গ্রহণের এক বছরের মাথায় ইমাদুদ্দিন জিনকি ইতিমধ্যে মসুল, আলেপ্পো ও হামা নগরীর শাসনকর্তায় পরিণত হয়েছেন। নিঃসন্দেহে তখন তার এ শক্তিকে মোটেও অবহেলা করার সুযোগ ছিল না।

এরপর তিনি তার রাজ্যকে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ করার লক্ষ্যে নগরী-তিনটির পারস্পরিক যোগাযোগব্যবস্থার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হন। এ লক্ষ্যে তিনি ৫২২ হিজরি সনের শেষ দিকে (১১২৮ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে) মসুল ও আলেপ্পোর মধ্যবর্তী সিনজার নগরীতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা

করেন।[৩৫১] এদিকে ইযযুদ্দিন মাসউদ বিন আক সুনকুর আল-বুরসুকির মৃত্যুর পর যোগ্য নেতৃত্বশূন্য হয়ে ক্রুসেডারদের হামলার শিকার হওয়া হাররান নগরীর অধিবাসীরা এ সময় নগরীটিকে জিনকি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার জন্য ইমাদুদ্দিন জিনকিকে আহ্বান জানায়। মহান আল্লাহর অনুগ্রহে ৫২৩ হিজরি সনে (১১২৯ খ্রিষ্টাব্দে) ইমাদুদ্দিন হাররানকে তার রাজ্যভুক্ত করে নেন। হাররান যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে নবগঠিত রাজ্যটি সার্বিকভাবে নিরাপদ ও স্থিতিশীল হয়ে ওঠে।[৩৫২]

ইমাদুদ্দিন জিনকির এরূপ সর্বময় প্রচেষ্টা ও সাধনায় যদিও এ অঞ্চলে এমন এক নতুন ও অদম্য শক্তির উত্থানবার্তা ঘোষিত হচ্ছিল; যা ক্রুসেডারদের আগ্রাসন থেকে মুসলিম জাতিকে উদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে; কিন্তু এই নবশক্তির উত্থান সমসাময়িক সকলের জন্য প্রশান্তিদায়ক ছিল না!

খোরাসান ও মাওয়ারাউন নাহার অঞ্চলের সেলজুক শাসক সুলতান সানজার এ সময় অনুভব করেন যে, এই উদীয়মান শক্তিটি একসময় খোদ সেলজুক সাম্রাজ্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই তিনি পারস্য ও ইরাক অঞ্চলের সেলজুক শাসক ও তার ভ্রাতুষ্পুত্র সুলতান মাহমুদকে পরামর্শ দেন, তিনি যেন ইমাদুদ্দিন জিনকিকে বরখাস্ত করে দুবাইস বিন সাদাকাকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন! আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি, দুবাইস ছিল বনু মাজিদ গোত্রের নেতা। সে ও তার পুরো গোত্র ছিল শিয়া মতাবলম্বী। নয় বছর পূর্বে ৫১৪ হিজরি সনে সে বাগদাদে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করে খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহচেষ্টা চালিয়েছিল।[৩৫৩] এ সময় সে সুলতান সানজারের আশ্রয়ে ছিল এবং তার বিশেষ আস্থাভাজন ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিল। সানজার মসুল ও আলেপ্পোতে তাকে বসিয়ে এ অঞ্চলে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছিলেন। সানজার এ বিষয়টিও বিবেচনায় রেখেছিলেন যে, পূর্ব

---

[৩৫১]. আবু শামা আল-মাকদিসি, *আর-রাওযাতাইন ফি তারীখিদ দাওলাতাইন আন-নূরিয়া ওয়াস-সালাহিয়া*, ১/৭৭।

[৩৫২]. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ৩৭।

[৩৫৩]. সে সময়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো জানতে আরও পড়তে পারেন আল-হুসায়নি কৃত *আখবারুদ-দাওলাতিস সালজুকিয়া*, পৃষ্ঠা : ৮৮-৯০।

বিরোধের কারণে আব্বাসি খলিফাও দুবাইসকে নিজের পক্ষে টানতে পারবেন না।

নিঃসন্দেহে এটি ছিল স্বার্থ ও কুপ্রবৃত্তির যুদ্ধ। সুলতান সানজার মুসলমানদের স্বার্থ ও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করছিলেন না; চিন্তা করছিলেন নিজের স্বার্থের কথা। তাই তিনি সুলতান মাহমুদের কাছে এমন অন্যায় আবদার করে বসেন। সুলতান মাহমুদই ইমাদুদ্দিন জিনকিকে মসুলের শাসনভার প্রদান করেছিলেন। তিনি তার চাচার মর্যাদার প্রতি লক্ষ করে সরাসরি তার বিরোধিতা না করে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করতে ইমাদুদ্দিন জিনকিকে ডেকে পাঠান।

পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত গুরুতর। যে পরিকল্পনা দানা বাঁধছিল, তা হয়তো মুসলমানদের ঐক্যের স্বপ্ন ও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদের ভাবনাতেই সমাপ্তি-রেখা টেনে দেবে।

ইমাদুদ্দিন জিনকি দ্রুত বাগদাদে পৌঁছে সুলতান মাহমুদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে তিনি সুলতানকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিজের পূর্ণ মেধা ও কূটনৈতিক দক্ষতা ব্যবহার করে এ পদে তাকে বহাল রাখার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। তিনি এমন কিছু কার্যকারণ উত্থাপন করেন, যেগুলোর কারণে তাকে স্বপদে বহাল রাখা জরুরি ছিল। যথা—

১. তিনি এই দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর কোনো ভুল করেননি। বরং উল্টো এমন কিছু সফলতা এনে দিয়েছেন, যার অতীত দৃষ্টান্ত নেই। তিনি মসুল, আলেপ্পো, হামা, সিনজার, হাররান ও কুর্দি অধ্যুষিত অঞ্চলকে এক পতাকাতলে সমবেত করতে সক্ষম হয়েছেন।

২. এসব সফলতার সুনাম ও কল্যাণফল মূলত সুলতান মাহমুদই ভোগ করছেন। কারণ, ইমাদুদ্দিন জিনকি তার নামেই রাজ্য পরিচালনা করছেন।

৩. সুলতান সানজার সুলতান মাহমুদের চাচা হলেও তিনি মূলত এ অঞ্চলে সুলতান মাহমুদের স্বার্থ রক্ষা করতে চাচ্ছেন না; বরং নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এজন্যই তিনি নিজের অনুগত লোককে মসুলের মসনদে বসাতে চাচ্ছেন। তিনি মূলত সুলতান

মাহমুদকে আপন অবস্থান থেকে সরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবেই এমনটি করতে চাচ্ছেন।[৩৫৪]

৪. তা ছাড়া ইমাদুদ্দিনের বিকল্প হিসেবে কার নাম প্রস্তাব করা হয়েছে? দুবাইস বিন সাদাকা। যে ভ্রষ্ট লোকটি ইতিপূর্বে বাগদাদে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছিল। অধিকন্তু সে হলো শিয়া মতাদর্শী, আর সেলজুক সাম্রাজ্য আপাদমস্তক সুন্নি মতাদর্শে প্রতিষ্ঠিত।

৫. দুবাইস বিন সাদাকা স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠায় অভিলাষী একজন লোক। মোটেও সুদূরপরাহত নয় যে, তাকে দায়িত্ব প্রদান করা হলে সে কিছুদিন পর মসুল ও আলেপ্পোতে সেলজুক বশ্যতামুক্ত স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার দাবি করবে। ইতিপূর্বে তো সে একেবারে দারুল খিলাফত বাগদাদেই এমন কিছু করার পাঁয়তারা চালিয়েছিল।

৬. দুবাইস বিন সাদাকাকে দায়িত্ব প্রদান করা হলে সে অবশ্যই এ মুহূর্তে মুসলমানদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও লক্ষ্য ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা ভন্ডুল করে দেবে। কেননা, ইতিপূর্বে সে কেবল নেতিবাচক অবস্থানই গ্রহণ করেনি; মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ক্রুসেডারদের সঙ্গে সহযোগিতা বিনিময়ও করেছে।

মুসলমানদের কল্যাণ ও সুলতান মাহমুদের স্বার্থ রক্ষার এসব সম্মিলিত কার্যকারণের দাবি ছিল ইমাদুদ্দিন জিনকিকে স্বপদে বহাল রাখা।

ঐতিহাসিক ইবনুল আছির বলেছেন, সুলতান মাহমুদ ছিলেন সহনশীল ও প্রজ্ঞাবান একজন শাসক।[৩৫৫] ইমাদুদ্দিন জিনকির দীর্ঘ আলোচনা ও এসব যুক্তি শোনার পর তিনি তাকে স্বপদে বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেন। বরং পূর্বের নিয়োগপত্রের সমর্থনে তিনি নতুন আরেকটি নিয়োগপত্র জারি করেন। নতুন নিয়োগপত্রে তিনি ইমাদুদ্দিনকে মসুল, জাযিরা অঞ্চল এবং ইমাদুদ্দিন ইতিমধ্যে শাম অঞ্চলের যেসব নগরী রাজ্যভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন, সেসব এলাকার শাসনভার প্রদান করেন।[৩৫৬]

---

৩৫৪. ইমাদুদ্দিন খলিল, *ইমাদুদ্দিন জিনকি*, পৃষ্ঠা : ৫১।
৩৫৫. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৫৯।
৩৫৬. ইবনে ওয়াসিল, *মুফাররিজুল কুরূব*, ১/৪০৩ আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৪৯।

এভাবে ইমাদুদ্দিন জিনকির সূচিত অগ্রযাত্রায় নেতিবাচক কোনো প্রভাব পড়া ব্যতিরেকেই উম্মাহর ওপর নেমে আসা ভয়াবহ এক সংকটের সমাপ্তি ঘটে।

এ ঘটনা আমাদেরকে আশ্বস্ত করে যে, আল্লাহ এ প্রজন্মের কল্যাণ চান। কারণ, তিনি তাদের হৃদয়ের সততা ও নিষ্ঠার কথা জানতেন। যদি ইমাদুদ্দিন জিনকিকে অপসারণ করে দুবাইস বিন সাদাকাকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হতো, নিশ্চিত করেই জিহাদি আন্দোলন ও জাতি-জাগরণের নবসূচিত উদ্যোগ পুরোপুরি থেমে যেত। কিন্তু আল্লাহ তাআলাই একমাত্র রক্ষাকর্তা।

সুলতান মাহমুদের সমর্থন ও অনুপ্রেরণা সঙ্গে নিয়ে ইমাদুদ্দিন জিনকি আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে মসুলে ফিরে আসেন। খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহও এতে সন্তুষ্ট ছিলেন। কারণ, খলিফা জানতেন, দুবাইস বিন সাদাকা যদি মসুল ও আলেপ্পোর প্রশাসক হতে পারে, পূর্ব শত্রুতার কারণে নিশ্চিত করেই সে খলিফার জন্য সমূহ সংকট সৃষ্টি করবে। সে ধরনের আশঙ্কা থেকে ইমাদুদ্দিন জিনকিই তো তাকে মুক্ত করেছেন!

উরতুক পরিবারের সঙ্গে ইমাদুদ্দিনের সংঘর্ষ

ইমাদুদ্দিন জিনকি মসুলে ফিরে নতুন করে চলমান পরিস্থিতির ওপর নজর বোলান। তিনি অনুভব করেন যে, ইতিমধ্যে তিনি উত্তরে এডেসা ও পশ্চিমে এন্টিয়ক রাজ্যের সীমানার খুব কাছে চলে এসেছেন। এখন ঠিক করতে হবে—কোনটিকে দিয়ে শুরু করবেন তার ক্রুসেডার বিতাড়ন অভিযান।

সন্দেহাতীতভাবেই এডেসা রাজ্য এন্টিয়ক রাজ্যের তুলনায় অনেক গুণ দুর্বল ছিল। এন্টিয়কের কেবল দুর্ভেদ্য দুর্গই ছিল না; ছিল শক্তিশালী নরম্যান যোদ্ধাবাহিনী। ওদিকে এডেসায় ছিল ক্রুসেডার ও আর্মেনীয়দের সম্মিলিত বসবাস এবং উভয় পক্ষের মধ্যে বিদ্যমান তিক্ত সম্পর্ক-সংকট। আর্মেনীয়রা ভুলতে পারেনি বল্ডউইনের ঘটানো সেই গণহত্যার কালো ইতিহাস। অপরদিকে এন্টিয়কে ছিল অভিন্ন জাতির সহাবস্থান, যেখানে আধিক্য ছিল নরম্যান ক্যাথলিকদের।

দুই রাজ্যের এসব পার্থক্যের কারণে ইমাদুদ্দিন জিনকি এন্টিয়কের পূর্বে তুলনামূলক দুর্বল রাজ্য এডেসায় আক্রমণের পরিকল্পনা করেন।

কিন্তু এডেসামুখী অভিযানের পথে বড় একটি বাধা ছিল।

এডেসা রাজ্যের অবস্থান ছিল জাযিরা অঞ্চলের উত্তর অংশে ফুরাত নদীর তীর-ঘেঁষে। জাযিরার উত্তর অংশের অন্যান্য নগরী তখন উরতুক পরিবারের নিয়ন্ত্রণে ছিল। উরতুক পরিবারের সমকালীন প্রজন্ম ছিল তাদের পূর্বপুরুষদের তুলনায় সম্পূর্ণই ব্যতিক্রম। তাদের মাঝে সুকমান বিন উরতুক, ইলগাজি বিন উরতুক বা বালক বিন বাহরামের সমজাতীয় কেউ ছিল না। সমকালীন প্রজন্মের উরতুকি নেতৃবৃন্দ ছিল নিতান্ত দুর্বল ও ভঙ্গুর প্রকৃতির। তারা নিজেদের মাঝে রাজ্য ও জনবল বিভক্ত করে নিয়ে মুসলমানদের দুর্বল ও বিক্ষিপ্ত করে রেখেছিল। এ কথা বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না যে, অঞ্চলটি তখন গোটাদশেক আলাদা রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সবগুলোই ছিল ক্রুসেড রাজ্য এডেসার আশেপাশে এবং এডেসা ও ইমাদুদ্দিন জিনকির মাঝে অন্তরায়।

এডেসার ক্রুসেডারদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উরতুকিদের রাজ্য মাড়ানোর ঝুঁকি নিলে ইমাদুদ্দিন জিনকি একাধিক সংকটে পড়ে যাবেন। যেমন :

১. এসব মুসলিম নেতাই হয়তো পেছন দিক থেকে তার ওপর হামলে পড়বে। ইমাদুদ্দিন জিনকিকে তারা ক্রুসেডারদের মতো নিজেদের জন্যও ঝুঁকি মনে করবে।

২. তারা ক্রুসেডারদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা বিনিময়ও করতে পারে। এমনটি ঘটলে ইমাদুদ্দিন জিনকির বাহিনীকে বিরাট বিপর্যয়ের মুখে পড়ে যেতে হবে।

৩. ইমাদুদ্দিন জিনকি যদি এডেসায় পরাজিত হন, তাহলে পিছু হটে কোথায় আশ্রয় নেবেন? হাররান, আলেপ্পো বা মসুলে ফিরে আশ্রয় গ্রহণের চিন্তা করলে বিরাট দূরত্বের কারণে সমূহ সংকটের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা থাকবে। আর তাই ধারেকাছে কোথাও এমন কোনো ঘাঁটি থাকা দরকার, যেখান থেকে তিনি অভিযানে বের হবেন এবং প্রয়োজনে সেখানে ফিরে আসবেন।

৪. অঞ্চলটি ছিল অতি ঘনবসতিপূর্ণ। আর অধিবাসীরা সকলেই ছিল মুসলিম। তাই তাদের শক্তিকে ইমাদুদ্দিন জিনকির বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত

করা গেলে নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত সহায়ক সংযুক্তি বিবেচিত হবে। বিপরীতে তারা যদি তাকে প্রতিরোধ করে এবং তার অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেয়, তাহলে এমন সংকট সৃষ্টি হবে, যার সমাধান অতি কঠিন।

এসব কারণে ইমাদুদ্দিন জিনকি এডেসা রাজ্যে অভিযান চালানোর পূর্বে এ অঞ্চলটিকে নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার পদক্ষেপকে অতি জরুরি বিবেচনা করেন। তিনি অঞ্চলটির পরিস্থিতি নিরীক্ষণ করতে শুরু করেন এবং মূল ও কেন্দ্রীয় শক্তিগুলোকে চিহ্নিত করেন।

এ অঞ্চলে গোটাদশেক রাজন্যের অস্তিত্ব থাকলেও মূল ও কেন্দ্রীয় নেতা ছিল তিনজন।

১. উরতুক পরিবারের সদস্য হুসামুদ্দিন তামারতাশ বিন ইলগাজি। আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি, তিনি ছিলেন বিলাসী ও আরামপ্রিয় একজন শাসক।[৩৫৭] ক্রুসেডারদের বিতাড়নচিন্তার কোনো স্থান তার মনোজগতে ছিল না। তিনি মারদিনে বাস করতেন। মারদিনের পাশাপাশি আরও কিছু নগরী তার অধিকারে ছিল। সম্ভবত সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নগরী ছিল নুসায়বিন (বর্তমান তুরস্ক-সিরিয়া সীমান্তে অবস্থিত একটি নগরী)।

২. উরতুক পরিবারের আরেক সদস্য রুকনুদ্দৌলা দাউদ বিন সুকমান। তিনি ছিলেন হাসানকেইফের আমির। রুকনুদ্দৌলা চূড়ান্ত কঠোর ও রূঢ় স্বভাবের শাসক ছিলেন।

৩. আমিদ নগরীর আমির সাদুদ্দৌলা আবু মানসুর ইকলিদি। সামরিক শক্তিতে তিনি ছিলেন তিনজনের মধ্যে দুর্বলতম।[৩৫৮]

ইমাদুদ্দিন দেখতে পান, তার রাজ্যের সবচেয়ে নিকটতম নগরী হচ্ছে হুসামুদ্দিন তামারতাশ শাসিত নুসায়বিন নগরী। দামেশক নিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা তার স্মরণে ছিল। তিনি জানতেন, শান্তিপূর্ণ সমঝোতা প্রচেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো কার্যকর ফলাফল এনে দেয় না। আর তাই বাগদাদ থেকে ফেরার পরই ৫২৪ হিজরি সনের শুরুতে তিনি তার বাহিনী

---

৩৫৭. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২২৭।

৩৫৮. মুহাম্মাদ সুহাইল তাকূশ, *তারীখুয-যিনকিয়্যীন ফিল-মাওসিলি ওয়া বিলাদিশ-শাম*, পৃষ্ঠা : ১১১।

নিয়ে রওনা হন এবং নুসায়বিন অবরোধ করেন। শাসক হুসামুদ্দিন তামারতাশ তখন মারদিনে অবস্থান করছিলেন।

ইমাদুদ্দিন জিনকির বাহিনীর সঙ্গে শক্তির তুলনা করে উরতুকি প্রতিরক্ষা বাহিনী নিজেদের অসহায় ভাবতে থাকে। তারা দ্রুত হুসামুদ্দিন তামারতাশের কাছে সাহায্য চেয়ে বার্তা পাঠায়। জবাবে হুসামুদ্দিন বার্তা প্রেরণ করেন যে, তিন দিনের ভেতর তিনি নুসায়বিনে সেনাসাহায্য পাঠাবেন। অথচ নগরদুটির মাঝে দূরত্ব পঞ্চাশ কিলোমিটারেরও কম। হুসামুদ্দিনের ফিরতি বার্তাই তার প্রস্তুতিহীনতা ও অদূরদর্শিতার প্রমাণ বহন করছিল। আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় বার্তাবাহী কবুতরের মাধ্যমে পাঠানো হুসামুদ্দিনের বার্তাটি এসে পড়ে ইমাদুদ্দিন জিনকির হাতে! তিনি বার্তার শব্দে রদবদল ঘটান এবং তিন দিনকে বিশ দিন বানিয়ে দিয়ে কবুতরটি ছেড়ে দেন! তিনি আশা করছিলেন, এর ফলে নগরীটির প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত সেনারা প্রতিরোধের বিষয়ে নিরাশ হয়ে পড়বে এবং শান্তি প্রত্যাশায় নগরদ্বার খুলে দেবে। বাস্তবেও তা-ই ঘটে। ইমাদুদ্দিন জিনকি অনায়াসে বিনা রক্তপাতে নগরটিকে তার রাজ্যভুক্ত করে নেন।[৩৫৯]

এ সংবাদ হুসামুদ্দিন তামারতাশের কাছে পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি দ্রুত উরতুক পরিবারের অন্যান্য নেতার সঙ্গে আলোচনা করে রুকনুদ্দৌলা দাউদ বিন সুকমানের নেতৃত্বে আবু মানসুর ইকলিদি ও দাউদের মিত্র অন্যান্য তুর্কমেন প্রশাসকসহ সহযোগী সবাইকে একত্র করেন। সম্মিলিত বাহিনী 'দারা' নগরীতে সমবেত হয়। বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল বিশ হাজার। ইমাদুদ্দিন জিনকি তাদের সৈন্যসমাবেশের সংবাদ পেয়ে নিজ বাহিনীর চার হাজার সৈন্যের একটি ক্ষুদ্র অংশ নিয়েই তাদের মোকাবিলায় ছুটে যান। এই সামান্য সংখ্যক সৈন্য নিয়েই তিনি অল্প সময়ের যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে সক্ষম হন। বিজয়যাত্রা অব্যাহত রেখে তিনি দারা ও সারজা দুর্গসহ এ অঞ্চলের বেশ কয়েকটি দুর্গ অধিকার করেন।[৩৬০]

---

৩৫৯. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ৩৬-৩৭।

৩৬০. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৫৫।

মাত্র চার হাজার সৈন্যের জিনকি বাহিনীর কাছে উরতুকি বাহিনীর এমন শোচনীয় পরাজয় এ কথাই প্রমাণ করে যে, স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য যেসব মৌলিক উপাদান থাকা জরুরি, তা মোটেও সমকালীন উরতুকি নেতৃবৃন্দের মাঝে ছিল না। তারা প্রত্যেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একেকটি ভূখণ্ডে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের শাসক-রাজাধিরাজ জ্ঞান করত এবং উম্মাহর ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে সম্ভাব্য অগ্রযাত্রাকে স্তিমিত করে দিত।

উরতুকিদের সঙ্গে ইমাদুদ্দিনের এই প্রথম সংঘাত অভাবনীয় ও দ্রুত সফলতা বয়ে আনে। এটি ছিল পুরো জাযিরা অঞ্চলকে ইমাদুদ্দিন জিনকির রাজ্যভুক্ত করার নতুন এক সম্ভাবনার সূচনা। সামান্য প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসহ পুরো অঞ্চলই এ সময় ইমাদুদ্দিন জিনকির পদানত হয়ে যেত, যদি না সেই মুহূর্তেই এন্টিয়ক থেকে উড়ে আসত এক আকস্মিক সংবাদ!

এন্টিয়কের পথে

ঘটনা হলো, ক্রুসেড রাজ্য এন্টিয়কের উত্তর সীমান্তের নিকটবর্তী তোরোস পর্বতমালায় আর্মেনীয়রা একটি আলাদা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। এ সময় তারা এন্টিয়কের শাসক ২য় বোহেমন্ডের হামলার শিকার হয়। আর্মেনীয় রাজ্যটির অধিপতি ১ম লিওন তখন নিরুপায় হয়ে মালাতিয়ার[৩৬১] মুসলিম শাসক ইলগাজি দানিশমান্দির কাছে সহযোগিতা কামনা করেন। একে কেন্দ্র করে ইলগাজি দানিশমান্দির নেতৃত্বাধীন দানিশমান্দ বাহিনী ও ২য় বোহেমন্ডের নেতৃত্বাধীন নরম্যান বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। সবাইকে হতবাক করে দিয়ে যুদ্ধে নরম্যান বাহিনী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয় এবং ২য় বোহেমন্ড নিহত হন![৩৬২]

এর ফলে এন্টিয়ক হয়ে পড়ে নেতৃত্বশূন্য!

২য় বোহেমন্ড তখন বয়সে উঠতি যুবক ছিলেন। তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজা ২য় বল্ডউইনের কন্যা এলিসকে বিয়ে করেছিলেন।

---

৩৬১. মালাতিয়া: শাম সংলগ্ন প্রসিদ্ধ রোমান নগরী। দেখুন: ইয়াকুত আল-হামাবি, *মুজামুল বুলদান*, ৫/১৯২।

৩৬২. আলি বিন মুহাম্মাদ তানুখি, *তারীখুল উয়ায়মি*, ২/৬৭৯।

তাদের একমাত্র কন্যাসন্তান রাজকন্যা কন্সটেন্স (Constance of Hauteville) তখন কোলের শিশু। পশ্চিম ইউরোপের জায়গির রীতি অনুযায়ী এন্টিয়কের শাসনভার এখন চলে যাবে প্রয়াত শাসকের একমাত্র উত্তরাধিকারী শিশু কন্সটেন্সের কাছে! অবশ্য সে পরিণত বয়সে উপনীত হওয়া পর্যন্ত তার জন্য একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত থাকবে। এ সময় পিতা ২য় বল্ডউইনের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা না করে তার কন্যা এলিস নিজেকেই কন্সটেন্সের তত্ত্বাবধায়ক ঘোষণা করেন। সুস্পষ্টই অনুমিত হচ্ছিল যে, তিনি তখন রাজক্ষমতার অভিলাষী হয়ে উঠেছিলেন। বরং এন্টিয়কজুড়ে এ কথা ছড়িয়ে পড়ে যে, তিনি শিশুকন্যা কন্সটেন্সের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নয়; বরং স্বাধীন শাসক হিসেবেই রাজ্যশাসন করতে চাচ্ছেন।[৩৬৩]

এন্টিয়ক থেকে এসব সংবাদ দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

ইমাদুদ্দিন জিনকি এসব সংবাদকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নেন। তিনি অনুভব করেন, এন্টিয়ক পরিস্থিতি এখন একেবারেই বিশৃঙ্খল। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে তিনি যদি আকস্মিকভাবে রাজ্যটির ওপর আক্রমণ চালাতে পারেন, তাহলে হয়তো রাজ্যটি জয় করতে পারবেন এবং অঞ্চলটিকে ক্রুসেডারদের জবরদখল থেকে মুক্ত করতে পারবেন।

খবর পৌঁছে যায় বাইতুল মুকাদ্দাসে রাজা ২য় বল্ডউইনের কাছেও। উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচনের লক্ষ্যে তিনি দ্রুত এন্টিয়ক অভিমুখে রওনা হন।

২য় বল্ডউইন এন্টিয়ক নগরপ্রাচীরের কাছে পৌঁছতেই এক আকস্মিক বিপর্যয়ের শিকার হন! তার কন্যা এলিস তার প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিজেকে এন্টিয়কের একচ্ছত্র শাসক ঘোষণা করেন।[৩৬৪] বরং এতটুকুতেই ক্ষান্ত না হয়ে তিনি ইমাদুদ্দিন জিনকির কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করে বার্তা প্রেরণ করেন এবং তাকে এন্টিয়ক শাসনে সহায়তা করার বিনিময়ে ইমাদুদ্দিন জিনকিকে আনুগত্য ও বশ্যতার নিদর্শনস্বরূপ জিজিয়া কর প্রদানের অঙ্গীকার করেন।[৩৬৫]

---

৩৬৩. Setton op.cit 1, p. 431.

৩৬৪. Stevenson : op.cit., p. 129.

৩৬৫. Runciman: op.cit., II, p.183.

স্বভাবতই ইমাদুদ্দিন জিনকির জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল। কিন্তু ২য় বল্ডউইন এলিসের পত্রবাহককে আটকে ফেলতে সক্ষম হন এবং তাকে হত্যা করেন। এরপর তিনি এন্টিয়ক প্রশাসনের এমন কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে পত্রবিনিময় করেন, যারা স্পষ্টতই অনুভব করছিল যে, এলিসের এই প্রচেষ্টা মূলত এন্টিয়কের মতো একটি সামরিক শক্তিনির্ভর ক্রুসেডরাজ্যকে একচেটিয়া দখলের শিশুসুলভ প্রচেষ্টা। তারা এলিসের পিতা ২য় বল্ডউইনের জন্য নগরদ্বার খুলে দেয়। ২য় বল্ডউইন এন্টিয়কে প্রবেশ করেই দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন এবং কন্যা এলিসকে লাতাকিয়া অঞ্চলে নির্বাসিত করেন।[৩৬৬]

২য় বল্ডউইন যদিও এন্টিয়ক পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন; কিন্তু ইমাদুদ্দিন জিনকি জানতেন, এন্টিয়ক পরিস্থিতি তখনও অস্থিতিশীল রয়ে গেছে। আর তাই তিনি এন্টিয়ক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য দ্রুত তার বাহিনী নিয়ে আলেপ্পোতে চলে আসেন। সম্ভবত চলমান পরিস্থিতিতে এডেসার তুলনায় এন্টিয়কে আক্রমণ করাটাই শ্রেয়তর হবে। আর তাই তিনি উরতুক পরিবার শাসিত রাজ্যগুলোর চিন্তা আপাতত স্থগিত রাখেন। রাজ্যগুলো তেমন শক্তিশালীও ছিল না বিধায় সেগুলো নিয়ে ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণের তেমন প্রয়োজনও ছিল না।

এন্টিয়ক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ইমাদুদ্দিন জিনকি দেখতে পান যে, এন্টিয়ক রাজ্য-শাসিত সবচেয়ে নিকটবর্তী দুর্গ হচ্ছে আসারিব দুর্গ। তখন থেকে পূর্ণ বিশ বছর পূর্বে ৫০৪ হিজরি সনে (১১১০ খ্রিষ্টাব্দে) রিজওয়ান বিন তুতুশ দুর্গটির কর্তৃত্ব হাতছাড়া করেছিলেন।[৩৬৭] আসারিব দুর্গ ছিল পুরো অঞ্চলের সবচেয়ে দুর্ভেদ্য দুর্গ। দুর্গটি থেকে সরাসরি আলেপ্পোর ওপর নজর রাখা যেত। তা ছাড়া আলেপ্পো ও এন্টিয়কের যোগাযোগপথও ছিল দুর্গটির নিয়ন্ত্রণে। এই অতি গুরুত্বের কারণে ক্রুসেডাররা এন্টিয়ক বাহিনীর বিশেষ দক্ষ একটি স্কোয়াডকে আসারিব দুর্গের প্রহরায় নিয়োজিত রেখেছিল।[৩৬৮]

---

৩৬৬. উইলিয়াম সুরি, *তারিখুল হুরূবিস সালিবিয়্যাহ*, ২/৬৫০।

৩৬৭. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৪৭ ও Guillaume de Tyr, pp. 559-601.

৩৬৮. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/১৪০ ও ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/১৫৬।

ইমাদুদ্দিন জিনকি উপলব্ধি করেন, আসারিব দুর্গের পতন ঘটানো গেলে এন্টিয়ককে প্রবলভাবে প্রকম্পিত করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি এর মাধ্যমে আলেপ্পোর নিরাপত্তা জোরদার হবে। কারণ, ক্রুসেডার সৈন্যরা অনেক সময় দুর্গটি থেকে বের হয়ে এসে আলেপ্পোর কৃষকদের ওপর হামলা চালাত এবং ক্ষেত-খামারে লুটপাট চালিয়ে নিরাপদে দুর্গে ফিরে যেত। সবদিক বিবেচনা করে ইমাদুদ্দিন জিনকি এন্টিয়ক রাজ্যের চলমান বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে কাজে লাগাতে সরাসরি আসারিব দুর্গ অবরোধের লক্ষ্যে অগ্রসর হন।

কিন্তু আপন সামরিক অভিজ্ঞতাবলে তিনি অনুভব করেন, দুর্গটি জয় করা অত্যন্ত কঠিন। হয়তো দীর্ঘসময় অবরোধ অব্যাহত রাখলেও বিশেষ কোনো লাভ হবে না। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ দুর্গটি অবিজিত অবস্থায় পেছনে রেখে গিয়ে পশ্চিমে এন্টিয়কে হামলা করাও নিরাপদ নয়। আর তাই তিনি এক বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি তার বাহিনী নিয়ে এন্টিয়ক অভিমুখে রওনা হন এবং আসারিবের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে বোঝান যে, তিনি এন্টিয়কের দুরাবস্থার সুযোগ নিয়ে নগরটির পতন ঘটাতে রওনা হয়েছেন। এটি সুস্পষ্ট যে, তিনি আসারিবের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সামনে নিজের পূর্ণ শক্তিমত্তা প্রকাশ করেননি। ফলে দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থানরত প্রতিরক্ষা বাহিনী ধারণা করে যে, তারা দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে ইমাদুদ্দিনের বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করতে পারবে এবং এর মাধ্যমে এন্টিয়ক রাজ্যকে রক্ষা করতে পারবে।

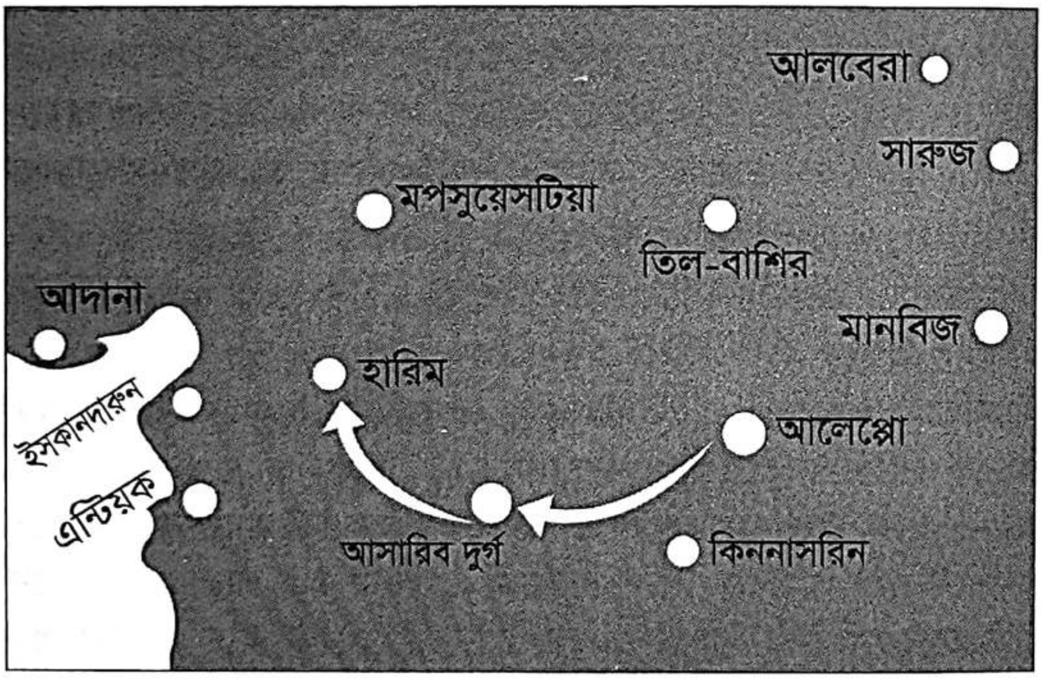
আসারিবের প্রতিরক্ষা বাহিনী ইমাদুদ্দিনের বাহিনীর পিছু নেয়। ইমাদুদ্দিন জিনকি কৌশলে ধীরে ধীরে তাদেরকে দুর্গ থেকে দূরে টেনে আনেন; এরপর হঠাৎ করে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। ইমাদুদ্দিন তাদেরকে এক কৌশলী সামরিক ফাঁদে আটকে ফেলেন। অল্প সময়ের ব্যবধানে প্রতিরক্ষা বাহিনীটি পরাজিত হয়; অনেকে নিহত হয়, বাকিরা হয় বন্দি।[৩৬৯] এরপর ইমাদুদ্দিন জিনকি দ্রুত আসারিবে ফিরে এসে যুদ্ধের মাধ্যমে দুর্গটি জয় করেন। তিনি ভেতরে প্রহরারত সৈন্যদের বন্দি করেন

---

৩৬৯. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৫।

এবং ভবিষ্যতে যেন ক্রুসেডাররা আলেপ্পোতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কোনো সুযোগ না পায়, এ উদ্দেশ্যে দুর্গটি গুঁড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন।[৩৭০]

নিঃসন্দেহে এ বিজয় ছিল অত্যন্ত প্রভাব সৃষ্টিকারী। কারণ, আসারিবে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালনকারী বাহিনীটি ছিল এন্টিয়কের অন্যতম শক্তিশালী ও সুদক্ষ বাহিনী। কিন্তু ইমাদুদ্দিন জিনকি এতেই তুষ্ট না হয়ে এন্টিয়ক অভিমুখে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখেন। তিনি এন্টিয়কের অতি নিকটবর্তী হারিম নগরী অবরোধ করেন। নগরবাসী তাকে নগরীর অর্ধেক রাজস্ব প্রদানের প্রস্তাব দিয়ে শান্তিচুক্তির আবেদন জানায়। ইমাদুদ্দিন জিনকি উপলব্ধি করেন, বিদ্যমান সামরিক শক্তি ব্যবহার করে তার পক্ষে নগরটির পতন ঘটানো কিছুতেই সম্ভব নয়। আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি, তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অভ্যস্ত ছিলেন। আর তাই দুর্গ জয় অসম্ভব বিবেচিত হওয়ায় তিনি কালবিলম্ব না করে নগরবাসীর প্রস্তাব মেনে নেন এবং অবরোধ তুলে নেন।[৩৭১]



মানচিত্র নং-২৭

আসারিব দুর্গ পুনরুদ্ধার এবং হারিম অঞ্চলে জিজিয়া আরোপ

৩৭০. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ৩৯-৪২।

৩৭১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৪২।

নিঃসন্দেহে ইমাদুদ্দিনের এ অভিযান ছিল পুরোপুরি সফল এক অভিযান। এ অভিযানে তিনি আসারিবের মতো দুর্ভেদ্য একটি দুর্গের পতন ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন, সুদক্ষ একটি ক্রুসেড স্কোয়াডের সদস্যদের হত্যা ও বন্দি করতে সক্ষম হয়েছেন। এর পাশাপাশি হারিম নগরীর ওপর জিজিয়া আরোপ করেছেন। এসব ঘটনা ঘটে ৫২৪ হিজরি সনে (১১৩০ খ্রিষ্টাব্দে)।

ক্রুসেডারদের উপর্যুপরি বিপদ

দিগন্তজুড়ে ইমাদুদ্দিন জিনকির সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ইসলামের লড়াকু সৈনিক হিসেবে তিনি সবার মুখেমুখে চর্চিত হতে থাকেন। সকলে অনুভব করে, মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা ইতিমধ্যে ফল দিতে শুরু করেছে।

৫২৫ হিজরি সন মুসলমানদের জন্য সুখকর আরও কিছু সংবাদ নিয়ে আসে। আল্লাহর ইচ্ছায় সে বছরই (১১৩১ খ্রিষ্টাব্দের ২১ আগস্ট) মারা যান বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজা ২য় বল্ডউইন।[৩৭২] ২য় বল্ডউইন ছিলেন বিস্তৃত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন ক্রুসেডার নেতা। তিনি আঠারো বছর এডেসা রাজ্যের শাসক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এরপর তেরো বছর ছিলেন বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজা। এই পুরোটা সময়ে তিনি ক্রুসেডারদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব মজবুতকরণে কাজ করেছেন। এ অঞ্চলের মুসলমান এবং ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রেও তিনি অত্যুচ্চ দক্ষতা ও সুগভীর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন।

২য় বল্ডউইনের মৃত্যু ছিল ক্রুসেডারদের জন্য অনেক বড় আঘাত। এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, ২য় বোহেমন্ডের মৃত্যু এবং ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে এলিসের ব্যর্থ প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে এন্টিয়কে যে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, তখন থেকে ২য় বল্ডউইনই ছিলেন এন্টিয়কের তত্ত্বাবধায়ক।

২য় বল্ডউইনের মৃত্যুতে বাইতুল মুকাদ্দাস ও এন্টিয়ক রাজ্য বিরাট সংকটে পড়ে যায়। বল্ডউইনের মৃত্যুর পর যিনি বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসক পদে অধিষ্ঠিত হন, ইসলামি ভূখণ্ডে তার পদচারণা ছিল অতি

---

৩৭২. Guillaume de Tyr pp. 601-602.

সাম্প্রতিক; এ অঞ্চলে তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছিল না। নতুন এই শাসকের নাম ফাল্ক (Fulk the Younger)।[৩৭৩]

ফাল্ক কীভাবে বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসক পদে উঠে আসেন, তার ইতিহাস বলতে গেলে ফিরে যেতে হবে আরও তিন বছর পেছনে ৫২১ হিজরি সনে (১১২৮ খ্রিষ্টাব্দে)। এ সময় ২য় বল্ডউইন তার বড় মেয়েকে এমন কোনো রাজন্যের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার মনস্থ করেন, যে তার মৃত্যুর পর বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসনভার গ্রহণের যোগ্যতা রাখে। ২য় বল্ডউইনের কোনো পুত্রসন্তান ছিল না; ছিল চার কন্যাসন্তান। এক মেয়ে এলিসকে তিনি এন্টিয়কের শাসক ২য় বোহেমন্ডের কাছে বিয়ে দিয়েছিলেন। এ আলোচনা আমরা পেছনে করে এসেছি। যেহেতু ২য় বল্ডউইন এ অঞ্চলের ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দের মাঝে কন্যাদানে উপযুক্ত কাউকে পাচ্ছিলেন না, তাই তিনি ফ্রান্সের তৎকালীন রাজা ৬ষ্ঠ লুই-এর কাছে পত্র পাঠিয়ে মেয়ের পাণিগ্রহণের উপযুক্ত কোনো যোগ্য রাজন্যকে মনোনীত করার অনুরোধ জানান। রাজা লুই ফ্রান্সের অত্যন্ত প্রভাবশালী এক রাজন্য অ্যাঞ্জো অঞ্চলের কাউন্ট (Count of Anjou) ফাল্ককে উপযুক্ত বিবেচনা করে বাইতুল মুকাদ্দাসে পাঠিয়ে দেন। ২য় বল্ডউইন তার প্রতি আশ্বস্ত হয়ে জ্যেষ্ঠ কন্যা মেলিসেন্ড (Melisende)-কে তার কাছে বিয়ে দেন। এরপর তিনি জামাতা ফাল্ক অ্যাঞ্জোকে সুর ও আক্কা নগরীর জায়গির প্রদান করেন। ২য় বল্ডউইন ফাল্কের সামরিক ও রাজনৈতিক দক্ষতা তৈরিতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি ইহধাম ত্যাগ করলে ফাল্ক বাইতুল মুকাদ্দাসের মসনদে অধিষ্ঠিত হন এবং প্রয়াত রাজার যাবতীয় ক্ষমতা ও অধিকার লাভ করেন। স্বভাবতই তিনি এন্টিয়ক রাজ্যের তত্ত্বাবধায়কও নির্বাচিত হন।[৩৭৪] আর তাই নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, ক্রুসেডারদের পরিস্থিতি সামনে অনেকটা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে। ফাল্কের অনভিজ্ঞতাই এর একমাত্র কারণ নয়; বরং লাতাকিয়ায় নির্বাসিত রাজকন্যা এলিস নিশ্চয়ই সামনে সুযোগ পেলেই এন্টিয়কের ক্ষমতায় বাগড়া বসাবেন।

---

৩৭৩. Guillaume de Tyr pp. 601-602.

৩৭৪. Guillaume de Tyr pp. 594.

এর অল্প কদিন পরই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়। এডেসার অভিজ্ঞ শাসক জোসেলিন ডি কার্টেনি ইহধাম ত্যাগ করেন এবং তার পুত্র ২য় জোসেলিন (Joscelin II of Edessa) এডেসার শাসনভার গ্রহণ করেন। ২য় জোসেলিন তার পিতার অভিজ্ঞতার এক-দশমাংশেরও অধিকারী ছিলেন না।[৩৭৫] নিঃসন্দেহে এ ঘটনা ছিল মুসলমানদের পক্ষে বিরাট সহায়ক। এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, পরপর দুজন ঝানু ক্রুসেডার শাসকের মৃত্যু এমন সময়ে হয়েছিল, যখন ইমাদুদ্দিন জিনকির নেতৃত্বে মুসলমানদের শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

দুবাইস বিন সাদাকার বন্দিত্ব

প্রায় একই সময় ঘটে আরেক কাণ্ড, যার প্রভাবে চলমান পরিস্থিতি অনেকটা বদলে যায়। শিয়া বনু মাজিদ গোত্রের নেতা ও সেলজুক পরিবারের প্রবীণ পুরুষ সুলতান সানজারের মিত্র দুবাইস বিন সাদাকা এ সময় দামেশকের শাসক বুরি বিন তুগতেকিনের হাতে বন্দি হয়। কোনো যুদ্ধে বা সংঘাতে নয়; ঘটনাক্রমে দুবাইস পথ হারিয়ে হাসসান বিন কুলসুম আল-কালবির হাতে পড়ে যায়। হাসসান তাকে চিনতে পেরে এবং তার মূল্য উপলব্ধি করে তাকে বুরি বিন তুগতেকিনের হাতে তুলে দেন এবং এর মাধ্যমে দামেশক অধিপতির নৈকট্য অর্জনে সচেষ্ট হন।

দুবাইস বিন সাদাকার বন্দিত্বের সংবাদ জানতে পেরে ইমাদুদ্দিন জিনকি এ বিষয়ে উদ্যোগী হন এবং বুরি বিন তুগতেকিনের কাছে দূত প্রেরণ করে সমঝোতা আলোচনা করেন। শেষে উভয়ের মধ্যে বন্দিবিনিময়ের চুক্তি হয়। সিদ্ধান্ত হয়, ইমাদুদ্দিন জিনকি দামেশক অধিপতির পুত্র সোনজকে মুক্তিদানের বিনিময়ে দুবাইস বিন সাদাকাকে গ্রহণ করবেন।[৩৭৬]

চুক্তি অনুযায়ী বন্দিবিনিময় কার্যকর হয়। স্বয়ং দুবাইস বিন সাদাকাসহ সকলের ধারণা ছিল, ইমাদুদ্দিন জিনকি দুবাইসকে হাতে পেয়ে প্রচণ্ড শাস্তি দেবেন। কারণ, দুবাইস ছিল প্রচণ্ড দুরাচারী ও ফিতনার প্ররোচক। তা ছাড়া ইতিপূর্বে সে আলেপ্পো ও মসুলের প্রশাসক পদে ইমাদুদ্দিন

---

৩৭৫. Guillaume de Tyr pp. 610.

৩৭৬. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৫৮।

জিনকির প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। কিন্তু ইমাদুদ্দিন তার সুবিখ্যাত কূটনৈতিক প্রজ্ঞা খাটিয়ে সকলের প্রত্যাশার বিপরীত এক কাজ করেন।[৩৭৭]

তিনি দুবাইসকে একজন নেতা ও শাসকের মতো অভ্যর্থনা জানান, তাকে একজন মহান রাজার মতো নৈকট্য ও মর্যাদা প্রদান করেন। তার এ আচরণ সকলকে বিস্মিত ও হতবাক করে দেয়। কিন্তু ইমাদুদ্দিন জিনকি এই সক্রিয় চরিত্রটিকে নিজের পক্ষে টেনে তার দ্বারা উপকৃত হতে এবং আপন রাজ্যের বৃহৎ স্বার্থে তাকে কাজে লাগাতে চাচ্ছিলেন।[৩৭৮]

দুবাইস বিন সাদাকা ছিল সে সময়ের সমাজে অন্যতম প্রভাবশালী চরিত্র। যদিও এ কথা অনস্বীকার্য যে, তার প্রভাব ছিল পুরোপুরি নেতিবাচক; কিন্তু সে এমন বৃহৎ একটি জনগোষ্ঠীকে পরিচালিত করতে পারত, যারা বিশেষ করে ওয়াসিত ও হিল্লা অঞ্চলসহ মধ্য ইরাকের বিরাট এলাকাজুড়ে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। এমন একজন ব্যক্তি ইতিপূর্বে কীভাবে বাগদাদে শাসনব্যবস্থা বদলে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছিল? এমন পরিকল্পনা করার মতো দক্ষতা, ক্ষমতা, প্রভাব ও জনশক্তি ছিল বলেই সে এই পরিকল্পনা করতে পেরেছিল। তাহলে ইমাদুদ্দিন জিনকি কেন এই পরিস্থিতিতে তার মিত্রতা কিনে নেবেন না?! এর মাধ্যমে তো তিনি তার 'উম্মাহর ঐক্য ও ক্রুসেডারদের বিতাড়ন'-এর বৃহৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দুবাইসকে তার পাশে পাবেন কিংবা নিদেনপক্ষে তার নিরপেক্ষতা ও নিষ্ক্রিয় থাকার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হবেন।

দুবাইসের গোত্র বনু মাজিদ কখনোই ময়দান থেকে পুরোপুরি অদৃশ্য হবে না। দুবাইসের অবর্তমানে কেউ না কেউ তাদের নেতৃত্বভার গ্রহণ করবে। তাহলে ইমাদুদ্দিন কেন দুবাইসকে নিজের পক্ষে টেনে বৃহৎ গোত্রটির ঝোঁক তার দিকে ঘুরিয়ে দেবেন না?

তা ছাড়া দুবাইস ছিল সেলজুক সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ ব্যক্তি সুলতান সানজারের অতি নিকটভাজন। ইমাদুদ্দিন জিনকির এ আচরণ নিশ্চিত করেই সুলতান সানজারের মনকে প্রশমিত করবে। সুলতান সানজার তো ইতিপূর্বে ইমাদুদ্দিনের জায়গায় এই দুবাইসকে মসুলের প্রশাসক পদে অধিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি এখন অবাক বিস্ময়ে

---

৩৭৭. প্রাগুক্ত, ৯/২৫৮-২৫৯।

৩৭৮. হাসান ইবরাহিম হাসান, *তারীখুল ইসলাম*, ৪/৭১।

দেখবেন, সেই ইমাদুদ্দিন জিনকিই এখন তার অতি নিকটভাজন বন্ধুকে রক্ষায় এগিয়ে এসেছেন।

ইমাদুদ্দিন জিনকির এই আচরণ পারস্য ও ইরাকের সেলজুক নেতা সুলতান মাহমুদের নিকটও সমালোচিত হবে না। কারণ, দু-বছর পূর্বে ইমাদুদ্দিন যদি মজবুত যুক্তি-প্রমাণ ও চমৎকার উপস্থাপনের মাধ্যমে তাকে সন্তুষ্ট করতে না পারতেন, তাহলে তো তিনি দুবাইসকে মসুল ও আলেপ্পোর শাসনভার প্রদানে দ্বিধা করতেন না।

এই আচরণের একমাত্র নেতিবাচক দিক হলো, এতে খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহ প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন। কারণ, তিনি দুবাইসকে প্রচণ্ড ঘৃণা করতেন। এই দুবাইস তাকে খলিফা পদ থেকে অপসারণের জন্য বিদ্রোহ প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, যা খলিফাদের নীতিতে বিস্মরণ-অযোগ্য অমার্জনীয় এক অপরাধ। তাই স্বভাবতই অনুমিত ছিল যে, খলিফা ইমাদুদ্দিন জিনকির এই অবস্থানের বিরোধিতা করবেন। কিন্তু ইমাদুদ্দিন শুরু থেকেই তার দৃষ্টিভঙ্গি সুনির্ধারিত করে রেখেছিলেন। এ অঞ্চলের কেন্দ্রীয় শক্তিগুলোর প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সুস্পষ্ট। তার মূল মিত্রতা ও আনুগত্য ছিল সুলতান সানজার ও সুলতান মাহমুদের প্রতি, খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহর প্রতি নয়। এমনকি খলিফা কিছুটা শক্তি প্রদর্শন করলেও তার দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিতে পরিবর্তন আসবে না।

এ কথা বলার অবকাশ রাখে না যে, শিয়া নেতা দুবাইস বিন সাদাকাকে নিজের পক্ষে টানার জন্য ইমাদুদ্দিন জিনকি আকিদা ও বিশ্বাস এবং ফিকহ ও শরিয়তের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের শিথিলতা করেননি; আদর্শগত নমনীয়তাও প্রদর্শন করেননি। তার এই আচরণ ছিল পুরোপুরি রাজনৈতিক পদক্ষেপ এবং দুবাইসের দৃষ্টিভঙ্গিকে ইসলামের স্বার্থমুখী করার কৌশলী প্রচেষ্টা। দুবাইসের ইসলামবিরোধী ধর্মীয় বিশ্বাস ও আদর্শের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ যেমন তার উদ্দেশ্য ছিল না, বিপরীত দুই মেরুর দুই মতাদর্শকে মৈত্রিক সহাবস্থানে নিয়ে আসাও তার উদ্দেশ্য ছিল না।

যেমনটি স্বাভাবিক ছিল, ইমাদুদ্দিন জিনকির এ আচরণ সুলতান সানজার ও সুলতান মাহমুদের মনঃপূত হয় এবং একই সঙ্গে তা খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহকে প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ করে। খলিফা ইমাদুদ্দিন জিনকির

কাছে দূত পাঠিয়ে দুবাইস বিন সাদাকাকে তার হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানান। কিন্তু এত কিছু করার পর দুবাইসকে মেরে ফেলার জন্য খলিফার কাছে হস্তান্তর করা ইমাদুদ্দিনের জন্য স্বভাবতই অসম্ভব ছিল। তিনি খলিফার দাবি নাকচ করে দেন। এতে খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহ আরও বেশি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।[৩৭৯]

৫২৪ হিজরি সনের শুরু ও মধ্যভাগের প্রতি সামগ্রিকভাবে নজর বোলালে আমরা বলতে পারি, ইতিমধ্যে ব্যাপকভাবে ইমাদুদ্দিন জিনকির ক্ষমতা ও মর্যাদার প্রভূত উন্নতি ঘটেছে। তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসারিব দুর্গ পুনরুদ্ধার করেছেন, হারিমে অভাবনীয় সফলতা লাভ করেছেন এবং জনহৃদয়ের প্রিয়তম নেতায় পরিণত হয়েছেন। চলমান রাজনৈতিক যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো ঘুঁটি এখন তার হাতে। বিশেষত নুসায়বিন ও দারা নগরী জয়ের পর পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, সবাই মনে করছে—শীঘ্রই তিনি এডেসায় অভিযান পরিচালনা করবেন। এরপর দুবাইস বিন সাদাকাকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে তিনি বিদ্যমান সকল শক্তিকে একটি সুনির্ধারিত লক্ষ্যে ব্যবহারের মনোভাব স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আর তা হলো—উম্মাহর ঐক্য ও ক্রুসেডার বিতাড়ন।

মুসলমানদের এমন ইতিবাচক চিত্রের বিপরীতে ক্রুসেড শিবিরে তখন ব্যাপক বিপর্যয়-চিত্র। ২য় বল্ডউইন ও ১ম জোসেলিন দৃশ্যপট থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন এ অঞ্চলে একেবারে সীমিত অভিজ্ঞতার অধিকারী ফাল্ক অ্যাঞ্জো এবং পিতার তুলনায় যোগ্যতা ও বীরত্বে যোজন যোজন পিছিয়ে থাকা ২য় জোসেলিন। এ ছাড়াও আছে এন্টিয়কের বিধ্বস্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি।

চলমান পরিস্থিতি এ বার্তাই ঘোষণা করছিল যে, আগামী দিনগুলো হবে মুসলমানদের উন্নতি-অগ্রগতি ও বিজয়ের দিন এবং ক্রুসেডারদের উদ্বেগ-অস্থিরতা ও পরাজয়ের দিন।

---

৩৭৯. প্রাগুক্ত, ৪/৭১।

সুলতান মাহমুদের ইন্তেকাল

কিন্তু বাতাস তো অনেক সময় প্রবাহিত হয় জীবনতরীর প্রতিকূলে!

হঠাৎ করেই এমন এক ঘটনা ঘটে, যা ঘটনাপ্রবাহের গতিধারাই পরিবর্তন করে দেয় এবং পরবর্তী প্রায় চার বছরের জন্য জিহাদি তৎপরতা থামিয়ে দেয়। মাত্র সাতাশ বছরেরও কম বয়সে ইন্তেকাল করেন সুলতান মাহমুদ।[৩৮০]

আকস্মিক এ ঘটনা মুসলিম উম্মাহর শক্তির ভারসাম্য বদলে দেয়। অল্পবয়সী সুলতান মৃত্যুকালে অপরিণত কয়েকটি শিশুসন্তান রেখে যান। ফলে সাম্রাজ্যের ক্ষমতা দখলের জন্য ক্ষমতালোভী বিভিন্ন শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। উম্মাহর অবস্থা হয়ে যায় কুরআনে বর্ণিত সেই নারীর ন্যায়, যে বহু পরিশ্রম করে মজবুত সুতা তৈরি করার পর পাক খুলে তা টুকরো টুকরো করে ফেলেছে!

সালতানাতের মসনদ বড় লোভনীয় ও আকর্ষণীয় বস্তু। বহু দিন, বহু বছর পর এই মসনদ দখলের সুযোগ আসে। আবার কত দিন পর এ সুযোগের পুনরাবৃত্তি ঘটবে, আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না! আর তাই ক্ষমতালোভী প্রতিটি শক্তি এই আরামদায়ক মসনদের কর্তৃত্ব দখলে মরিয়া হয়ে ওঠে।

কারা ছিল সালতানাতের ক্ষমতাপ্রত্যাশী? এক-দুজন নয়; গুনে গুনে ছয়জন!

১. দাউদ বিন সুলতান মাহমুদ। সুলতান মাহমুদ মৃত্যুর আগে তাকেই সালতানাতের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে গিয়েছিলেন। কিন্তু এ সময় তার বয়স ছিল দশ বছরেরও কম। এ কারণেই তিনি তার আতাবিক (রাজশিক্ষক) আক সুনকুর আহমাদিলির তত্ত্বাবধানে ছিলেন।[৩৮১]

২. সুলতান মাহমুদের ভাই মাসউদ বিন মুহাম্মাদ বিন মালিকশাহ। সদাচারী ও সচ্চরিত্রবান সুলতান মাসউদ এ সময় জুরজানের শাসনকর্তা ছিলেন। যথেষ্ট সামরিক শক্তি ও বৃহৎ একটি সেনাবাহিনী তার অধীনে ছিল। এ সময় তার বয়স ছিল তেইশ বছর।[৩৮২]

---

৩৮০. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৫৯।

৩৮১. প্রাগুক্ত, ৯/২৫৯।

৩৮২. প্রাগুক্ত, ৯/৩৭৩।

৩. সুলতান মাহমুদের আরেক ভাই তুগরল বিন মুহাম্মাদ বিন মালিকশাহ। তিনি মহানুভব, ন্যায়পরায়ণ ও জনসাধারণের প্রিয়পাত্র ছিলেন। এ সময় তার বয়স ছিল বাইশ বছর।[৩৮৩]

৪. সুলতান মাহমুদের তৃতীয় আরেক ভাই সেলজুকশাহ বিন মুহাম্মাদ বিন মালিকশাহ। তিনি পারস্য ও খোজেস্তানের শাসক ছিলেন। তার বয়স অজ্ঞাত।

৫. সুলতান মাহমুদের চাচা সুলতান সানজার। তৎকালীন সেলজুক পরিবারের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি। খোরাসান ও মাওয়ারাউন নাহার অঞ্চলের শাসক ছিলেন। বয়সেও সবার প্রবীণ ছিলেন, তখন তার বয়স ছিল ছেচল্লিশ বছর। তবে প্রয়াত সুলতান মাহমুদের রাজ্য ইরাক ও পূর্ব পারস্য থেকে তার শাসিত অঞ্চল ছিল বেশ দূরে।[৩৮৪]

৬. খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহ। তিনি সেলজুক পরিবারের প্রভাব-কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী হতে চাচ্ছেন। অবশ্য এক্ষেত্রে তিনি সফল হলেও কেবল বাগদাদ ও আশেপাশের এলাকার শাসনক্ষমতার চেয়ে বড় কিছু লাভ করতে পারবেন না। কারণ, সে সময় খলিফা ও খিলাফতের সামরিক শক্তি ও নিজস্ব বাহিনী ছিল খুবই দুর্বল।

ক্ষমতার লড়াইয়ে ছিল এই ছয় শক্তি। রাজত্ব হাসিলের পেছনে তাদের প্রত্যেকেরই কিছু বিশেষ স্বার্থ ও যৌক্তিকতা আছে। প্রত্যেকের পেছনেই আছে কিছু সহযোগী, সমর্থক, জনতা ও সৈন্যদল!

নিঃসন্দেহে এটি ছিল এক কঠিন দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি, যা উম্মাহকে ঠেলে দিচ্ছিল সংঘাত ও বিভক্তির এক জ্বলন্ত উনুনে।

এর সঙ্গে যদি যোগ করা হয় সেসব শক্তিকে, যারা সালতানাতের মসনদ লাভের অভিলাষী না হলেও অন্যতম প্রভাবক শক্তি ছিল, তাহলে পরিস্থিতি আরও জটিল বিবেচিত হবে। নিঃসন্দেহে এ জাতীয় শক্তিসমূহের মধ্যে সর্বশীর্ষে থাকবে ইমাদুদ্দিন জিনকির নাম।

---

৩৮৩. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৭৮।

৩৮৪. সুলতান মাহমুদের জীবনী সম্পর্কে জানতে দেখুন: আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৪১৫-৪১৬।

ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত

ইমাদুদ্দিন জিনকি যদিও কাগজে-কলমে ছিলেন একটি রাজ্যের প্রশাসক মাত্র; কিন্তু ততদিনে তিনি অন্যতম শক্তিশালী সামরিক নেতা ও প্রভাবশালী প্রশাসকে পরিণত হয়েছিলেন। কারণ, ইতিমধ্যে তিনি মসুল, আলেপ্পো, হাররান, হামা, নুসায়বিন ও কুর্দি অধ্যুষিত অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। বরং তার কর্তৃত্ব এন্টিয়ক রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলেও পৌঁছে গেছে। অধিকন্তু তিনি সেই মহান বীর, যিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে একের পর এক বিজয় অর্জন করেছেন। মুসলিম উম্মাহর হৃদয়জগতের স্বপ্ন এখন তাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। হ্যাঁ, এ পর্যায়ে তিনি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্রের ঘোষণা প্রদানের সক্ষমতা রাখতেন না এবং স্বাধীনতা ঘোষণা ও একটি নির্ভেজাল জিহাদি চেতনানির্ভর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তাকে সার্বিক সহায়তা করার মতো বৃহৎ কোনো গোত্র ও পর্যাপ্ত সহযোগী-সমর্থক তার পাশে ছিল না। কিন্তু এ পর্যায়ের শক্তি তার ছিল যে, সালতানাতের ক্ষমতা নিয়ে বিবাদরত কোনো পক্ষই তাকে উপেক্ষা করতে পারত না। তদ্রূপ এ সময় হুট করে তাকে পদচ্যুত করাও কারও জন্য সহজ ছিল না। কারণ, এতে মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তা ছাড়া ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তার প্রয়োজনীয়তাও তখন সকলের সামনে দৃশ্যমান ছিল।

আর তাই এমনটিই প্রত্যাশিত ছিল যে, ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে মাঠে থাকা এক বা একাধিক শক্তি ইমাদুদ্দিন জিনকিকে নিজেদের পক্ষে টানার চেষ্টা করবে আর ইমাদুদ্দিন জিনকিও ভেবে-চিন্তে উত্তম ও অনুকূল সিদ্ধান্ত নেবেন। এমন কারও সঙ্গে তার সংঘাতে জড়ানো চলবে না, যে পরবর্তী সময়ে হয়তো সুলতান পদ লাভ করবে। সেক্ষেত্রে তার অবস্থান নড়বড়ে হয়ে পড়বে এবং অনিবার্য পরিণতি হিসেবে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদি তৎপরতাও স্থগিত হয়ে যাবে।

এই জটিল পরিস্থিতিতে কী ছিল ইমাদুদ্দিন জিনকির দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা?

পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত জটিল। কারণ, ক্ষমতার সম্ভাব্য দাবিদাররা অনেকটা সমশক্তিসম্পন্ন ছিল এবং প্রত্যেকের সম্ভাবনা ছিল কাছাকাছি পর্যায়ের। তবে ইমাদুদ্দিন জিনকির ধারণা অনুযায়ী প্রয়াত সুলতান

মাহমুদের জীবিত ভাইদের মধ্যে সবার বড় মাসউদ বিন মুহাম্মাদের সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিল অন্যদের চেয়ে বেশি।[৩৮৫]

তিনি ভাইদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতম হওয়ায় তার পক্ষে জনসমাগমের সম্ভাবনা বেশি ছিল। তদ্রূপ প্রয়াত সুলতান মাহমুদের শিশু পুত্র দাউদের চেয়েও তিনি শ্রেয়তর বিকল্প। কারণ, দাউদের কোনো কিছু করার ক্ষমতাই নেই; তিনি সুলতান হলে অচিরেই আতাবিক আক সুনকুর আহমাদিলির হাতের পুতুলে পরিণত হবেন। সুলতান সানজারের চেয়েও সুলতান মাসউদের সম্ভাবনা প্রবল ছিল। কারণ, সুলতান সানজার বয়সে প্রবীণ ও প্রভাবশালী হলেও প্রয়াত সুলতানের সাম্রাজ্য থেকে বেশ দূরে ছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল অনেকটা সম্মানসূচক।

বাকি রইল খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহর সম্ভাবনা! খলিফার সাধ ও সাধ্যের মাঝে ছিল বিস্তর ফারাক। চলমান দুর্যোগে দুর্বল সামরিক শক্তির অধিকারী খলিফার পাশে দাঁড়ানো হবে সম্পূর্ণই বাস্তবতাবিবর্জিত ও অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত।

এ সবকিছুর পাশাপাশি সুলতান মাসউদ ছিলেন জননন্দিত সদাচারী একজন ব্যক্তি। আর তাই সুলতান পদে জনগণের তাকে মেনে নেওয়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল।

ইমাদুদ্দিন জিনকি যখন সুলতান মাসউদের সম্ভাবনা নিয়ে ভাবছিলেন, সুলতান মাসউদও তখন সালতানাতের দায়িত্ব প্রাপ্তিতে সহায়তা লাভের জন্য দৃশ্যপটে বিদ্যমান শক্তিগুলোর মধ্যে কোনো মিত্র খুঁজে ফিরছিলেন। আর তার মাথায় প্রথমেই আসে প্রভাবশালী আমির ইমাদুদ্দিন জিনকির নাম!

সুলতান মাসউদ ইমাদুদ্দিনের কাছে বার্তা পাঠিয়ে ক্ষমতার মসনদে যেতে তার সামরিক সহায়তা কামনা করেন এবং বিনিময়ে তাকে সামরিক বিবেচনায় অতি গুরুত্বপূর্ণ নগরী ইরবিলের কর্তৃত্ব প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। ইমাদুদ্দিন জিনকি সুলতান মাসউদের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে ক্ষমতার লড়াইয়ে তার পক্ষে দাঁড়িয়ে যান।[৩৮৬]

---

৩৮৫. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৬২।
৩৮৬. ইবনে ওয়াসিল, *মুফাররিজুল কুরুব*, ১/৪৭।

তৎকালে অনুসৃত রীতি-ঐতিহ্য অনুযায়ী নতুন সুলতানের জন্য আব্বাসি খলিফার কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রাপ্তি জরুরি বিবেচিত হতো। খলিফার স্বীকৃতি লাভের পর সমগ্র ইসলামি বিশ্বে নতুন সুলতানের আনুগত্য-প্রভাব বিস্তৃত ও প্রসারিত হতো। কারণ, জনসাধারণ অন্তত ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে হলেও খলিফার মতামতকে অত্যন্ত মূল্যায়ন করত। জনসাধারণ যদিও খলিফার কেন্দ্রীয় দুর্বলতা ও ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে জানত; কিন্তু তারা মনে করত, খলিফার বিরুদ্ধাচরণ কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না। এজন্য সুলতানরা সব সময় খলিফার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভে সচেষ্ট থাকত। যিনি মনে করতেন যে, খলিফা তাকে কিছুতেই স্বীকৃতি প্রদান করবেন না, তিনি খলিফাকে পুরোপুরি অপসারিত করে নতুন করে এমন কাউকে খলিফা পদে বসাতে সামান্য দ্বিধা করতেন না, যিনি তাকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করবেন!

আর তাই সুলতান পদপ্রত্যাশী সকলে খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষায় ছিল। সাধারণত একজন সুলতানের মৃত্যুর পর সেলজুক পরিবার যার বিষয়ে একমত হতো, খলিফা নতুন সুলতান হিসেবে তাকেই স্বীকৃতি দিতেন। কিন্তু এবার তো পরিস্থিতি ভিন্ন; সেলজুক পরিবারেরই পাঁচ সদস্য নেমেছে ক্ষমতার লড়াইয়ে। প্রয়াত সুলতানের চাচা সানজার, তিন ভাই মাসউদ, তুগরল ও সেলজুকশাহ এবং পুত্র দাউদ। খলিফা তাদের মধ্য হতে কাকে বেছে নেবেন?!

যেহেতু খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহ নিজেও ক্ষমতাপ্রত্যাশী ছিলেন, তাই তিনি তাদের মধ্য হতে এমন কাউকে নির্বাচন করতে চাচ্ছিলেন, প্রশাসনে যার ক্ষমতা ও প্রভাব হবে সবচেয়ে কম। তখন তিনি নিজেই প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে খলিফার পছন্দ ছিল সুলতান সানজার। কারণ, সানজারের অবস্থান ছিল ইরাক থেকে অনেক দূরে। সানজারকে সুলতান নির্বাচিত করা হলে অন্তত পক্ষে ইরাক অঞ্চলে খলিফার কর্তৃত্ব সৃষ্টি হবে, এমনকি ভাগ্য ভালো হলে হয়তো শাম অঞ্চলেও![৩৮৭]

এই ছিল খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহর পরিকল্পনা ও অভিলাষ!

---

৩৮৭. ইবনে ওয়াসিল, *মুফাররিজুল কুরূব*, ১/৪৬-৪৭।

খলিফা তার পরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন সুলতান হিসেবে সানজারের নাম খুতবায় চালু করে দেন। পাশাপাশি তিনি সানজারের প্রতিটি পদক্ষেপকে নতুন সুলতানের পদক্ষেপ বিবেচনা করে সমর্থন জানাতে থাকেন। সুলতান সানজার এতে যারপরনাই মুগ্ধ ও আনন্দিত হন।[৩৮৮]

প্রয়াত সুলতান মাহমুদ মৃত্যুর পূর্বে তার পুত্র দাউদকে পরবর্তী সুলতান নির্বাচিত করেছিলেন। দাউদের সঙ্গে ছিল সেলুজক বাহিনীর মূল ও কেন্দ্রীয় শক্তি ইস্পাহানের বাহিনী। ইতিপূর্বে তারা স্বয়ং সুলতান মাহমুদের অধীনস্থ ছিল। সুলতান দাউদ বয়সে অপরিণত হলেও কিছুতেই তার ক্ষমতা অপহৃত হতে দিতে পারেন না। আর তাই তিনি তাকে নতুন সুলতান হিসেবে স্বীকৃতি দানের জন্য খলিফাকে বাধ্য করতে নিজ বাহিনী নিয়ে বাগদাদ অভিমুখে রওনা হন।

একই সময় প্রয়াত সুলতানের দুই ভাই মাসউদ ও সেলজুকশাহও আলাদা আলাদা বাগদাদের উদ্দেশে যাত্রা করেন। তাদের উদ্দেশ্যও একই— নতুন সুলতান হিসেবে স্বীকৃতি লাভে খলিফাকে চাপ প্রয়োগ!

বাগদাদের পথে এখন তিনটি বাহিনী। দুই ভাই মাসউদ ও সেলজুকশাহর বাহিনী এবং তাদের ভ্রাতুষ্পুত্র দাউদের বাহিনী।

একই সময় মসুল থেকে মাসউদের সমর্থনে সসৈন্য রওনা হন ইমাদুদ্দিন জিনকি।

সুলতান সানজার অনুভব করেন, পথের দূরত্বের কারণে তিনি পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না। তাই তিনি তার তৃতীয় ভ্রাতুষ্পুত্র তুগরলের সঙ্গে জোটবদ্ধ হন এবং বিশাল সৈন্যসমাবেশ ঘটিয়ে বাগদাদের পথে যাত্রা করেন।

খলিফা তো এমন কিছু একদমই প্রত্যাশা করেননি। তিনি কল্পনাই করেননি যে, সানজার নিজে তুগরলকে সঙ্গে নিয়ে বাগদাদ চলে আসবেন আর খলিফা তাদের নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়বেন; যেমন ইতিপূর্বে তিনি অন্যদের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন।[৩৮৯]

---

৩৮৮. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৬২।
৩৮৯. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৬২-২৬৪।

পরিস্থিতি পুরোপুরি জটিল হয়ে পড়েছে। দৃশ্যপটে এখন চারটি পরস্পরবিরোধী শক্তি!

এখন পর্যন্ত ঘোষিত সুলতান দাউদ বিন মাহমুদ তার বাহিনী নিয়ে বাগদাদ রওনা হয়েছেন। আর তার মোকাবিলায় এগিয়ে আসছে আপন আপন সেনাদলের সমর্থনপুষ্ট আরও তিনটি শক্তি। তারাও রওনা হয়েছে বাগদাদ অভিমুখে। যথা—

১. মাসউদের বাহিনী। তার সমর্থনে ইমাদুদ্দিন জিনকিও রওনা হয়েছেন।
২. সেলজুকশাহর বাহিনী।
৩. তুগরলকে সঙ্গে নিয়ে সুলতান সানজারের বাহিনী।

এই জটিলতর পরিস্থিতিতে খলিফার জন্য জরুরি ছিল পরবর্তী সুলতান নির্বাচনে যথেষ্ট আন্তরিক হওয়া এবং এমন কাউকে নির্বাচন করা, যিনি তার পক্ষে থাকবেন।

আত্মঘাতী সংঘাতের কার্যকারণ

সম্ভাব্য সংঘাতের পরিণতি আলোচনা করার আগে এই বিস্ময়কর পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুটা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। অনুসন্ধান করা জরুরি, কেন সহোদর ভাই ও একেবারে নিকটাত্মীয়দের নেতৃত্বে শক্তিশালী বাহিনীগুলো এভাবে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে।

কেন এমনটি হলো? কেমন ছিল তাদের পারস্পরিক সংঘাতের প্রকৃতি?

আমি এখানে কয়েকটি পর্যালোচনামূলক মন্তব্য করব, যা ঘটনার ভেতর থেকে সঠিক সমীক্ষা বের করে আনতে সহায়ক হবে, ইনশাআল্লাহ!

১. পার্থিব মোহ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا»

'আমি তোমাদের জন্য যেসব ফিতনার আশঙ্কা করি, তার অন্যতম হলো পার্থিব শোভা ও চাকচিক্য, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেবেন'[৩৮০]

---

৩৮০. ইমাম বুখারি, *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৬০৬৩ ও ইমাম মুসলিম, *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১০৫২।

তাদের সামনে উন্মোচিত হয়েছিল ক্ষমতামোহের বিরাট ফিতনা। সামান্য ত্যাজ্য সম্পত্তি নিয়ে বিভিন্ন সময় আমরা ভাইদের বিরোধ দেখতে পাই; সেখানে অনেকগুলো বৃহৎ রাজ্যের সমন্বয়ে গঠিত বিশাল সাম্রাজ্যের ক্ষমতা কে ছাড়তে চাইবে?!

যিনি এ পদ লাভ করবেন, তার হাতে ইরাক, ইরান ও বিভক্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রসহ পুরো শাম অঞ্চল, আজারবাইজান, আর্মেনিয়া ও পাকিস্তানের পূর্ণাঙ্গ কর্তৃত্ব এসে যাবে। পরবর্তী সময়ে হয়তো রাজ্য আরও বিস্তৃত হয়ে আরব উপদ্বীপ ও তুর্কিস্তানও তাতে যুক্ত হবে। নিঃসন্দেহে এটি ছিল এক বিশাল আকর্ষণ। বিশেষত মানুষের হৃদয়ের সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ চাহিদা থাকে রাজত্ব ও ক্ষমতার প্রতি—তা কি আর অস্বীকার করা যায়?

২. বিবাদরত ভাইয়েরা এক পিতার সন্তান হলেও প্রতিপালিত হয়েছিল পরস্পর বিচ্ছিন্ন পরিবেশে। একেকজন বড় হয়েছিল একেক রাজ্যে। কারও কারও ক্ষেত্রে মাতৃপরিচয় ছিল ভিন্ন; শিক্ষক-দীক্ষকও ছিল ভিন্ন। আর তাই ভাইদের মধ্যকার স্বভাবজাত যে হৃদ্যতা আমরা দেখে থাকি, তা তাদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি।

৩. নিরেট সামরিক ছত্রছায়ায় প্রতিপালন। বিশেষত সেলজুক সাম্রাজ্যের মতো সর্বোচ্চ স্তরের সামরিক শক্তিনির্ভর সাম্রাজ্যে রাজপরিবারের সন্তানগণ সামরিক পরিবেশেই প্রতিপালিত হতো। ইতিপূর্বেও আমরা দেখেছি, সাধারণত সেলজুক পরিবারের সন্তানদের প্রতিপালন-দায়িত্ব কোনো সামরিক ব্যক্তিকেই প্রদান করা হতো। বরং কখনো সরাসরি সেনাপ্রধানই এই দায়িত্ব পালন করতেন। তুর্কি সেলজুকগণ তাদেরকে 'আতাবিক' বা রাজপুত্রের দীক্ষক নামে অভিহিত করত। যেমন ইমাদুদ্দিন জিনকি ছিলেন সুলতান মাহমুদের পুত্র আলপ আরসালানের আতাবিক, দামেশকের আমির তুগতেকিন ছিলেন দাক্কাক বিন তুতুশের পুত্রদের আতাবিক। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে। নিঃসন্দেহে এরূপ সামরিক প্রতিপালনের কারণে তাদের কাছে পারিবারিক সম্পর্কবোধ ও মানবিক সম্পর্কের অনুভূতি অন্যদের তুলনায় কম ছিল।

৪. যুগটাই ছিল ফিতনা ও বিশৃঙ্খলার। খলিফা ছিলেন দুর্বল। এদিকে ক্ষমতার অভিলাষী প্রত্যেকেরই ক্ষমতা লাভের কোনো না কোনো যৌক্তিকতা আছে। হয়তো সেসব যৌক্তিকতা সন্তোষজনকও ছিল। প্রত্যেকে মনে করছিল, সে আপন ন্যায্য অধিকার লাভের জন্য লড়াই করছে; যাতে শিথিলতার সুযোগ নেই।

পরিস্থিতি যে সত্যিই অস্পষ্ট ও গোলযোগপূর্ণ ছিল, তার একটি প্রমাণ এটিও যে, মুসলিম উম্মাহর আস্থাভাজন শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশও এতে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। বরং ক্ষমতা নিয়ে বিবাদমান সুলতানরাও ছিল উন্নত চরিত্র ও উৎকৃষ্ট আচরণগুণের অধিকারী। সামগ্রিকভাবে তারা তাদের জনগণের কাছে প্রিয় ও নিকটভাজন ছিল।

৫. যোগাযোগ-দুর্বলতা অনেক নেতিবাচক ফলাফল ও জটিল সমীকরণের জন্ম দেয়। তাদের প্রত্যেকেই প্রথমে খলিফার কাছে পৌঁছতে মরিয়া ছিল। অথচ বাগদাদে পৌঁছতে যেমন দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন, দীর্ঘ সময় প্রয়োজন ফিরতেও। এর সঙ্গে যোগ করুন তাদের প্রত্যেকের শাসিত অঞ্চলের বিস্তৃতির বিষয়টি, তাহলে অনুধাবন করা যাবে যে, বিষয়টি কত জটিল ছিল।

৬. নিঃসন্দেহে তাদের প্রত্যেকের চারপাশে যেসব অনুচর ছিল, তারা তাদের প্রত্যেককে আচরণে-উচ্চারণে এ কথাই বোঝাচ্ছিল যে, আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান এবং দায়িত্ব লাভের অধিক হকদার। কারণ, তাদের নেতা সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হতে পারলে লাভ তো তাদেরও। অর্থাৎ এটি কেবল সম্ভাব্য সুলতানের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নয়; আরও অনেকের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়!

এসব প্রেক্ষাপটকে সামনে রাখলে এই বিস্ময়কর ফিতনা ও সংঘাত সৃষ্টির কারণ আমাদের সামনে কিছুটা হলেও সুস্পষ্ট হবে। অবশ্য এসব কারণে এই বিবাদ ও সংঘাতকে কিছুতেই বৈধতা প্রদান বা মার্জনীয় বিবেচনা করা যায় না। কারণ, এই ফিতনা ছিল মুসলিম উম্মাহর জন্য এক বিরাট দুর্যোগ, যা চলমান জিহাদি তৎপরতাকে পরবর্তী চারটি বছরের জন্য স্তিমিত করে দিয়েছিল। আমরা এসব কার্যকারণ মূলত উল্লেখ করেছি ঘটনাপ্রবাহের আদ্যোপান্ত সঠিকভাবে উপলব্ধির মানসে।

এ বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য যে, বিবাদমান এসব পক্ষের মধ্যে যেসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তা তেমন রক্তক্ষয়ী ছিল না। অথচ প্রতিটি পক্ষের জনবল ছিল অনেক, প্রস্তুতিও ছিল ব্যাপক। এর দ্বারা অনুমিত হয় যে, বিবাদরত সুলতানগণের বেশিরভাগই প্রতিপক্ষ ভাইদের রক্তপাতে যথেষ্ট সংযত ছিল। এ কারণেই আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, যুদ্ধের মাঝেই তারা পরস্পর সন্ধি করে নিয়েছে, যুদ্ধজয়ের পর ক্ষমার আচরণ করেছে এবং লড়াই চলাকালে মরিয়াভাব প্রকাশের পরিবর্তে সংযতভাব প্রকাশ করেছে। আর তাই এসব যুদ্ধের ফলাফল ছিল বাহ্যত বিস্ময়কর। এরূপ সংযত মনোভাব কেবল ক্ষমতার অভিলাষী সুলতানদেরই ছিল না; ছিল তাদের সহযোগিতায় অগ্রসর হওয়া সেনাপতিদের মাঝে, এমনকি সৈন্যদের মাঝেও। কারণ, এটি নিশ্চিত যে, ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় যেরূপ উদ্দীপনা কাজ করে, এসব যুদ্ধে তাদের কারও মাঝেই তা ছিল না।

সেলজুক পরিবারে সংঘাতের আগুন

ইতিহাসের ধারাবর্ণনায় ফিরি।

খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহ যদিও ইরাকের পরবর্তী সুলতান হিসেবে সুলতান সানজারের নাম ঘোষণা করার মনস্থ করেছিলেন; কিন্তু সানজারের সসৈন্য রওনা হওয়ার সংবাদ পেয়ে তিনি দ্বিধায় পড়ে যান। তা ছাড়া সানজার সঙ্গে নিয়ে আসছেন সুলতান তুগরল বিন মুহাম্মাদকে। সানজার চলে গেলেও তুগরল তো পুরো পরিস্থিতি নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেবেন।

এ সময়ই পারস্য ভূমিতে সুলতান দাউদ বিন মাহমুদ ও তার চাচা সুলতান মাসউদের বাহিনী পরস্পর মুখোমুখি হয়। প্রত্যেক পক্ষ অপর পক্ষকে বাগদাদ পৌঁছতে বাধা দিলে শুরু হয় উভয় পক্ষের মধ্যে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত দু-পক্ষের সন্ধি হয়। কিন্তু দুজনই খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহর কাছে দ্রুত বার্তা পাঠিয়ে সুলতান পদ লাভের দাবি জানান।

সুলতান দাউদ ও সুলতান মাসউদের মধ্যকার এই লড়াইয়ের সুযোগে ক্ষমতার আরেক দাবিদার সেলজুকশাহ সবার আগে বাগদাদে পৌঁছে যেতে সক্ষম হন এবং এরপর স্বভাবতই তিনি নিজের জন্য সুলতান পদ দাবি করেন।[৩৯১]

---

৩৯১. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৬২-২৬৩।

খলিফা যখন সেলজুকশাহকে অভ্যর্থনা জানিয়ে পারস্পরিক বৈঠকে মিলিত হন, তখনই বাগদাদের নিকটে পৌঁছে যায় দুটি বাহিনী! উত্তর-পূর্ব দিক থেকে পৌঁছায় সুলতান মাসউদের বাহিনী আর উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে পৌঁছায় সুলতান মাসউদের মিত্র ইমাদুদ্দিন জিনকির বাহিনী।

খলিফা পড়ে যান কঠিন সংকটে। বিশেষত দুবাইস বিন সাদাকার ব্যাপারটি নিয়ে তিনি ইমাদুদ্দিন জিনকির প্রতি মোটেও সন্তুষ্ট ছিলেন না। আর তাই তিনি সেলজুকশাহর সঙ্গে দ্রুত সমঝোতা করেন এবং উভয়ে বাগদাদের প্রতিরক্ষার লক্ষ্যে আগত বাহিনীদুটির মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, খলিফা নিজেও জানতেন না, তিনি কার স্বার্থে বাগদাদ রক্ষায় অবতীর্ণ হতে যাচ্ছেন! তিনি বাগদাদের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করবেন নিজের জন্য, সুলতান সেলজুকশাহর জন্য, নাকি সানজার বা সুলতান দাউদের জন্য?! নিঃসন্দেহে পরিস্থিতি ছিল অতি ঘোলাটে। এদিকে যারা বাগদাদ আক্রমণ করতে এসেছে, তারাও পূর্ণ উদ্যম ও শক্তিব্যয়ে আক্রমণ চালাচ্ছে না। কারণ, যত যা হোক, দিনশেষে তো এই বাগদাদ ইসলামি খিলাফতের রাজধানী ও প্রাণকেন্দ্র। তারা, তাদের ভাই-বন্ধু, পরিবার ও আপনজন তো সারাজীবন এই বাগদাদের নিরাপত্তা রক্ষায়ই সচেষ্ট থেকেছে।

আর তাই এসব যুদ্ধ ছিল একেবারেই প্রাণহীন। যোদ্ধাদের সুপ্রসিদ্ধ যুদ্ধদক্ষতার প্রদর্শনী এসব যুদ্ধে হয়নি।

সেলজুকশাহ তার বাহিনী নিয়ে সুলতান মাসউদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বের হন আর খলিফা বের হন ইমাদুদ্দিন জিনকির বিরুদ্ধে লড়াই করতে!

প্রথম সংঘর্ষ হয় খলিফার নেতৃত্বাধীন বাগদাদের বাহিনী ও ইমাদুদ্দিনের নেতৃত্বাধীন মসুলের বাহিনীর মধ্যে। এটি সুস্পষ্ট যে, ইমাদুদ্দিন এ যুদ্ধে তার চিরাচরিত শক্তিমত্তা ও উদ্দীপনা প্রদর্শন করেননি। ফলে যা ঘটার, তা-ই ঘটে; তিনি খলিফার বাহিনীর কাছে পরাজিত হন! আমরা বলব, এমনটিই ছিল স্বাভাবিক। কারণ, খলিফা লড়েছিলেন তার পূর্ণ শক্তি নিয়ে; তার সঙ্গে ছিল বাগদাদের ত্রিশ হাজার সৈন্য। অপরদিকে ইমাদুদ্দিন জিনকি এমন যুদ্ধে জড়াতেই দ্বিধা করছিলেন। তার পরিকল্পনা ছিল একটি প্রতীকী বাহিনী নিয়ে বাগদাদে পৌঁছে কেবল এ বিষয়টি ঘোষণা করা যে, মসুল ও শাম অঞ্চল সুলতান মাসউদের পাশে আছে।

কিন্তু তিনি প্রত্যাশা না করলেও শেষ পর্যন্ত তাকে যুদ্ধে জড়াতে হয়। খলিফার কাছে এটি ছিল প্রাণপণ লড়াই। তাই তিনি তার সর্বোচ্চ শক্তি ব্যয় করেন। তিনি হয়তো এ যুদ্ধের মাধ্যমে ইরাকে সেলজুক সালতানাতের চূড়ান্ত পতনের স্বপ্ন দেখছিলেন!

ইমাদুদ্দিন জিনকি ও তার বাহিনী পরাজিত হয়ে এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। ইমাদুদ্দিন নিজে পালিয়ে উত্তর দিকে চলে যান এবং তিকরিতে গিয়ে পৌঁছেন। তিকরিতের অবস্থান ছিল বাগদাদ ও মসুলের মাঝামাঝি এলাকায়। এ সময় আব্বাসি বাহিনীর একটি অংশ তার পিছু নেয়। স্বভাবতই মারাত্মক কিছু ঘটার আশঙ্কা ছিল। কারণ, মাঝে দজলার প্রতিবন্ধকতা থাকায় তার পক্ষে মসুলে পৌঁছা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তিকরিত দুর্গপতি ইমাদুদ্দিনকে চিনতে পেরে দ্রুত তার নদী পাড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং তাকে আব্বাসি বাহিনীর হাত থেকে উদ্ধার করেন। বরং এরপর তিনি ইমাদুদ্দিন জিনকিকে সসম্মানে তার দুর্গে অতিথি হিসেবে আশ্রয় দেন এবং বেশ কয়েকদিন তার সেবা-শুশ্রূষা করে তার হৃদয় প্রশান্ত করেন। তিকরিত দুর্গের অধিপতি অনুভব করছিলেন, এ ব্যক্তি মুসলমানদের স্বপ্নসম্বল এবং ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঝান্ডাবাহী। আশ্চর্যের বিষয় হলো, তিকরিত তখন অন্য কারও নয়, স্বয়ং আব্বাসি খলিফার অধীনস্থ ছিল। অর্থাৎ তিকরিত দুর্গের অধিপতি নিজের পদ ও ক্ষমতাকে ঝুঁকির মুখে ফেলে ইমাদুদ্দিন জিনকিকে রক্ষায় অগ্রসর হয়েছিলেন।[৩৯২]

দুর্গপতির পরিচয় এখনো বলা হয়নি! তিনি হলেন নাজমুদ্দিন আইয়ুব বিন শাজি। তার অন্যতম পরিচয়, তিনি পরবর্তী ইসলামি ইতিহাসের মহানায়ক সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির পিতা। অবশ্য, আমরা যে সময়ের কথা বলছি, তখনও সালাহুদ্দিনের জন্ম হয়নি।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাজমুদ্দিন আইয়ুব ও ইমাদুদ্দিন জিনকির মধ্যে পারস্পরিক পরিচিতি ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের সূচনা হয়। এর সূত্র ধরেই সালাহুদ্দিন পরবর্তীকালে ইমাদুদ্দিন জিনকির পুত্রদের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন এবং 'সালাহুদ্দিন' হয়ে ওঠেন! স্বভাবতই

---

৩৯২. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৬৩।

এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইমাদুদ্দিন জিনকির জ্যেষ্ঠ পুত্র নুরুদ্দিন মাহমুদ।

দেখুন, রাব্বে কারিমের কী অপূর্ব ব্যবস্থাপনা! আলোচ্য ফিতনা ও দুর্যোগের যদি আর কোনো কল্যাণ না-ও থেকে থাকে, নাজমুদ্দিন আইয়ুব ও ইমাদুদ্দিন জিনকির পারস্পরিক পরিচিতিই তো কল্যাণ হিসেবে যথেষ্ট! এই পরিচয় তো পরবর্তী ইতিহাসের গতিধারাই বদলে দিয়েছিল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা সত্য বলেছেন—

﴿وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾

> কখনো তোমরা কোনো কিছুকে অপছন্দ করো, অথচ তাতে রয়েছে তোমাদের জন্য কল্যাণ। [সুরা বাকারা: ২১৬]

ইমাদুদ্দিন জিনকির পরাজয়ের সংবাদ পৌঁছে যায় সুলতান মাসউদের কানে। তিনি তখন ভাই সেলজুকশাহর সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত। তিনি বুঝতে পারেন, সামরিক পথে কোনো সমাধানে পৌঁছা সম্ভব নয়। এদিকে সুলতান সানজারের বাহিনীও বাগদাদের কাছাকাছি চলে এসেছে। সবদিক বিবেচনা করে সুলতান মাসউদ ভাই সেলজুকশাহর সঙ্গে সন্ধি করেন এবং খলিফার কাছে উভয়ের সম্মিলিত একটি প্রস্তাব প্রেরণ করেন।

তাদের সম্মিলিত প্রস্তাব ছিল—ইরাকের শাসনভার খলিফার হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। তিনি নিজের পছন্দমতো একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করে তার মাধ্যমে ইরাক অঞ্চল শাসন করবেন। এর পাশাপাশি খলিফা সুলতান মাসউদকে বর্তমান সুলতান এবং তার ভাই সেলজুকশাহকে ওলিয়ে আহদ(৩৯৩) বা পরবর্তী সুলতান ঘোষণা করবেন। অর্থাৎ সুলতান মাসউদের মৃত্যুর পর তার কোনো সন্তান নয়; ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হবেন তার ভাই সেলজুকশাহ।(৩৯৪)

---

৩৯৩. শাসনকর্তা কর্তৃক রাজপরিবারের কাউকে ভবিষ্যৎ শাসনকর্তা হিসেবে ঘোষণা করা হলে তাকে ওলিয়ে আহদ (ভবিষ্যৎ শাসক/যুবরাজ) বলা হয়। শাসনকর্তার মৃত্যু, মারাত্মক অসুস্থতা বা বরখাস্তের ঘটনা ঘটলে ঘোষিত ওলিয়ে আহদ তার স্থলাভিষিক্ত হন। রাজতন্ত্রে পরিচালিত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্তমানেও ওলিয়ে আহদ বা যুবরাজ ঘোষণার রীতি প্রচলিত আছে। [সম্পাদক]

৩৯৪. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৬২।

খলিফা চিন্তা করে দেখেন, সুলতান সানজারকে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ প্রদানের চেয়ে এই সমাধানই শ্রেয়তর। তাই তিনি এ প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করেন। ইরাকে খুতবায় এবার সুলতান সানজারের পরিবর্তে সুলতান মাসউদের নাম উচ্চারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এদিকে সুলতান সানজার ধীরে ধীরে বাগদাদের আরও নিকটে চলে এসেছেন। বাধ্য হয়ে সুলতান মাসউদ ও সেলজুকশাহ তাদের চাচা সুলতান সানজারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেন। অথচ তারা জানতেন, চাচার বাহিনীতে তাদের অপর ভাই সুলতান তুগরলও আছেন!

বড় বিস্ময়কর যুদ্ধ। উভয় পক্ষে বিপুল সংখ্যক সৈন্য। বিশেষ করে সুলতান সানজারের বাহিনীতে এক লক্ষ বা তারও বেশি সৈন্য ছিল। যুদ্ধে সুলতান সানজার সুস্পষ্ট বিজয় লাভ করেন। যুদ্ধ শেষে সানজার তার ভ্রাতুষ্পুত্র সুলতান মাসউদকে ডেকে এনে কপালে চুমু খান, সম্মান দেখান এবং এমন অবাধ্যতার দরুণ তিরস্কার করেন। তিনি মাসউদকে সসম্মানে পারস্যের কানজায় ফেরত পাঠান। এরপর সানজার খলিফার সিদ্ধান্তের সামান্য তোয়াক্কা না করে তার আরেক ভ্রাতুষ্পুত্র তুগরলকে সুলতানের মসনদে অধিষ্ঠিত করেন। খলিফা নাখোশ হলেও তুগরলকে স্বীকৃতি দান করতে বাধ্য হন। এভাবে ৫২৬ হিজরি সনের ৮ রজব (১১৩২ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে) সুলতান সানজারের তত্ত্বাবধানে ইরাক ও পারস্যের নতুন সুলতান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন সুলতান তুগরল।[৩৯৫]

৫২৬ হিজরি সনে উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি

নতুন সুলতান তুগরল দায়িত্ব গ্রহণের পর কি পরিস্থিতি শান্ত হয়ে গিয়েছিল?!

একটুও না। ফিতনা ও গোলযোগ মোটেও থামেনি। সকলের অন্তর্জগৎ ছিল সমস্যাগ্রস্ত। প্রত্যেকের চিন্তাজগৎ ছিল নানাবিধ কল্পনা-পরিকল্পনায় ব্যস্ত। আসুন, আমরা এই সংঘাত আলোচনা থেকে একটু বিশ্রাম নিই! দেখি, এ বছরের শেষ দিকের পরিস্থিতি কেমন। কারণ, এই গোলযোগের সময়ই এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে, যা উল্লেখ না করলেই নয়। দশটি পয়েন্টে আমরা সেসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তুলে আনার চেষ্টা করছি।

---

৩৯৫. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৬৩-২৬৫।

১. তুগরলকে ইরাকের সুলতান পদে অধিষ্ঠিত করে সুলতান সানজার দ্রুত তার রাজ্যে ফিরে যান। কারণ, তার শাসিত রাজ্য খোরাসান ও মাওয়ারাউন নাহার অঞ্চল ছিল বাগদাদ থেকে বেশ দূরে, মধ্য এশিয়ায়। দীর্ঘকাল সুলতানের অনুপস্থিতি সেখানে হয়তো ক্ষমতালোভীদের প্ররোচিত করে তুলবে।

২. সুলতান তুগরল এখন সালতানাতের ক্ষমতা ভোগ করলেও চাচা সানজারের বাহিনী ছাড়া তার একক শক্তি খুবই দুর্বল। নিঃসন্দেহে এ বিষয়টি তার অবস্থানকে প্রভাবিত করছিল এবং অপর ভাইদের তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করছিল।

৩. সুলতান মাসউদ চাচা সানজারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হেরে গেলেও তার সামরিক শক্তি শেষ হয়ে যায়নি। কারণ, সুলতান সানজার তার ও তার বাহিনীর প্রতি অনুগ্রহ করে তাদেরকে পারস্যে ফিরে যেতে দিয়েছেন। কোনো সন্দেহ নেই, ইরাকের সালতানাতের প্রতি সুলতান মাসউদের আগ্রহ ও অভিলাষ মোটেও হ্রাস পাবে না। তা ছাড়া তিনি সুলতান তুগরলের বড় ভাই, তাকে বাদ দিয়ে তুগরলকে ক্ষমতা প্রদানের কোনো যৌক্তিকতা তার দৃষ্টিতে নেই।

৪. প্রয়াত সুলতান মাহমুদের পুত্র দাউদ ছিলেন ঘোষিত সুলতান। তাকে সুলতান পদ থেকে অপসারণ করে তার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তিনি অবশ্যই তার পরিণতি নিয়ে চিন্তা করবেন। তিনি প্রয়াত সুলতানের পুত্র। তার পিতা তাকেই সুলতান ঘোষণা করে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার দাদা ও চাচারা তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়েছে। তিনি কি শান্ত হয়ে যাবেন, নাকি হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে সংগ্রাম করবেন?!

৫. খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহ ছিলেন প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ। তার প্রত্যাশার বিপরীতে সালতানাত এখন সুলতান তুগরলের নিয়ন্ত্রণে। তিনি নিশ্চয়ই সুলতান তুগরলের নিয়ন্ত্রণ থেকে নিষ্কৃতি লাভের সুযোগের প্রতীক্ষায় ওত পেতে থাকবেন।

৬. শেষ পর্যন্ত যা ঘটেছে, তাতে ইমাদুদ্দিন জিনকির আফসোস ও দুঃখই কেবল বেড়েছে। ক্রুসেডাররা এখন চরম বিশৃঙ্খল ও কঠিন সময়কাল পার করছে, সামনে হয়তো আরও কঠিন দুর্যোগের শিকার হবে।

মুসলিম উম্মাহ যদি এই ফিতনা ও জটিলতার শিকার না হতো, তাহলে এটি ছিল ক্রুসেডারদের ওপর ব্যাপক পরিসরে হামলা চালানোর এক মোক্ষম সুযোগ। এদিকে মুসলমানদের চলমান ফিতনা অতি দ্রুত শেষ হওয়ারও কোনো লক্ষণ নেই।

৭. যে মাসে সুলতান তুগরল সেলজুক সাম্রাজ্যের দায়িত্ব লাভ করেন, সে মাসেই অর্থাৎ ৫২৬ হিজরি সনের ২১ রজব দামেশকের আমির বুরি বিন তুগতেকিন মৃত্যুবরণ করেন।[৩৯৬] তার অবর্তমানে দামেশকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তার পুত্র ইসমাইল বিন বুরি বিন তুগতেকিন। তিনি 'শামসুল মুলুক' উপাধি ধারণ করেন। ইসমাইল বিন বুরি ছিলেন দুরাচারী-অত্যাচারী একজন শাসক। জীবনে এত বড় বড় অন্যায় ও অনাচার তিনি ঘটান, যা তাকে সকলের বিরাগভাজনে পরিণত করে। তিনি তার রাজ্যের সকল কেন্দ্রীয় শক্তির সঙ্গেই যুদ্ধ শুরু করেন। ফলে জনমনে তৈরি হয় ব্যাপক আতঙ্ক। বুরি বিন তুগতেকিনের ইন্তেকাল ও তার অত্যাচারী পুত্রের দায়িত্ব গ্রহণ দামেশকবাসীর জন্য বিরাট দুর্যোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[৩৯৭]

৮. ক্ষমতা নিয়ে দামেশকের আমির শামসুল মুলুক ইসমাইল বিন বুরি ও তার ভাই বালাবাক্কু অঞ্চলের আমির শামসুদ্দৌলা মুহাম্মাদ বিন বুরির মাঝে বিরোধ তৈরি হয় এবং শেষ পর্যন্ত তা বিরাট যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে। উভয়ের বিরোধের পরিসমাপ্তি ঘটে দামেশকের উত্তরের গুরুত্বপূর্ণ দুটি দুর্গের অধিকার শামসুল মুলুক ইসমাইলের হাতে আসার মধ্য দিয়ে। অবশ্য তিনি ভাই শামসুদ্দৌলাকে বালাবাক্কুর আমির হিসেবে স্বীকৃতি দেন।[৩৯৮] দামেশকের এই ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতের ঘটনা ছিল ইমাদুদ্দিন জিনকির জন্য দামেশককে নিজের রাজ্যভুক্ত করে নেওয়ার এক চমৎকার সুযোগ। কিন্তু ইরাকে যে আরও কঠিন ফিতনা তরঙ্গায়িত হয়ে তাকে কার্যত নিশ্চল করে দিয়েছে!

---

৩৯৬. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৬৫ ও ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ২৬৫।
৩৯৭. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৭৮-২৭৯।
৩৯৮. প্রাগুক্ত, ৯/২৬৬।

৯. এন্টিয়কের পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হতে থাকে। সদ্য গত হওয়া ২য় বল্ডউইনের কন্যা এলিস এন্টিয়কের মসনদ দখলের জন্য ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখেন। তিনি ইসলামি প্রাচ্য অঞ্চলে বাইতুল মুকাদ্দাসের নতুন রাজা ফাল্ক অ্যাঞ্জোর অনভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে প্রথম সারির তিনজন ক্রুসেডার নেতার মদদে এন্টিয়কের ক্ষমতা হাতানোর পাঁয়তারা করেন। এতে ক্রুসেড শিবিরে মারাত্মক বিপর্যয়ের আশঙ্কা তৈরি হয়। বিপর্যয় কেবল এজন্য নয় যে, এলিস এ অঞ্চলে ক্রুসেডারদের অঘোষিত প্রধান নেতা ফাল্কের আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করছেন এবং তার মতো একজন অপরিণত-অযোগ্য নারীর হাতে এন্টিয়কের শাসনভার চলে যাচ্ছে। বরং এর চেয়েও বড় শঙ্কার কারণ ছিল, এলিসের সঙ্গে একজোট হওয়া সেই তিন নেতার পরিচিতি। এলিসের সঙ্গে এন্টিয়কের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের বিষয়ে যারা একমত হয়েছিল, তারা হলো—এডেসা রাজ্যের শাসক ২য় জোসেলিন, ত্রিপোলির শাসক পন্স এবং এন্টিয়ক রাজ্যের অধীনস্থ লাতাকিয়া অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ জিয়ন (Zion) দুর্গের প্রশাসক উইলিয়াম। অর্থাৎ এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হলে ক্রুসেড শিবিরে বিরাট বিভক্তি সৃষ্টি হবে। কারণ, এন্টিয়কের শাসনক্ষমতা প্রশ্নে সবচেয়ে শক্তিশালী ক্রুসেড রাজ্য বাইতুল মুকাদ্দাসের বিরুদ্ধে বাকি তিন রাজ্য একজোট হয়েছে।

ঘটনাক্রমে এন্টিয়কের কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তা গোপন ষড়যন্ত্রের বিষয়টি জেনে ফেলে এবং দ্রুত পত্র পাঠিয়ে রাজা ফাল্ককে বিষয়টি অবহিত করে। রাজা ফাল্ক তৎক্ষণাৎ তার বাহিনী নিয়ে বেপরোয়া এলিসের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে এন্টিয়ক অভিমুখে রওনা হন।[৩৯৯] কিন্তু ত্রিপোলির শাসক পন্স মাঝপথে লেবাননে তার পথ আগলে দাঁড়ান। সেখানে বাইতুল মুকাদ্দাসের বাহিনী ও ত্রিপোলির বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। শাম ও ফিলিস্তিন ভূমিতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর এটি ছিল ক্রুসেড শিবিরের ইতিহাসে প্রথম পারস্পরিক যুদ্ধ। ঘোরতর লড়াইয়ের কারণে পরিস্থিতি কঠিন হয়ে পড়ে। রাজা ফাল্ক রণাঙ্গন থেকে পিছু হটেন। অবশ্য তিনি বৈরুত নৌবন্দর হয়ে সমুদ্রপথে

৩৯৯. Guillaume de Tyr, p. 611.

এন্টিয়কে পৌঁছতে সক্ষম হন।[৪০০] তিনি এন্টিয়কে প্রবেশ করে এলিসের ষড়যন্ত্র বানচাল করে দেন। এদিকে এলিসের কর্তৃত্ব মজবুত করতে পন্স‌ও দ্রুত এন্টিয়কে ছুটে আসেন। এখানেও দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ লেগে যায়।[৪০১] শেষ পর্যন্ত ত্রিপোলির শাসক পন্স শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং এন্টিয়কের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ চলে যায় রাজা ফাঙ্কের হাতে।[৪০২] তিনি তার পক্ষ থেকে রেনাড মাশোয়ের (Renaud Masoier) নামক জনৈক ব্যক্তিকে এন্টিয়কের শাসক নিযুক্ত করেন।[৪০৩] নিঃসন্দেহে ক্রুসেডারদের এই চরম বিপর্যয়কর পরিস্থিতিকে মুসলমানদের স্বার্থে ব্যবহারের সুযোগ ছিল। কিন্তু মুসলমানরা তো ব্যস্ত নিজেদের দুর্যোগ নিরসনে!

১০. এটিই চলমান সময়ে ক্রুসেডারদের একমাত্র সমস্যা ছিল না। এ সময় তারা আরেকটি বিপর্যয়ের শিকার হয়, যা ছিল আগেরটির চেয়েও গুরুতর। বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের অভ্যন্তরে রাজা ফাঙ্ক ও জাফা নগরীর প্রশাসক ২য় হিউ (Hugh II of Jaffa)-এর মধ্যে সামরিক সংঘাতের ঘটনা ঘটে। সংঘাতের কারণ ছিল, রাজা ফাঙ্ক জেনে ফেলেন যে, তার স্ত্রী মেলিসেন্ড যুবক প্রশাসক ২য় হিউয়ের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন! লড়াই শেষে রাজা ফাঙ্ক ২য় হিউকে বন্দি করতে সক্ষম হন এবং তাকে মারাত্মক আহত করে সিসিলিতে নির্বাসিত করেন। অল্প কদিন পরই হিউ সেখানে ইহধাম ত্যাগ করে।[৪০৪]

দাম্পত্য জীবনে সুস্পষ্ট বিশ্বাসঘাতকতা প্রমাণিত হওয়ায় খ্রিষ্টধর্ম মতে যদিও রাজা ফাঙ্ক তার স্ত্রীকে পরিত্যাগের অধিকার লাভ করেন; কিন্তু তিনি জানতেন, মেলিসেন্ডকে পরিত্যাগ করার অর্থ তার ক্ষমতাই শেষ হয়ে যাওয়া! কারণ, তিনি তো প্রয়াত রাজা ২য় বল্ডউইনের মেয়ের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসনভার লাভ করেছেন। আর তাই তিনি যদি স্ত্রী মেলিসেন্ডকে অভিযুক্ত করে

---

৪০০. Michaud : op.cit.,ll, p,85.

৪০১. Stevenson : op.cit.,ll, p.141.

৪০২. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৫১।

৪০৩. Guillaume de Tyr., p. 612-613.

৪০৪. Guillaume de Tyr., p. 627-633; Besant,Palmer:Jerusalem, pp. 291-292.

দোষী প্রমাণ করেন, তাহলে শাসনভার চলে যাবে তার অন্য কোনো বোনের হাতে এবং সেই সূত্রে সেই বোনের স্বামীর হাতে। সবদিক বিবেচনা করে রাজা ফাল্ক সিদ্ধান্ত নেন, তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যাবেন এবং স্ত্রীকে কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে বলবেন। বরং পরবর্তী সময়ে যখন মেলিসেন্ড তার প্রেমিক পুরুষকে হত্যা করায় ফাল্কের প্রতি প্রচণ্ড ক্রোধ প্রকাশ করেন, রাজা ফাল্ক নতজানু হয়ে বিভিন্ন উপায়ে তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতে থাকেন।(৪০৫)

স্ত্রী মেলিসেন্ডকে তুষ্ট করার জন্য ফাল্ক যেসব অতিরঞ্জনমূলক আচরণ করেন, তার অন্যতম হলো তিনি মেলিসেন্ডের দাবি মেনে নিয়ে এন্টিয়কের শাসক পদ হতে রেনাড মাশোয়েরকে সরিয়ে মেলিসেন্ডের বোন এলিসকে এন্টিয়কের ক্ষমতা ফিরিয়ে দেন!(৪০৬) এর মাধ্যমে রাজা ফাল্ক কেবল যে তার মর্যাদা ও প্রতিপত্তি খুইয়ে ফেলেন তা-ই নয়; বরং ইতিপূর্বে তিনি যে এলিসের বিষয়ে প্রচণ্ড কঠোর ছিলেন, তা থেকে সরে আসতে বাধ্য হন এবং এন্টিয়কের শান্তি ও নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলে দেন। নিঃসন্দেহে এর মাধ্যমে তিনি পুরুষোচিত আত্মমর্যাদা ও মানবিক বিবেচনাবোধই হারিয়ে ফেলেন।

সুতরাং ৫২৬ হিজরি সনের শেষ দিকে ক্রুসেড শিবিরের অভ্যন্তরীণ সংঘাত-পরিস্থিতি মুসলমানদের জন্য শুভবার্তা বয়ে আনছিল। এ সময় মুসলমানরা যদি ইরাকে নিজেদের অভ্যন্তরীণ সংকটে ব্যস্ত না থাকত, নিশ্চিত করেই পরিস্থিতি ভিন্ন রকম হতে পারত। মুসলমানদের উপলব্ধি করা উচিত নিজেদের বিভেদ-বিসংবাদের কারণে যুগে যুগে তাদের কত বিরাট মূল্য চুকাতে হয়েছে!

ফিতনার উত্তপ্ত সময়

আমাদের মহান বীর ইমাদুদ্দিন জিনকি এ সময় নিরুপায় হয়ে বাগদাদের উত্তপ্ত ঘটনাপ্রবাহের নিকটেই মসুলে সসৈন্য নিশ্চল বসে ছিলেন। কারণ, বাগদাদে চলমান বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির কারণে যেকোনো মুহূর্তে পুরো অঞ্চলের পরিস্থিতি ও প্রশাসনিক বিন্যাসে রদবদল ঘটার আশঙ্কা ছিল। এ সময় তিনি তার অধীনস্থ আলেপ্পোর প্রশাসক সিওয়ারের মাধ্যমে

৪০৫. Runciman: op.cit.,ll, p.193.
৪০৬. Guillaume de Tyr.,p. 636.

ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে কিছু খণ্ড যুদ্ধ পরিচালনা করেই ক্ষান্ত ছিলেন।[৪০৭] পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে, দামেশকের অন্যতম শক্তিশালী সেনাপতি সিওয়ার ৫২৪ হিজরি সনে দামেশক থেকে পলায়ন করলে ইমাদুদ্দিন জিনকি তাকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন এবং তাকে আলেপ্পো ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি দৃঢ়চেতা মুজাহিদ ছিলেন; ইমাদুদ্দিন জিনকির মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি তার পদের যথোচিত মর্যাদা রক্ষা করে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে গেছেন।

আবারও ইরাকের জটিল পরিস্থিতিতে ফিরে আসছি!

স্বভাবতই পরিস্থিতি মোটেও শান্ত হয়নি। সুলতান সানজার ভ্রাতুষ্পুত্র তুগরলকে সুলতান পদে অধিষ্ঠিত করে খোরাসান ফিরে গিয়েছিলেন। ফলে তুগরলের প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ক্ষমতাপ্রত্যাশীরা আবারও ক্ষমতা লাভের আশায় উদ্যোগী হয়ে ওঠে। সুলতান তুগরল বাগদাদের পরিবর্তে হামাদান নগরীকে তার আবাসভূমি নির্বাচন করেছিলেন। সুলতান দাউদ বিন মাহমুদ ও তার আতাবিক আক সুনকুর আহমাদিলি এ সময় সুলতান তুগরলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং সৈন্যসমাবেশ ঘটান। ৫২৬ হিজরি সনের রমজান মাসে হামাদানের অদূরে দু-পক্ষের মাঝে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সুলতান দাউদ পরাজিত হন এবং পুনরায় পরিস্থিতি সুলতান তুগরলের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

কিন্তু বিষয়টি এখানেই সমাপ্ত হয়নি। পরাজিত সুলতান দাউদ সেখান থেকে সোজা বাগদাদে চলে যান এবং খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। খলিফা তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনায় বরণ করে নেন এবং বাগদাদের সুলতান-প্রাসাদ তার জন্য ছেড়ে দেন। অবশ্য খলিফা তাকে সুলতান উপাধি প্রদানে বিরত থাকেন। শত হোক, দাউদ তো এখন পরাজিত ও দুর্বল![৪০৮]

যথারীতি এ সংবাদ পৌঁছে যায় সুলতান মাসউদের কাছে। তিনি মনে করতেন, ভাইদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হিসেবে তিনিই সালতানাত লাভের অধিক হকদার। অন্তত বর্তমান সুলতান ও তার ছোট ভাই সুলতান তুগরলের চেয়ে তো তিনি অবশ্যই অগ্রাধিকার রাখেন। তাই তিনি দ্রুত বাগদাদে

---

[৪০৭]. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৬৮-২৬৯।
[৪০৮]. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৬৬-২৬৭।

ছুটে যান এবং খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহ ও সুলতান দাউদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরপর তিনজন এ বিষয়ে একমত হন যে, খলিফা সুলতান মাসউদকে সুলতান উপাধি প্রদান করবেন, আর দাউদ হবেন তার ওলিয়ে আহদ বা পরবর্তী সুলতান। এভাবে মূলত খলিফা ও সুলতান মাসউদের পূর্বের পুরোনো সেই পরিকল্পনাই বাস্তবায়িত হবে; পাল্টে যাবে শুধু ওলিয়ে আহদের জায়গাটুকু। পূর্বের চুক্তিতে ওলিয়ে আহদ হওয়ার কথা ছিল সেলজুকশাহর, আর নতুন চুক্তিতে সেখানে সুলতান দাউদ বিন মাহমুদের নাম!

সুলতান মাসউদ ও সুলতান দাউদ তাদের সৈন্যসমাবেশ ঘটান এবং পারস্যের বিভিন্ন স্থানে সুলতান তুগরলের বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেন। এসব যুদ্ধে সুলতান মাসউদ জয়লাভ করেন এবং এর অনিবার্য দাবি অনুযায়ী তিনিই এবার ইরাক ও পারস্যের সুলতান উপাধি ধারণ করেন। এটি ৫২৭ হিজরি সনের শেষ দিকের ঘটনা। অর্থাৎ দুঃখজনক এই ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতে পূর্ণ এক বছর চলে যায়।[৪০৯]

এই অব্যাহত সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির সময় দামেশকের অত্যাচারী শাসক ইসমাইল বিন বুরি ঘটনাপ্রবাহের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলেন। সুযোগ বুঝে তিনি হঠাৎ ইমাদুদ্দিন জিনকির রাজ্যভুক্ত হামা নগরীতে অভিযান চালান। কঠিন অবরোধ আরোপের পর একসময় তিনি নগরীটির পতন ঘটাতে সক্ষম হন। এটি ছিল নবগঠিত জিনকি রাজ্যের জন্য বড় ধরনের আঘাত।[৪১০] কারণ, হামা ছিল দামেশক অভিমুখে অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি কেন্দ্র। তা ছাড়া ক্রুসেড রাজ্য ত্রিপোলিতে অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রেও হামা হতে পারত অন্যতম ঘাঁটি। কিন্তু সেলজুক সুলতানদের অব্যাহত সংঘাতের কারণে নিরাপত্তার যে চরম অবনতি হয়েছিল, তাতে এমন দুঃখজনক ঘটনার অবতারণা একদম স্বাভাবিক ছিল।

তবে ইরাকে চলমান দীর্ঘস্থায়ী বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে ক্রুসেডাররা যেন মুসলমানদের ভূখণ্ডে লোলুপ দৃষ্টি ফেলার সাহস না করে,

---

৪০৯. প্রাগুক্ত, ৯/২৬৯-২৭০।

৪১০. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৭১ ও Grousset: Hist. des Croisades, II. p. 55.

এ উদ্দেশ্যে অভিজ্ঞ প্রশাসক ইমাদুদ্দিন জিনকি এতকিছুর পরও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বাহিনী প্রেরণ অব্যাহত রাখেন। অবশ্য এ সময়ের অধিকাংশ অভিযান পরিচালিত হয় আলেপ্পোর আমির সিওয়ারের নেতৃত্বে। এসব অভিযানের অন্যতম হলো, সিওয়ার ৫২৭ হিজরি সনের জুমাদাল উখরা মাসে এডেসা রাজ্যের অন্তর্গত তিল-বাশির নগরীতে হামলা চালান এবং ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। হাজারখানেক ক্রুসেডার সৈন্য এ সময় নিহত হয়। মুসলিম বাহিনী প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদও লাভ করে। সিওয়ার এর পাশাপাশি জাযিরা অঞ্চলের তুর্কমেন গোত্রগুলো থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে বেশ কয়েকটি বাহিনী গঠন করেন এবং বাহিনীগুলোকে ত্রিপোলি ও এন্টিয়ক রাজ্যে হামলার কাজে ব্যবহার করে বিক্ষিপ্ত আরও কিছু বিজয় অর্জন করেন। এসব অভিযানেও ক্রুসেডারদের প্রচুর সৈন্য নিহত হয় এবং প্রভূত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়।[৪১১] রাজ্যগুলোর পতন ঘটানো এসব অভিযানের লক্ষ্য ছিল না। কারণ, ক্রুসেড রাজ্যগুলোর পতন ঘটানোর মতো শক্তি এসব বাহিনীর ছিল না। অভিযানগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল, ইরাকের ফিতনা নিরসন এবং ইমাদুদ্দিন জিনকির নতুন করে জিহাদি তৎপরতা শুরু করার আগ পর্যন্ত আলেপ্পো ও এর আশপাশের অঞ্চলকে ক্রুসেডারদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে রক্ষা করা। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে কোনো দুর্গ বা নগরী পুনরুদ্ধার না হলেও এসব অভিযান ছিল অনেকটাই সফল।

আবারও ফিরে আসছি ইরাক ও পারস্যের ঘটনাপ্রবাহে।

আমরা এখন আছি ৫২৮ হিজরি সনে। ইরাকি সেলজুক সালতানাতের মসনদে এখন সুলতান মাসউদ। কিন্তু নিঃসন্দেহে অপসারিত সুলতান তুগরল এতে বিলকুল সন্তুষ্ট নন। অতীতে তিনি দূর থেকে তার চাচা সুলতান সানজারের সহযোগিতা পেয়ে আসছিলেন। এবার তিনি বিভিন্ন জায়গা থেকে সৈন্য সংগ্রহ করতে শুরু করেন। পাশাপাশি তিনি সুলতান দাউদ বিন মাহমুদকেও সুলতান মাসউদের পক্ষ ত্যাগ করতে প্ররোচিত করতে থাকেন এবং তাতে সফলও হন। এমনকি তিনি খোদ সুলতান মাসউদের বাহিনীর কিছু অংশকেও নিজের দলে টানতে সক্ষম হন।

---

৪১১. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৭১-২৭২।

পারস্য ভূমিতে দুই ভাই সুলতান মাসউদ ও সুলতান তুগরলের বাহিনীর মধ্যে বেশ কয়েকটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। যুদ্ধে সুলতান তুগরল সুলতান মাসউদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং পুনরায় সালতানাতের মসনদ লাভ করতে সক্ষম হন।[৪১২]

মুসলিম জনসাধারণ এক অব্যাহত ফিতনা ও সংঘাতের গোলকধাঁধায় আটকে যায়। ভ্রাতৃঘাতী লড়াই এবং মুসলিম বাহিনীগুলোর পারস্পরিক যুদ্ধ নিত্যদিনের বিষয়ে পরিণত হয়। তদ্রূপ কয়েক মাস পরপর সুলতান পদে পালাবদলও যেন স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়। ইরাকের সুলতান পদ যেন অতি সাধারণ একটি পদ; জাতির পথচলায় যার কোনো দায়িত্ব ও ভূমিকা নেই!

ইরাকের চলমান ফিতনার অনিবার্য ফল

এমন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি কাজে লাগাতে অসুস্থ মনের অধিকারী প্রতিটি ব্যক্তি হামলে পড়বে এমনটাই স্বাভাবিক। চলমান ঘটনাপ্রবাহে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাচ্ছিলেন ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ.। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াই করার উপযুক্ত একটি একক শক্তিশালী কাঠামো গড়ে তুলতে উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। এখন তার চোখের সামনে সেই ঐক্য-কাঠামো ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। মুসলিম সুলতানগণ বিশুদ্ধ চেতনায় মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করতে চেষ্টা করার পরিবর্তে নিজেরাই সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে এবং প্রত্যেকেই একদল সাধারণ মুসলমানকে নিজের পক্ষে টেনে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছে। এর ফলে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে অস্থিরতা-অস্থিতিশীলতা। বিস্তৃত জিনকি রাজ্যের অভ্যন্তরেও অস্থিরতা সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। জনসাধারণ অনুভব করছে, সুলতানদের এই সংঘাতে শেষ পরিণতি দেখার অপেক্ষা ছাড়া ইমাদুদ্দিন জিনকির এখন কিছু করার নেই। স্বয়ং ইমাদুদ্দিনও এই বিরোধে অংশ নিতে দ্বিধাবোধ করছিলেন। তাই তিনি তার বাহিনী নিয়ে মসুলেই অবস্থান করে পরিস্থিতি স্থিতিশীল হওয়ার প্রতীক্ষা করছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি যে কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না!

---

৪১২. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৭৩-২৭৪।

এ সময় মসুলের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তে কুর্দি হাকারিয়া ও হামিদিয়া গোত্র অধ্যুষিত অঞ্চলে বেশ কয়েকটি বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে। আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি, গোত্রদুটি ইতিপূর্বে ইমাদুদ্দিন জিনকির বশ্যতা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু এই অশান্ত সময়ে সুযোগ পেয়ে তারা জিনকি রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। এমনকি তারা মসুলের কৃষিক্ষেত্র ও বাজারগুলোতে হামলা ও লুটপাট শুরু করে। ফলে নতুন করে মসুলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ইমাদুদ্দিন জিনকি পূর্ণ বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি তার বাহিনীর একটি অংশ নিয়ে নিজে এ অঞ্চলে গমন করেন এবং দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় কয়েকটি যুদ্ধের পর মহান আল্লাহর অনুগ্রহে তাদেরকে দমন করতে সক্ষম হন। তিনি বিদ্রোহীদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিভিন্ন পাহাড়ের শীর্ষদেশে অবস্থিত তাদের কয়েকটি দুর্গ অধিকার করেন। ফলে কয়েক মাসের মধ্যেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে এবং নতুন করে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪১৩]

কদিন না যেতেই নতুন করে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে নতুন আরেক অঞ্চলে। এবার জাযিরা ও দিয়ারে বকর অঞ্চলের স্থানীয় কিছু নেতা উপলব্ধি করে যে, ইরাকের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি ইমাদুদ্দিন জিনকিকে অনেকটা স্থবির করে দিয়েছে। সুতরাং ইমাদুদ্দিন জিনকি ইতিপূর্বে তাদের অঞ্চলের যেসব এলাকা নিজের রাজ্যভুক্ত করে নিয়েছিলেন, সেগুলো পুনরুদ্ধার করার এটিই সুবর্ণ সুযোগ।

পূর্বেও আমরা বলেছি, এ অঞ্চলের সার্বিক পরিস্থিতি লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই, অঞ্চলটিতে রাজ্য ও শাসকের অভাব নেই! তবে অধিকাংশ শাসকই প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন। এ অঞ্চলের তুলনামূলক শক্তিশালী ও প্রধান নেতা ছিল তিনজন।

১. মারদিনের আমির হুসামুদ্দিন তামারতাশ বিন ইলগাজি।
২. (প্রথমজনের চাচাতো ভাই) হাসানকেইফের আমির রুকনুদ্দৌলা দাউদ বিন সুকমান।
৩. আমিদ নগরীর আমির সাদুদ্দৌলা আবু মানসুর ইকলিদি।

---

৪১৩. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৭৫-২৭৬।

এই তিনজনই চার বছর পূর্বে ৫২৪ হিজরি সনে দারা নগরীতে একজোট হয়ে ইমাদুদ্দিন জিনকির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল।[৪১৪]

ইমাদুদ্দিন জিনকি অনুভব করেন, নতুন করে তাদের এই ঐক্য প্রচেষ্টা বিশেষত চলমান দুর্যোগপূর্ণ সময়ে মুসলমানদের বৃহত্তর ঐক্যে বড় ধরনের বাধা সৃষ্টি করবে। এমনিতেই ইরাক ও পারস্যের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল, ওদিকে কুর্দি অধ্যুষিত অঞ্চলে বারবার বিদ্রোহপ্রচেষ্টা সংঘটিত হচ্ছে। আর আলেপ্পো ও তার আশেপাশের এলাকায় ক্রুসেডারদের আক্রমণের আশঙ্কা তো আছেই। সার্বিক বিবেচনায় এই নতুন সমস্যার মোকাবিলায় সহসা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দ্রুত দমনের কোনো বিকল্প ছিল না।[৪১৫]

ইমাদুদ্দিন জিনকি অনুভব করেন, তাদের সম্মিলিত শক্তির সঙ্গে এ মুহূর্তে যুদ্ধে জড়ালে বড় ধরনের ক্ষতি পোহাতে হবে। তাই তিনি যথাসম্ভব কম ক্ষতি স্বীকার করে সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে তাদের ঐক্য প্রচেষ্টায় ফাটল ধরিয়ে কাউকে তার পক্ষে টানার জন্য কূটনৈতিক পথ অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নেন। প্রতিপক্ষ তিন নেতার ব্যক্তিত্ব, সামর্থ্য ও সম্ভাবনা বিচার করে তিনি উপলব্ধি করেন, রুকনুদ্দৌলা দাউদ অত্যন্ত কঠোর ও একগুঁয়ে প্রকৃতির মানুষ, সাদুদ্দৌলা আবু মানসুর ইকলিদি একদম দুর্বল এবং তার সামর্থ্যও সীমিত, আর হুসামুদ্দিন তামারতাশ বৃহৎ ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী। অবশ্য ব্যক্তি হিসাবে তিনি নমনীয়। ঐতিহাসিক ইবনুল আছির রহ.-এর ভাষ্য অনুসারে হুসামুদ্দিন ছিলেন বিলাসী ও আরামপ্রিয় একজন শাসক।[৪১৬] আর তাই হুসামুদ্দিন তামারতাশের সঙ্গে ঐক্য গড়ে তাকে অন্যান্য দুর্বল নেতার সঙ্গে মিত্রতা পরিহারে প্ররোচিত করার পরিকল্পনা একটি ফলপ্রসূ চিন্তা হতে পারে। এমন ভাবনা থেকেই ইমাদুদ্দিন জিনকি তার নৈকট্য অর্জনে চেষ্টা শুরু করেন। তিনি হুসামুদ্দিনের রাজ্য অভিমুখে সামরিক তৎপরতা বন্ধ করে দেন এবং তার কাছে বিভিন্ন উপঢৌকন প্রেরণ করেন। পাশাপাশি তিনি তাকে মুসলমানদের পারস্পরিক ঐক্যের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেন এবং

---

৪১৪. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৫৫।

৪১৫. মুহাম্মাদ সুহাইল তাকুশ, *তারীখুয-যিনকিয়্যীন ফিল-মাওসিলি ওয়া বিলাদিশ-শাম*, পৃষ্ঠা : ১১১।

৪১৬. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২২৭।

ইমাদুদ্দিন জিনকির সঙ্গে ঐক্য গড়লে তার রাজ্য আরও বিস্তৃত হবে বলে তাকে প্ররোচিত করতে থাকেন। দ্রুত তার কৌশল কাজ করতে থাকে; অল্পতেই হুসামুদ্দিন প্রভাবিত হন। হুসামুদ্দিন অনুভব করেন, রুকনুদ্দৌলা দাউদ বা সাদুদ্দৌলা ইকলিদির চেয়ে ইমাদুদ্দিন জিনকির সঙ্গে মিত্রতা বেশি ফলদায়ক হবে। তিনি ইমাদুদ্দিনের প্রস্তাবে সাড়া দেন। অল্প কদিন না যেতেই প্রকাশ্যে উভয় পক্ষের রাজনৈতিক সম্প্রীতি ও ঐক্যবদ্ধ সামরিক কাঠামোর ঘোষণা দেওয়া হয়। এরপর ইমাদুদ্দিন জিনকি ও তার নতুন মিত্র হুসামুদ্দিন তামারতাশ এ অঞ্চলে তাদের কর্তৃত্ব বিস্তার শুরু করেন। এ অঞ্চলের অন্যান্য প্রশাসক তাদেরকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলেও তারা দুজন প্রথম মোকাবিলাতেই বিজয় লাভ করেন। রুকনুদ্দৌলার নিয়ন্ত্রিত মারদিনের অদূরে অবস্থিত অতি গুরুত্বপূর্ণ সাওর দুর্গ তাদের অধিকারে চলে আসে। ইমাদুদ্দিন জিনকি পারস্পরিক মিত্রতা মজবুত করার লক্ষ্যে দুর্গটি তার নতুন মিত্র হুসামুদ্দিন তামারতাশকে উপহার দেন।[৪১৭]

এভাবে ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ. তার প্রজ্ঞাপূর্ণ কূটনীতির মাধ্যমে হুসামুদ্দিনকে নিজের স্বার্থে কাজে লাগান। এর মাধ্যমে নতুন কিছু ভূখণ্ডই কেবল তার রাজ্যভুক্ত হয়নি; বরং বড় ধরনের সামরিক ক্ষতি ছাড়াই এ অঞ্চলের মজবুত নিরাপত্তাও নিশ্চিত হয়েছে।

জাযিরা ও দিয়ারে বকর অঞ্চল; বরং পুরো জিনকি রাজ্য ছেড়ে এবার চলুন দ্রুত ঘুরে আসা যাক আমাদের মহান বীর ইমাদুদ্দিন জিনকির চিন্তাজগতে!

চলমান ফিতনা থেকে ইমাদুদ্দিন জিনকির বিচ্ছিন্নতা

উম্মাহর এই ঘনঘোর দুর্যোগকাল অনেকের শক্তি ও সম্ভাবনার পরিধি প্রকাশ করে দিচ্ছিল, উন্মোচিত করছিল ব্যক্তির স্বভাব ও অন্তর্নিহিত মনোভাব। প্রশ্ন হলো—এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে সঠিক ও বিশুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি কী হতে পারে? আপাতদৃষ্টিতে এমন পরিস্থিতিতে ইমাদুদ্দিন জিনকির সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াই-বা কী হতে পারে?

---

৪১৭. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৭৪ ও উসামা বিন মুনকিয, *আল-ই'তিবার*, পৃষ্ঠা : ১৯৯-২০১।

ইমাদুদ্দিন জিনকি তার পিতার মতোই সেলজুক সালতানাতের আনুগত্যে অভ্যস্ত ছিলেন। কারণ, তিনি জানতেন, সেলজুক সুলতানই বর্তমানের সর্বোচ্চ শক্তি এবং শাসনব্যবস্থার প্রকৃত নিয়ন্ত্রক। সেলজুক সুলতানই মুসলমানদের জাতীয় বিষয়সমূহ নিয়ে চিন্তা করেন, উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং বাস্তবায়নে ব্রতী হন। শুরু থেকে ইমাদুদ্দিন জিনকি এমনটিই ভাবতেন। কিন্তু অতীতের সুলতান ও বর্তমানের সুলতানদের মাঝে তো কত পার্থক্য! যেন আকাশপাতাল ব্যবধান!

আলপ আরসালান, মালিকশাহ, বারকিয়ারুক বা সুলতান মুহাম্মাদের মতো দৃঢ়চেতা সুলতান কি একজনও আছেন বর্তমানে সংঘাতরত সুলতানদের কাতারে?! এমনকি বয়সে প্রবীণ না হলেও প্রয়াত সুলতান মাহমুদেরও একটি স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল; মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে কাজ করার স্পৃহা ছিল। অধিকন্তু প্রতিপক্ষ ও বিরোধীদের পরাভূত করার মতো পর্যাপ্ত শক্তিও তার ছিল। আর তাই তার শাসনামলে সাম্রাজ্যজুড়ে শান্তি বিরাজ করত; তিনি বহিঃরাষ্ট্র নিয়ে চিন্তা-পরিকল্পনার সুযোগ পেতেন, বিশেষ করে ক্রুসেডারদের বিতাড়নের বিষয়ে ভাবতে পারতেন।

অপরদিকে বর্তমানের এই খর্ব শক্তির সুলতানগণ কীসের ভিত্তিতে ক্রমাগত লড়ছেন?!

একজনও কি দাবি করতে পারবেন, এ লড়াই আল্লাহর জন্য?!

বরং একজনও কি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারবেন, এই বিবাদে তিনিই আছেন ন্যায়ের পক্ষে; অন্যরা নয়?!

তারা কেন, ঘটনার সমসাময়িক যারা, তারাও নিশ্চিতভাবে বলতে পারত না, চলমান বিরোধে অমুকই বৈধ দাবিদার আর বাকিরা অন্যায় দাবি করছে! এ কারণেই আমরা দেখেছি, এ সময় অনেক সেনাপতি, রাজন্য, সৈন্যবাহিনী ও জনসাধারণ কদিন পরপরই এক সুলতানকে রেখে আরেক সুলতানের আনুগত্য শুরু করেছে। এটি কিন্তু নীতি-আদর্শ ও স্বভাব-চরিত্রের দুর্বলতা ছিল না; ছিল দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণের দুর্বলতা।

তা ছাড়া সংঘাতরত সুলতানদের সকলেই ছিল দুর্বল; কিংবা তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বলা যায়, সকলেই ছিল প্রায় সমশক্তিসম্পন্ন। এ কারণেই একজন হয়তো কয়েক মাস বা কয়েকদিন সুলতান পদ ধরে রাখতে পারত, তারপরই অন্য একজন তাকে সরিয়ে তার জায়গা

দখল করত! এক এলাকায় একজনের নাম সুলতান হিসেবে ঘোষিত হতো, একই সময়ে আরেক অঞ্চলে ঘোষিত হতো আরেকজনের নাম! খলিফা আজ এক সুলতানের পাশে দাঁড়াতেন, তো কাল আরেকজনের পাশে। আগামী পরশুই হয়তো তাকে দেখা যাবে তৃতীয়জনের পক্ষাবলম্বন করতে!

এ এমন এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি, যা অতি সহনশীল ব্যক্তিকেও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ছাড়বে!

সুলতান মাহমুদের মৃত্যু-পরবর্তী তিন বছরে পর্যায়ক্রমে ক্ষমতায় এসেছেন সুলতান দাউদ, সুলতান মাসউদ, সুলতান তুগরল, সুলতান মাসউদ এবং এখন আবার সুলতান তুগরল। কারও জানা নেই, আগামীকাল ঘুম থেকে উঠে সুলতান হিসেবে কাকে দেখতে পাবে?!

এটা কি মেনে নেওয়ার মতো কোনো বিষয়?! কোনো যুক্তিতে গ্রহণযোগ্য?!

এদিকে উচ্চাভিলাষী খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহও সংঘাতের স্বতন্ত্র একটি পক্ষে পরিণত হয়েছেন। সবাইকে আপন নির্দেশনা মানতে বাধ্য করার মতো বড় না হলেও তারও একটি মোটামুটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী আছে। কিন্তু তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার পরিবর্তে এখন পরিণত হয়েছেন চলমান সমীকরণে অন্যদের হাতে ব্যবহৃত এক প্রভাবক উপাদানে। সামনে কি এমন সময় আদৌ আসবে, যখন খলিফা কেবল নামে নয়, দায়িত্ব ও প্রভাবক্ষমতায়ও খলিফাতুল মুসলিমীনে পরিণত হবেন?!

এমন ক্রম পরিবর্তিত সময়ে এটি বড় জটিল প্রশ্নই বটে!

আমরা বরং আমাদের মহান বীর ইমাদুদ্দিন জিনকির চিন্তাজগতে বিচরণ করি!

তিনি তাদের মধ্য হতে কার সঙ্গে যুক্ত হবেন? কাকে সাহায্য করবেন? তার দৃষ্টিতে চলমান সংঘাতে কোন পক্ষ মহান ও শ্রেষ্ঠ?

শুরুতে তিনি সুলতান মাসউদের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। কারণ, সংঘাতে জড়ানো ভাইদের মধ্যে তিনি ছিলেন জ্যেষ্ঠতম। ইমাদুদ্দিন জিনকির মনে হয়েছিল, অন্যদের তুলনায় তার সালতানাত লাভের

সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু চলমান যুদ্ধ ও সংঘাত প্রমাণ করে দিয়েছে, তারা সকলেই দুর্বল; চারিত্রিক উৎকর্ষ ও স্বভাবগত নম্রতা থাকলেও সকলেই পার্থিব স্বার্থান্বেষী। এখন তিনি কী করবেন? সুলতান মাসউদকেই সঙ্গ দিয়ে যাবেন, অন্য কোনো সুলতানের পক্ষ নেবেন, নাকি খলিফার পাশে দাঁড়াবেন?!

হতভম্ব করে দেওয়ার মতো গুরুতর পরিস্থিতি!

বরং অতি জটিল পরিস্থিতি!

জটিলতা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার কারণ জানেন?!

জটিলতার কারণ কেবল এই নয় যে, পরস্পরবিরোধী অনেকজনের মধ্য হতে একজনকে বেছে নিতে হবে। জটিলতার কারণ আরও জটিল!

সময় ততদিনে প্রমাণ করে দিয়েছে, ইমাদুদ্দিন জিনকি সবার চেয়ে শক্তিশালী!

তিনি সমকালীন সকল সুলতানের চেয়ে শক্তিশালী, প্রতাপশালী আব্বাসি খলিফার চেয়েও। কেবল বিশ্বাসশক্তি ও চরিত্রগুণের বিচারে নয়; সামরিক ও জাগতিক শক্তির বিবেচনায়ও তিনি তাদের চেয়ে শক্তিশালী। তিনি তাদের চেয়ে যোগ্য ও শক্তিশালী চিন্তায়, মেধায় ও দৃষ্টিভঙ্গিতেও। তিনিই একমাত্র নেতা, যিনি ক্রুসেডার বিতাড়নকে জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছেন। তিনিই একমাত্র শাসক, যিনি মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধকরণের কঠিন দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তিনিই একমাত্র রাষ্ট্রনায়ক, যিনি নিজের প্রতিটি পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্তের বিষয়ে আলিম ও ফকিহদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

জনপ্রিয়তায়ও তিনি সবার চেয়ে যোজন যোজন এগিয়ে। মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলের জনগণের হৃদয় তার প্রতি ধাবমান। তার প্রতিটি সংবাদ জানার জন্য সকলের হৃদয়জগৎ উন্মুখ, ভালোবাসায় টইটম্বুর। জনসাধারণের মাঝেও তার বিষয়ে দ্বিমত নেই। বিপরীতে এসব সুলতানের কারও সঙ্গে কি জনসাধারণের সামান্য সখ্য আছে? সালতানাতের মসনদে তুগরল আছেন, না মাসউদ; সেলজুকশাহ, না দাউদ বিন মাহমুদ, জনতার দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো পরিবর্তন ঘটে?! বরং তারা চারজন বাদে পঞ্চম-ষষ্ঠ বা দশম কোনো ব্যক্তিও মসনদে আরোহণ করলে জনমনে কোনো দৃশ্যমান পরিবর্তন বা আলাদা গুরুত্ব রাখবে না।

এটিই হলো প্রকৃত বাস্তবতা। তাহলে ইমাদুদ্দিন জিনকিই কেন মুসলিম বিশ্বের প্রধান ব্যক্তি হবেন না? যে দায়িত্ব সুলতান পালন করেন, সে দায়িত্ব কেন তিনি নিজের কাঁধে তুলে নেবেন না?

নিঃসন্দেহে বড় ধৃষ্টতাপূর্ণ প্রশ্ন!

কিন্তু এটিই বাস্তব প্রশ্ন!

হয়তো এ প্রশ্নের দুঃখজনক উত্তর হবে—তিনি তো সেলজুক পরিবারের সদস্য নন। তাহলে তিনি কীভাবে সেলজুক সুলতানের স্থলাভিষিক্ত হবেন?!

কিন্তু সুলতান হতে হলে কি সেলজুক পরিবারের সদস্য হওয়া জরুরি?!

খলিফাকে আব্বাসি পরিবারেরই হতে হবে?!

শাসনক্ষমতা কি বংশগত অধিকার?!

এগুলো নিশ্চয়ই দুঃসাহসী প্রশ্ন; কিন্তু এসব প্রশ্নের উত্তর এমন অনেক ভুল প্রকাশ করে দেবে, মুসলিম উম্মাহ তার যাপিত জীবনে বারবার যার শিকার হয়েছে।

আমি বলছি না, পিতার পর তার পুত্র রাষ্ট্রশাসনভার গ্রহণ করতে পারবেন না। অবশ্যই পারবেন; শর্ত হলো সন্তানকে হতে হবে মালিকশাহর মতো; যিনি পিতা আলপ আরসালানের মৃত্যুর পর শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন।

নিঃসন্দেহে এই উত্তরাধিকার শরিয়তের কোনো মূলনীতি লঙ্ঘন করেনি; প্রশাসনিক রীতিনীতি বিনষ্ট করেনি।

একজন মুসলিম প্রশাসকের মাঝে জ্ঞান, শক্তি, সদাচার, শরিয়তের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, প্রশাসনিক দক্ষতা, নিপুণ কূটনীতির মতো অপরিহার্য কিছু গুণ বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। কোনো ভাই বা পুত্রের মাঝে এসব গুণ বিদ্যমান থাকলে প্রয়াত ভাই বা পিতার পর তার স্থলাভিষিক্ত হতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু এসব গুণ না থাকা সত্ত্বেও কেবল পূর্ববর্তী শাসকের আত্মীয়তার 'যোগ্যতা'বলে মুসলমানদের শাসক বনে যাওয়া না ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ, না বিবেকের যুক্তিতে গ্রহণযোগ্য।

সেলজুক সাম্রাজ্যকাল ছিল মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ কথা প্রযোজ্য সেলুজক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তুগরল বেগ, এরপর আলপ আরসালান, মালিকশাহ ও অন্যান্য প্রতাপশালী সুলতানের

শাসনামলের ক্ষেত্রে, যারা ইসলামের পতাকা সমুন্নত করেছিলেন। কিন্তু সেলজুকদের শক্তি ও প্রভাব যখন ঝিমিয়ে আসে, তখন ইসলামের পতাকা সমুন্নত রাখতে অন্য কারও এগিয়ে আসাই ছিল বাস্তবতার দাবি। সুনির্দিষ্ট জাতি-গোষ্ঠী বা পরিবারের স্বার্থে তো উম্মাহর অস্তিত্ব শেষ করার কোনো সুযোগ নেই।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾

আর আমি লোকদের মাঝে দিন ও কালের বিবর্তন ঘটিয়ে থাকি।

[সুরা আলে-ইমরান: ১৪০]

এ রাজত্ব তো অন্য এক পরিবারের হাত থেকেই সেলজুক পরিবারের হাতে এসেছিল। সুতরাং এমন একদিন আসবেই, যখন তাদের হাত থেকে কর্তৃত্ব চলে যাবে অন্য কারও হাতে।

স্পষ্টতই অনুমিত হচ্ছিল, তৎকালে সেই 'অন্য' হতে যাচ্ছেন ইমাদুদ্দিন জিনকি!

জিহাদের অঙ্গনে তার অবিচলতা, অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা, অবস্থান ও মর্যাদা সে যুগে তাকে এ পদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হিসেবে তুলে ধরেছিল। সালতানাতের পদ নিয়ে যারা সংঘাতে লিপ্ত ছিল, তাদের মধ্যে কে যোগ্যতা ও মর্যাদায় তার কাছে ভিড়তে পারে? অন্য সব বিষয় না হয় বাদ দিলাম, কেবল অভিজ্ঞতার কথাই বলি! তারা সকলেই তো ছিল বয়সে নবীন, অভিজ্ঞতায় কাঁচা। বয়সে তাদের জ্যেষ্ঠতম ছিলেন সুলতান মাসউদ; ৫২৮ হিজরি সনে তার বয়স সাতাশ পেরোয়নি। অথচ সে সময় ইমাদুদ্দিন জিনকির বয়স ছিল একান্ন বছর! তিনি পদে পদে হাজারো অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, ঘটনা-দুর্ঘটনার দুর্বিপাকে জ্বলে-পুড়ে সমৃদ্ধ হয়েছেন, সুনিপুণ দক্ষতায় কাছের-দূরের সবকিছু পর্যবেক্ষণ করেছেন। তার শক্তি ও দক্ষতা, ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতার কথা সকলে জানে। তিনি যদি মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব লাভ করেন, সকলে তাতে সুখী হবে, সকলে তার নির্দেশনা মেনে নেবে।

কিন্তু ইমাদুদ্দিন জিনকি এখন কী করবেন?!

তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করে তার রাজ্য নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন?

নাকি তার শক্তি নিয়ে দুর্বল একজনের পাশে দাঁড়াবেন এবং তাকে শক্তিশালী করবেন?

তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করলে হয়তো পুরো সেলুজক পরিবার একসঙ্গে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবে! কারণ, তিনি তো সেলজুক পরিবারের কেউ নন। তখন তো রাষ্ট্র উত্তপ্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে পতিত হবে! জাতি আটকে যাবে সংঘাতের এক গোলকধাঁধায়!

আর তিনি যদি তার শক্তি নিয়ে দুর্বল এক পক্ষের পাশে দাঁড়ান, তাহলে দুর্বল সেই ব্যক্তি হয়তো এমন পদে অধিষ্ঠিত হবে, সে যার যোগ্য নয়; এমন অবস্থানে পৌঁছে যাবে, যা তার যথোচিত নয়। এটা তো হবে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা এবং উম্মাহর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা।

তা ছাড়া এই আত্মঘাতী গৃহবিবাদের স্রোতে ক্রুসেডার বিতাড়ন তৎপরতা পুরোপুরি বিস্মৃত হয়ে যাবে।

ইমাদুদ্দিন জিনকি কী করবেন?!

মহৎপুরুষদের চিন্তাধারা তো অভাবনীয়ই হয়ে থাকে!

তিনি সিদ্ধান্ত নেন, চলমান বিরোধের নথিপত্র পুরোপুরি বন্ধ করে তিনি মনোযোগ দেবেন ক্রুসেডারদের দমনে। তিনি সচেষ্ট হবেন নির্যাতিত-নিপীড়িত, অধিকার ও মর্যাদাবঞ্চিত, আপন বসতভিটা থেকে বিতাড়িত মুসলমানদের ঠোঁটে হাসি ফিরিয়ে আনতে।

কিন্তু ফিতনার এমন ভীতিপ্রদ জটিল সময়ে এমন চিন্তা বাস্তবায়নের রূপরেখা কী হতে পারে?!

ইমাদুদ্দিন জিনকি ভাবতে থাকেন। অনেক চিন্তার পর তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, কার্যত তিনি সালতানাত ও খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পথ চলবেন। তবে ক্ষোভ ও বিক্ষোভের আশঙ্কায় তিনি বিচ্ছিন্নতার বিষয়টি প্রকাশ্যে ঘোষণা করবেন না।

তিনি এসব দুর্বল সুলতানদের সবাইকে পেছনে রেখে সামনে এগিয়ে যাবেন। এমনকি তাদের চলমান সংঘাত যদি শেষ হয়ে যায় এবং কোনো একজন পরিস্থিতির ওপর স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন, তখনও তার নীতিতে পরিবর্তন ঘটবে না। পক্ষান্তরে তিনি তাদের পেছনে পড়ে

থাকলে অচিরেই তারা তাকে তাদের পছন্দের 'দুনিয়া'য় নিয়ে যাবে এবং তাকে নিজেদের পার্থিব স্বার্থোদ্ধারের মাধ্যম বানাবে। তাই তিনিই জাতিকে নেতৃত্ব দেবেন গৌরব ও মর্যাদার পথে এবং তার আগে-পরে আপন রবের সন্তুষ্টি অর্জনের পথে।

তার কাঁধে এক কঠিন আমানত ও দায়িত্বভার। তিনি তাই দীর্ঘ বিরোধ ও ফলহীন সংঘাতে সময় অপচয় করতে চান না।

তিনি এখনই নিজেকে উম্মাহর অনুসরণীয় প্রধান নেতা ঘোষণা করবেন না; হয়তো জাহির করবেন না কখনোই। কিন্তু তিনি কাজ করে যাবেন মুসলিম বিশ্বের প্রধান নেতার মতো করে। একই সঙ্গে তিনি সমসাময়িক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যথাসম্ভব কোমল আচরণ করবেন। তাদের অনিষ্টতা থেকে বাঁচতে এবং নিজের মহান কর্মতৎপরতাকে তাদের বাধামুক্ত রাখতে এটিই হবে প্রজ্ঞাপূর্ণ নীতির দাবি।

প্রয়াত সুলতান মাহমুদ তার নিয়োগপত্রে ইমাদুদ্দিন জিনকির জন্য যে রাজ্যসীমা নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন, তিনি সে অঞ্চলেই অর্থাৎ মসুল, জাযিরা ও শাম অঞ্চলে তার কর্মধারা সীমাবদ্ধ রাখবেন। সেলজুক ও আব্বাসিদের সংঘাতক্ষেত্র বাগদাদ, মধ্য ইরাক, পারস্য ও অন্যান্য অঞ্চলে তিনি মোটেও নজর দেবেন না। তা ছাড়া আল্লাহ তাওফিক দিলে মসুল, জাযিরা ও শামের সম্মিলিত শক্তিই ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অনেক মূল্যবান দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে সক্ষম হবে। আর ভবিষ্যতের কথা কে জানে?! হয়তো ইমাদুদ্দিন জিনকির এ চেষ্টা ও সাধনা অন্য কারও হাতে পূর্ণতা লাভ করবে; যিনি এ ঐক্যের পরিধি আরও বিস্তৃত করে উম্মাহর সম্মান ও গৌরব আরও ব্যাপক ও সমৃদ্ধ করবেন। তুগরল বেগ ও আলপ আরসালানের রাজ্য তো মালিকশাহর রাজত্বের তুলনায় অনেক ছোট ছিল। সব সময় তো এমনই হয়; ধীরে ধীরে উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি!

শেষ কথা হলো, ইমাদুদ্দিন জিনকি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতেন। এর স্বপক্ষে ইতিপূর্বে আমরা বিভিন্ন প্রমাণ উল্লেখ করে এসেছি। আর যে আল্লাহর জন্য কাজ করে, আল্লাহ তার চেষ্টা ও সাধনা নিষ্ফল করেন না। হয়তো জীবদ্দশায় সে তার কাজের পরিণতি দেখে যেতে পারে না, কিন্তু আল্লাহ তার কর্মফল ও পুরস্কার পরকালের

জন্য গচ্ছিত রেখে দেন। আর এটিই তো মুমিনের চূড়ান্ত প্রত্যাশা, সর্বশেষ চাওয়া।

মহান বীরপুরুষ ইমাদুদ্দিন জিনকির মনমস্তিষ্কে এসব চিন্তা ও পরিকল্পনাই বিচরণ করছিল। দীর্ঘ তিন বছরের ধারাবাহিক সংকটের নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং আপন করণীয় নির্ণয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনার পর তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ফিতনা তো চলছেই; আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না, কবে এর অবসান হবে।

আর তাই ইমাদুদ্দিন জিনকি এবার তার গৃহীত নতুন কূটনীতির বাস্তবায়ন শুরু করেন। এক পক্ষকে বাদ দিয়ে আরেক পক্ষের পাশে দাঁড়ানোর সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে নমনীয়তা ও সুসম্পর্কের নীতি।

ইমাদুদ্দিন জিনকি এ নীতির বাস্তবায়ন শুরু করেন খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহকে দিয়ে। সুলতান মাসউদের পক্ষে অগ্রসর হওয়ার পর থেকে বিগত দুই বছর ধরে খলিফার সঙ্গে তার সম্পর্কে টানাপোড়েন চলছিল। তিনি এবার খলিফা বরাবর মূল্যবান হাদিয়া-তোহফা প্রেরণ করেন। বরং খলিফার মর্যাদার স্বীকৃতি এবং খলিফার প্রতি আনুগত্য ও মিত্রতার নিদর্শনস্বরূপ তিনি তার বড় পুত্র সাইফুদ্দিন গাজিকে খলিফার খেদমতে প্রেরণ করেন। এতে খলিফার মন প্রশান্ত হয়ে যায়। তিনিও ইমাদুদ্দিন জিনকির উদ্দেশে হাদিয়া প্রেরণ করেন।[৪১৮]

দামেশক নগরীকে রাজ্যভুক্ত করার প্রচেষ্টা

৫২৯ হিজরি সনের শুরু ভাগ। বিগত কয়েক মাস ধরে সালতানাতের মসনদে আছেন সুলতান তুগরল। ইমাদুদ্দিন জিনকি এ সময় তার নতুন চিন্তার প্রেক্ষিতে সুলতানদের সঙ্গে কর্মনীতির পরিকল্পনা সাজাচ্ছিলেন। এরই মধ্যে মসুলে এক বিস্ময়কর সংবাদ পৌঁছায়। হঠাৎ ইন্তেকাল করেছেন সুলতান তুগরল। তার বয়স হয়েছিল মাত্র ছাব্বিশ বছর। ৫২৯ হিজরি সনের মুহাররম মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন। সুযোগ পেয়ে সুলতান মাসউদ দ্রুত তার সৈন্য ও সহযোগীদের সমবেত করে ছুটে আসেন এবং সালতানাতের মসনদে অধিষ্ঠিত হন।[৪১৯]

---

৪১৮. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ৪৭-৪৮।
৪১৯. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৭৮।

নতুন সুলতান হওয়ার জন্য সুলতান মাসউদের সামনে এখন শূন্য ময়দান। তুগরল তো চলেই গেলেন! দাউদ বিন মাহমুদ তার আতাবিক আক সুনকুর আহমাদিলি নিহত হওয়ার পর শক্তিতে অনেক দুর্বল হয়ে গেছেন। কথিত আছে, স্বয়ং সুলতান মাসউদই বাতিনি গুপ্তঘাতকদের মাধ্যমে তাকে হত্যা করিয়েছেন। ওদিকে সুলতান সানজারও উপলব্ধি করেছেন যে, তার মনোনীত সুলতান তুগরলের মৃত্যুর পর ইরাক ও পারস্যে চলমান বিরোধে হস্তক্ষেপ করা তার সামর্থ্যে কুলাবে না। সালতানাতের আরেক দাবিদার সেলজুকশাহ তো সবার চেয়ে দুর্বল। এভাবে সুলতান মাসউদ পৌঁছে যান কাঙ্ক্ষিত সালতানাতের মসনদে; যোগ্যতাবলে নয়; ময়দানে অন্য কারও অনুপস্থিতির সুযোগে। সুস্পষ্ট অনুমিত হচ্ছিল যে, সেলজুক সালতানাত তার অন্তিমকাল অতিক্রম করছে!

এ সময় ইমাদুদ্দিন জিনকির কাছে দামেশক থেকে এক বিস্ময়কর বার্তা এসে পৌঁছায়। বার্তায় দামেশকের দুষ্কর্মা অধিপতি শামসুল মুলুক ইসমাইল বিন বুরি ইমাদুদ্দিন জিনকির সাহায্যপ্রার্থনা করেছেন এবং তাকে দামেশকে এসে নগরীটির দায়িত্বভার গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন!

মূল ঘটনা হলো, দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই শামসুল মুলুক ইসমাইল বিন বুরি একের পর এক অপ্রত্যাশিত অন্যায় করে গিয়েছিলেন। এমনকি তিনি তার ভাই সোনজ বিন বুরিকে দীর্ঘদিন এক কুঠুরিতে আটকে রাখেন এবং শেষ পর্যন্ত বেচারা ক্ষুধার যন্ত্রণায় মারা যায়। এরপর তিনি দামেশকের জনগণের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা শুরু করেন, তাদের সম্পত্তি লুট করে নেন। তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তু ছিনিয়ে নিতেও তিনি সামান্য দ্বিধা করতেন না। অসহায় ও দরিদ্র জনতার অর্থ চুরি করতেও তিনি সংকোচ করতেন না। ফলে দামেশকের জনমনে ক্ষোভ দানা বাঁধে। তার কিছু সহযোগী তার আচরণের প্রতিবাদ করলে তিনি তাদেরকে হত্যা করেন এবং এরপর প্রত্যেক বিরোধীকে প্রকাশ্যে বিনা দ্বিধায় হত্যা করার ঘোষণা দেন। দামেশকের পরিবেশ ক্রমশ অশান্ত হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, একসময় ইসমাইল নিজের নিরাপত্তা নিয়ে পুরোপুরি শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তিনি আশঙ্কা করেন যে, শীঘ্রই জনতা প্রতিশোধ নেবে। এমনকি তিনি অতি আপনজনদেরকেও ভয় করতে থাকেন এবং আশঙ্কা

করেন, যেকোনো মুহূর্তে তাকে হত্যা করা হতে পারে। এ কারণেই তিনি নিরুপায় হয়ে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে প্রতাপশালী শাসক ইমাদুদ্দিন জিনকির কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করেন। তিনি নিজের নিরাপত্তালাভের বিনিময়ে ইমাদুদ্দিনের কাছে দামেশকের কর্তৃত্ব সমর্পণের প্রস্তাব দেন। বরং অতি ভীত ইসমাইল বিন বুরি হুমকি দেন যে, ইমাদুদ্দিন যদি দ্রুত না আসেন, তাহলে তিনি দামেশকের নিয়ন্ত্রণ ক্রুসেডারদের হাতে তুলে দেবেন![৪২০]

ইমাদুদ্দিন জিনকি দেখতে পান, এটি দামেশককে রাজ্যভুক্ত করার এক মূল্যবান সুযোগ। তিনি কালবিলম্ব না করে মসুল থেকে দামেশক অভিমুখে রওনা হন। তবে পথিমধ্যে তিনি রাক্কা নগরীকে তার ঐক্যবদ্ধ কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করার এক অভাবিত সুযোগ পেয়ে যান। রাক্কা জাযিরা অঞ্চলের একটি নগরী। নগরীটির অবস্থান ফুরাতের পূর্ব দিকে হাররানের নিকটে।[৪২১] ইমাদুদ্দিন জিনকি যদিও রাক্কা নগরীকে তার রাজ্যভুক্ত করতে সক্ষম হন; কিন্তু এতে তার অগ্রযাত্রা কিছুটা ব্যাহত হয়। ফলে দামেশক পৌঁছতে তার তুলনামূলক দেরি হয়ে যায়। সেখানে পৌঁছে তিনি জানতে পারেন, শামসুল মুলুক ইসমাইল ইতিমধ্যে নিহত হয়েছেন!

শামসুল মুলুক ইসমাইল বিন বুরি এমন এক দিক থেকে ষড়যন্ত্রের শিকার হন, যা তার কল্পনাতেও ছিল না। অন্য কেউ নয়; তাকে হত্যা করেন তার গর্ভধারিণী মা। নিঃসন্দেহে এটি ইতিহাসের অন্যতম বিস্ময়কর ঘটনা যে, একজন মা তার শাসকপুত্রকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছেন। এর কারণ হলো, চরম দুরাচারী ইসমাইল একসময় তার মাকে পর্যন্ত হত্যার পরিকল্পনা করেন। বিষয়টি জানতে পেরে তার মা-ই আগে তার দফারফা করে দেন। শামসুল মুলুক নিহত হওয়ার পর দামেশকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তার ভাই শিহাবুদ্দিন মাহমুদ বিন বুরি। দামেশকবাসী তার আনুগত্য স্বীকার করে নেয়।[৪২২]

---

৪২০. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৭৮-২৭৯।

৪২১. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৫৭।

৪২২. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৭৯ ও ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৫৬-২৫৭।

ইমাদুদ্দিন জিনকি আপন রাজ্যভুক্ত করার চেষ্টায় দামেশক অবরোধ করেন। কিন্তু দুর্ভেদ্য দামেশকের পতন ঘটানো দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। দামেশক মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ কাঠামোতে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানায়। নগরবাসী বিভিন্ন দুর্গে আশ্রয় নেয়। দামেশকের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব নেন প্রয়াত অধিপতি তুগতেকিনের জনৈক ক্রীতদাস মুইনুদ্দিন আনুর।[৪২৩] মুইনুদ্দিন আনুর অসাধারণ সামরিক দক্ষতার অধিকারী সেনাপতি ছিলেন। কিন্তু সমানতালে তিনি ছিলেন চরম স্বার্থবাদী। পদ ও ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে যেকোনো মাধ্যম গ্রহণ করতে তিনি দ্বিধা করতেন না। অচিরেই আমরা তাকে ক্রুসেডারদের সঙ্গে প্রকাশ্যে সহযোগিতা বিনিময় করতেও দেখব। দামেশকের আগামী ইতিহাসে অন্যতম নীতিনির্ধারক চরিত্র বিবেচিত হবেন এই মুইনুদ্দিন আনুর।

এরই মধ্যে ইরাক পরিস্থিতিতে ঘটে যায় এক উষ্ণ বিবর্তন। খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহ আবারও সেলজুক সাম্রাজ্যের শেকল ছিঁড়ে স্বায়ত্তশাসনের স্বপ্নপূরণে উদ্যোগী হন। তার স্বপ্নের পালে বাতাস জোগান সুলতান দাউদ বিন মাহমুদ! তিনি চাচা সুলতান মাসউদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য খলিফার সঙ্গে জোট করে খলিফাকে প্ররোচিত করেন। খলিফা সৈন্যসমাবেশ শুরু করেন এবং সরাসরি নতুন সুলতান মাসউদের মুখোমুখি হওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকেন।[৪২৪]

শামের ময়দানে অবস্থানরত ইমাদুদ্দিন জিনকি অনুভব করেন, দামেশক পতনের সুযোগ ও সম্ভাবনা ক্রমেই দুর্বল হয়ে আসছে। ওদিকে ইরাকে যেভাবে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠছে এবং উম্মাহর দিগন্তজুড়ে কালো মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে, তাতে দামেশকের নগরপ্রাচীরের সামনে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার সুযোগও নেই। অধিকন্তু এরই মধ্যে তিনি জানতে পারেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দামেশকের নিরাপত্তা রক্ষার লক্ষ্যে হামা নগরীর প্রতিরক্ষাবাহিনীর সিংহভাগ সদস্য দামেশকে চলে এসেছে এবং হামা এখন কার্যত অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, বছরতিনেক পূর্বে ইরাক-বিপর্যয়ের সুযোগ কাজে

---

[৪২৩]. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৭৯-২৮০ ও ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ৩৯১।

[৪২৪]. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৮১-২৮২।

লাগিয়ে শামসুল মুলুক ইসমাইল হামা নগরীকে দামেশকের সঙ্গে একীভূত করে নিয়েছিলেন।

সব দিক বিবেচনা করে ইমাদুদ্দিন জিনকি সুযোগ কাজে লাগান এবং সুরক্ষিত দামেশকের অবরোধ তুলে নিয়ে হামার দিকে অগ্রসর হন।[৪২৫] তিনি সহজেই নগরটি অধিভুক্ত করে নেন। এরপর তিনি হিমস অভিমুখে অগ্রসর হয়ে নগরীটি অবরোধ করেন। কিন্তু কুরাইশ বিন খায়র খানের নেতৃত্বে সুরক্ষিত হিমস নগরী প্রতিরোধ গড়ে তুললে অপারগ হয়ে ইমাদুদ্দিন জিনকি আলেপ্পোতে ফিরে আসেন।[৪২৬]

এসব ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেই সংবাদ আসে—৫২৯ হিজরি সনের ১০ রমজান (১১৩৫ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে) খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহ ও সুলতান মাসউদের মধ্যে দুঃখজনক লড়াই সংঘটিত হয়েছে। যুদ্ধে সুলতান মাসউদ বিজয়ী হয়েছেন এবং খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহ তার হাতে বন্দি হয়েছেন। বন্দি খলিফাকে সুলতান মাসউদের মূল নিবাস হামাদানে সুলতানের হেফাজতে রাখা হয়েছে। বিস্ময়কর তথ্য হলো, এ যুদ্ধে কোনো পক্ষের একজন সৈন্যও নিহত হয়নি!

নিঃসন্দেহে এটি ছিল আব্বাসি খলিফার জন্য চরম অবমাননাকর এক পরিণতি। খলিফা এরপর সুলতান মাসউদের সঙ্গে লাঞ্ছনাকর সন্ধিচুক্তি করতেও বাধ্য হন। চুক্তির শর্ত ছিল, খলিফা সুলতান মাসউদকে চার লক্ষ দিনার মুক্তিপণ প্রদান করবেন, ভবিষ্যতে সৈন্যসমাবেশ ঘটাবেন না, নিজ বাসস্থান থেকে কখনো বের হবেন না এবং সুলতান মাসউদকে সুলতান হিসেবে স্বীকৃতি দেবেন।

পরিবর্তিত পরিস্থিতি মেনে নেওয়া ছাড়া খলিফার উপায় ছিল না। তিনি যখন বাগদাদে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখনই ঘটে বড় বেদনাদায়ক এক ঘটনা। অতর্কিতে চব্বিশজনের একটি বাতিনি গুপ্তঘাতকদল খলিফার তাঁবুতে প্রবেশ করে তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলে! দিনটি ছিল ৫২৯ হিজরি সনের ১৭ জিলকদ।[৪২৭]

---

[৪২৫]. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ১/২৭৫-২৭৮।

[৪২৬]. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ৩৯৭-৩৯৮।

[৪২৭]. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৮১-২৮৩।

চারিদিকে রটে যায়, সুলতান মাসউদই খলিফাকে হত্যার মদদ জুগিয়েছেন। কারণ, এমন কঠোর শর্তযুক্ত সন্ধিচুক্তির পরও তিনি খলিফার বিষয়ে চিন্তামুক্ত ছিলেন না। অবশ্য এরপর প্রয়াত খলিফার পুত্র আবু জাফর মানসুরের হাতে খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করা হয় এবং তিনি 'রাশিদ বিল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করেন।[৪২৮] কিন্তু এটি সুস্পষ্ট যে, ইরাক অঞ্চল ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। ইরাকের পরিস্থিতি তখন প্রচণ্ড তাপে টগবগ করা উত্তপ্ত কড়াইয়ের মতো! এদিকে সুলতান মাসউদ এতটুকুতেই শান্ত হয়ে এরপর রওনা হন তার ভ্রাতুষ্পুত্র দাউদ বিন মাহমুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে; যিনি তার বিরুদ্ধে খলিফার সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েছিলেন।[৪২৯]

ইমাদুদ্দিনের অব্যাহত বিজয়

এতসব দুর্যোগ চলাকালে ইমাদুদ্দিন জিনকি ব্যস্ত ছিলেন অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজে। তিনি হামা অধিকার ও হিমসে ব্যর্থ হওয়ার পর আলেপ্পোতে ফিরে আসেন। এরপর তিনি ক্রুসেড রাজ্য এন্টিয়কের সামরিক অস্থিরতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে রাজ্যটিতে অভিযান পরিচালনার ছক আঁকতে শুরু করেন। তিনি জানতেন, এন্টিয়ক এখন এলিসের মতো অবিবেচক মহিলার প্রত্যক্ষ শাসনে চলছে। নিকটবর্তী আরেক ক্রুসেড রাজ্য এডেসা থেকে এন্টিয়কে যেন কোনো ধরনের সামরিক সাহায্য পৌঁছতে না পারে, এ উদ্দেশ্যে ইমাদুদ্দিন জিনকি আলেপ্পোর আমির সিওয়ারকে তিল-বাশির, আনতেপ (Antep) ও আযায নগরীতে হামলা চালানোর নির্দেশ দেন। এর মাধ্যমে তিনি এডেসা ও এন্টিয়কের যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেন। এডেসার সৈন্যরা এখন নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকবে বলে এন্টিয়কের দিকে মনোযোগ দেওয়ার সামান্য সুযোগও তাদের থাকবে না।

পরিকল্পনা প্রণয়নের পর ইমাদুদ্দিন জিনকি এন্টিয়ক নগরীর আশেপাশের বিভিন্ন দুর্গে এবং এ অঞ্চলের অধিকৃত বিভিন্ন মুসলিম নগরীতে হামলা চালাতে থাকেন। একটানা কয়েকটি যুদ্ধের পর আমাদের মহান বীর

---

৪২৮. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৮৩ ইবনুল জাওযি, *আল-মুনতাযাম*, ১০/৫৫।

৪২৯. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৮৮।

ইমাদুদ্দিন জিনকি কাফারতাব, মাআররাতুন-নোমান ও যারদানা নগরী পুনরুদ্ধার করেন। ইরাক পরিস্থিতিতে বিপর্যস্ত মুসলিম উম্মাহর জন্য ইমাদুদ্দিন জিনকির এ বিজয়গুলো ক্ষতস্থানে মলমের কাজ করে।[৪৩০]

ইমাদুদ্দিনের এই বিজয়ধারা হিল্লাল-ছালিব উভয় শিবিরের সকলকে সমান্তরালে সচেতন ও সতর্ক করে তোলে!

ইমাদুদ্দিন জিনকির ধারাবাহিক বিজয় ক্রুসেড শিবিরের এন্টিয়ক শাসক এলিসের অন্তরে প্রচণ্ড ভীতি সৃষ্টি করে। তিনি এবার নতুন এক পাগলামি করে বসেন! এলিস বাইজান্টাইন সম্রাট ২য় জন কমনিনোসের কাছে বার্তা পাঠিয়ে তার পুত্রের সঙ্গে নিজের কন্যা কন্সটেন্সের বিয়ের প্রস্তাব দেন[৪৩১] এবং এর মধ্য দিয়ে কার্যত ক্যাথলিক এন্টিয়ক রাজ্যের ওপর অর্থোডক্স বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেন!

এলিসের এমন পদক্ষেপ ক্রুসেডারদের শেকড় নাড়িয়ে দেয়। দীর্ঘ প্রায় চল্লিশটি বছর ধরে তারা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যকে এন্টিয়ক থেকে দূরে রাখতে সচেষ্ট থেকেছে। আজ এই অবিবেচক নারী শাসক এক মুহূর্তে ক্রুসেডারদের এতদিনের সব সাধনা ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চাচ্ছেন! এন্টিয়কের ক্রুসেডাররা প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং রাজা ফাল্কের সঙ্গে পত্রবিনিময় করে। ফাল্ক আর কোনো সমাধান না খুঁজে পেয়ে এন্টিয়কের শিশু রাজকন্যা কন্সটেন্সকে তার এমন কোনো মিত্রের কাছে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, যিনি এন্টিয়ক রাজ্যভার সামলাতে পারবেন। অথচ কন্সটেন্সের বয়স তখন দশ বছরও হয়নি! ফাল্ক এ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বেছে নেন আকুইতিনের ডিউক (The Duke of Aquitaine) ৯ম উইলিয়ামের[৪৩২] পুত্র যুবরাজ রেমন্ড অফ পয়টিয়ার্স (Raymond of Poitiers)-কে।[৪৩৩] ফরাসি এই যুবরাজ তখন তৎকালীন ইংল্যান্ডের রাজা ১ম হেনরির রাজপ্রাসাদে তার তত্ত্বাবধানে

---

৪৩০. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৬০-২৬১।

৪৩১. Runciman: op.cit.,II, pp. 88-90.

৪৩২. এই ৯ম উইলিয়াম ইতিপূর্বে একটি ক্রুসেডার বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এর বিবরণ পূর্বে গত হয়েছে। [সম্পাদক]

৪৩৩. Guillaume de Tyr., p. 618.

বাস করতেন। ফাঙ্কের ত্বরিত বার্তা পেয়ে রেমন্ড এন্টিয়কে চলে আসেন এবং কন্সটেন্সকে বিয়ে করে এন্টিয়কের শাসনভার গ্রহণ করেন! শক্তিশালী এই তরুণ শাসক এন্টিয়কের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নতুন করে গুছিয়ে নেন। স্বভাবতই বেপরোয়া নারী শাসক এলিস প্রশাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং বাধ্য হয়ে লাতাকিয়ার চলে যান। কিছুদিন পরই তিনি সেখানে মারা যান।[৪৩৪]

এই ছিল ইমাদুদ্দিন জিনকির অব্যাহত বিজয়ধারায় ক্রুসেড শিবিরের প্রতিক্রিয়া।

ওদিকে ইমাদুদ্দিন জিনকির বিজয়ধারা মুসলিম বিশ্বে সৃষ্টি করে দ্বিমুখী প্রতিক্রিয়া। সাধারণ জনতা, আলিম ও ফকিহসমাজ এবং উম্মাহর সৎ ও পুণ্যবান ব্যক্তিগণ এ বিজয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।[৪৩৫] সকলের হৃদয়ে চলমান সংকট থেকে নিষ্কৃতির আশা আরও জোরালো হয়। কিন্তু বিপরীতে মুসলিম সমাজেরই কিছু মানুষ ইমাদুদ্দিনের বিজয় সংবাদে প্রচণ্ড বিচলিত-উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে! তাদের অন্তর্জগতে সাম্প্রদায়িক চেতনা আরও তীব্র হয়ে জেগে ওঠে!

হত্যাপ্রচেষ্টা থেকে ইমাদুদ্দিনের নিষ্কৃতি

বীরযোদ্ধা ইমাদুদ্দিন জিনকির অব্যাহত বিজয় সুলতান মাসউদের মনে প্রচণ্ড উদ্বেগের জন্ম দেয়। বেশ কিছু কারণে তার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পেয়ে শঙ্কায় রূপ নেয়। যথা—

১. খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহর শেষ সময়ে খলিফার সঙ্গে ইমাদুদ্দিন জিনকির বেশ চমৎকার সম্পর্ক ছিল। হতে পারে, খলিফার হত্যাকাণ্ড তাকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। অধিকন্তু আমজনতার মুখেমুখে ছড়িয়ে পড়েছে, সুলতান মাসউদই খলিফাকে হত্যা করতে বাতিনিদের প্ররোচিত করেছেন।

২. এসব ধারাবাহিক বিজয়ের ঘটনা মুসলিমসমাজে ইমাদুদ্দিন জিনকির মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। ফলে সকল সুলতানের তুলনায় তার ধার-ভার অনেক বেড়ে গেছে। মোটেও অসম্ভব কিছু নয় যে,

---

৪৩৪. সাইদ আশুর, *আল-হারাকাতুস সালীবিয়্যা*, ১/৪৩৪।

৪৩৫. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৯১।

ইমাদুদ্দিন জিনকি তার শাসিত অঞ্চল নিয়ে স্বাধীন রাজ্যের দাবি তুলবেন। ইতিপূর্বে তার চেয়ে শক্তিতে দুর্বল অনেকেও এরূপ দুঃসাহস দেখিয়েছে। দামেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালনা করছে তুগতেকিনের বংশধরগণ, হিমস শাসন করছে খায়র খানের পুত্ররা, শাইজার শাসন করছে মুনকিযের ছেলেরা।

৩. ইমাদুদ্দিন জিনকির নেতৃত্বে শুরু হওয়া ঐক্য-প্রচেষ্টার যথার্থতা সকলের কাছে সুস্পষ্ট। তিনি ইতিমধ্যে মসুলের সঙ্গে আলেপ্পো ও হামা নগরীকে যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। জাযিরা অঞ্চলের বেশ কিছু নগরীও তিনি অধিকার করে নিয়েছেন। তিনি কুর্দিদের সঙ্গে সম্পর্ক জোরালো করেছেন; সখ্যতা ও হৃদ্যতা গড়ে তুলেছেন উরতুকি শাসক হুসামুদ্দিন তামারতাশ বিন ইলগাজির সঙ্গেও। এভাবে ইমাদুদ্দিন জিনকির একীভূতকরণ প্রচেষ্টা অন্যান্য ইসলামি নগরীতেও প্রসারিত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। এরই ধারাবাহিকতায় অচিরেই একসময় হয়তো তিনি নজর দেবেন বাগদাদের দিকে এবং সেলজুকদের দুর্গ পারস্য ভূমির দিকেও।

৪. সুলতান মাসউদের শত্রুর অভাব নেই। এক্ষেত্রে সবার ওপরে আছে ভ্রাতুষ্পুত্র দাউদ বিন মাহমুদ, ভাই সেলজুকশাহ ও চাচা সুলতান সানজারের নাম। তাদের কেউ যদি সুলতান মাসউদের বিপক্ষে ইমাদুদ্দিন জিনকির সঙ্গে জোট করেন, তখন তিনি কীভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করবেন?!

সবগুলো বিষয় সামনে রেখে সুলতান মাসউদ এমন এক গর্হিত কর্মের পরিকল্পনা করেন, যা তার মতো 'সচ্চরিত্রে'র পরিচয়ে খ্যাতিমান ব্যক্তির কাছ থেকে একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। তিনি ইমাদুদ্দিন জিনকিকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন!

সুলতান মাসউদ তাকে পদচ্যুত করবেন না। কারণ, তাহলে তো ইমাদুদ্দিন তার সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ময়দানে থেকে যাবেন। তাই তিনি ইমাদুদ্দিন জিনকিকে হত্যা করেই পুরোপুরি নিষ্কৃতি লাভ করবেন! মুসলমানদের স্বপ্ন-সাধনা, ক্রুসেডবিরোধী জিহাদ-সংগ্রাম বা মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রচেষ্টা—এসব বিষয়ের কী হবে, সে চিন্তা সুলতান মাসউদের বিলকুল ছিল না।

এরই নাম আত্মকেন্দ্রিকতা ও অহমিকা! তিনি মনে করছিলেন, পৃথিবীর সবকিছু আবর্তিত হবে তাকে কেন্দ্র করে। তিনি চাচ্ছিলেন, চারিদিকের সবকিছু পরিচালিত হবে তার ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থে; ফলাফল যাই হোক না কেন!

সুলতান মাসউদ যদিও এমন নিকৃষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করেন; কিন্তু আল্লাহ তাআলা তো আপন বান্দার প্রতি পরম দয়াশীল। আল্লাহ তাআলা ইমাদুদ্দিন জিনকির নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করে দেন এমন এক ব্যক্তির মাধ্যমে, যার হাত ধরে কোনো কল্যাণ আসতে পারে, এমনটি কারও দূরতম কল্পনাতেও ছিল না।

সেই ব্যক্তির নাম দুবাইস বিন সাদাকা!

সেই দুরাচারী শিয়া নেতা, ইমাদুদ্দিন জিনকি যাকে কয়েক বছর পূর্বে বুরি বিন তুগতেকিনের বন্দিশালা থেকে মুক্ত করে এনেছিলেন; তার প্রতি সদ্ব্যবহার করে তাকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন এবং সম্মানিত করেছিলেন। দুবাইস বিন সাদাকা ইমাদুদ্দিন জিনকির সেই সদাচরণের কথা মনে রেখেছিল। খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহর সঙ্গে প্রচণ্ড বিরোধের জের ধরে দুবাইস সুলতান মাসউদের সঙ্গে জোট বেঁধেছিল। সুলতান মাসউদ যখন ইমাদুদ্দিন জিনকিকে হত্যার পরিকল্পনা করেন, সে তখন সুলতানের বাসভবনেই অবস্থান করছিল। দুবাইস সুলতান মাসউদের দুষ্ট পরিকল্পনার বিষয়টি জেনে ফেলে। সে আরও জানতে পারে, ইমাদুদ্দিন জিনকিকে প্রথমে হামাদানে সুলতানের বাসভবনে ডেকে আনা হবে, এরপর অসতর্ক মুহূর্তে তাকে হত্যা করা হবে। দুবাইস দ্রুত ইমাদুদ্দিন জিনকির কাছে বার্তা পাঠিয়ে তাকে ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত করে এবং সুলতানের আহ্বানে তার বাসভবনে আসতে কঠোরভাবে নিষেধ করে।

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর কী মহিমা! সুলতান মাসউদ জেনে ফেলেন যে, দুবাইস বিন সাদাকাই তার ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দিয়ে ইমাদুদ্দিনকে গুপ্তহত্যার চক্রান্ত বানচাল করে দিয়েছে। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ দুবাইসকে হত্যা করেন। এ সংবাদ জানার পরই ইমাদুদ্দিন জিনকি তার সেই বিখ্যাত উক্তিটি করেন, 'আমরা তাকে অর্থের

বিনিময়ে (বন্দিদশা থেকে) মুক্ত করেছিলাম; আর সে প্রাণের বিনিময়ে আমাদের রক্ষা করল।'[৪৩৬]

মহান আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ছিল ইমাদুদ্দিন জিনকি আরও কয়েক বছর বেঁচে থাকবেন। কেননা, আল্লাহ তাআলা আরও কিছু মহৎ কর্ম তার জন্য জমিয়ে রেখেছিলেন।

এমন বিতৃষ্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পরও এবং ক্রুসেডবিরোধী যুদ্ধ তৎপরতার সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত অবস্থায় এভাবে পৃষ্ঠদেশে আঘাতের শিকার হওয়া সত্ত্বেও ইমাদুদ্দিন জিনকি তার জিহাদি তৎপরতা অব্যাহত রাখেন। তিনি তো সুলতানদের পারস্পরিক পার্থিব সংঘাতে নিজেকে জড়াতে চাননি। তারপরও তিনি যখন এমন হত্যাষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হলেন, তখন বাধ্য হয়েই ভবিষ্যতে তিনি সুলতানদের বিরোধ-বিসংবাদ সম্পর্কে উদাসীন থাকবেন না এবং এই ঘনীভূত বিপর্যয়ে নিজে জড়িত না হলেও আত্মরক্ষায় সর্বোচ্চ সচেষ্ট থাকবেন।

ইরাকের পরিস্থিতি এখন অত্যন্ত উত্তপ্ত। মুসতারশিদ বিল্লাহর পুত্র রাশিদ বিল্লাহর হাতে এই শর্তে বায়আত গ্রহণ করা হয়েছে যে, তিনি কখনো সৈন্যসমাবেশ ঘটাতে পারবেন না এবং সুলতান মাসউদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবেন না। কিন্তু নতুন খলিফা কীভাবে সবার মুখের এই মন্তব্য উপেক্ষা করেন যে, সুলতান মাসউদই তার পিতাকে হত্যা করার জন্য বাতিনিদের প্ররোচিত করেছেন! তা ছাড়া সুলতান মাসউদের ভয়ে তটস্থ রাজন্যদের অনেকেই তখন তাকে ছেড়ে খলিফা রাশিদ বিল্লাহর পক্ষে সমবেত হয়েছে। নিজের হৃত সালতানাত খুঁজে ফেরা সুলতান দাউদ বিন মাহমুদও খলিফার পক্ষ নিয়েছেন। তারা সকলে সুলতান মাসউদের বিরুদ্ধে নতুন করে যুদ্ধে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য তাদের বাহিনীগুলো বাগদাদে সমবেত হতে শুরু করে। সুলতান মাসউদ নিজে তখন অবস্থান করছেন হামাদানে।[৪৩৭]

ইমাদুদ্দিন জিনকি ঘটনাপ্রবাহের ওপর নজর রাখছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, সংঘাতে না জড়ালেও তিনি ঘটনার কাছাকাছি থাকবেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি মসুলের নিকটে চলে আসেন এবং সম্ভাব্য প্রয়োজন দেখা

---

৪৩৬. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৫০।
৪৩৭. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/ ২৮৮-২৮৯।

দিলে তা পূরণের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। পাশাপাশি তিনি সুস্পষ্ট ঘোষণা করে দেন যে, তিনি খলিফা রাশিদ বিল্লাহর পক্ষে আছেন।[৪৩৮] সুলতান মাসউদ কর্তৃক ইমাদুদ্দিন জিনকিকে হত্যার ষড়যন্ত্র ফাঁস হওয়ার পর খলিফার সঙ্গে তার এই নতুন মিত্রতায় কারও আপত্তি করার কিছু ছিল না।

বাগদাদে খলিফা রাশিদ বিল্লাহ, অন্যান্য সহযোগী সুলতান ও দাউদ বিন মাহমুদের বাহিনীর সঙ্গে সুলতান মাসউদের বাহিনীর কয়েকটি যুদ্ধ হয়। যুদ্ধগুলোতে সুলতান মাসউদের বাহিনীরই প্রাধান্য ছিল। এরপর সুলতান মাসউদ শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে বাগদাদে প্রবেশ করেন। খলিফা রাশিদ বিল্লাহ বাধ্য হয়ে উত্তর দিকে পলায়ন করলে ইমাদুদ্দিন জিনকি তাকে মসুলে আশ্রয় দেন এবং বাগদাদের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের প্রতি নজর রাখেন।[৪৩৯]

সুলতান মাসউদ বাগদাদে আব্বাসি রাজপরিবারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। যেহেতু খলিফা রাশিদ বিল্লাহ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করেছেন, তাই সুলতান মাসউদ তাকে অপসারণ করে এমন কাউকে নতুন খলিফা নির্বাচনের মনস্থ করেন, যিনি সুলতান মাসউদের প্রতি অনুগত থাকবেন আর জনগণ তার পক্ষে থাকবে। তখন আর নতুন করে কোনো সংঘাতের সূচনাও হবে না। আব্বাসি নেতৃবৃন্দ এমন এক ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করে, যিনি ছিলেন সকলের প্রিয়, সদাচারী, ন্যায়বান ও সচ্চরিত্রের অধিকারী। সুলতান মাসউদও তাদের প্রস্তাব মেনে নেন। ফলে ইরাকের পরিস্থিতিও অনেকাংশে শান্ত হয়ে আসে। প্রস্তাবিত সেই ব্যক্তি হলেন, প্রয়াত খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহর ভাই ও অপসারিত খলিফা রাশিদ বিল্লাহর চাচা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন মুসতাযহির বিল্লাহ। দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি 'আল-মুকতাফি লি-আমরিল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। পরবর্তী চব্বিশ বছরেরও অধিক সময় তিনি খলিফা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ফলে বাগদাদ-পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসে। খলিফা মুকতাফি লি-আমরিল্লাহ ৫৩০ হিজরি

---

৪৩৮. প্রাগুক্ত, ৯/২৮৮-২৮৯।

৪৩৯. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৯১-২৯২।

সনের জিলহজ মাসে (১১৩৬ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৪৪০]

দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা

এমন উত্তাল ঘটনাবহুল সময়েও ইমাদুদ্দিন জিনকি তার মূল ও প্রধান লক্ষ্য থেকে উদাস থাকেননি। সুলতান মাসউদের বিজয় ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পরও তিনি তাকে হত্যার ষড়যন্ত্রকারী সুলতানের প্রতি প্রতিশোধপ্রবণ হওয়ার সামান্য চিন্তাও করেননি। অথচ ইমাদুদ্দিন জিনকির সেনাশক্তি, জনমনে তার মর্যাদা ও সম্মান সুলতান মাসউদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তিনি কোনো পারিপার্শ্বিক যুদ্ধে জড়িয়ে উম্মাহকে দ্বিধাবিভক্ত করতে চাচ্ছিলেন না। তিনি বরং সব সময় জীবনের সবচেয়ে বড় দুই গুরুদায়িত্বের প্রতি সচেতন থাকতে সচেষ্ট ছিলেন—মুসলমানদের ঐক্য ও ক্রুসেডবিরোধী জিহাদ।

সে মতে ইমাদুদ্দিন জিনকি ৫৩০ হিজরি সনের শেষ ও ৫৩১ হিজরি সনের শুরু ভাগে চারটি মৌলিক বিষয়কে কেন্দ্র করে কাজ করে যান।

১. খলিফা মুকতাফি লি-আমরিল্লাহর সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা। উদ্দেশ্য ছিল আব্বাসি কাঠামোর সঙ্গে কোনো ধরনের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি না হওয়ার নিশ্চয়তা লাভ। যদিও আব্বাসিরা তখন উদ্বেগ জাগানোর মতো কোনো শক্তি ছিল না; কিন্তু ঘটনাপ্রবাহে এটি স্পষ্ট ছিল যে, দুর্বল হলেও মুসলমান জনসাধারণ তখনও খলিফার মত ও সম্মানের প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছিল। তদুপরি নতুন খলিফা একজন সদাচারী, জনপ্রিয় ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।[৪৪১]

২. হুসামুদ্দিন তামারতাশের সহায়তায় জাযিরা অঞ্চলের দিকে জিনকি রাজ্যের বিস্তৃতি। ইমাদুদ্দিন ও তার মিত্র হুসামুদ্দিন মিলে দিয়ারে বকরের উত্তরে অবস্থিত জুর পাহাড় ও সিওয়ান অঞ্চলে সম্মিলিত অভিযান পরিচালনা করেন। এর মধ্য দিয়ে জাযিরা অঞ্চলে জিনকি রাষ্ট্র যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করে এবং ঐক্য পরিকল্পনার বিরোধীরা কার্যত

---

৪৪০. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/ ২৯২-২৯৩ ও ইবনে ওয়াসিল, *মুফাররিজুল কুরূব*, ১/৬৫-৬৬।

৪৪১. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ৪৪৩ ও ইবনে ওয়াসিল, *মুফাররিজুল কুরূব*, ১/৬৭-৭১।

নিষ্ক্রিয় ও শান্ত হয়ে যায়। ফলে জাযিরা অঞ্চলের পরিস্থিতিও অনেকটা স্থিতিশীল হয়ে আসে। ইমাদুদ্দিন জিনকিও নিশ্চিন্তে ক্রুসেডার দমনে মনোযোগী হওয়ার সুযোগ পান।[৪৪২]

৩. হিমস নগরী! দামেশকের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হিমস নগরী। তদ্রূপ ইমাদুদ্দিন জিনকি যদি এন্টিয়ক বা ত্রিপোলি রাজ্যে অভিযান পরিচালনা করতে চান, তখনও তার পৃষ্ঠদেশে দুর্বলতার তিলক-চিহ্ন হয়ে থাকবে হিমস। ইমাদুদ্দিন বারবার অবরোধ-চেষ্টা চালালেও নগরটি জয়ে ব্যর্থ হন। কিন্তু ইমাদুদ্দিন জিনকির অব্যাহত প্রচেষ্টায় হিমসের শাসক কুরাইশ বিন খায়র খানের অন্তর্জগৎ প্রকম্পিত হয়ে পড়ে। তিনি নিরুপায় হয়ে হিমসের নিয়ন্ত্রণ দামেশকের অধিপতি শিহাবুদ্দিন মাহমুদের হাতে সমর্পণ করেন এবং ইমাদুদ্দিন জিনকির কর্তৃত্ব থেকে নগরীটিকে রক্ষা করতে তার সহযোগিতা কামনা করেন। শিহাবুদ্দিন হিমসের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব প্রদান করেন তার সবচেয়ে শক্তিশালী ও কঠোর সেনাপতি মুইনুদ্দিন আনুরকে।[৪৪৩]

৪. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ক্রুসেডারদের দমন। ইমাদুদ্দিন জিনকি ক্রুসেডারদের সুসংগঠিত হওয়ার সামান্য সুযোগও দিতে চাচ্ছিলেন না। তাই তিনি কদিন পরপরই অতর্কিতে তাদের ওপর হামলা চালাতে থাকেন। এমনই এক অভিযানে তিনি লাতাকিয়া অঞ্চলে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে এক তাৎপর্যপূর্ণ বিজয় অর্জন করেন। তিনি লাতাকিয়া অঞ্চলের ক্রুসেড দুর্গগুলো গুঁড়িয়ে দেন, প্রচুর সৈন্যকে হত্যা করেন এবং একবারেই বন্দি করেন সাত হাজারের অধিক ক্রুসেড সেনাকে। মুসলিম বাহিনী অগণিত যুদ্ধলব্ধ সম্পদও লাভ করে। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে প্রাপ্ত ঘোড়া, গাধা, খচ্চর, গরু ও মেষের সংখ্যাই ছিল এক লক্ষের অধিক! আর ঐতিহাসিক ইবনুল আছিরের ভাষ্যমতে পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকার ও আসবাবপত্রের পরিমাণ ছিল গণনাতীত!

---

৪৪২. ইমাদুদ্দিন খলিল, *ইমাদুদ্দিন জিনকি*, পৃষ্ঠা : ১১৯।

৪৪৩. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৯৮।

> এই মহান বিজয় বাস্তবার্থেই মুসলমানদের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনে। এটি ছিল ৫৩০ হিজরি সনের শাবান মাসের ঘটনা।[৪৪৪]

ইমাদুদ্দিন জিনকি এই চারটি কেন্দ্রে সম্মিলিতভাবে তার কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখলেও নিজের পৃষ্ঠদেশের নিরাপত্তার বিষয়ে সচেতন ছিলেন। সুলতান মাসউদ আবারও যেন কোনো ধরনের প্রতারণা করতে না পারেন, এজন্য তিনি ইরবিল ও বাগদাদের মধ্যবর্তী দাকুকা নগরীকে তার রাজ্যভুক্ত করে নেন। দাকুকার অবস্থান ছিল মসুলের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। এখন থেকে দাকুকা নগরী তার ও সুলতান মাসউদের শাসিত অঞ্চলের মধ্যে প্রতিবন্ধকরূপে বিবেচিত হবে। সুলতান মাসউদ যদি মসুলে কোনো ধরনের অভিযান চালাতে চান, দাকুকা থেকে ইমাদুদ্দিন তা জেনে ফেলবেন এবং আকস্মিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন না। ৫৩১ হিজরি সনের শুরুতে তিনি নগরীটির ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।[৪৪৫]

জেগে উঠেছে মুজাহিদদের আত্মমর্যাদাবোধ।

এরপর আল্লাহ তাআলা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এক মাধ্যমে ইমাদুদ্দিন জিনকির সামনে ক্রুসেডারদের শক্তিকে আরও দুর্বল করার ব্যবস্থা করে দেন। বাযওয়াশ নামক দামেশকের জনৈক সেনাপতি এ সময় ইমাদুদ্দিন জিনকির মতো ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে তৎপর হয়ে ওঠেন। অথচ ইতিপূর্বে আমরা দামেশককে প্রয়োজনে ক্রুসেডারদের সঙ্গে সহযোগিতা বিনিময় করতেও দ্বিধা করতে দেখিনি। নিকট ভবিষ্যতেও আমরা এর আরেকটি দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করব। ব্যতিক্রমী এই ঘটনার বিবরণ হলো, এই সেনাপতি তার বাহিনীর একটি অংশ নিয়ে ত্রিপোলি অভিমুখে অগ্রসর হন। এ অঞ্চল ও দিয়ারে বকর অঞ্চলের বেশ কিছু তুর্কমেন সৈন্যও তাকে সহায়তা করে। তারা দ্রুতবেগে ত্রিপোলি রাজ্যে হামলা চালায়। মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলায় ত্রিপোলির শাসক পন্স বেরিয়ে এলে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। পন্সের পিতামহ ৪র্থ রেমন্ডের প্রতিষ্ঠিত সেন্ট গিল্‌স দুর্গের নিকটে সংঘটিত এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। যুদ্ধে ত্রিপোলির শাসক পন্স নিহত হন; বন্দি হয়

---

[৪৪৪]. প্রাগুক্ত, ৯/২৯১।

[৪৪৫]. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩০০।

প্রচুর ক্রুসেড সেনা। পাশাপাশি প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়।[৪৪৬] ৫৩১ হিজরি সনের রজব মাসে (১১৩৭ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে) এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

মহান বীর ইমাদুদ্দিন জিনকি উম্মাহর হৃদয়ে সুপ্ত জিহাদি চেতনাকে এমনভাবে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, কখনোই জিহাদে অভ্যস্ত নয় এমন এক বাহিনী জিহাদের জন্য বেরিয়ে এসেছে এবং বিরাট সফলতা এনে দিয়েছে। তারা শুধু ত্রিপোলির ক্রুসেডশক্তির সমূহ ক্ষতিসাধনই করেনি, কার্যত ক্রুসেড শিবিরের দম্ভই চূর্ণ করে দিয়েছে।

পন্সের মৃত্যুর পর ত্রিপোলি রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন তার পুত্র ২য় রেমন্ড (Raymond II)। কঠিন সামরিক ও রাজনৈতিক সংকটের মাঝে শুরু হয় তার শাসনামল।

হিলাল-ছালিব সংঘাতের ইতিহাসে এ যুদ্ধটি এক বিস্ময়কর যুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। কারণ, তৎকালীন দামেশক-প্রশাসন ও দামেশকের সেনাপতিগণ ক্রুসেডারদের অত্যন্ত নিকটভাজন ছিল। এমনকি তারা ইমাদুদ্দিন জিনকির বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরোধের লক্ষ্যে পরস্পর পত্রবিনিময় করত। এতে অনুমিত হয় যে, ত্রিপোলির এ যুদ্ধ ছিল দামেশক বাহিনীর একটি অংশের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা, যাতে স্বেচ্ছায় যোগ দিয়ে শক্তি জুগিয়েছিল প্রচুর সংখ্যক তুর্কমেন সৈন্য। তাদের হাত ধরেই এরূপ মহান বিজয় ও প্রভাবক ফলাফল অর্জিত হয়েছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এরপরও দামেশক-ক্রুসেডার মিত্রতায় তেমন একটা ফাটল ধরেনি! আর তাই এ সম্ভাবনাই দৃঢ়তা লাভ করে যে, ত্রিপোলি অভিযানে অংশগ্রহণকারী দামেশক বাহিনী মোটেও তৎকালীন দামেশক প্রশাসনের প্রতিনিধিত্ব করেনি।

বারিনের যুদ্ধ

বিষয়টি আরও নিশ্চিত হয় পরবর্তী মাসের অর্থাৎ ৫৩১ হিজরি সনের শাবান মাসের একটি ঘটনায়। এ সময় ইমাদুদ্দিন জিনকি হিমস নগরী অবরোধ করেন। দামেশক অধিপতি শিহাবুদ্দিন কর্তৃক নিযুক্ত হিমসের

---

৪৪৬. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৯৮ ও Guillaume de Tyr., pp. 640.

প্রশাসক মুইনুদ্দিন আনুর শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুললেও একসময় অনুভব করেন, তার প্রতিরোধশক্তি ভেঙে পড়তে যাচ্ছে। তখন তিনি দ্রুত ক্রুসেডার নেতাদের কাছে সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। স্বয়ং বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজা ফাঙ্কের নেতৃত্বে ক্রুসেডারদের একটি বাহিনী হিমস রক্ষায় ছুটে আসে। এমনকি বাহিনীটিতে ত্রিপোলির নতুন শাসক ২য় রেমন্ডও ছিলেন, যার পিতা পন্স কদিন আগেই দামেশকের বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছেন।[৪৪৭] হিমস, দামেশক ও ক্রুসেডারদের সম্মিলিত শক্তি কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তুললে ইমাদুদ্দিন জিনকি হিমসের অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হন। কিন্তু এ ঘটনার মাধ্যমে তার সামনে; বরং সকল মুসলমানের সামনে মুইনুদ্দিন আনুর ও শিহাবুদ্দিনের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়ে যায়। তাদের এ অবস্থান অতি নিকৃষ্ট হলেও এর দ্বারা অন্তরালের পাতা উন্মোচিত হয়ে যায় এবং তাদের দুষ্ট মনোবৃত্তি প্রকাশ পেয়ে যায়। যে মুসলিম নেতাকে জবরদখলকারী জালিমরা সহযোগিতা করে, সে যে একজন দালাল নেতা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার কাজে-কর্মে ও চিন্তায়-দায়িত্বে ন্যূনতম নিষ্ঠা নেই। তার প্রতিটি কর্মতৎপরতা কেবল নিজের স্বার্থে। উম্মাহর সর্বময় বিজয়ের আশা অন্তত তার কাছ থেকে করা যায় না।

ইমাদুদ্দিন জিনকি যদিও হিমসের পতন ঘটাতে ব্যর্থ হন; কিন্তু ক্রুসেডাররা শামের এত ভেতরে চলে আসায় তিনি এবার তাদের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধের সুযোগ পেয়ে যান। এ বিষয়টিও তার বিবেচনায় ছিল যে, তুলনামূলক নিকটবর্তী ক্রুসেড রাজ্য ত্রিপোলি এই কিছুদিন আগেই কঠিন পরাজয়-গ্লানির শিকার হয়েছে এবং তাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ শাসক পন্সের মৃত্যু হয়েছে। আরেক ক্রুসেডার নেতা ফাঙ্কও অনেক দূর থেকে এসেছেন; দুর্যোগে পড়লে সহসা নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ তার জন্য কঠিনই বটে। আর তাই ইমাদুদ্দিন জিনকি কৌশলে ক্রুসেডারদের হিমসের নগরপ্রাচীর থেকে দূরে টেনে এনে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। পাশাপাশি তিনি ক্রুসেডারদের ওপর এমন চাপ সৃষ্টি করার মনস্থ করেন, যাতে তারা যুদ্ধ না করে রাজ্যে ফিরে যাওয়ার চিন্তা করার পরিবর্তে যুদ্ধের পথই বেছে নেয়।

---

৪৪৭. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৬১।

তিনি কী পরিকল্পনা করেন?

ইমাদুদ্দিন জিনকি ক্রুসেডারদের অতি গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক এক স্থাপনায় হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নেন, যাতে ক্রুসেডাররা তা রক্ষায় বাধ্য হয়ে এগিয়ে আসে এবং তার সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ইমাদুদ্দিন জিনকির নির্বাচিত সে স্থাপনাটি ছিল নাসিরিয়া পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত প্রকাণ্ড বারিন দুর্গ। দুর্গটি বাকিয়া (Peki'in) অঞ্চলগামী পথের নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত।[৪৪৮]

বারিন দুর্গের অত্যধিক সামরিক গুরুত্বের আরেকটি কারণ হলো, দুর্গটির নিয়ন্ত্রণ হাতে থাকলে ওরোন্টেস নদীর অববাহিকার ওপর পূর্ণ নজর রাখা যেত। আর তাই মুসলমানরা যদি দুর্গটি জয় করতে পারে, তাহলে তারা উত্তরের এন্টিয়ক এবং দক্ষিণের ত্রিপোলি ও বাইতুল মুকাদ্দাসের মধ্যকার যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারবে। তা ছাড়া দুর্গটি থেকে হিমস ও হামা নগরীর ওপরও সরাসরি নজরদারি করা সম্ভব ছিল।

ইমাদুদ্দিন জিনকির পরিকল্পনামতোই ঘটনাপ্রবাহ এগিয়ে যেতে থাকে। ক্রুসেডার বাহিনী অতি গুরুত্বপূর্ণ বারিন দুর্গের প্রতিরক্ষায় এগিয়ে আসে। দুর্গটি তখন ক্রুসেডারদের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং সেখানেও প্রচুর সংখ্যক ক্রুসেডার সৈন্য অবস্থান করছিল।

বারিন দুর্গের পার্শ্ববর্তী বিস্তৃত ময়দানে ৫৩১ হিজরি সনের শাওয়াল মাসে (১১৩৭ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে) সংঘটিত হয় এক ঐতিহাসিক যুদ্ধ।

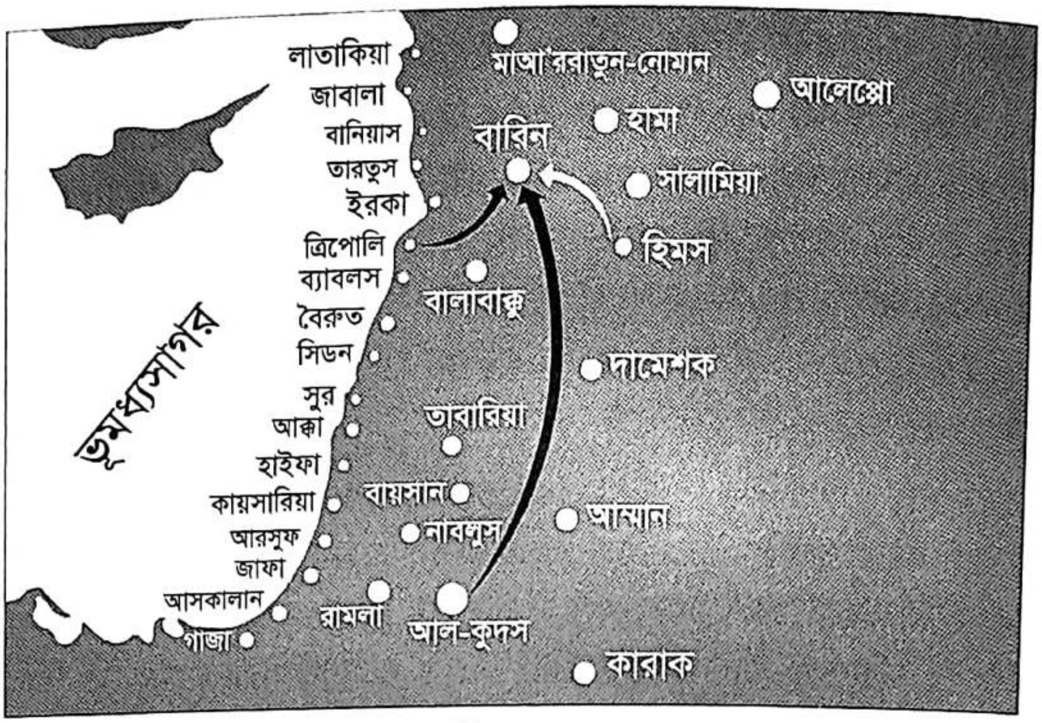
এ যুদ্ধের নাম বারিনের যুদ্ধ (Battle of Ba'rin)।
বারিনের যুদ্ধে তৎকালীন ক্রুসেড শিবিরের গুরুত্বপূর্ণ দুই নেতা বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজা ফাল্ক ও ত্রিপোলির শাসক ২য় রেমন্ড অংশগ্রহণ করেন।

তুমুল যুদ্ধ হয় দু-পক্ষের মধ্যে। ময়দানজুড়ে বিক্ষিপ্ত পড়ে থাকে অসংখ্য লাশ। উভয় পক্ষের সৈন্যদের অস্থির বিচরণ আর অশ্বের ছোটাছুটিতে ধুলো-মেঘে ঢাকা পড়ে সবকিছু। তবে অল্পক্ষণ পরেই মেঘ কেটে উদ্ভাসিত হয় চূড়ান্ত ফলাফল!

মুসলমানদের পদচুম্বন করে এক আলোকিত বিজয়-গৌরব!

---

৪৪৮. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ২৫৮-২৫৯।



মানচিত্র নং-২৮

বারিনের যুদ্ধ

ক্রুসেডার বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য নিহত হয়, জীবিত ও আহতদের সিংহভাগ হয় বন্দি। বন্দিদের মাঝে ত্রিপোলির নতুন শাসক ২য় রেমন্ডও ছিলেন। রাজা ফাল্ক অবশ্য কিছু সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে পার্শ্ববর্তী বারিন দুর্গে আশ্রয় নিতে সক্ষম হন।[৪৪৯] তিনি এন্টিয়কের শাসক রেমন্ড অফ পয়টিয়ার্স ও এডেসার শাসক ২য় জোসেলিনের কাছে ত্বরিত সাহায্যবার্তা প্রেরণ করেন এবং তাদের দুজনকে দ্রুত নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে সুরক্ষিত বারিন দুর্গে অবরুদ্ধ ক্রুসেডারদের রক্ষায় চলে আসতে বলেন।[৪৫০]

ইমাদুদ্দিন জিনকিও যুদ্ধের পর বিলম্ব না করে দুর্গ ঘিরে শক্ত অবরোধ আরোপ করেন এবং দুর্গে প্রবেশের সকল পথের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে সব ধরনের সাহায্যের পথ রুদ্ধ করে দেন। ফলে রাজা ফাল্ক বহির্বিশ্ব থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। দুর্গের বাইরে কী ঘটছে, তা জানার কোনো উপায় এখন তার নেই।[৪৫১]

---

৪৪৯. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৯৮।

৪৫০. Guillaume de Tyr., pp. 644-645.

৪৫১. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৯৯।

মুসলিম বাহিনী দিনরাত একটানা প্রকাণ্ড দুর্গটির প্রাচীর লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ অব্যাহত রাখে। সুস্পষ্টই অনুমিত হচ্ছিল, দুর্গটির পতন নিয়ে কোনো সংশয় নেই, সংশয় কেবল তার সময়কাল নিয়ে। ওদিকে অবরুদ্ধ ক্রুসেডারদেরও বড় ধরনের সামরিক সহায়তা আসার পূর্বে যুদ্ধের লক্ষ্যে বের হওয়ার ন্যূনতম ইচ্ছা ছিল না।

বাইজান্টাইন সহায়ক বাহিনী

ইমাদুদ্দিন জিনকি বিশালকায় দুর্গটি অবরোধ করে রাখেন। এরই মধ্যে সংবাদ আসে এডেসা ও এন্টিয়কের বাহিনী বারিন দুর্গ অভিমুখে এগিয়ে আসছে। বরং হঠাৎ করেই এ অঞ্চলে বাইজান্টাইন বাহিনীর আবির্ভাবের সংবাদও প্রকাশ পায়। ক্রুসেড যুদ্ধ ইতিহাসে এই প্রথম পূর্ণ শক্তির বাইজান্টাইন বাহিনী এ অঞ্চলে পা রাখতে যাচ্ছে!

পরিস্থিতি আসলেই জটিল দিকে মোড় নিচ্ছিল। কারণ, বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সুবিশাল বাহিনী যদি এডেসা ও এন্টিয়কের ক্রুসেডারদের সঙ্গে মিলিত হয়, তাহলে ইমাদুদ্দিন জিনকি উল্টো অবরুদ্ধ হয়ে পড়বেন। সামনে দুর্গের ভেতরে আছে ক্রুসেডার বাহিনী আর পেছনে বাইজান্টাইন-ক্রুসেডার সম্মিলিত বাহিনী! এতে হয়তো আগের বিজয়ের অর্জন এক ধাক্কায় ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন হলো—হঠাৎ করে কেন বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য এ অঞ্চলে হস্তক্ষেপ করতে উদ্যোগী হলো?

এর মূল কারণ ছিল দুটি।

১. রাজা ফাল্ক অ্যাঞ্জো বারিন দুর্গে অবরুদ্ধ হওয়ার পরই এডেসা ও এন্টিয়কের পাদরি ও সন্ন্যাসীদের একটি প্রতিনিধিদল বাইজান্টাইন রাজপ্রাসাদে পৌঁছে বাইজান্টাইন সম্রাটকে বারিন দুর্গে অবরুদ্ধ ক্রুসেডারদের উদ্ধারে হস্তক্ষেপ করার আবেদন জানায়। তারা সম্রাটকে সতর্ক করে বলে যে, রাজা ফাল্ক নিহত হলে মুসলমানদের জন্য বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারের পথ সুগম হয়ে যাবে।[৪৫২]

৪৫২. আবুল হাসান ইয্যুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৯৯ ও ইবনে ওয়াসিল, *মুফাররিজুল কুরূব*, ১/৩৭।

২. এডেসার পদচ্যুত শাসক এলিসের কন্যা কন্সটেন্সকে রেমন্ড অফ পয়টিয়ার্স বিয়ে করায় বাইজান্টাইন সম্রাট প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ ছিলেন। কারণ, এর পূর্বেই তার পুত্রের কাছে কন্সটেন্সকে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। সম্রাট-পুত্রের জন্য প্রস্তাব পাঠানোর পর অন্য ছেলের কাছে কন্সটেন্সকে বিয়ে দেওয়াকে সম্রাট মহা অপমান বিবেচনা করেছিলেন। অধিকন্তু এর ফলে এন্টিয়ক রাজ্যকে সরাসরি বাইজান্টাইন কর্তৃত্বে নিয়ে আসার সুবর্ণ সুযোগও হাতছাড়া হয়েছিল।[৪৫৩]

এভাবে হঠাৎ করেই প্রেক্ষাপট বদলে যায় এবং ইমাদুদ্দিন জিনকি ও মুসলমানদের জন্য চূড়ান্ত ভীতিকর পরিস্থিতির অবতারণা হয়।

এখন কী করবেন আমাদের মহান বীর ইমাদুদ্দিন জিনকি?!

তিনি বহির্বিশ্বের সঙ্গে রাজা ফাল্কের বিচ্ছিন্নতার সুযোগ কাজে লাগান এবং দুর্গ লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ আরও জোরদার করেন। ইমাদুদ্দিন জিনকি আশা করছিলেন, রাজা ফাল্ক অ্যাঞ্জো এতে ভীত হয়ে যেকোনো শর্তে দুর্গ সমর্পণে সম্মত হবেন। তখন যৌথ খ্রিষ্টান বাহিনী পৌঁছার আগেই বারিন দুর্গ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ইমাদুদ্দিন জিনকি যেমন আশা করেছিলেন, তেমনই ঘটে। রাজা ফাল্ক দুর্গের অবরোধ তুলে নিতে সমঝোতা আলোচনার প্রস্তাব পাঠান।[৪৫৪]

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন!

এ ঘটনা কোনো বিরল বা আকস্মিক বিষয় ছিল না। যারা আল্লাহর দ্বীনের সহযোগিতা করে, আল্লাহ সর্বদা তাদের সহযোগী হন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের প্রতিরক্ষা করেন। জেনে রেখো, আল্লাহ কোনো বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না। [সুরা হজ্জ: ৩৮]

---

৪৫৩. Stevenson: op.cit., p.138.

৪৫৪. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৬২।

ইমাদুদ্দিন জিনকি রাজা ফাল্কের সমঝোতা প্রস্তাবে দ্রুত সম্মতি প্রকাশ করেন। পুরো প্রক্রিয়া যেন নিজের চাহিদামতো সম্পন্ন করা যায়, এ উদ্দেশ্যে তিনি এই পুরোটা সময় ফাল্কের কাছে যেন বাইরের কোনো সংবাদ পৌঁছতে না পারে, তার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। দ্রুত উভয় পক্ষ সমঝোতায় পৌঁছায়। দু-পক্ষের সম্মতিতে সিদ্ধান্ত হয়, ক্রুসেডাররা নিরাপদে দুর্গ থেকে বের হয়ে চলে যাবে এবং ২য় রেমন্ডকে মুক্তি দেওয়া হবে; বিনিময়ে বারিন দুর্গ মুসলমানদের অধিকারে চলে আসবে আর রাজা ফাল্ক মুক্তিপণ হিসেবে পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করবেন।

অবিলম্বে চুক্তি বাস্তবায়িত হয়। মুসলমানরা দুর্গটির নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে। রাজা ফাল্ক, ২য় রেমন্ড ও দুর্গে অবস্থানরত ক্রুসেড সেনাদের নিরাপদে প্রস্থানের সুযোগ দেওয়া হয়। অবশ্য মুসলমানদের হাতে আগে থেকেই বন্দি ক্রুসেড সেনারা মুসলমানদের হেফাজতেই থাকে।

ইমাদুদ্দিন জিনকির পরিকল্পনা পুরোপুরি সফল হয়। ওদিকে রাজা ফাল্ক বাইরে এসে খ্রিষ্টান বাহিনীর সমবেত হওয়ার সংবাদ জানতে পেরে অনুতাপে দগ্ধ হতে থাকেন। কিন্তু তখন তার সামনে ভুল শোধরানোর কোনো পথ খোলা ছিল না।[৪৫৫]

এক বিরল ঐতিহাসিক ভূমিকা।

আগত বাইজান্টাইন-ক্রুসেডার সম্মিলিত বাহিনীর পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে এখানে আমরা আরেকটি বিষয়ের অবতারণা করতে চাই। আর তা হলো বারিন দুর্গ ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চল পুনরুদ্ধার করার পর মুসলমানদের সঙ্গে ইমাদুদ্দিন জিনকির কৃত আচরণ। এ সময় এ অঞ্চলের ভূমির পুরোনো মুসলিম মালিকগণ ইমাদুদ্দিন জিনকির কাছে উপস্থিত হয়ে তাদের ভূ-মালিকানা ফেরত লাভের দাবি জানায়। আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি, যাদের কাছেই জমির মালিকানা প্রমাণের উপযুক্ত কাগজপত্র ছিল, তিনি তাদের সকলকে ভূ-মালিকানা বুঝিয়ে দেন। অথচ এটি ছিল ইমাদুদ্দিন জিনকির অনুসৃত হানাফি মাজহাবের সিদ্ধান্তের বিপরীত। তিনি মনে করতেন, এমনটি না করা হলে এসব ভূমির মালিক বিনা অপরাধে তাদের প্রাপ্য অধিকার

---

৪৫৫. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৯৯ ও Guillaume de Tyr.,pp. 650-651.

থেকে বঞ্চিত হবে। কিন্তু এরপরও একটি সমস্যা রয়ে যায়। কিছু লোক এমন থেকে যায়, যারা ভূ-মালিকানা দাবি করছে; কিন্তু দুঃখজনকভাবে ক্রুসেডারদের আগ্রাসনের সময় ত্রস্তপদে পালাতে গিয়ে তাদের কাগজপত্র হারিয়ে গেছে। নিজেদের প্রাপ্য অধিকার লাভের জন্য তারা কী করবে বুঝতে পারছিল না। এদিকে ইমাদুদ্দিন জিনকিও দলিল ছাড়া কাউকে কোনো জমি বুঝিয়ে দিতে পারছিলেন না। কারণ, হয়তো দেখা যাবে, তার দাবি ভুল ছিল; জমির প্রকৃত মালিক পরে এসে নিজের অধিকার দাবি করবে। আরও বড় সমস্যা, এ অঞ্চল প্রায় চল্লিশ বছর ধরে ক্রুসেডারদের দখলে ছিল; সহসা দলিল-প্রমাণ খুঁজে বের করাও ছিল কার্যত অসম্ভব!

ইমাদুদ্দিন জিনকি যদিও তখন নানাবিধ গুরুদায়িত্ব মাথায় নিয়ে হাজারো চিন্তায় ব্যস্ত; কিন্তু জনসাধারণের দুশ্চিন্তা দেখে তিনি ব্যথিত হন এবং সমাধান চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে পড়েন। এরপর হঠাৎ করেই তিনি এর সমাধান খুঁজে পান। তিনি ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে ওঠেন, 'আলেপ্পোর ভূমি রেজিস্টার নিয়ে আসা হোক। যাদের নামে ভূমিকর আদায়ের প্রমাণ পাওয়া যাবে, তাদেরকেই জমি হস্তান্তর করা হবে।'[৪৫৬]

পূর্বে এ অঞ্চলটি আলেপ্পো রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর তাই ইমাদুদ্দিন জিনকি এ অঞ্চলের পুরোনো ভূমিকর আদায়ের নথিপত্র তলব করেন। যদি এসব জমির মালিকেরা আলেপ্পোর প্রশাসনকে ঠিকমতো ভূমিকর আদায় করে থাকে, তাহলে অবশ্যই তা নথিপত্রে লিপিবদ্ধ থাকবে। সুতরাং নির্দিষ্ট কোনো ভূমির বিষয়ে কারও নাম লিপিবদ্ধ থাকা মানে নিশ্চিত সে-ই উক্ত জমির মালিক!

ইমাদুদ্দিন জিনকির পরিকল্পনা সফল হয়; সকলে সুষ্ঠুভাবে নিজ নিজ জমি ফিরে পায়। ঐতিহাসিক ইবনুল আছির ইমাদুদ্দিন জিনকির এই চিন্তা ও কর্মের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, 'এটি ছিল সদাচরণ ও ন্যায়পরায়ণতার এক সমুন্নত দৃষ্টান্ত।'[৪৫৭]

বাস্তবেই এটি অতি মহৎ ও মহান এক আচরণ। শাসক নিজে প্রতিটি হক হকদারকে পৌঁছিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। এতে যদিও তার প্রচুর সময় ব্যয় হয়েছে, চেষ্টা-পরিশ্রম করতে হয়েছে, এমনকি এতে রাজ্যের

---

৪৫৬. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/২৯৯।

৪৫৭. প্রাগুক্ত, ৯/২৯৯।

স্বার্থহানিও হয়েছে, তথাপি তিনি কোনো কিছুর পরোয়া করেননি। মালিক অজ্ঞাত থাকলে তো এসব জমি রাষ্ট্রীয় সম্পদে পরিণত হতো। এটিও অভিনব যে, বাইজান্টাইন ও ক্রুসেডার বাহিনী দরজায় কড়া নাড়ছে জেনেও ইমাদুদ্দিন জিনকি নিজে এই সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কারণ, তিনি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখতেন, তিনি যে ন্যায় বাস্তবায়নের চেষ্টা করছেন, এর বিনিময়ে আল্লাহ তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। আল্লাহ তাআলা এই মহান শাসককে আপন বিস্তৃত রহমতে আচ্ছাদিত করুন।

ক্রুসেডার-বাইজান্টাইন সন্ধিচুক্তি

ইতিহাসের ধারাবর্ণনায় ফিরে আসি।

বাইজান্টাইন বাহিনীর মূল লক্ষ্য ছিল নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করা। রাজা ফাল্ককে উদ্ধার করা বা তার রাজ্যের ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়ার চিন্তা তাদের পরিকল্পনায় বিলকুল ছিল না। অতীত আলোচনায় আমরা দেখেছি, ক্রুসেড যুদ্ধের প্রথম দিন থেকেই বাইজান্টাইন ও ক্রুসেডারদের মধ্যে স্বার্থের বিরোধ লেগে আছে।[৪৫৮] আর তাই সম্রাট ২য় জন কমনিনোসের প্রথম দৃষ্টি ছিল এন্টিয়ক ও তার আশপাশের প্রাচীন বাইজান্টাইন ভূমিগুলোর প্রতি। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো কিলিকিয়া অঞ্চল; বিশেষ করে সুপ্রাচীন তারসুস, আদানা ও মপসুয়েসটিয়া নগরী। অঞ্চলটি এ সময় আর্মেনীয় নেতা লিওনের শাসনাধীন ছিল।

আর তাই মুসলমানদের হাত থেকে বারিন দুর্গ উদ্ধারের জন্য এ অঞ্চলে দ্রুত আগমনের কোনো ইচ্ছাই বাইজান্টাইন সম্রাটের ছিল না। তিনি তার বিশাল বাহিনী নিয়ে প্রথমে কিলিকিয়া অঞ্চল অভিমুখে অগ্রসর হন। আর্মেনীয়রা এত বিশাল বাইজান্টাইন বাহিনী দেখে ভড়কে যায়। বিগত কয়েক দশকেও এ অঞ্চলে বাইজান্টাইনরা এরূপ বিশাল সৈন্যসমাবেশ ঘটায়নি। মূলত এন্টিয়ক প্রশাসনের দীর্ঘ দিনের অস্থিরতা এবং ইমাদুদ্দিন জিনকির ধারাবাহিক আক্রমণের ফলে ক্রুসেড শিবিরের বিপর্যস্ত অবস্থা অনুধাবন করেই বাইজান্টাইন সম্রাট এরূপ দুঃসাহস দেখাতে প্ররোচিত হন। তিনি অনুভব করেন, এমন সহজ সুযোগ বারবার আসবে না।

---

৪৫৮. মুহাম্মাদ সুহাইল তাকূশ, *তারীখুয-যিনকিয়্যীন ফিল-মাওসিলি ওয়া বিলাদিশ-শাম*, পৃষ্ঠা : ১৩৮-১৩৯ ও সাইদ আশুর, *আল-হারাকাতুস সালীবিয়্যা*, ১/৪৫৯।

বাইজান্টাইন সম্রাট ২য় জন কমনিনোস অনায়াসে কিলিকিয়ার বেশ কিছু নগরী দখল করে নেন। অবশ্য আর্মেনীয় শাসক লিওন পালিয়ে তোরোস পর্বতমালায় আশ্রয় নেওয়ায় বাইজান্টাইন বাহিনীকে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীনও হতে হয়নি। প্রাথমিক সফলতায় উদ্যমী হয়ে সম্রাট ২য় জন কমনিনোস এরপর সরাসরি এন্টিয়ক অভিমুখে অগ্রসর হন এবং নগরীটির চারপাশে কঠিন অবরোধ আরোপ করেন। এন্টিয়কের নতুন শাসক রেমন্ড অফ পয়টিয়ার্স এতে প্রচণ্ড ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন।

রেমন্ড অফ পয়টিয়ার্স চিন্তা করে দেখেন, ইমাদুদ্দিন জিনকির উপর্যুপরি আঘাতে এ অঞ্চলের ক্রুসেড শিবির বর্তমানে একেবারে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। বড় দুই নেতা রাজা ফাল্ক ও ২য় রেমন্ড নিজেদের ঘর সামলাতে ব্যস্ত; আরেক নেতা ২য় জোসেলিন আলেপ্পোর প্রশাসক সিওয়ারের উপর্যুপরি আঘাতে পর্যুদস্ত। আর তাই তার সামনে এখন মাত্র দুটি পথ খোলা আছে—হয় বাইজান্টাইন বাহিনীর সামরিক প্রতিরোধ করা কিংবা সম্রাটের সঙ্গে সমঝোতা করে যৎসামান্য যা মেলে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা।

কিন্তু রেমন্ড স্পষ্টতই অনুভব করেন, বাইজান্টাইন বাহিনীর তুলনায় তার সমরশক্তি একদমই দুর্বল। তিনি যদি সামরিক পন্থায় প্রতিরোধের চেষ্টা চালান আর এরপর নগরীটির পতন ঘটে, তাহলে সবকিছুই হারাতে হবে। এমনকি প্রতিরোধ লড়াইয়ে নিজের অতি সাধের প্রাণটুকুও হারাতে হতে পারে! আর তাই তিনি প্রতিরোধের চিন্তা বাদ দিয়ে সমঝোতা আলোচনার সিদ্ধান্ত নেন।(৪৫৯)

দীর্ঘ আলোচনার পর দু-পক্ষ সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাসহ একটি সমঝোতা চুক্তিতে উপনীত হয়। চুক্তিটি বাস্তবায়িত হলে মুসলমানদের জন্য ভয়াবহ পরিণতি টেনে আনতে পারে। চুক্তির ধারাগুলো ছিল—

১. এন্টিয়ক রাজ্যের অধিকার বাইজান্টাইন সম্রাটকে অর্পণ করা হবে।

২. ইমাদুদ্দিন জিনকির বিরুদ্ধে ক্রুসেডার ও বাইজান্টাইন বাহিনী জোটবদ্ধ হয়ে লড়াই করবে।

৩. রেমন্ড অফ পয়টিয়ার্সের জন্য বিকল্প নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হবে। রাজ্যটির অবস্থান হবে এন্টিয়কের উত্তরে, যার মূল ঘাঁটি হবে

---

৪৫৯. উইলিয়াম সুরি, *তারিখুল হুরুবিস সালিবিয়্যাহ*, ২/৬৯৭-৬৯৯।

আলেপ্পো নগরী। বর্তমানে ইমাদুদ্দিন জিনকির নিয়ন্ত্রণে থাকা হামা নগরীসহ এ অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু নগরী রাজ্যটিতে যুক্ত হবে। এ ছাড়াও বনু মুনকিযের কাছ থেকে শাইজার নগরী এবং দামেশকের কাছ থেকে হিমস নগরী কেড়ে নিয়ে রাজ্যটিতে যুক্ত করা হবে। হিমস হবে পরিকল্পিত রাজ্যটির দক্ষিণ সীমা।

৪. আগামী বছরের (১১৩৮ খ্রিষ্টাব্দের) গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত সাময়িক সময়ের জন্য রেমন্ড অফ পয়টিয়ার্সই এন্টিয়কের শাসনদায়িত্ব পালন করবেন। আগামী গ্রীষ্মে দু-পক্ষ পারস্পরিক সামরিক সহযোগিতা বিনিময়ের মাধ্যমে চুক্তির বাস্তবায়ন শুরু করবে। অবশ্য পরাধীনতার নিদর্শনস্বরূপ এখন থেকেই এন্টিয়ক নগরপ্রাচীরের শীর্ষদেশে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পতাকা ওড়ানো হবে।

এই ছিল দু-পক্ষের সম্মতিতে স্বাক্ষরিত উদ্বেগজনক চুক্তিটির ধারাসমূহ। চুক্তি সম্পাদনের পাশাপাশি তারা এ বিষয়ে এ অঞ্চলের প্রধান ক্রুসেডার নেতা রাজা ফাল্ক অ্যাঞ্জোর সম্মতিও গ্রহণ করে নেয়।[৪৬০]

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা গেলে সার্বিকভাবে এ চুক্তি উভয় পক্ষের জন্যই লাভজনক। এর মাধ্যমে বাইজান্টাইন সম্রাট শুধু বাইজান্টাইন নাগরিকদের স্বপ্নের নগরী এন্টিয়কের কর্তৃত্বই ফিরে পাবেন না, আঘাত হানতে পারবেন ইসলামি শক্তির একেবারে ভিত্তিমূলে। শুধু তা-ই নয়; পরিকল্পিত নতুন রাজ্যটি এন্টিয়ক ও মুসলমানদের মাঝে প্রাচীরের কাজ করবে। ফলে ক্রুসেডাররাই স্বয়ংক্রিয়ভাবে এন্টিয়ক রাজ্যের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করবে।

রেমন্ড অফ পয়টিয়ার্সের দিক থেকে বিবেচনা করলে বলতে হয়, তার মূল লক্ষ্য ছিল যেকোনো মূল্যে একটি রাজ্যের শাসক হওয়া। তিনি এন্টিয়ক রাজ্য প্রতিষ্ঠায় কোনো ভূমিকা রাখেননি; বরং মাত্র বছরদুয়েক পূর্বে বলতে গেলে ইউরোপ থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন! তা ছাড়া বাইজান্টাইন সম্রাট তাকে বিকল্প যে রাজ্যের শাসনভার প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছেন, তা এন্টিয়কের চেয়ে শ্রেয়তর। আলেপ্পো, হিমস, শাইজার ও হামার মতো নগরী যে রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে, তা নিশ্চিত করেই একটি বৃহৎ ও শক্তিশালী রাজ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

---

৪৬০. Grousset: op.cit.,II, p.97.

আর তাই উভয় পক্ষই সন্তুষ্টচিত্তে চুক্তিতে সম্মত হয়। রাজা ফাল্ক এতে সম্মতি প্রদান করেন। তবে নিঃসন্দেহে এ চুক্তি ও সিদ্ধান্ত ছিল ক্রুসেড রাজ্যটির মূল প্রতিষ্ঠাতা নরম্যানদের প্রত্যাশা-বিরোধী। এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, চুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রেমন্ড অফ পয়টিয়ার্স বা রাজা ফাল্ক ছিলেন ফরাসি, আর এন্টিয়কের প্রতিষ্ঠাতা নরম্যানরা ছিল ইতালিয়ান।

বাইজান্টাইন সম্রাট ২য় জন কমনিনোস ইমাদুদ্দিন জিনকিকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করেন। সম্রাট তার কাছে একটি বার্তা প্রেরণ করে এন্টিয়কের আশেপাশের অঞ্চলে প্রবেশের কৈফিয়ত প্রদান করেন। বার্তায় তিনি বলেন, আমি এখানে মুসলমানদের সঙ্গে লড়তে আসিনি; বরং আর্মেনীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছি।[৪৬১] কিন্তু ইমাদুদ্দিন তার জবাবদিহিতায় প্রতারিত না হয়ে চিন্তা করেন, জিনকি রাজ্যের মর্যাদার দাবি হলো এমন অনৈতিক হস্তক্ষেপের উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন। ভেবে-চিন্তে তিনি ইসলামি ভূখণ্ডের সীমানা অবমাননার উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া হিসেবে সামরিক পদক্ষেপকেই খুঁজে পান। তিনি বাইজান্টাইন বাহিনীর ওপর আক্রমণ করতে আলেপ্পোর আমির সিওয়ারের নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। সিওয়ারের নেতৃত্বাধীন বাহিনীটি বিপুল সংখ্যক বাইজান্টাইন সৈন্য হত্যা করে, বন্দিও করে অনেককে। অথচ সিওয়ারের বাহিনীটি বাইজান্টাইন বাহিনীর তুলনায় জনবলে অনেক ছোট ছিল। সরাসরি এমন লাঞ্ছনাকর পরাজয় বরণের পরও বাইজান্টাইন সম্রাট মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে না জড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। কারণ, তিনি মুসলমানদের মহান নেতা ইমাদুদ্দিন জিনকির বীরত্ব সম্পর্কে অনেক কথাই শুনেছিলেন। আর তাই সমূহ ক্ষতি উপেক্ষা করে তিনি প্রস্থান করেন আর সিদ্ধান্ত নেন আরও বড় ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে আগামী বছর পুনরায় আগমনের।[৪৬২]

বাইজান্টাইন বাহিনীর পুনঃআগমন

এ বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য যে, ক্রুসেডার বা বাইজান্টাইন কোনো পক্ষই এ সময় পারস্পরিক চুক্তির বিষয়টি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেনি। ইমাদুদ্দিন জিনকিও তখন এ বিষয়ে কিছু জানতে পারেননি। অবশ্য ক্রুসেডারদের

---

৪৬১. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৬৩।

৪৬২. *প্রাগুক্ত*, ২/২৬৩।

উল্লেখযোগ্য কোনো আপত্তি ছাড়া এন্টিয়ক নগরপ্রাচীরের ওপর বাইজান্টাইন পতাকা উড়তে দেখে তিনি অনুমান করেন, উভয় পক্ষের মধ্যে কোনো ধরনের সমঝোতা ও সহযোগিতা বিনিময়ের চুক্তি হয়েছে। এজন্য ইমাদুদ্দিন জিনকি তার রাজ্যের এশিয়া মাইনর অঞ্চল সংলগ্ন উত্তর সীমান্তের নিরাপত্তায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ জারি করেন। এ দিকটায় বাইজান্টাইনরা কিলিকিয়া অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং সেখানে বাইজান্টাইন বাহিনীর একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা রেজিমেন্ট অবস্থান করছিল।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইমাদুদ্দিন জিনকির হাতে সম্পাদিত এসব বিজয় এবং ক্রুসেডার ও বাইজান্টাইনদের অবৈধ অনুপ্রবেশের মোকাবিলায় তার শক্তিশালী উদ্যোগ নির্বিবাদে তাকে তৎকালীন মুসলিম নেতাদের অঘোষিত নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। বিশেষত এসব মাহাত্ম্যপূর্ণ বিজয় ও সুস্পষ্ট সম্মান তিনি এমন সময় অর্জন করেন যখন অন্যান্য মুসলিম সুলতান, রাজন্য ও নেতার পার্থিব ক্ষমতালিপ্সা সকলের সামনে উন্মোচিত হয়ে গিয়েছিল। এসব নেতার দুর্বলতার এর চেয়ে বড় দলিল আর কী হতে পারে যে, ইমাদুদ্দিন জিনকি যখন ক্রুসেডার ও বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মুসলমানদের একক শক্তিতে পরিণত করতে চেষ্টা করছিলেন, সে সময়ই তারা ইরাক ও পারস্য ভূমিতে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়িয়ে ছিল। শাম অঞ্চলে যখন এত কিছু হয়ে যাচ্ছে, পারস্য ও ইরাকে তখনও চলছে সুলতান মাসউদ ও তার ভ্রাতুষ্পুত্র দাউদ বিন মাহমুদের ধারাবাহিক বিবাদ-সংঘাত।[৪৬৩]

ইমাদুদ্দিন জিনকি অনুভব করছিলেন, ক্রুসেডাররা বাইজান্টাইনদের সঙ্গে মিলে শাম অঞ্চলে বড়সড় কোনো কাণ্ড ঘটানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই তিনি শত্রুপক্ষের সম্ভাব্য সম্মিলিত আক্রমণ মোকাবিলায় শক্তি লাভের লক্ষ্যে শামের বিভিন্ন দুর্গ ও নগরীতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন।

ইমাদুদ্দিন জিনকি প্রথমে লেবানন অঞ্চলে বালাবাক্কু নগরী অভিমুখে অগ্রসর হয়ে নগরীটি জয়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু নগরটির নিরাপত্তাব্যবস্থা অত্যন্ত মজুবত হওয়ায় তার কাজ কঠিন হয়ে যায়। বালাবাক্কু তখন দামেশকের অধীনে ছিল। নগরীটির প্রশাসক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের

---

৪৬৩. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩০৪-৩০৫।

বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিলে ইমাদুদ্দিন তাতে সম্মত হন। কারণ, এর ফলে অন্তত নগরীটি ভবিষ্যতে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবে আর তিনি এখন অন্যত্র অভিযানের লক্ষ্যে অগ্রসর হতে পারবেন। আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি, ইমাদুদ্দিন জিনকি সিদ্ধান্ত ও কর্মতৎপরতায় দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন। তার অনুমানে কোনো স্থানের পতন-সম্ভাবনা ক্ষীণ হলে তিনি জেদ ধরে সেখানে অবরোধ করে পড়ে থাকতেন না।

ইমাদুদ্দিন জিনকি এরপর বালাবাক্কু ছেড়ে মিজদাল দুর্গ অভিমুখে অগ্রসর হন। সামান্য চেষ্টার পর তিনি দুর্গটি জয় করে নিজ রাজ্যভুক্ত করতে সক্ষম হন। এ দুর্গটিও দামেশকের অধীনস্থ ছিল। এরপর তিনি অগ্রসর হন দামেশক রাজ্যেরই অন্তর্গত বানিয়াস নগরীর দিকে। বানিয়াস নগরীও অতি সহজে তার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। এগুলো ৫৩২ হিজরি সনের শুরু ভাগের (১১৩৭ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকের) ঘটনা।[৪৬৪]

দামেশক রাজ্যের অধীনস্থ সিংহভাগ এলাকার ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর দামেশক নগরী দখলের জন্য ইমাদুদ্দিন জিনকির সামনে এখন একটি বাধাই বাকি আছে। আর তা হলো হিমস নগরী। হামা ও দামেশকের মধ্যবর্তী পথে সটান দাঁড়িয়ে ছিল হিমস নগরী। আর তাই তিনি এরপর সরাসরি হিমসে পৌঁছে নগরীটি অবরোধ করেন। কিন্তু হিমস শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুললে অবরোধ দীর্ঘায়িত হয়। দীর্ঘ অবরোধের পর হিমসবাসী যখন নতি স্বীকার করে নগরদ্বার খুলে দেওয়ার প্রস্তুতি নেয়, তখনই মুসলমানদের কাছে এক উদ্বেগজনক সংবাদ এসে পৌঁছায়!

শামের জমিনে পৌঁছে গেছে বিশাল বাইজান্টাইন বাহিনী। তাদের নেতৃত্বে আছেন স্বয়ং সম্রাট ২য় জন কমনিনোস। গত বছর এন্টিয়কের শাসক রেমন্ড অফ পয়টিয়ার্সের সঙ্গে কৃত চুক্তি বাস্তবায়নে লক্ষ্যে তারা সরাসরি আলেপ্পোর দিকে এগিয়ে আসছে।

নিঃসন্দেহে এ সংবাদে মুসলমানদের জন্য যথেষ্ট শঙ্কা ও ভীতির উপাদান ছিল। কারণ, আলেপ্পোর পতন হলে চলমান উম্মাহর ঐক্য প্রচেষ্টা একেবারে গোড়া থেকে মুখ থুবড়ে পড়বে এবং অর্জন শূন্যের ঘরে নেমে যাবে। আর তাই ইমাদুদ্দিন জিনকি তার সঙ্গে হিমসের অবরোধে শরিক

---

৪৬৪. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩০১ ও ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৬৩-২৬৪।

আলেপ্পোর আমির সিওয়ারকে অবরোধ ছেড়ে দ্রুত আলেপ্পোতে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং তাকে সর্বোচ্চ স্তরের প্রস্তুতি গ্রহণ, নগরীর প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সংহতকরণ ও পরিখাগুলো গভীর করার ব্যবস্থা নিতে বলেন। পাশাপাশি তিনি সিওয়ারকে বলেন, 'নগরবাসীকে আশ্বস্ত করো; মুসলিম সেনারা তাদের সহায়তায় দ্রুতই চলে আসছে।' এটি ৫৩২ হিজরি সনের রজব মাসের (১১৩৮ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের) কথা।[৪৬৫]

বাইজান্টাইন বাহিনী মুসলিম ভূখণ্ডে অবতরণ করতেই এন্টিয়কের শাসক রেমন্ড অফ পয়টিয়ার্স ও এডেসার শাসক ২য় জোসেলিন তাদের সঙ্গে যোগ দেন। এ ছাড়াও নাইট টেম্পলার সংগঠনের একটি শক্তিশালী স্কোয়াড তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়। সম্মিলিত বাহিনী বালাত নগরী অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে নগরটি দখল করে নেয়। এরপর তারা অগ্রসর হয় আলেপ্পোর অন্তর্গত সুরক্ষিত ইসলামি নগরী বিজায়া নগরী অভিমুখে। যেহেতু নগরীটির অবস্থান ছিল আলেপ্পো ও এশিয়া মাইনর অঞ্চলের যোগাযোগপথের পাশে, তাই বাইজান্টাইন সম্রাট যেকোনো মূল্যে নগরটি দখলের জন্য জেদ ধরেন। সাতদিন অবরোধের পর দু-পক্ষ পত্রবিনিময় শুরু করে। চুক্তি হয়, নগরবাসীকে নিরাপত্তা প্রদানের শর্তে নগরদ্বার খুলে দেওয়া হবে। কিন্তু চুক্তিমতো নগরদ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়ার পর বাইজান্টাইন সম্রাট ২য় জন কমনিনোস মুসলমানদের সঙ্গে প্রতারণা করেন এবং নগরজুড়ে ভয়াবহ গণহত্যা চালানোর নির্দেশ দেন। পাঁচ হাজার আটশ মুসলিম নর-নারীকে হত্যা করা হয়, বাকিদের দাস হিসেবে বন্দি করা হয়। কিছু মুসলিম নাগরিক পালিয়ে আশেপাশের বিভিন্ন পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিলে বাইজান্টাইন সম্রাট গুহাগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। ফলে আত্মগোপনকারী মুসলমানরা সেখানেই নির্মমভাবে মারা যায়। ৫৩২ হিজরি সনের ২৫ রজব বিজায়া নগরীর পতন ঘটে।[৪৬৬]

নিঃসন্দেহে এটি ছিল সুবিশাল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সম্রাটের এক ন্যাক্কারজনক প্রতারণা!

---

৪৬৫. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৬৪-২৬৫।

৪৬৬. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩০১-৩০২ ও ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৬৫।

অবশ্য বিজায়া নগরী অবরোধ এবং মুসলিম নাগরিকদের হত্যা ও বন্দি করতে গিয়ে খ্রিষ্টান বাহিনী মূল্যবান কিছু সময় নষ্ট করে ফেলে। এ সুযোগে আলেপ্পো সর্বোচ্চ প্রতিরক্ষার যথাযথ প্রস্তুতি নিতে সক্ষম হয় এবং প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ করার জন্য পূর্ণোদ্যমে প্রস্তুত হয়ে যায়। বাইজান্টাইন সম্রাট নগরটিতে অতর্কিতে হামলে পড়ার সুযোগ খুইয়ে বসেন। বিজায়ার পতন ঘটিয়ে অবশেষে তিনি আলেপ্পো অভিমুখে রওনা হন।[৪৬৭]

মুসলমানদের নির্ভীক প্রতিরোধ

এমন কঠিন সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে ইমাদুদ্দিন জিনকি কী করছিলেন?!

আসুন উপভোগ করি এমন জটিল বিপর্যয়ের মুখে ইমাদুদ্দিন জিনকির চমৎকার প্রতিক্রিয়া; একসঙ্গে অধ্যয়ন করি এই জরুরি সংকটের মোকাবিলায় তার কর্মনীতি। জানতে চেষ্টা করি, ঘটনাপ্রবাহের ওপর তার সামগ্রিক দৃষ্টি কেমন ছিল এবং কর্মক্ষেত্রে তার খোদাপ্রদত্ত বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল।

১. প্রথমেই তিনি আলেপ্পোর প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সর্বোচ্চ দৃঢ় ও শক্তিশালী করতে সচেষ্ট হন এবং আলেপ্পোবাসীর মনোবল দৃঢ় রাখতে সাহসী প্রশাসক সিওয়ারকে আলেপ্পোতে ফেরত পাঠান।[৪৬৮]

২. হিমসে আক্রমণ অব্যাহত রাখার জন্য তিনি তার বাহিনীর ক্ষুদ্র একটি অংশকে হিমসেই রেখে যান। সুতরাং হিমসের প্রতিরক্ষা বাহিনী এখন নিজেদের দুর্গের নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যস্ত থাকবে এবং পেছন দিক থেকে ইমাদুদ্দিন জিনকির ওপর আক্রমণ করতে পারবে না।

৩. ইমাদুদ্দিন জিনকি নিজে মূল বাহিনী নিয়ে হিমস থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত সালামিয়া অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হন। তার লক্ষ্য ছিল শামের মধ্যবর্তী এ অঞ্চলে অবস্থান গ্রহণ করে বাইজান্টাইন বাহিনীর গতিবিধির প্রতি খেয়াল রাখা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী উত্তর শাম অঞ্চলের যেকোনো স্থানে দ্রুত অগ্রসর হওয়া নিশ্চিত করা।

---

৪৬৭. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৬৪।

৪৬৮. ইবনে ওয়াসিল, *মুফাররিজুল কুরূব*, ১/৭৮।

৪. ইমাদুদ্দিন জিনকি এক বিরল ও বিস্ময়কর ধরনের বার্তা প্রেরণ করেন। পত্রটির ভাষ্য দ্বারা আল্লাহর প্রতি তার পূর্ণ নিষ্ঠা এবং মুসলিম উম্মাহর সংকট নিরূপণে তার সুগভীর বোধ ও চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি সে সময় বাগদাদে অবস্থানরত সেলজুক সুলতান মাসউদের কাছে একটি বার্তা প্রেরণ করেন এবং তাকে আলেপ্পো ও শাম অঞ্চলের মুসলমানদের সহায়তায় একটি বিশাল বাহিনী পাঠানোর প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন![৪৬৯]

ইমাদুদ্দিন জিনকির এ পদক্ষেপ অনেক কিছু বলে যায়! মুসলমানদের বৃহত্তর স্বার্থকে সামনে রেখে তিনি মুহূর্তের মধ্যে যেন সুলতান মাসউদের সঙ্গে পূর্ব বিরোধের ইতিহাস ভুলে যান। ভুলে যান, এই সুলতান মাসউদ দু-বছর পূর্বে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। তার যেন মনেই নেই যে, সুলতান মাসউদই ৫২৫ হিজরি সনে সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পর থেকে গত সাতটি বছর পার্থিব স্বার্থে একের পর এক অনর্থক যুদ্ধ-সংঘাত সৃষ্টি করছেন। ইমাদুদ্দিন জিনকি মুসলমানদের দুর্যোগ দূর করতে নিজের বাহিনীকে সুলতান মাসউদের শক্তির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে এ সবকিছু ভুলে যান। শুধু কি এতটুকুই! এ সময় কাজি কামালুদ্দিন শাহরাযুরি ইমাদুদ্দিন জিনকিকে পুরোপুরি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'সুলতান মাসউদ তার বাহিনী নিয়ে শাম অঞ্চলে আগমন করলে নিশ্চয়ই পুরো অঞ্চলকে নিজের রাজত্বে জুড়ে নেবেন এবং এর ফলে ইমাদুদ্দিন জিনকির নেতৃত্ব ও ক্ষমতার অবসান ঘটবে।' ইমাদুদ্দিন বড় আশ্চর্য উত্তর প্রদান করেন। তিনি বলেন, 'শত্রুপক্ষ মুসলিম ভূখণ্ড দখলে লালায়িত হয়ে উঠেছে। তারা আলেপ্পো দখল করে নিতে পারলে শাম অঞ্চলে ইসলামের অস্তিত্বই থাকবে না। আর শাম অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ কাফিরদের হাতে না থেকে যেকোনোভাবে মুসলমানদের হাতে থাকা আমার কাম্য।'[৪৭০]

এই বিস্ময়কর চেতনা এবং এই অপূর্ব নিষ্ঠাই ছিল ইমাদুদ্দিন জিনকির বিজয়ের সবচেয়ে শক্তিশালী কার্যকারণ। কত পার্থক্য সেই দু-ব্যক্তির

---

৪৬৯. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩০৩।

৪৭০. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ৬২।

মাঝে, যাদের একজন কাজ করে আল্লাহর জন্য, আর অন্যজন কাজ করে নিজের স্বার্থপূরণের জন্য!

ইমাদুদ্দিন জিনকি শামের মুসলমানদের সহায়তায় বাহিনী প্রেরণের জন্য সুলতান মাসউদকে উৎসাহিত করতে বাগদাদে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন এবং খোদ কামালুদ্দিন শাহরাযুরিকে প্রতিনিধিদলের প্রধান নির্বাচন করেন।

৫. নিষ্ঠাবান বীর সেনানী ইমাদুদ্দিন জিনকি আরেকটি অভিনব বার্তা প্রেরণ করেন জাযিরা অঞ্চলে তার চরম বিদ্বেষী প্রতিপক্ষ রুকনুদ্দৌলা দাউদ বিন সুকমান উরতুকির কাছে![৪৭১] বিগত এক দশক ধরে যদিও দু-পক্ষের বিরোধ-সংঘাত চলছিল; কিন্তু ইমাদুদ্দিন জিনকি চিন্তা করেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে পেছনের সব বিরোধ ও সংঘাত ভুলে গিয়ে ক্রুসেডার-বাইজান্টাইন সম্মিলিত বৃহৎ শক্তির মোকাবিলা করতে সক্ষম একক কাঠামোয় মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করতে প্রচেষ্টা চালানো তার অপরিহার্য দায়িত্ব।

৬. তিনি তৃতীয় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র প্রেরণ করেন, যা দ্বারা পরিস্থিতি অনুধাবনে তার সূক্ষ্ম সামরিক প্রজ্ঞার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই ত্বরিত বার্তাটি তিনি প্রেরণ করেন এশিয়া মাইনর অঞ্চলের দুই মুসলিম নেতা রোমান সেলজুক রাষ্ট্রের শাসক সুলতান মাসউদ বিন কিলিজ আরসালান এবং দানিশমান্দ রাষ্ট্রের শাসক মুহাম্মাদ বিন গাজি দানিশমান্দির কাছে। ইমাদুদ্দিন জিনকি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাইজান্টাইনদের অধিকৃত এশিয়া মাইনর অঞ্চলের ইসলামি জনপদগুলোতে হামলা চালানোর আহ্বান জানান। তিনি আশা করছিলেন, এর ফলে বাইজান্টাইন সম্রাট এশিয়া মাইনর অঞ্চলের মুসলমানদের হামলা প্রতিরোধ করার জন্য শাম ছেড়ে সেদিকে ফিরে যেতে বাধ্য হবেন।[৪৭২]

নিঃসন্দেহে ইমাদুদ্দিন জিনকির পরিকল্পনা ছিল অতি নিখুঁত, চমৎকার এবং তার অনন্যসাধারণ সামরিক জ্ঞানের অনুপম দৃষ্টান্ত।

---

৪৭১. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩০২-৩০৩ ও ইবনে ওয়াসিল, *মুফাররিজুল কুরূব*, ১/৭৯-৮০।

৪৭২. সাঈদ মাহমুদ ইমরান, *আত-তারীখুল ইসলামি*, পৃষ্ঠা : ২০৯।

পরিকল্পনার কথা তো জানলাম। এবার আসুন, জেনে নিই, বাস্তবতার জমিনে কী ঘটেছিল!

৫৩২ হিজরি সনের ৬ শাবান ক্রুসেডার-বাইজান্টাইন সম্মিলিত বাহিনী আলেপ্পো নগরপ্রাচীরের কাছে অবতরণ করে। তারা মুসলিম বাহিনীর সুসংহত-শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যবস্থা দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। চারদিকে প্রচুর গভীর পরিখা ও সুউচ্চ মজবুত নগরপ্রাচীর! মুসলিম বাহিনী অস্ত্রসজ্জিত ও সদা প্রস্তুত! চারদিক থেকে খ্রিষ্টান বাহিনীকে লক্ষ্য করে অনবরত তিরবৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে! ফলে তাদের পক্ষে নগরীর কাছে যাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।[৪৭৩]

মুসলিম বাহিনী কেবল প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করেই তুষ্ট থাকেনি। সাহসী মুসলিম আমির সিওয়ার ঝটিকা হামলা চালানোর জন্য কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী নগরপ্রাচীরের বাইরে প্রেরণ করেন। তারা অবরোধকারী শত্রুপক্ষের বিভিন্ন অংশের ওপর অতর্কিতে হামলা চালায়। এতে প্রচুর ক্রুসেডার ও বাইজান্টাইন সৈন্য নিহত হয়। এমনকি এই ঝটিকা হামলায় ক্রুসেডারদের একজন শীর্ষস্থানীয় সন্ন্যাসীও নিহত হন। ফলে পুরো খ্রিষ্টান শিবিরে প্রচণ্ড ভীতি ছড়িয়ে পড়ে।

বাইজান্টাইন সম্রাট অনুভব করেন, এই দুঃসাহসী বাহিনী ও সুরক্ষিত নিরাপত্তাব্যবস্থা ভেদ করে আলেপ্পো দখলের স্বপ্নের নাগাল কখনোই পাওয়া যাবে না! আর তাই তিনি অবরোধ শুরু করার মাত্র তিন দিনের মধ্যে হুট করে নির্ভীকতার অনন্য প্রতীক আলেপ্পো থেকে অবরোধ তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন![৪৭৪]

এত বিশাল খ্রিষ্টান বাহিনীও আলেপ্পোবাসী মুসলমানদের মনোবলে চিড় ধরাতে ব্যর্থ হয়। আমাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, চল্লিশ বছরের অধিক সময় পূর্বে এন্টিয়ক অবরোধকালে ক্রুসেডাররা কী বিস্ময়কর অবিচলতার পরিচয় দিয়েছিল। অবরোধ একটানা সাত মাস দীর্ঘ হওয়ার পরও তারা এন্টিয়কের পতন না ঘটিয়ে হাল ছাড়েনি। এবার তো সম্মিলিত খ্রিষ্টান

---

৪৭৩. ইবনে ওয়াসিল, *মুফাররিজুল কুরুব*, ১/৭৮।

৪৭৪. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩০২ ও ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৬৫-২৬৬।

বাহিনী এন্টিয়ক অবরোধকারী বাহিনীর চেয়ে কয়েক গুণ বড়। কিন্তু তারা তিন দিনের বেশি ধৈর্যধারণ করতে পারেনি।

কী এর রহস্য?!

এর রহস্য খ্রিষ্টান বাহিনীর প্রকৃতি বা সংখ্যায় লুকিয়ে নেই; লুকিয়ে আছে মুসলিম বাহিনীর চেতনা ও শক্তিতে। আলেপ্পোর অবরুদ্ধ মুসলিম জনতা ছিল চার দশক পূর্বের এন্টিয়কে অবরুদ্ধ মুসলমানদের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা চরিত্রের। এই সংকট-মুহূর্তেই সেই ঈমানি-আমলি শিক্ষা এবং জিহাদ ও সামরিক প্রশিক্ষণের ফল প্রকাশ পেয়েছিল, যার জন্য ইমাদুদ্দিন জিনকি দীর্ঘ সময় ও চিন্তা ব্যয় করেছিলেন এবং আলিম-উলামা ও সমরবিদদের নিয়োজিত করেছিলেন। তাদের অক্লান্ত সাধনায় গড়ে উঠেছিল এই শক্তিশালী মুসলিম বাহিনী ও এই অটল-অবিচল মুসলিম জনশক্তি।

বাইজান্টাইন সম্রাট নিরাশ হয়ে আলেপ্পো ত্যাগ করেন এবং আলেপ্পোর পশ্চিমে আসারিব দুর্গ অভিমুখে অগ্রসর হন। সেখানে একটি সাধারণ মুসলিম প্রতিরক্ষা বাহিনী নিয়োজিত ছিল। তারা পতন নিশ্চিত দেখে প্রস্থানের সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে বাইজান্টাইন সম্রাট সহজেই আসারিব দুর্গ দখল করেন। বিজায়া নগরী থেকে যেসব মুসলমানকে বন্দি করা হয়েছিল, বাইজান্টাইন বাহিনী তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। সম্রাট তাদেরকে আসারিব দুর্গে রেখে যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং তাদের প্রহরায় একটি বাইজান্টাইন রেজিমেন্ট রেখে যান।[৪৭৫] বাইজান্টাইন বাহিনী সেখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে মাআ'ররাতুন-নোমান ও কাফারতাব নগরী দখল করে নেয়। এরপর তারা অগ্রসর হয় শাইজার অভিমুখে।[৪৭৬]

আলেপ্পোর মুসলিম প্রতিরক্ষা বাহিনী যখন দেখতে পায়, খ্রিষ্টান বাহিনী আলেপ্পো ছেড়ে চলে গেছে; তখন তারা খ্রিষ্টান বাহিনীর গতিপথ সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য গোয়েন্দা প্রেরণ করে। আলেপ্পোর আমির সিওয়ার জানতে পারেন, বাইজান্টাইনরা মুসলিম বন্দিদের আসারিব দুর্গে রেখে গেছে এবং তাদের প্রহরার জন্য ক্ষুদ্র একটি রেজিমেন্ট রেখে গেছে। তিনি

---

৪৭৫. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৬৫-২৬৬।

৪৭৬. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৬৭।

সুযোগ কাজে লাগাতে তৎপর হয়ে ওঠেন এবং দ্রুত একদল সৈন্য নিয়ে আলেপ্পো থেকে বেরিয়ে এসে আসারিব দুর্গ অবরোধ করেন। অল্প সময় না যেতেই তিনি দুর্গটির পতন ঘটাতে সক্ষম হন। বাধাদানকারী বাইজান্টাইন সৈন্যরা নিহত হয়, বাকিরা মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দি হয়। সেনাপতি সিওয়ার বন্দি সকল মুসলমানকে মুক্ত করে আলেপ্পোতে ফিরে আসেন।[৪৭৭]

মুসলমানদের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস তখন আকাশচুম্বী। সালামিয়ায় শিবির স্থাপনকারী ইমাদুদ্দিন জিনকির কাছেও এ সংবাদ পৌঁছে যায়। এতে জিহাদের প্রতি তার দৃঢ়তা আরও বৃদ্ধি পায়, সৈন্যদের চেতনা ও মনোবল সুদৃঢ় হয় এবং সকলে হৃদয় থেকে অনুভব করে—আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন।

ওদিকে আগ-পিছ ভেবে বাইজান্টাইন সম্রাট শাইজারের দিকে অগ্রসর হন। শাইজার তখন ইমাদুদ্দিন জিনকির রাজ্যভুক্ত ছিল না; বরং সুলতান বিন মুনকিয শাসিত স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। দৃঢ়চেতা বীর সেনাপতি ইমাদুদ্দিন জিনকি যেন ক্রুদ্ধ না হন, এ উদ্দেশ্যে বাইজান্টাইন সম্রাট জিনকি রাষ্ট্রের পরিবর্তে তুলনামূলক দুর্বল কোনো রাজ্য দখল করতে চাচ্ছিলেন![৪৭৮]

বাইজান্টাইন সম্রাট এমনটা ভাবলে কী হবে; বাস্তবতা তার ভাবনাকে মিথ্যা প্রমাণ করে!

সুলতান বিন মুনকিয যদিও ইমাদুদ্দিন জিনকির আনুগত্য স্বীকার না করে নিজের আলাদা রাজ্য ধরে রাখার প্রতি পূর্ণ সচেষ্ট ছিলেন; কিন্তু পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে তিনি নিরুপায় হয়ে ইমাদুদ্দিন জিনকির কাছে ত্বরিত সাহায্যের আবেদনবার্তা প্রেরণ করেন। ইমাদুদ্দিন জিনকিও এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে দ্রুত তার মূল বাহিনী নিয়ে শাইজার রক্ষায় ছুটে আসেন। তিনি (ফুরাত নদীর শাখা) কুয়েক নদী পাড়ি দেন, এরপর তার রাজ্যভুক্ত হামা নগরী অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হন। আল্লাহ না করুন, বাইজান্টাইন বাহিনী বিজয়ী হলে যেন নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করা যায়, এ উদ্দেশ্যে তিনি হামা নগরীকে পেছনে রাখেন। এরপর তিনি শাইজার ও হামার

---

[৪৭৭]. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩০২ ও ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৬৬।

[৪৭৮]. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩০২।

মাঝামাঝি এলাকায় শিবির স্থাপন করেন এবং শত্রুপক্ষের হাল-হাকিকত ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য কয়েকজন গুপ্তচর প্রেরণ করেন।[৪৭৯]



মানচিত্র নং-২৯

শাইজারের যুদ্ধ

কিছুক্ষণের মধ্যেই সংবাদ আসে, খ্রিষ্টান বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা গণনাতীত; ইমাদুদ্দিন জিনকির বাহিনীর চেয়ে অনেক গুণ বেশি। তিনি আরও জানতে পারেন, বাইজান্টাইন-ক্রুসেডারদের সম্মিলিত বাহিনী অবরোধের বিশালকায় আসবাবপত্র তো নিয়ে এসেছেই; অধিকন্তু শাইজারের চারপাশে আঠারোটি মিনজানিক স্থাপন করেছে। আর খ্রিষ্টান বাহিনীর পতাকাতলে বাইজান্টাইন বাহিনী, এন্টিয়কের বাহিনী ও এডেসার বাহিনীর সঙ্গে নাইট টেম্পলারদের একটি দুর্ধর্ষ স্কোয়াডও যুক্ত হয়েছে।[৪৮০]

বাইজান্টাইন সম্রাটের প্রস্থান!

গুপ্তচরদের মাধ্যমে সবকিছু জেনে ইমাদুদ্দিন জিনকি উপলব্ধি করেন, এই বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে উন্মুক্ত লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া মোটেও নিরাপদ

---

৪৭৯. ইবনে ওয়াসিল, *মুফাররিজুল কুরূব*, ১/৭৮।

৪৮০. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩০২ ও উসামা বিন মুনকিয, *আল-ই'তিবার*, পৃষ্ঠা : ১৪৫-১৪৭।

নয়। আর তাই তিনি শ্রেয়তর ফলাফল আনতে সক্ষম ভিন্ন একটি যুদ্ধনীতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত নেন।

কী ছিল এই মহান নেতার গৃহীত যুদ্ধনীতি?!

তিনি একই সঙ্গে কয়েকটি ক্ষেত্রজুড়ে কাজ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

[এক] শত্রুপক্ষের শক্তিক্ষয়ের লক্ষ্যে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ

পূর্ণ শক্তির খ্রিষ্টান বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে ইমাদুদ্দিন জিনকি এই যুদ্ধনীতি অবলম্বন করেন। তিনি তার বাহিনীর বড় একটি অংশকে শাইজার অভিমুখে প্রেরণ করতেন। খ্রিষ্টান সৈন্যরা তাদেরকে দেখে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে এলে ইমাদুদ্দিন কৌশলে পিছু হটে তাদেরকে শাইজার অবরোধকারী মূল বাহিনী থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে আসতেন। এরপর তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদেরকে হত্যা ও বন্দি করতেন।[৪৮১]

তিনি এই কৌশল প্রয়োগ করে খ্রিষ্টান বাহিনীকে উন্মুক্ত যুদ্ধের সুযোগ না দিয়েই তাদের মাঝে ভীতি সঞ্চার করতে সক্ষম হন।

[দুই] খ্রিষ্টান বাহিনীর রসদ সরবরাহব্যবস্থা বিচ্ছিন্নকরণ

ইমাদুদ্দিন জিনকি তার বাহিনীর কয়েকটি অংশকে প্রেরণ করে খ্রিষ্টান বাহিনীর পেছনের পথগুলো বন্ধ করে দেন। ফলে তাদের কাছে যুদ্ধসামগ্রী ও রসদপত্র পৌঁছা অসম্ভব হয়ে যায়। স্বভাবতই যত সময় গড়াবে, খ্রিষ্টান বাহিনীর রসদ ফুরিয়ে আসবে এবং একসময় তারা অবরোধ অব্যাহত রাখার ধৈর্য ও সাহস হারিয়ে ফেলবে।[৪৮২]

[তিন] স্নায়ুযুদ্ধ

ইমাদুদ্দিন জিনকি প্রতিপক্ষ মিত্রবাহিনীর কাছে বার্তা প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে বোঝান যে, তার বাহিনীও অনেক বড় ও বিশাল। তিনি তাদেরকে উপহাস করে লেখেন, 'তোমরা আমার ভয়ে পালিয়ে এই পাহাড়ি এলাকায় আশ্রয় নিয়েছ! সাহস থাকলে ওখান থেকে বের হয়ে উন্মুক্ত ময়দানে আমাদের মুখোমুখি হও। যদি তোমরা জিতে যাও,

---

৪৮১. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩০২।

৪৮২. উইলিয়াম সুরি, *তারিখুল হুরুবিস সালিবিয়্যাহ*, ২/২৯৭-২৯৮।

শাইজার তোমাদের; আর যদি আমি বিজয়ী হই, তাহলে তোমাদের অনিষ্ট থেকে মুসলমানদের চিরদিনের জন্য মুক্ত করব।'[৪৮৩]

ইমাদুদ্দিন জানতেন, তার শক্তি শত্রুপক্ষের তুলনায় অনেক দুর্বল। তারা বের হয়ে আসুক, তিনি তা চাচ্ছিলেন না। কিন্তু তিনি এসব বলে তাদের মনোবল ভেঙে দিতে চাচ্ছিলেন; তাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছিলেন, তাদের চেয়ে তার শক্তি অনেক বেশি এবং তিনি নিজের ও নিজ বাহিনীর সামর্থ্যের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল। তার এ কৌশল প্রতিপক্ষকে ভীত করে তোলে। জনৈক ক্রুসেডার সেনাপতি যখন বাইজান্টাইন সম্রাটকে ইমাদুদ্দিন জিনকির বিরুদ্ধে লড়াই করতে অগ্রসর হওয়ার পরামর্শ দেয়, তখন সম্রাট যে উত্তর দেন, তাতে এই ভীতির ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সম্রাট ভীত কণ্ঠে উত্তর দেন, 'তোমরা কি মনে করছ, শিবিরে থাকা এই বাহিনী ছাড়া তার আর কোনো সৈন্য নেই? সে চায়, তোমরা তার মুখোমুখি হও। তখন তার সাহায্যে মুসলমানদের এত বিরাট বাহিনী এসে যাবে, যা গণনা করেও শেষ করা যাবে না।'[৪৮৪]

এভাবেই তার 'ঘাবড়ে দেওয়া'র কৌশলে প্রভাবিত হয়ে বাইজান্টাইন সম্রাট ভীত হয়ে পড়েন এবং দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হওয়ার সাহস হারিয়ে ফেলেন।

[চার] মিত্রশক্তির ঐক্যে ভাঙন সৃষ্টি

এক্ষেত্রে ইমাদুদ্দিন জিনকি আরেকটি অভিনব কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি প্রতিপক্ষ মিত্রবাহিনীর ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দের কাছে বার্তা পাঠিয়ে তাদেরকে বলেন যে, বাইজান্টাইন সম্রাট শাম অঞ্চলে কোনো একটি দুর্গ নিয়ন্ত্রণে নিতে পারলেই এরপর তাদের হাত থেকে তাদের রাজ্যগুলো ছিনিয়ে নেবেন। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অতীত নীতি ক্রুসেডারদের অজানা ছিল না। তাদের মনে পড়ে যায় বর্তমান সম্রাট ২য় জন কমনিনোসের পিতা ১ম অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোসের সঙ্গে তাদের পূর্বসূরি

---

৪৮৩. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩০২, শিহাবুদ্দিন আহমাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নুওয়াইরি, *নিহায়াতুল আরাব ফী ফুনূনিল আদাব*, ২৭/১২৬ ও ইবনে ওয়াসিল, *মুফাররিজুল কুরূব*, ১/৮১।

৪৮৪. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩০২।

ক্রুসেডার নেতাদের দীর্ঘ সংঘাতের ইতিহাস। তাই ইমাদুদ্দিন জিনকির বক্তব্য তাদেরকে যথেষ্ট প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়।

এতটুকুতেই ক্ষান্ত না দিয়ে এরপর তিনি বাইজান্টাইন সম্রাটের কাছেও একটি বার্তা প্রেরণ করে তাকে বলেন, 'শাম অঞ্চলের ক্রুসেডাররা আপনাকে ভয় পাচ্ছে; আপনি এখান থেকে ফিরে গেলেই তারা আপনার সঙ্গে প্রতারণা করবে।' তার এ বার্তা বাইজান্টাইন সম্রাটকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে।[৪৮৫] কারণ, ক্রুসেডারদের ইতিহাস বলে, অতীতে তারা কনস্টান্টিনোপল চুক্তি ভঙ্গ করে এন্টিয়ক ও কিলিকিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন নগরী নিজেদের দখলে রেখেছিল। ফলে এটা একেবারেই স্বাভাবিক যে, বিজয় লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে তারা তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসবে।

এভাবে কৌশলে ইমাদুদ্দিন জিনকি মিত্রশক্তিগুলোর মনে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও সংশয় ঢুকিয়ে দেন। এক পক্ষ অপর পক্ষকে ভয় পেতে শুরু করে এবং উভয় পক্ষের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সাহস ও সংকল্প দুর্বল হয়ে পড়ে।

এমন সুষম পরিকল্পনার সুষ্ঠু প্রয়োগের ফলে বাইজান্টাইনরা শাইজারে অবরোধ দীর্ঘ করার ব্যাপারে দোদুল্যমান হয়ে পড়ে। তা ছাড়া নগরটিও ছিল যথেষ্ট সুরক্ষিত; যার পতন ঘটাতে কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসও লেগে যেতে পারে। পুরো খ্রিষ্টান বাহিনীতে হতাশা ও দ্বিধাবিভক্তি ছড়িয়ে পড়ে। কোনো সুস্পষ্ট বিজয় অর্জন ছাড়াই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিহত ও বন্দির সংখ্যা বাড়তে থাকাও এক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

মহান আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছিল, তিনি বাইজান্টাইন বাহিনীর প্রস্থান প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত করবেন। আর তাই প্রায় একই সময়ে এমন চারটি ঘটনা ঘটে, যা খ্রিষ্টান বাহিনীর রণকৌশল রদবদলে বিরাট প্রভাব ফেলে। ঘটনাগুলো হলো—

১. সংবাদ আসে, রুকনুদ্দৌলা দাউদ বিন সুকমান ইমাদুদ্দিন জিনকির আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন এবং একসঙ্গে পঞ্চাশ হাজার তুর্কমেন

---

৪৮৫. শিহাবুদ্দিন আহমাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নুওয়াইরি, *নিহায়াতুল আরাব ফী ফুনূনিল আদাব*, ২৭/১৩৬ ও আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩০২।

সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে তার সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছেন।[৪৮৬] খ্রিষ্টান বাহিনীর মনোবল আরও ভেঙে দেওয়ার জন্য ইমাদুদ্দিন জিনকি এ সংবাদ কৌশলে খ্রিষ্টান শিবিরে পৌঁছিয়ে দেন।

২. একই সময় সংবাদ আসে, রোমান সেলজুক ও দানিশমান্দ রাজ্যের বাহিনী একজোট হয়ে কিলিকিয়া অঞ্চলের আদানা নগরীতে হামলা চালিয়েছে।[৪৮৭] নগরটি কিছুদিন পূর্বে বাইজান্টাইনরা দখল করে নিয়েছিল। এর অর্থ হলো, বাইজান্টাইনরা সাম্রাজ্য বৃদ্ধির পরিবর্তে উল্টো সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ হারাতে যাচ্ছে।

৩. দুই ক্রুসেডার নেতা রেমন্ড অফ পয়টিয়ার্স ও ২য় জোসেলিনের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়! দুজনই একে অপরকে ঘৃণা করতে থাকে এবং অপরজনের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। ২য় জোসেলিন চিন্তা করছিলেন, বাইজান্টাইনরা যদি শাইজার ও আলেপ্পোর পতন ঘটাতে সক্ষম হয় এবং চুক্তি অনুযায়ী নগরীদুটি রেমন্ডের হাতে তুলে দেয়, তাহলে তার স্বাধীনতা অনেকাংশে সংকুচিত হয়ে আসবে। কারণ, তখন রেমন্ডের নতুন রাজ্যটি জোসেলিন ও বাইতুল মুকাদ্দাসের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। অথচ বাইতুল মুকাদ্দাস তাদের সকলের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করে আসছে। ওদিকে রেমন্ড অফ পয়টিয়ার্স তার পরিকল্পিত রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও রাজ্যটিতে তার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিয়ে প্রচুর দ্বিধান্বিত ছিলেন। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন, এত বিশাল বাহিনীও আলেপ্পো ও শাইজার দখলের পরিকল্পনায় এখন পর্যন্ত সামান্য সফলতা অর্জন করতে পারেনি। তাহলে বাইজান্টাইন বাহিনী ফিরে যাওয়ার পর অবস্থা কী দাঁড়াবে? এসব আশঙ্কা, সম্ভাবনা ও দুশ্চিন্তা উভয় নেতাকে পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের দিকে ঠেলে দেয়। তা ছাড়া ২য় জোসেলিন রেমন্ডের বিরুদ্ধে বাইজান্টাইন সম্রাটের কান ভারী করায় উভয়ের সম্পর্কে আরও অবনতি ঘটে।[৪৮৮]

---

৪৮৬. ইবনে ওয়াসিল, *মুফাররিজুল কুরূব*, ১/৭৯-৮০।

৪৮৭. Guillaume de Tyr., pp. 662-665.

৪৮৮. উইলিয়াম সুরি, *তারিখুল হুরূবিস সালিবিয়্যাহ*, ২/৬৯৬-৬৯৭ ও Runciman: op. cit., II, p.216.

৪. শাইজারের আমিরের পক্ষ থেকে বাইজান্টাইন সম্রাটের কাছে একটি সমঝোতা প্রস্তাব আসে। এতে সম্রাটকে সেই মুহূর্তে অবরোধ তুলে শাইজার ত্যাগের বিনিময়ে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে মোটা অঙ্কের অর্থ প্রদানের প্রস্তাব করা হয়।[৪৮৯]

শাইজার শাসকের প্রস্তাব পাওয়ার পর বাইজান্টাইন সম্রাটের চিন্তা-পরিকল্পনা নতুন করে ওলটপালট হওয়ার উপক্রম হয়। পরবর্তী করণীয় নির্ণয়ে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন। কারণ, অভিযান অব্যাহত রাখলে হয়তো তার নিজের ও বাহিনীর সমূহ ক্ষতি হতে পারে; আবার অভিযান মুলতবি করে প্রস্থান করলে তার মর্যাদা ও সম্মানে বিরাট আঘাত আসবে। তাহলে তিনি কী করবেন?

নিশ্চিত করেই বলা যায়, এ সময় তার মনমস্তিষ্কে নানাবিধ চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। তিনি বিভিন্ন যুক্তি ও ঘটনাকে পাশাপাশি সাজিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করছিলেন।

আসুন, ক্ষণিকের জন্য একসঙ্গে ঘুরে আসি বাইজান্টাইন সম্রাট ২য় জন কমনিনোসের ভাবনার জগৎ থেকে!

১. কোনো রকম অগ্রগতি ছাড়াই শাইজার অবরোধে ইতিমধ্যে তিন সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে।

২. শাইজার অতি সমৃদ্ধ একটি নগরী। নগরীটির অভ্যন্তরীণ উৎপাদন সক্ষমতা যথেষ্ট মজবুত। তাই দীর্ঘ অবরোধ মোকাবিলা করে টিকে থাকার ক্ষমতা নগরীটির আছে।

৩. বাইজান্টাইন বাহিনী ইতিমধ্যে আলেপ্পো অবরোধে, আসারিব দুর্গে, শাইজারের নগরপ্রাচীরের সামনে এবং ইমাদুদ্দিন জিনকির বিক্ষিপ্ত বেশ কিছু হামলায় প্রচুর সৈন্য হারিয়েছে। নিহতের সংখ্যা যেমন অনেক, বন্দিও হয়েছে অনেকে। আবার বিজায়া থেকে যেসব মুসলিম নাগরিককে বন্দি করা হয়েছিল, তাদেরকেও আলেপ্পোর আমির সিওয়ার আসারিব দুর্গ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গেছেন। অর্থাৎ এখন পর্যন্ত বাইজান্টাইনরা হারিয়েছে অনেক, পায়নি কিছুই!

---

৪৮৯. উইলিয়াম সুরি, *তারিখুল হুরুবিস সালিবিয়্যাহ*, ২/৬৯৭ ও Setton:op.cit.I, p. 456.

৪. মুসলিম বাহিনীর প্রধান ইমাদুদ্দিন জিনকি এমন দৃঢ়চিত্ত ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ যে, বর্শার আঘাতও তাকে হটাতে পারে না; এমন অটল ও অবিচল যে, কিছুতেই তার সংকল্প দুর্বল হয় না; এমন অভিজ্ঞ ও পেশাদার যে, সমরনীতির প্রতিটি অধ্যায় তার আগাগোড়া রপ্ত আছে। কোনোভাবেই ভাবা যায় না যে, তিনি পরাজয় মেনে নেবেন।

৫. সম্রাটের সহযোগী ক্রুসেডার বাহিনীগুলো নিতান্ত দুর্বল। তদুপরি তাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল প্রচুর। দু-পক্ষের মাঝে পারস্পরিক আস্থা ও নির্ভরতার সামান্য উপাদানও বিদ্যমান নেই।

৬. আদানা নগরী পতনের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে।[৪৯০] নগরীটি বেদখল হয়েই তো দুর্যোগ শেষ হবে না; বরং এর মধ্য দিয়ে বাইজান্টাইন বাহিনীর প্রত্যাবর্তনের পথও বন্ধ হয়ে যাবে। বাইজান্টাইন বাহিনী একদিকে রোমান সেলজুক ও দানিশমান্দ বাহিনী এবং অপরদিকে ইমাদুদ্দিন জিনকির বাহিনীর মধ্যে আটকে যাবে।

৭. সাবেক বাইজান্টাইন সম্রাট ৪র্থ রোমানোস (Romanos IV Diogenes) প্রতিপক্ষের শক্তিমত্তা অনুমান করতে না পেরে এবং সামরিক সমীকরণ মেলাতে না পেরে আরেক মহান ইসলামি বীরযোদ্ধা আলপ আরসালানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়েছিলেন। ৪৬৩ হিজরি সনে (১০৭০ খ্রিষ্টাব্দে) সংঘটিত 'মানজিকার্টের যুদ্ধ' নামে খ্যাত সেই যুদ্ধে শোচনীয় ও লজ্জাজনক পরাজয়ের খেসারত দিতে হয়েছিল সম্রাট ৪র্থ রোমানোসকে; বরং পুরো বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যকে। এখন সম্রাট ২য় জন কমনিনোস কি একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করবেন, না সাম্রাজ্যে ফিরে গিয়ে নিজেকে ও বাইজান্টাইন বাহিনীকে রক্ষা করবেন?!

৮. এতসব ভয়াবহ জটিলতা তৈরি হয়েছে কেবল এক ইমাদুদ্দিন জিনকির বাহিনীর কারণে। এখন যদি উরতুকি তুর্কমেন বাহিনীও চলে আসে, তাহলে অবস্থা কী দাঁড়াবে?! গুপ্তচরদের মাধ্যমে জানা গেছে, তাদের সৈন্যসংখ্যা পঞ্চাশ হাজার![৪৯১] নিঃসন্দেহে বাইজান্টাইন বাহিনী তখন আরও ভয়াবহ বিপদ ও বিপর্যয়ের মুখে পড়ে যাবে।

---

৪৯০. Guillaume de Tyr, p.324.

৪৯১. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৬৭।

৯. এ সংবাদও এসেছে যে, ইমাদুদ্দিন জিনকি ইতিমধ্যে বৃহৎ সেলজুক সাম্রাজ্যের শাসক সুলতান মাসউদের কাছে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেছেন।[৪৯২] উনসত্তর বছর পূর্বে মানজিকার্টের যুদ্ধে বাইজান্টাইন বাহিনীকে যিনি ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিলেন, সেই আলপ আরসালানের অধস্তন পুরুষ সুলতান মাসউদের নেতৃত্বে এখন যদি বাগদাদ থেকেও বিরাট বাহিনী এসে পৌঁছায়, তাহলে পরিস্থিতি কোথায় গড়াবে?!

১০. কোনো ধরনের সফলতা ছাড়াই বাইজান্টাইন সম্রাট যদি দেশে ফিরে যান, তাহলে নিশ্চিত করেই রাজপ্রাসাদে বহু তিরস্কার ও ভর্ৎসনা শুনতে হবে, যা এমনকি তার পদ নিয়েও টান দিতে পারে! কিন্তু এখন তার সামনে কিছু অর্জনের সুযোগ আছে। যুদ্ধব্যয়ের ক্ষতিপূরণ হিসেবে শাইজারের আমির যে মোটা অঙ্কের অর্থ প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছেন, তিনি তা গ্রহণ করতে পারেন। পাশাপাশি তিনি বিজায়া ও কাফারতাবে একটি করে প্রতিরক্ষা বাহিনী রেখে গিয়ে নগরীদুটিকে শাম অঞ্চলে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ঘাঁটি বানাতে পারেন। আর ফেরার পথে তিনি যদি দ্রুত আদানায় ছুটে যান, তাহলে হয়তো রোমান সেলজুক ও দানিশমান্দ বাহিনীর হাত থেকে নগরীটি রক্ষা করতে পারবেন। বাহিনীদুটিকে পরাজিত করে তিনি হয়তো কিলিকিয়া অঞ্চলে আরও কিছু এলাকা জয় করতে পারবেন এবং নিজের অর্জনের পাল্লা কিছু হলেও ভারী করতে পারবেন। এভাবে শাম অঞ্চলের ব্যর্থ অভিযানের ক্ষতি কিছুটা হলেও ঘোচানো যাবে!

সম্রাটের মস্তিষ্কে ঘুরপাক খেতে থাকা এই দশটি চিন্তা সামনে আসার পর আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারছি যে, যৌক্তিক বিশ্লেষণ ও সুস্থ চিন্তার দাবি এটাই ছিল যে, বাইজান্টাইন সম্রাট শাইজারের আমিরের প্রস্তাব মেনে নিয়ে তল্পিতল্পা গুটিয়ে শাইজার ছেড়ে যাবেন। আর তার এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত সবকিছু হারাবার পূর্বেই এবং এমন সময় আসার পূর্বেই, যখন হয়তো এই প্রস্তাবও তার সামনে থাকবে না।

বাইজান্টাইন সম্রাট যৌক্তিক বিশ্লেষণ ও সুস্থ চিন্তার দাবিই মেনে নেন!

---

৪৯২. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩০৩।

অবরোধের তেইশ দিন গত হওয়ার পর বাইজান্টাইন সম্রাট ও তার মিত্রগণ শাইজার ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ঘোষণা করে।[৬৯৩]

বাইজান্টাইন সম্রাটের এ ঘোষণা ছিল স্পষ্টতই মুসলিম বাহিনীর অটল মনোবল দমাতে না পারার ব্যর্থতার স্বীকৃতি!

এ ঘোষণা ছিল মুসলমানদের শাশ্বত বিজয়ের স্বীকৃতি!

সুবিশাল ক্রুসেডার-বাইজান্টাইন মিত্রবাহিনী শাইজার ত্যাগ করে মুসলমানদের জ্বলন্ত উনুনের উত্তাপ থেকে আত্মরক্ষা করতে!

তারা প্রস্থান করে কোনো দিকে না তাকিয়ে! লাঞ্ছিত-অপদস্থ হয়ে! নিজেদের অবস্থান, প্রভাব, ইতিহাস এমনকি ভবিষ্যৎ বিস্মৃত হয়ে!

নিঃসন্দেহে সেই দিনটি ছিল ইসলামি ইতিহাসের এক ঐতিহাসিক দিন! আল্লাহর দ্বীনের পতাকা সমুন্নত হওয়ার দিন। সমগ্র পৃথিবী শুনেছে সে দিনের ইতিহাস; মুসলিম-খ্রিষ্টান নির্বিশেষে সকলের মুখেমুখে আলোচিত হয়েছে সে দিনের বিবরণ। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের তাবৎ ঐতিহাসিক দিনটিকে সর্বময় গুরুত্বের দৃষ্টিতে দেখেছে; প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সকলের মেধায়-মস্তিষ্কে দিনটি রয়ে গেছে খোদাইকৃত শিলালিপির মতো অটুট-অক্ষত।

৫৩২ হিজরি সনের রমজান মাসে (১১৩৮ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে) খ্রিষ্টান বাহিনী শাইজার ত্যাগ করে। অর্থাৎ ত্রিপোলি ও বাইতুল মুকাদ্দাসের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে বারিনের যুদ্ধে ইমাদুদ্দিন জিনকির বিজয়ের এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে এ ঘটনা ঘটে। এর মধ্য দিয়ে ইমাদুদ্দিন জিনকি বিনা তর্কে সমকালীন শ্রেষ্ঠতম মুসলিম বীর হিসেবে স্বীকৃত হয়ে ওঠেন। কেউ যদি মন থেকে বিষয়টি মেনে না-ও নেয়, অন্তত মুখে কারও পক্ষে এই বাস্তবতা অস্বীকার করার কোনো উপায় ছিল না। 'জিনকি রাষ্ট্র' শব্দটি সবার কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কারণ, জিনকি রাষ্ট্রই তখন নির্বিবাদে মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র।

এদিকে আমাদের প্রিয় বীরযোদ্ধা ইমাদুদ্দিন জিনকি কিন্তু খ্রিষ্টান বাহিনীর লাঞ্ছনাকর প্রস্থানেই তুষ্ট হয়ে বসে থাকেননি। তিনি অনতিবিলম্বে নতুন

---

৬৯৩. উসামা বিন মুনকিয, *আল-ই'তিবার*, পৃষ্ঠা : ১১৩, ১১৪, ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ২৬৬ ও ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৬৮।

কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেন, যেন সবাই বুঝতে পারে যে, ক্রুসেডার-বাইজান্টাইন মিত্রবাহিনী চলে যাওয়ায় তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেননি; শত্রুপক্ষেরই বরং এই ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করা উচিত যে, তারা প্রাণ হাতে নিয়ে মুসলমানদের নাগাল থেকে বের হতে পেরেছে!

ইমাদুদ্দিন জিনকির দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ

আমাদের মহান বীর ইমাদুদ্দিন জিনকি কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন?

১. তিনি তার বাহিনী নিয়ে দ্রুত বাইজান্টাইন বাহিনীকে ধাওয়া করতে ছুটে যান। তিনি বাইজান্টাইন বাহিনীর পেছনের অংশের নাগাল পেয়ে যান। তাদের সঙ্গে লড়াই হলে মুসলমানরা তাদের বেশ কিছু সৈন্যকে হত্যা করে, বন্দিও করে অনেককে। এ সময় মুসলমানরা প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করে।[৪৯৪] ইমাদুদ্দিন জিনকির তাড়া খেয়ে বাইজান্টাইনরা ত্রস্তপদে নিজেদের দেশে পালাতে থাকে।

২. বাইজান্টাইন বাহিনী আলেপ্পো অবরোধে যেসব ভারী ভারী অবরোধসামগ্রী ব্যবহার করেছিল, ইমাদুদ্দিন জিনকি সেগুলো দখলে নেওয়ার জন্য দ্রুত অগ্রসর হন। এসব অবরোধসামগ্রী তৈরিতে প্রচুর সময় ও অর্থ ব্যয় হয়েছিল। তিনি অধিকাংশ অবরোধসামগ্রীই হস্তগত করতে সক্ষম হন। এসব ভারী সামগ্রী নিয়ে দ্রুত চলা সম্ভব ছিল না বিধায় বাইজান্টাইনরা বাকি সামগ্রীগুলো পুড়িয়ে ফেলে। নিঃসন্দেহে এগুলো ছিল অনেক মূল্যবান যুদ্ধলব্ধ সম্পদ।[৪৯৫]

৩. ইমাদুদ্দিন জিনকি তার সহকারী সালাহুদ্দিন মুহাম্মাদ ইয়াগিসিয়ানির নেতৃত্বে একটি বাহিনী কাফারতাব থেকে বাইজান্টাইন প্রতিরক্ষা বাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে নগরীটি পুনরুদ্ধার করার জন্য প্রেরণ করেন। বাইজান্টাইন বাহিনী যে মাসে প্রস্থান করে, সে মাসেই অর্থাৎ ৫৩২ হিজরি সনের রমজান মাসে সালাহুদ্দিন মুহাম্মাদ নগরটি পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন।[৪৯৬]

---

৪৯৪. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩০৩ ও ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৬৮।

৪৯৫. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৬৮।

৪৯৬. প্রাগুক্ত, ২/২৬৮।

৪. ইমাদুদ্দিন এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ করেন। তিনি এই মহান বিজয়ের রেশ বাকি থাকতেই হঠাৎ ত্রিপোলি রাজ্যের অধীনস্থ ইরকা দুর্গ অভিমুখে যাত্রা করেন। দীর্ঘ অবরোধ ও অব্যাহত গোলাবর্ষণের পর তিনি দুর্গটি অধিকার করেন এবং সেখানে থাকা ক্রুসেড সেনাদের বন্দি করেন।[৪৯৭] এ অভিযান ছিল ইমাদুদ্দিন জিনকির তুখোড় সামরিক মেধার অনুপম দলিল। কারণ, স্বাভাবিক প্রত্যাশা ছিল, তিনি অভিযান চালাবেন এডেসা ও এন্টিয়কে, বাইজান্টাইন বাহিনীকে সহায়তা করার প্রতিশোধ হিসেবে। কিন্তু তিনি অভিযান চালান ত্রিপোলি রাজ্যে; যারা এমন অতর্কিত আক্রমণের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না।

৫. ইমাদুদ্দিন জিনকি উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধকরণের গুরুদায়িত্বও ভুলে যাননি। ৫৩২ হিজরি সনের রমজান মাসে বাইজান্টাইন বাহিনীর প্রস্থানের পরই তিনি দ্রুত পতন ঘটানোর আশায় পুনরায় হিমস অবরোধ করেন। ইমাদুদ্দিন জিনকি তার সারা জীবনে কখনোই বিশ্রাম খোঁজেননি। এমনকি শাইজার নগরপ্রাচীরের কাছে এত পরিশ্রমের পরও সামান্য অবসর না নিয়ে তিনি পুনরায় অবতীর্ণ হন উম্মাহর কল্যাণের ময়দানে।

কিন্তু এবারের হিমস অবরোধকালে ইমাদুদ্দিন জিনকি ভিন্ন এক পন্থা অবলম্বনের চিন্তা করেন। এতে সামান্য পরিশ্রমেই কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন করা যাবে; পাশাপাশি ভবিষ্যতেও বহু নগরী জিনকি রাজ্যভুক্ত করার পথ খুলে যাবে। তিনি দামেশকের অধিপতি শিহাবুদ্দিন মাহমুদ বিন বুরির ঘনিষ্ঠতা অর্জনের লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ 'রাজনৈতিক বিয়ে' সম্পাদনের পরিকল্পনা করেন। ইমাদুদ্দিন বিনিময় হিসেবে হিমস নগরীর কর্তৃত্ব দাবি করে শিহাবুদ্দিন মাহমুদ বিন বুরির মা সাফওয়াতুল মালিক যামরাদ খাতুনকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান!

কারও কৌতূহল হতে পারে, বিয়ের বিনিময়ে কিছু না দিয়ে তিনি উল্টো কীভাবে হিমস নগরীর কর্তৃত্ব দাবি করতে পারেন?!

উত্তর হলো, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি বিয়ের পর স্ত্রীকে মোহর ও বিভিন্ন মূল্যবান উপহারসামগ্রী প্রদান করেছিলেন। তবে তিনি হিমসের

---

৪৯৭. ইবনে ওয়াসিল, *মুফাররিজুল কুরুব*, ১/৮৪।

কর্তৃত্ব দাবি করেছিলেন সেই মহা গৌরবের বিনিময়ে, যা তার স্ত্রী সে যুগের মহাবীর ইমাদুদ্দিন জিনকির সঙ্গে বিয়ে হওয়ার মাধ্যমে লাভ করেছিলেন!

ইমাদুদ্দিন জিনকি তখন মুসলিম বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাজ্য শাসন করছেন। তিনি সেই দুঃসাহসী বীর, ক্রুসেডার ও বাইজান্টাইনের বিরুদ্ধে যার রয়েছে ধারাবাহিক বিজয়-গৌরব। এমন ব্যক্তির সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক করতে পারা নিঃসন্দেহে অতি মর্যাদা ও গৌরবের বিষয়।

ইমাদুদ্দিন জিনকির প্রত্যাশা পূরণ হয়। শিহাবুদ্দিন মাহমুদ এ প্রস্তাবে সম্মতি জানান। সে মাসেই অর্থাৎ ৫৩২ হিজরি সনের রমজান মাসে বিয়ে সম্পন্ন হয়[৪৯৮] এবং হিমস ইমাদুদ্দিন জিনকির রাজ্যভুক্ত হয়ে যায়।

সৌভাগ্য ও কল্যাণে সমৃদ্ধ একটি বছর

এ সময়ের আলোচনায় সমাপ্তি টানার আগে আমরা আরেকটি বিষয় জানব। আর তা হলো ইমাদুদ্দিন জিনকি কর্তৃক কাজি কামালুদ্দিন শাহরাযুরির নেতৃত্বে বাগদাদে সুলতান মাসউদের কাছে প্রেরিত প্রতিনিধিদলের প্রচেষ্টার পরিণতি!

কামালুদ্দিন শাহরাযুরি দ্রুত বাগদাদে পৌঁছে সুলতান মাসউদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সুলতান শাম অঞ্চলের মুসলমানদের সহায়তায় শিথিলতা করলে তার পরিণতি কী হতে পারে, তিনি তাকে তা বোঝাতে চেষ্টা করেন এবং একে কেন্দ্র করে যে তার রাজত্বও শেষ হয়ে যেতে পারে, এ বিষয়ে তাকে সতর্ক করেন। তিনি সুলতানকে বলেন, 'বাইজান্টাইনরা আলেপ্পো দখল করতে পারলে ফুরাত নদী পাড়ি দিয়ে বাগদাদে পৌঁছে যাবে এবং খিলাফতের রাজধানী বাগদাদও দখল করে নেবে!'

সুলতান মাসউদের প্রতিক্রিয়া কী ছিল?!

ঐতিহাসিক ইবনুল আছির রহ. বলেন, 'কাজি কামালুদ্দিন তার মাঝে কোনো স্পন্দনই দেখতে পেলেন না!'

অর্থাৎ সুলতান বিষয়টিকে একেবারে শীতলভাবে গ্রহণ করেন। মনে হচ্ছিল, তিনি যেন এক নিষ্প্রাণ জড়বস্তু; তার মাঝে কোনো প্রাণ ও

---

৪৯৮. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৬৯।

প্রাণশক্তিই অবশিষ্ট নেই! তাই তার কোনো প্রতিক্রিয়াও নেই, কোনো আচরণগত বহিঃপ্রকাশও নেই। তার কাছে বিষয়টির যেন কোনো গুরুত্বই নেই!

কাজি কামালুদ্দিন শাহরাযুরি ব্যর্থ মনোরথে সুলতান মাসউদের দরবার থেকে বের হয়ে আসেন। তিনি এরপর সুলতানের বোধ ও আত্মমর্যাদা জাগিয়ে তুলতে তার ওপর চাপ প্রয়োগের পরিকল্পনা করেন। কাজি কামালুদ্দিন তার এক সঙ্গীকে বলেন, তুমি আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে খলিফার প্রাসাদের নিকটবর্তী মসজিদে যাবে। খতিব সাহেব মিম্বরে আরোহণ করতেই তোমরা সকলে একযোগে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে থাকবে, 'হায়! ইসলামের কী হবে! হায়! দ্বীনে মুহাম্মাদির কী হবে!' এ সময় তোমরা পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়ে ফেলবে, মাথার পাগড়ি খুলে ছুড়ে মারবে। এরপর মাতম করতে করতে সুলতানের বাসভবনের দিকে অগ্রসর হবে।

কাজি কামালুদ্দিন তার আরেক সঙ্গীকে একই নির্দেশনা দিয়ে সুলতানের মসজিদে প্রেরণ করেন।

উদ্দেশ্য ছিল বাগদাদে গণবিক্ষোভ তৈরির মাধ্যমে সুলতানের ওপর চাপ সৃষ্টি করা। বিক্ষোভ এমন পর্যায়ের হতে হবে, যেন সুলতান বিদ্রোহের আশঙ্কা করেন এবং প্রভাবিত হন। তা ছাড়া তখনও সালতানাতের মসনদ নিয়ে ভ্রাতুষ্পুত্র দাউদ বিন মাহমুদের সঙ্গে সুলতানের পুরোনো বিরোধ জিইয়ে ছিল। জনগণের বিক্ষোভ দেখে সুলতান নিশ্চয়ই আশঙ্কা করবেন যে, দাউদ ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করে সাধারণ জনতাকে ক্রুসেডবিরোধী জিহাদের জন্য প্রস্তুত করবেন। নিশ্চয়ই এ চিন্তা সুলতান মাসউদকে বিরাট ঝামেলায় ফেলে দেবে।

কামালুদ্দিনের পরিকল্পনা সফল হয়। বিক্ষুব্ধ জনতা চিৎকার করে বলতে থাকে, 'হায় ইসলামের কী হবে! মুহাম্মাদের দ্বীনের কী হবে!' প্রাসাদের সামনে বিপুল সংখ্যক জনতাকে দেখে সুলতান ভয় পেয়ে যান। তিনি তৎক্ষণাৎ নির্দেশ দেন, 'ইবনে শাহরাযুরিকে আমার সামনে হাজির করো।' কামালুদ্দিন শাহরাযুরিকে উপস্থিত করা হলে সুলতান তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'এ কোন ফিতনা শুরু করলে?!' কামালুদ্দিন নির্বিকার চিত্তে উত্তর দেন, 'আমি কিছু করিনি, আমি তো আমার ঘরেই ছিলাম।

জনগণই দ্বীন ও ইসলামের কল্যাণ চিন্তায় বিক্ষোভ শুরু করেছে; তারা এই শিথিলতার পরিণতি নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে।' এরপর সুলতান নিরুপায় হয়ে বলেন, 'যাও, জনগণকে বুঝিয়ে এখান থেকে সরাও। আর আগামীকাল এসে যত সৈন্য চাও, নিয়ে যেয়ো।'

কামালুদ্দিন বাইরে এসে উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করেন এবং তাদেরকে জানান যে, সুলতান শাম অঞ্চলের মুসলমানদের সহায়তায় শীঘ্রই বাহিনী প্রস্তুত করবেন। পরের দিন কামালুদ্দিন সুলতানের দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখতে পান, সুলতান ইতিমধ্যে বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করে ফেলেছেন! এমনকি বাহিনীর বিশালতা দেখে কামালুদ্দিন ভয় পেয়ে যান এবং আশঙ্কা করেন যে, সুলতান হয়তো ক্রুসেডার ও বাইজান্টাইন বাহিনীর মোকাবিলা করার পর শাম অঞ্চলকে নিজের রাজ্যভুক্ত করে নেবেন। যেহেতু ইমাদুদ্দিন জিনকি তখন অনেক দূরে শাম ভূমিতে অবস্থান করছেন, তাই কাজি কামালুদ্দিন দ্রুত মসুলের আমির নাসিরুদ্দিন জাকারের কাছে পরামর্শ চেয়ে বার্তা প্রেরণ করেন। ফিরতি বার্তায় নাসিরুদ্দিন বলেন, 'শাম ভূমি তো নিশ্চিত কারও না কারও দখলে যাবেই। সুতরাং কাফিরদের হাতে চলে যাওয়ার চেয়ে তা মুসলমানদের হাতে যাওয়াই শ্রেয়!'

চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে নাসিরুদ্দিন জাকার যেন তার নেতারই প্রতিচ্ছবি! ইমাদুদ্দিন জিনকি যখন সুলতান মাসউদকে শাম অঞ্চলে আহ্বানের মনস্থ করেছিলেন, তখন ঘনিষ্ঠজনদের আপত্তির জবাবে যে উত্তর প্রদান করেছিলেন, নাসিরুদ্দিনও ঠিক একই উত্তর দেন।

বাগদাদের বাহিনী প্রস্তুতি শেষে যখন যাত্রার উদ্যোগ নেয়, তখনই ইমাদুদ্দিন জিনকির পক্ষ থেকে একটি বার্তা এসে পৌঁছায়। বার্তায় তিনি কাজি কামালুদ্দিনকে বাইজান্টাইন সম্রাটের প্রস্থান ও মুসলিম বাহিনীর বিজয় সম্পর্কে অবহিত করেন। ফলে বাগদাদ থেকে আলেপ্পোতে বাহিনী প্রেরণের প্রয়োজনও ফুরিয়ে যায়![৪৯৯]

---

৪৯৯. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩০৩ ও *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ৬২-৬৩।

এভাবে আল্লাহর তাআলার অনুগ্রহে পরিস্থিতি ইমাদুদ্দিন জিনকির পক্ষে প্রবাহিত হয়। শেষ পর্যন্ত সুলতান মাসউদের বাহিনীর মুখোমুখি হতে হলে হয়তো তা আক্ষেপের কারণ হয়ে দাঁড়াত।

ইতিমধ্যে পরিস্থিতি অনেক বদলে গেছে। ইমাদুদ্দিন জিনকির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র-সর্বমহলে। সবাই এখন অকুণ্ঠচিত্তে তার গুণ-কীর্তি এবং চেষ্টা ও অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করে। মুসলমানদের মিম্বরে মিম্বরে তার কল্যাণ কামনায় দোয়া করা হয়। পরিবর্তিত নতুন পরিস্থিতিতে সুলতান মাসউদ চিন্তায় পড়ে যান যে, ইমাদুদ্দিন জিনকির সঙ্গে এখন তার কী আচরণ করা উচিত। তিনি চাইলেও এখন ইমাদুদ্দিন জিনকির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে পারবেন না, পারবেন না এমন কোনো নির্দেশ দিতে, যা তাকে ক্রুদ্ধ করবে। কারণ, বৃহত্তর মুসলিম সমাজ তখন নিঃসন্দেহে ইমাদুদ্দিন জিনকির পক্ষে দাঁড়াবে। সবদিক বিবেচনা করে তিনি ইমাদুদ্দিন জিনকিকে নিজের পক্ষে আনার এবং তার সঙ্গে একজন প্রভাবশালী সেনাপতির ন্যায় আচরণ করার পরিকল্পনা করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ইমাদুদ্দিন জিনকির কাছে রাজকীয় সম্মানসূচক পরিচ্ছদ ও অন্যান্য মূল্যবান উপহার প্রেরণ করেন এবং মুসলমানদের পক্ষে এত বড় বিজয় ও সাফল্য অর্জন করায় তাকে মোবারকবাদ জানান। সুলতান তার আচরণে বোঝাতে চাচ্ছিলেন যে, তিনি ইমাদুদ্দিন জিনকিকে সেলজুক সাম্রাজ্য হতে বিচ্ছিন্ন স্বাধীন কোনো রাজ্যের শাসক মনে করছেন না; বরং তার অধীনস্থ একজন প্রশাসক মনে করছেন। ইমাদুদ্দিন জিনকি তার এ আচরণ মেনে নেন। কারণ, তিনি তো কোনো অর্থহীন সংঘাতে জড়াতে চান না। তিনি চান মুসলমানদের ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামি ভূখণ্ড থেকে ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করার লক্ষ্যে নিজের সমস্ত চিন্তা ও চেষ্টা ব্যয় করতে।[৫০০]

এভাবে মুসলমানদের জন্য একের পর এক সৌভাগ্য ও কল্যাণের বার্তা বয়ে এনে ৫৩২ হিজরি সনের সমাপ্তি ঘটে। মুসলমানরা এত দিনে চিনতে পেরেছে ঐক্য ও জিহাদের পথ; জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি

---

৫০০. হাসান ইবরাহিম হাসান, *তারীখুস-সিয়াসি ওয়াদ-দীনি ওয়াস-সাক্বাফি ওয়াল ইজতিমায়ি*, ৪/৭৫।

এখন স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন; সবার হৃদয়ে এখন ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করার আশা-প্রত্যাশা।

চলমান সময়ের ইতিহাসের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এই বছরটির আলোচনার ইতি টানার আগে সে বছরেরই এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করছি, যা মোটেও তৎকালীন জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি; অথচ পরবর্তী সময়ে তা কেবল মুসলিম সমাজে নয়; বরং পুরো বিশ্বের ওপর বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। এই ৫৩২ হিজরি সনেই জন্মগ্রহণ করেন ইসলামি ইতিহাসের অন্যতম বীরপুরুষ সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি! আল্লাহর কী মহিমা! সালাহুদ্দিন আইয়ুবি যেদিন জন্মগ্রহণ করেন; সেদিনই তার পিতা নাজমুদ্দিন আইয়ুব বাগদাদের পুলিশ বিভাগের প্রধান মুজাহিদুদ্দিন বাহরুযের সঙ্গে বিরোধের সূত্র ধরে তিকরিত দুর্গের প্রশাসক পদ থেকে অপসারিত হন। নাজমুদ্দিন আইয়ুব তার পদচ্যুতির দিন জন্মগ্রহণকারী এই সন্তানকে বাহ্যত অশুভ মনে করেছিলেন![৫০১] তিনি বুঝতেই পারেননি, এই সন্তানের জীবনেই একদিন দ্বীন ও দুনিয়ার সমূহ কল্যাণের সন্নিবেশ ঘটবে!

এরপর নাজমুদ্দিন আইয়ুব ও তার ভাই আসাদুদ্দিন শিরকুহ তিকরিত থেকে মসুলে চলে আসেন এবং মহান বীর ইমাদুদ্দিন জিনকির অধীনে কাজ করতে থাকেন। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, ৫২৬ হিজরি সনে ইমাদুদ্দিন জিনকি যখন খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহর কাছে পরাজিত হয়ে মসুলে ফিরছিলেন, তখন এই নাজমুদ্দিন আইয়ুব তাকে দজলা পাড়ি দিতে সহায়তা করেছিলেন এবং তাকে কয়েকদিন নিজ দুর্গে আশ্রয় দিয়ে সেবা-শুশ্রূষা করেছিলেন। এবার যখন নাজমুদ্দিন আইয়ুব তিকরিত দুর্গ থেকে বিতাড়িত হন, তখন তিনি এই দুর্যোগের সময় সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় ইমাদুদ্দিন জিনকির কাছে আশ্রয় গ্রহণের চিন্তা করেন। ইমাদুদ্দিন জিনকি নাজমুদ্দিন আইয়ুবের প্রতি সুধারণা পোষণ করতেন। তিনি নাজমুদ্দিন আইয়ুবকে সাদরে স্বাগত জানান এবং তার নেতৃত্ব-দক্ষতা যাচাই করতে তাকে কিছু জায়গিরের তত্ত্বাবধান-দায়িত্ব প্রদান করেন। ইমাদুদ্দিন জিনকির পরিকল্পনা ছিল নাজমুদ্দিনের দক্ষতা প্রমাণিত হলে তিনি তাকে সুউচ্চ কোনো পদে অধিষ্ঠিত করবেন। এভাবেই ইমাদুদ্দিন

৫০১. ইবনে খাল্লিকান, *ওফায়াতুল আ'য়ান*, ৭/১৪৪-১৪৫।

জিনকি ও নাজমুদ্দিন আইয়ুবের মধ্যে মজবুত সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং পরবর্তীকালে এ সূত্র ধরেই ইমাদুদ্দিন জিনকির পুত্র নুরুদ্দিন মাহমুদ ও নাজমুদ্দিন আইয়ুবের পুত্র সালাহুদ্দিন আইয়ুবির মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কত মহিমাময় সেই মহান সত্তা, যিনি এভাবেই আপন প্রজ্ঞায় জগৎ-সংসার পরিচালনা করেন!

* * *

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ইমাদুদ্দিন জিনকি ও ক্রুসেড রাজ্য এডেসা বিজয়

ইতিপূর্বে অর্জিত বিজয়গুলো যদিও অত্যন্ত মহান ছিল এবং ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সংঘাতপ্রবাহে মুসলমানদের সুস্পষ্ট প্রাধান্য পরিলক্ষিত হচ্ছিল; কিন্তু তারপরও চলমান ইসলামি অগ্রযাত্রায় সুস্পষ্ট দুটি ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছিল। অবশ্য ত্রুটিদুটি ইমাদুদ্দিন জিনকিরও অজানা ছিল না।

প্রথম ত্রুটি হলো, তখনও পর্যন্ত ইসলামি অভিযানসমূহ মৌলিকভাবে প্রতিক্রিয়ামূলক ছিল। অর্থাৎ অধিকাংশ সময় ক্রুসেডার বা বাইজান্টাইনদের পক্ষ থেকে আক্রমণ হতো; এরপর ইমাদদ্দিন জিনকি রহ. দ্রুত উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া দেখাতেন। যদিও ইমাদুদ্দিন রহ.-এর প্রতিক্রিয়া সর্বদা শক্তিশালী হতো; তবে এটি মোটেও নিরাপদ কৌশল ছিল না। কারণ, যুদ্ধের স্বাভাবিক প্রকৃতি হলো আক্রমণকারী বাহিনী প্রতিপক্ষকে অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে ফেলতে পারে এবং নিজেদের সুবিধামতো যুদ্ধের স্থান ও সময় নির্বাচন করতে পারে। এ কারণে অনেক সময়ই মুসলমানরা এমন অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতো, যার মোকাবিলায় উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া দেখানো সম্ভব হতো না। ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ. এই ত্রুটিটি দূর করার এবং নিজেরাই অগ্রসর হয়ে যুদ্ধপরিকল্পনা প্রণয়ন ও হামলা চালানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ক্রুসেডারদের উপর্যুপরি আক্রমণের কারণে তার এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছিল।

দ্বিতীয় ত্রুটি হলো, মুসলিম বাহিনী সুনির্দিষ্ট কোনো ক্রুসেড রাজ্যকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে আক্রমণ চালানোর পরিবর্তে সবগুলো ক্রুসেড রাজ্যের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। যদিও এর ফলে প্রতিটি ক্রুসেড রাজ্যকেই সতর্কাবস্থায় থাকতে হতো; কিন্তু একই সঙ্গে মুসলিম বাহিনীর প্রচেষ্টা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ত, তুলনামূলক অধিক শক্তিক্ষয় হতো; অথচ দু-একটি

দুর্গ বা নগরীর পতন ঘটানো ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো সফলতা অর্জিত হতো না এবং চলমান ঘটনাপ্রবাহে বড় ধরনের কোনো প্রভাবও পড়ত না। বিপরীতে আক্রান্ত ক্রুসেড রাজ্যগুলো পতন পরিস্থিতির মোকাবিলা করে দৃঢ়তার সঙ্গে টিকে থাকতে পারত।

ইমাদুদ্দিন জিনকি ত্রুটিদুটি দূর করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়কাল ব্যয় করার পরিকল্পনা করেন। তিনি এ সময়ে একটি মজবুত ও সুবিন্যস্ত বাহিনী প্রস্তুতকরণ, জিনকি রাজ্যকে আরও শক্তিশালী কাঠামোতে ঐক্যবদ্ধকরণ এবং ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনায় সহায়ক বিভিন্ন অঞ্চলকে জিনকি রাজ্যে যুক্তকরণের পেছনে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালানোর মনস্থ করেন। জিনকি রাজ্য তখন যে স্তর অতিক্রম করছিল, ইমাদুদ্দিন জিনকির এই পরিকল্পনা ছিল তার সঙ্গে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ। কারণ, ইতিমধ্যে তিনি প্রতিপক্ষের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে চলমান ঘটনাপ্রবাহ থেকে দৃঢ়ভাবে বেরিয়ে এসেছেন। স্পষ্টতই অনুমিত হচ্ছিল যে, ক্রুসেড রাজ্যগুলো তার রাজ্যে হামলা চালানোর বা তাকে উত্তেজিত করার দুঃসাহস দেখাবে না। ওদিকে সুলতান মাসউদের দিক থেকেও পরিস্থিতি অনেকটা শান্ত ও নিরাপদ ছিল। সুলতান ইতিমধ্যে ইমাদুদ্দিনের কাছে সম্মানসূচক বিভিন্ন উপহারসামগ্রী প্রেরণ করেছেন এবং ইসলামি ভূখণ্ডের সুবিস্তৃত অংশে ইমাদুদ্দিনের রাজত্ব ও নেতৃত্বের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।

এ পর্যায়ে এসে ইমাদুদ্দিন জিনকির কর্তব্য ছিল—তিনি সবার আগে কোন ক্রুসেড রাজ্যটির পুরোপুরি পতন ঘটানোর লক্ষ্যে তার কর্মপ্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করবেন, তা নির্দিষ্ট করা, এরপর লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু করা; যদিও তাতে কয়েক বছর লেগে যায়।

এডেসা বিজয়ের অনুপ্রাণিকাসমূহ

সে সময় ক্রুসেড রাজ্যগুলো যে পরিস্থিতিতে উপনীত হয়েছিল, তার প্রতি লক্ষ করে ইমাদুদ্দিন জিনকি অনুভব করেন যে, অন্য রাজ্যগুলো বাদ দিয়ে এডেসা রাজ্যের পতন ঘটানোর পেছনেই জোরদার প্রচেষ্টা চালানো উচিত।

বাকি তিন রাজ্যের পরিবর্তে এডেসাকে বেছে নেওয়ার পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ নিহিত ছিল। যথা—

১. এডেসা ছিল ইমাদুদ্দিন জিনকির বাহিনীর সবচেয়ে নিকটবর্তী ক্রুসেড রাজ্য। ফলে সেদিকে অগ্রসর হওয়া মুসলিম বাহিনীর জন্য সহজ ছিল। আল্লাহ না করুন, মুসলিম বাহিনী যদি এডেসায় অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে পরাজিতও হয়, তারা আশ্রয় গ্রহণের উপযুক্ত অনেক দুর্গ ও নগরী আশেপাশেই পাবে। অর্থাৎ অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এডেসা রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর প্রতিরক্ষাব্যবস্থা অধিক উন্নত ছিল।

২. এডেসা ছিল জিনকি রাজ্যের সবচেয়ে বড় হুমকি। কারণ, ক্রুসেড রাজ্যটির অবস্থান ছিল মসুল, আলেপ্পো ও জাযিরা অঞ্চলের সকল নগরীর সন্নিকটে। এ কারণেই এডেসা রাজ্যের বিভিন্ন বাহিনী দুর্গ থেকে বের হলে ইসলামি নগরী ও জনপদগুলোর নিরাপত্তা অনেকটা হুমকির মুখে পড়ে যেত। তা ছাড়া ইমাদুদ্দিন জিনকি এই সুরক্ষিত ক্রুসেড রাজ্যটিকে পেছনে রেখে এন্টিয়ক বা ত্রিপোলি অভিমুখে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হতেও পারবেন না। কারণ, সেক্ষেত্রে তার পেছনের পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার বা পৃষ্ঠদেশ আক্রান্ত হওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। উভয় সম্ভাবনাই ছিল মুসলিম বাহিনীর জন্য অতি ঝুঁকিপূর্ণ।

৩. এডেসা রাজ্যের পরিস্থিতি শান্ত-সুশৃঙ্খল ছিল না। যৌগিক জনবিন্যাসই রাজ্যটিকে অস্থিতিশীল করে রেখেছিল। এডেসার অতীত ইতিহাসও ছিল অস্থিরতাপূর্ণ। রাজ্যটি জীবনের বিভিন্ন অঙ্গনে আর্মেনীয়দের ওপর নির্ভর করত। আর্মেনীয়রা যদিও ক্রুসেডারদের মতোই খ্রিষ্টান ছিল; কিন্তু তারা ক্রুসেডারদের প্রচণ্ড ঘৃণা করত। কারণ, ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে তারা একাধিকবার ক্যাথলিক ক্রুসেডারদের হাতে গণহত্যার শিকার হয়েছিল। ফলে আর্মেনীয়দের অন্তরে ক্রুসেডারদের প্রতি মজবুত শঙ্কা ও বিদ্বেষ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের ইতিহাসে একাধিকবার তারা মুসলমানদের সঙ্গে পত্রবিনিময় করে তাদেরকে ক্রুসেডারদের দুঃশাসন থেকে উদ্ধার করার আবেদন জানিয়েছে। আর তাই এডেসা রাজ্যের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ছিল ইমাদুদ্দিন জিনকির পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়ক।

৪. তখন এডেসা রাজ্যের নেতৃত্বে ছিলেন ২য় জোসেলিন। তৎকালীন ক্রুসেডার নেতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে দুর্বল। পিতার মতো

অত্যুচ্চ সামরিক যোগ্যতা তার ছিল না। তিনি পারতপক্ষে যুদ্ধ-বিগ্রহ এড়িয়ে চলতেন। আর তাই অন্যান্য রাজ্যের পরিবর্তে তার রাজ্যে অভিযান পরিচালনা সহজতর হবে বলে মনে হচ্ছিল।[৫০২]

৫. এডেসা রাজ্য ছিল তুলনামূলক অভ্যন্তরীণ অঞ্চল। অর্থাৎ রাজ্যটির অবস্থান ছিল ভূমধ্যসাগরের তীর থেকে বেশ দূরে ও ভেতরে। এ কারণেই এন্টিয়ক, ত্রিপোলি ও বাইতুল মুকাদ্দাসের মতো উপকূলীয় রাজ্যগুলো মাঝেমধ্যেই যেমন ইতালিয়ান নৌবহরগুলোর সহায়তা লাভ করত, এডেসার ভাগ্যে তা জুটত না।

৬. যেহেতু এডেসা রাজ্য ছিল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সীমানা হতে অনেক দূরে অবস্থিত, তাই এডেসায় আক্রমণ করা হলে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের উত্তেজিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তা ছাড়া এডেসা রাজ্যের প্রতি বাইজান্টাইনদের তেমন আগ্রহও ছিল না। বিপরীতে ইমাদুদ্দিন জিনকি যদি এন্টিয়ক রাজ্যকে লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করেন, নিশ্চিত করেই তা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যকে আলোড়িত করবে। কারণ, তারা মনে করে, এন্টিয়কের ওপর তাদের বিশেষ অধিকার রয়েছে।

এসব কারণে মুসলমানদের জন্য অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এডেসা রাজ্যের পতন ঘটানোর সুযোগ বেশি ছিল। আর এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন ছিল নিবিড় ও জোরদার প্রচেষ্টা। অভিযানকে নিখুঁত ও লক্ষ্যভেদী করে তোলার প্রস্তুতির কারণে কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হলেও কোনো সমস্যা নেই। এতে বরং সফলতার সম্ভাবনা আরও বৃদ্ধি পাবে।

নিঃসন্দেহে এ অপেক্ষার অর্থ সময়টুকু কর্মহীন বেকার কাটিয়ে দেওয়া নয়। বরং এ সময়টুকু মূলত ব্যয় হবে অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণের পেছনে। যেহেতু প্রস্তুতির চূড়ান্ত লক্ষ্য ও লক্ষ্যবস্তু সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিত, তাই এ সময়ের যাবতীয় পদক্ষেপ একটি সুনির্দিষ্ট স্বার্থকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবে।

---

৫০২. Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 307.

ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ. এ সময় দুটি মৌলিক পদক্ষেপ সামনে রেখে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন।

[এক] জাযিরা অঞ্চলকে এডেসা রাজ্যে অভিযান পরিচালনার সহায়ক ক্ষেত্ররূপে প্রস্তুত করা

জাযিরা অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ তুর্কমেন নাগরিক বসবাস করত। অঞ্চলটির পরিস্থিতি ছিল অস্থিতিশীল। ইমাদুদ্দিন জিনকি যদিও এ অঞ্চলের শক্তিশালী নেতা হুসামুদ্দিন তামারতাশের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা বিনিময়ের সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন; কিন্তু এ সম্পর্ক ছিল একেবারেই দুর্বল। এ সম্পর্কের ভিত্তি কেবল এই ছিল যে, হুসামুদ্দিন ইমাদুদ্দিনের শক্তিকে ভয় পেতেন কিংবা তার দানদক্ষিণা লাভের আশা করতেন। আর এ জাতীয় শঙ্কা ও লালসা-নির্ভর মিত্রতা সাধারণত স্বার্থের সংঘাত হলেই ভেঙে পড়ে। জাযিরা অঞ্চলের আরেক প্রভাবশালী নেতা রুকনুদ্দৌলা দাউদ যদিও খ্রিষ্টান বাহিনীর শাইজার অবরোধের সময় পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের বাহিনী নিয়ে আগমনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত অনমনীয় ও একগুঁয়ে প্রকৃতির লোক। ইতিপূর্বে তিনি কয়েকবার ইমাদুদ্দিন জিনকির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। এ অঞ্চলে তার প্রচুর সহযোগী ও অনুসারীও আছে। আর তাই মোটেও অসম্ভব নয় যে, ভবিষ্যতেও তিনি বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করবেন।

ইমাদুদ্দিন জিনকির দিক থেকে বিবেচনা করলে তিনি জাযিরার পরিস্থিতি অস্থিতিশীল রেখে এডেসা জয়ের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতে সক্ষম ছিলেন না। কারণ, এডেসা অভিমুখে অগ্রসর হতে হলে তাকে অবশ্যই জাযিরা অঞ্চল পাড়ি দিতে হবে। আবার ক্রুসেডাররা কোনোভাবে তাকে চাপে ফেলে দিলে তখন তার অবশ্যই জাযিরা অঞ্চলে এমন একটি শক্তিশালী ঘাঁটির প্রয়োজন হবে, যেখানে তিনি নিরাপদে আশ্রয় নিতে পারবেন। আর তাই এডেসা জয়ের জন্য জাযিরা অঞ্চলের স্থিতিশীলতা ছিল অপরিহার্য শর্ত।

[দুই] দামেশক নগরীকে রাজ্যভুক্ত করার প্রচেষ্টা

দামেশক ছিল পুরো শাম অঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নগরী, অতি সুরক্ষিত সামরিক দুর্গ, অন্যতম ঘন জনবসতিপূর্ণ নগরী এবং ধনসম্পদ ও সামরিক সম্পদে সমৃদ্ধতম নগরী। তা ছাড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অবস্থানের কারণে দামেশক থেকে এ অঞ্চলের অতি

গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন এলাকার ওপর নজর রাখা যেত। দামেশক ছিল বৈরুত, সিডন, আক্কা ও তাবারিয়াসহ অধিকৃত বিভিন্ন ইসলামি নগরীর অতি নিকটে অবস্থিত। ত্রিপোলি ক্রুসেড রাজ্যের অবস্থানও ছিল দামেশকের কাছে। দামেশকের অবস্থান ছিল বাইতুল মুকাদ্দাসের পথের পাশে। দামেশক থেকে দক্ষিণের বাইতুল মুকাদ্দাস এবং উত্তরের ত্রিপোলি, এন্টিয়ক ও এডেসা রাজ্যের মধ্যবর্তী সংযোগপথে নজর রাখা যেত। আর তাই ক্রুসেডারদের পরাভূত করতে এবং তাদেরকে ইসলামি ভূখণ্ড থেকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম বাস্তব শক্তি নির্মাণের লক্ষ্যে মজবুত ঐক্য বাস্তবায়নের পথে দামেশক নগরীকে জিনকি রাজ্যের অন্তর্ভুক্তকরণ অপরিহার্য পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছিল।

নুসায়বিন ষড়যন্ত্র

এ সময় ইমাদুদ্দিন জিনকি এ দুটি বিষয়কেই তার মূল কর্মব্যস্ততা হিসেবে গ্রহণ করেন এবং ইসলামি ভূখণ্ড থেকে বাইজান্টাইন বাহিনীর প্রস্থানের পরবর্তী পাঁচ বছর এ দুটি লক্ষ্য বাস্তবায়নে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করেন।

ইমাদুদ্দিন যেমন ধারণা করেছিলেন, হুসামুদ্দিন তামারতাশ বিভিন্ন সমস্যা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করেন। ইমাদুদ্দিনের বিভিন্ন দান-অনুদানেও হুসামুদ্দিন তুষ্ট ছিলেন না। তিনি অনুভব করছিলেন, এভাবে বিজয়ধারা অব্যাহত রাখলে ইমাদুদ্দিন জিনকি অচিরেই এ অঞ্চলের একক নেতায় পরিণত হবেন। স্বভাবতই এতে হুসামুদ্দিনের স্বপ্ন মাঠে মারা যাবে। এ চিন্তা থেকেই হুসামুদ্দিন অত্যন্ত দুঃসাহসী ও ভয়াবহ এক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি নুসায়বিনে ইমাদুদ্দিন জিনকির নিযুক্ত আমির আবু বকরের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে ইমাদুদ্দিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করেন। আমির আবু বকর ইমাদুদ্দিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং তাকে বিরাট সমস্যায় ফেলে দেন। আমরা নিশ্চয়ই ভুলে যাইনি যে, ৫২৪ হিজরি সনে ইমাদুদ্দিন জিনকি নুসায়বিনকে আপন রাজ্যভুক্ত করার পূর্বে নগরীটি হুসামুদ্দিনের অধিকারে ছিল।

আবু বকর বিদ্রোহ করলেও ইমাদুদ্দিন জিনকি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন। আমির আবু বকর পালিয়ে হুসামুদ্দিনের কাছে আশ্রয় নেন। ইমাদুদ্দিন জিনকি হুসামুদ্দিনের কাছে আবু বকরকে তার হাতে সোপর্দ করার দাবি জানান। কিন্তু হুসামুদ্দিন তা প্রত্যাখ্যান করেন। একে কেন্দ্র

করে দু-পক্ষের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা, দেনদরবার চলতে থাকে। কিন্তু হুসামুদ্দিন আবু বকরকে হস্তান্তর না করার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। বাধ্য হয়ে ইমাদুদ্দিন জিনকি এবার তার মিত্র হুসামুদ্দিনকে সামরিক সমাধানের দিকে অগ্রসর হওয়ার হুমকি দেন। হুসামুদ্দিন তখন একটি মধ্যবর্তী সমাধান গ্রহণ করেন এবং সুলতান মাসউদকে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করে আবু বকরকে তার হাতে সোপর্দ করেন। তবে সুলতান মাসউদ চিন্তা করেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ইমাদুদ্দিন জিনকির সঙ্গে কোনো ধরনের দরকষাকষি করে লাভ হবে না। আর এখন ইমাদুদ্দিনের সঙ্গে বিবাদে জড়ালে তা মোটেও সুলতানের স্বার্থে প্রবাহিত হবে না। তাই তিনি পারস্পরিক হৃদ্যতার নিদর্শন হিসেবে আবু বকরকে ইমাদুদ্দিন জিনকির হাতে তুলে দেন! এটি ৫৩৩ হিজরি সনের ঘটনা।

এভাবেই নুসায়বিন সমস্যা ও আমির আবু বকর সমস্যার সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু এর মাধ্যমে ইমাদুদ্দিন জিনকি জাযিরা অঞ্চলের পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। অবশ্য এরপরও তিনি হুসামুদ্দিনের সঙ্গে সংঘাতে জড়ানোর পরিবর্তে তাকে মৃদু তিরস্কার করেই ক্ষান্ত থাকেন। পরিস্থিতিও ইমাদুদ্দিনকে সহায়তা করে। এ সময়ই রুকনুদ্দৌলা দাউদ হুসামুদ্দিনের রাজ্যের কিছু এলাকায় হামলা চালালে বাধ্য হয়ে হুসামুদ্দিন ইমাদুদ্দিনের সহায়তা কামনা করেন।[৫০৩] ইমাদুদ্দিনও একে কাজে লাগিয়ে হুসামুদ্দিনের সঙ্গে পুনরায় মৈত্রীচুক্তি করেন।[৫০৪] ফলে রুকনুদ্দৌলা দাউদ বিন সুকমানই এ অঞ্চলের মূল সমস্যা হিসেবে বাকি থাকেন।

এ বছরই আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে হাররান-পরিস্থিতি শান্ত হয়ে যায়। হাররানে নিযুক্ত ইমাদুদ্দিনের প্রশাসক সুতকিন কারজি নামক জনৈক আমির বিদ্রোহ করলেও হঠাৎ করেই ৫৩৩ হিজরি সনে মৃত্যুবরণ করে। ফলে নগরীটি শান্তিপূর্ণভাবে ইমাদুদ্দিন জিনকির কর্তৃত্বে ফিরে আসে।[৫০৫]

---

৫০৩. ইবনুল আযরাক আল-ফারিকি, *তারীখুল আযরাকিল-ফারিকি আ'লা হামিশি যায়লি তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ২৬৭।

৫০৪. মুহাম্মাদ সুহাইল তাকুশ, *তারীখুয-জিনকিয়্যীন ফিল-মাওসিলি ওয়া বিলাদিশ-শাম*, পৃষ্ঠা : ১১৩।

৫০৫. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৭১।

জাযিরা অঞ্চলে যখন তুলনামূলক স্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছিল, তখন হঠাৎ করেই দামেশকে শুরু হয় পট পরিবর্তন!

দামেশক অবরোধ

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি, ইমাদুদ্দিন জিনকি দামেশকের শাসক শিহাবুদ্দিন মাহমুদের মা যামরাদ খাতুনকে বিয়ে করেছিলেন। দামেশকের রাজপ্রাসাদে যামরাদ খাতুনের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ইমাদুদ্দিন জিনকি আশা করেছিলেন, একে কাজে লাগিয়ে পরবর্তী সময়ে তিনি রাজনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সহজে দামেশককে নিজ রাজভুক্ত করতে পারবেন। কিন্তু ৫৩৩ হিজরি সনের শাওয়াল মাসে সংবাদ আসে যে, শিহাবুদ্দিন মাহমুদ তার প্রশাসনের জনৈক কর্মকর্তার হাতে নিহত হয়েছেন! এ হত্যাকাণ্ডের পেছনে দামেশকের সেনাপ্রধান ও সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি মুইনুদ্দিন আনুরের ভূমিকা থাকা মোটেও অসম্ভব নয়।[৫০৬] পরবর্তী ঘটনায় সন্দেহটি আরও দৃঢ়তা লাভ করে। মুইনুদ্দিন আনুর এ সময় শিহাবুদ্দিনের কোনো সহোদর ভাইয়ের পরিবর্তে ক্ষমতায় বসান তার বৈমাত্রেয় ভাই জামালুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন বুরিকে। জামালুদ্দিন (ইমাদুদ্দিন জিনকির স্ত্রী) সাফওয়াতুল মালিক যামরাদ খাতুনের পুত্র নন। এর মাধ্যমে মুইনুদ্দিন আনুর নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন যে, দামেশক প্রশাসনের একচ্ছত্র ক্ষমতা তার হাতেই থাকবে এবং তিনি যামরাদ খাতুনকে প্রভাব-কর্তৃত্ব থেকে দূরে রাখতে পারবেন। স্বাভাবিকভাবেই তখন তার স্বামী ইমাদুদ্দিন জিনকিও দামেশক প্রশাসনের নাড়ি-নক্ষত্র সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন না। অধিকন্তু নতুন শাসক জামালুদ্দিন মুহাম্মাদ দুর্বল হওয়ায় সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুইনুদ্দিনের হাতে চলে আসবে এবং তিনিই দামেশকের প্রকৃত শাসনকর্তায় পরিণত হবেন।

সবকিছু মুইনুদ্দিন আনুরের প্রত্যাশামতোই এগিয়ে চলে। জামালুদ্দিন মুহাম্মাদ দামেশক প্রশাসনের কর্তৃত্ব তার হাতে তুলে দেন। বরং তিনি মুইনুদ্দিনকে গুরুত্বপূর্ণ বালাবাক্কু নগরীর জায়গির-ক্ষমতাও প্রদান করেন। উত্তর দিক থেকে দামেশকগামী পথের ওপর বালাবাক্কুর নিয়ন্ত্রণ ছিল।

---

[৫০৬]. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩০৯, ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৭২ ও ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ২৬৯।

দামেশকের উত্তরে বালাবাক্কুই ছিল একমাত্র নগরী, যা তখন পর্যন্ত ইমাদুদ্দিন জিনকির রাজ্যভুক্ত হয়নি। তার হাতে বালাবাক্কুর পতন ঘটলে দামেশকের পথ তার জন্য পুরোপুরি উন্মুক্ত হয়ে যাবে।[৫০৭]

এই অস্বস্তিকর সংবাদ ইমাদুদ্দিন জিনকির কাছে পৌঁছায়। এর ফলে তার দামেশকে রাজনৈতিক পন্থায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। ইমাদুদ্দিন জিনকি তখন মসুলে ছিলেন। এর অল্প কদিন পরই তার কাছে আলেপ্পো থেকে স্ত্রী যামরাদ খাতুনের পাঠানো একটি পত্র এসে পৌঁছায়। পত্রে যামরাদ খাতুন তাকে দামেশক অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করে পুত্র শিহাবুদ্দিন হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ এবং হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার অনুরোধ জানান।[৫০৮] প্রায় একই সময় ইমাদুদ্দিন জিনকির কাছে উপস্থিত হন দামেশকের নতুন শাসক জামালুদ্দিন মুহাম্মাদের ভাই বাহরামশাহ বিন বুরি।[৫০৯] তিনি মসুলে পৌঁছে তাকে সাহায্য করার জন্য ইমাদুদ্দিন জিনকিকে অনুরোধ জানান এবং অঙ্গীকার করেন যে, ইমাদুদ্দিন জিনকির সহায়তায় তিনি দামেশকের কর্তৃত্ব লাভ করলে ইমাদুদ্দিন জিনকির মিত্রে পরিণত হবেন!

ইমাদুদ্দিন জিনকি পরিবর্তিত পরিস্থিতির সবগুলো অংশকে পরস্পর জোড়া লাগিয়ে করণীয় নির্ণয়ে সচেষ্ট হন। তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, এখন তার মোটেও সময় নষ্ট করা সমীচীন হবে না। তিনি তৎক্ষণাৎ তার বাহিনী নিয়ে দামেশক অভিমুখে রওনা হন! এটি ৫৩৩ হিজরি সনের জিলকদ মাসের (১১৩৯ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসের) ঘটনা।

দামেশক অভিমুখে রওনা হওয়ার পর পথিমধ্যে ইমাদুদ্দিন জিনকি অনুভব করেন যে, বালাবাক্কুর পতন না ঘটিয়ে দামেশক অবরোধে অগ্রসর হওয়ার অর্থ নিজ বাহিনীকে নিশ্চিত ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেওয়া। কারণ, তখন তিনি দামেশকের বাহিনী ও বালাবাক্কুর প্রতিরক্ষা বাহিনীর মাঝে পড়ে যাবেন। যথা চিন্তা, তথা কর্ম! ইমাদুদ্দিন জিনকি তার গতিপথ বদলে এবার বালাবাক্কু অভিমুখে রওনা হন এবং গন্তব্যে পৌঁছে জিলহজের

---

৫০৭. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩১০ ও ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৭২।

৫০৮. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩১০।

৫০৯. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৭২।

২০ তারিখে বালাবাক্কু অবরোধ করেন। তিনি বালাবাক্কুর চারপাশে চৌদ্দটি মিনজানিক স্থাপন করেন। ইমাদুদ্দিন জিনকি প্রথমে নগরবাসীকে যুদ্ধ ব্যতিরেকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানালেও তারা তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে। বাধ্য হয়ে ইমাদুদ্দিন জিনকি আক্রমণের পথ অবলম্বন করেন। তার নির্দেশে বালাবাক্কুর নগরপ্রাচীর লক্ষ্য করে মিনজানিকগুলোর মাধ্যমে রাতদিন গোলা নিক্ষেপ করা হতে থাকে এবং নগরীর চারপাশে অবরোধ আরও কঠিন ও দুর্ভেদ্য করে তোলা হয়। বালাবাক্কুবাসী প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুললেও ধীরে ধীরে তাদের শক্তি দুর্বল হতে থাকে। অবশেষে একটানা চল্লিশ দিনেরও অধিক সময় অবরোধ দীর্ঘায়িত হওয়ার পর বালাবাক্কুর পতন ঘটে। ৫৩৪ হিজরি সনের সফর মাসে (১১৩৯ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে) ইমাদুদ্দিন জিনকি নগরীটিকে নিজ রাজ্যভুক্ত করতে সক্ষম হন। এর মাধ্যমে দামেশক রাজ্যের কর্তৃত্বাধীন উত্তরের সবগুলো নগরীর ওপর ইমাদুদ্দিন জিনকির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। নগরীগুলো হলো বালাবাক্কু, হিমস, হামা, বানিয়াস ও মিজদাল।[৫১০]

ইমাদুদ্দিন জিনকি পূর্ণ এক মাস বালাবাক্কুতে অবস্থান করে নগরীটির প্রশাসন পুনঃবিন্যস্ত করেন এবং অবরোধ চলাকালে উপর্যুপরি গোলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত নগরপ্রাচীরগুলোর সংস্কার করেন। এরপর তিনি (সালাহুদ্দিন আইয়ুবির পিতা) নাজমুদ্দিন আইয়ুবকে নগরীটির দায়িত্ব প্রদান করেন।[৫১১]

দামেশক অভিমুখে রওনা হওয়ার পূর্বে ইমাদুদ্দিন জিনকি সামরিক অবরোধের পথে অগ্রসর হওয়ার আগে শান্তিপূর্ণ পথে দামেশক-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তার বাহিনী নিয়ে বিকা উপত্যকায় (The Beqaa Valley) শিবির স্থাপন করেন, এরপর দামেশকের শাসক জামালুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন বুরির কাছে বার্তা পাঠিয়ে তাকে পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতা বিনিময়ের প্রস্তাব দেন। তিনি দামেশক শাসককে প্রস্তাব দেন যে, দামেশকের নিয়ন্ত্রণ তার হাতে তুলে

---

৫১০. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩১০, ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৭২, ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ২৬৯-২৭০ ও ইবনে ওয়াসিল, *মুফাররিজুল কুরূব*, ১/৮৬।

৫১১. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ২৬১।

দেওয়া হলে বিনিময়ে তিনি জামালুদ্দিনকে হিমস ও বালাবাক্কর কর্তৃত্ব প্রদান করবেন। কিন্তু জামালুদ্দিন ও দামেশকের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। স্বভাবতই তাদের নেতৃত্বে ছিলেন মুইনুদ্দিন আনুর। বাধ্য হয়ে ইমাদুদ্দিন জিনকি এবার তার বাহিনী নিয়ে দামেশক অভিমুখে অগ্রসর হন এবং ৫৩৪ হিজরি সনের রবিউল আউয়াল মাসে (১১৩৯ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে) দামেশক অবরোধ করেন।

দামেশক নগরী ঘিরে দুর্ভেদ্য অবরোধ আরোপ করা হয়। একটানা কয়েক মাসের অবরোধ চলাকালে উভয় পক্ষের মধ্যে বেশ কয়েকবার বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। মুইনুদ্দিন যদি প্রতিরোধের জন্য পীড়াপীড়ি না করতেন, তাহলে জামালুদ্দিন হয়তো নগরী সমর্পণের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতেন। দীর্ঘ অবরোধের ফলে দামেশকের অভ্যন্তরে পরিস্থিতি খুব জটিল হয়ে ওঠে। এরই মধ্যে ৫৩৪ হিজরি সনের শাবান মাসে (১১৪০ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে) এক আকস্মিক ঘটনা ঘটে। দামেশকের শাসক জামালুদ্দিন হঠাৎ করেই মারা যান। তার মৃত্যুর পর দামেশকের শাসনক্ষমতা নিয়ে তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে গৃহবিবাদ শুরু হয় এবং ইমাদুদ্দিন জিনকির সামনে সামরিক হস্তক্ষেপের সুযোগ এসে যায়। কিন্তু মুইনুদ্দিন আনুর দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য মৃত শাসক জামালুদ্দিনের পুত্র মুজিরুদ্দিন আবিক বিন মুহাম্মাদকে ক্ষমতায় বসান। এরপর দামেশক নতুন করে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এতে ইমাদুদ্দিন জিনকি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। দামেশক অবরোধ করার পর ইতিমধ্যে ছয় মাসের অধিক সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। অবশ্য তিনি এরপরও অবরোধ অব্যাহত রাখেন। তিনি আশা করছিলেন, দামেশকের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি একসময় ভেঙে পড়বে এবং তখন তারা বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করবে।[৫১২]

দামেশক-ক্রুসেডার মিত্রতা

মজবুত অবরোধের শিকার মুইনুদ্দিন আনুর এরপর ইমাদুদ্দিন জিনকিকে অবরোধ প্রত্যাহার করে দামেশক ত্যাগে বাধ্য করার জন্য নতুন এক কৌশল অবলম্বন করেন। কৌশলটি ছিল অতি নিকৃষ্ট। এর দ্বারাই আমরা

---

৫১২. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩১৩, ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৭৩।

সুস্পষ্টভাবে অনুমান করতে পারব মুইনুদ্দিন আনুরের স্বভাব-প্রকৃতি, নতুন শাসক মুজিরুদ্দিন আবিকের নীতি এবং সেসব জনগণের স্বভাব-চরিত্র, যারা এই প্রচেষ্টায় সমর্থন জোগাচ্ছিল। মুইনুদ্দিন আনুর এ সময় বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজা ফাল্ক অ্যাঞ্জোর কাছে সাহায্যবার্তা প্রেরণ করেন এবং ইমাদুদ্দিন জিনকির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাকে বৃহৎ আকারের ক্রুসেডার বাহিনী নিয়ে আগমনের অনুরোধ জানান। তিনি ফাল্ককে এই বলে সতর্ক করেন যে, ইমাদুদ্দিন জিনকি যদি দামেশক জয় করতে পারেন, তাহলে তা বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়াবে![৫১৩]

দেখুন, মুইনুদ্দিন আনুর কীভাবে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ক্রুসেডারদের নিরাপত্তা রক্ষার চিন্তা করছেন!

এরপর তিনি রাজা ফাল্ককে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিতে প্ররোচিত করার জন্য বিভিন্ন প্রলুব্ধকর প্রস্তাব প্রদান করেন।

কী সেই প্রলুব্ধকর প্রস্তাব?!

১. মুইনুদ্দিন আনুর ক্রুসেডার বাহিনীর যুদ্ধব্যয় বহন করবেন। তিনি এর পরিমাণ নির্ধারণ করেন মাসিক বিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা, যা রাজা ফাল্ক অ্যাঞ্জোকে প্রদান করা হবে!

২. ইমাদুদ্দিন জিনকির হাত থেকে বানিয়াস নগরী পুনরুদ্ধারের অভিযানে ক্রুসেডার বাহিনী দামেশক বাহিনীর সঙ্গে শরিক থাকবে। নগরীটি পুনরুদ্ধার করার পর মুইনুদ্দিন তা উপহার হিসেবে ক্রুসেডার বাহিনীর হাতে তুলে দেবেন!

৩. রাজা ফাল্ক যেন মুইনুদ্দিনের অঙ্গীকারের ওপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখেন, তার জামানতস্বরূপ তিনি কয়েকজন মুসলিম আমিরকে ফাল্কের কাছে জিম্মি হিসেবে সোপর্দ করার প্রস্তাব দেন। যুদ্ধ শেষে ইমাদুদ্দিন জিনকির প্রস্থান এবং প্রতিশ্রুত উপহার বানিয়াস নগরীর কর্তৃত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার আগ পর্যন্ত তারা রাজা ফাল্ক অ্যাঞ্জোর হেফাজতে থাকবে![৫১৪]

---

৫১৩. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩১৩-৩১৪।

৫১৪. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৭৩, ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ২৭২ ও উইলিয়াম সুরি, *তারীখুল হুরূবিস সালিবিয়্যাহ*, ২/৬৭৮-৬৭৯।

তৎকালে দামেশকের মুসলমানরা এতটাই লাঞ্ছনাকর পরিস্থিতিতে উপনীত হয়েছিল যে, তাদের বিবেক-বুদ্ধি এ ধরনের অযৌক্তিক ও ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হতেও বাধা দেয়নি; বরং ইমাদুদ্দিন জিনকির সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা বিনিময় না করার জন্য সব ধরনের ঝুঁকি বরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এমনকি এর বিনিময়ে যদি ক্রুসেডারদের সঙ্গে সুস্পষ্ট ও সরাসরি সহযোগিতা বিনিময় করতে হয়, তারা তাতেও রাজি আছে!

যে মূল্যই চুকাতে হোক, যেকোনো মূল্যে ক্ষমতার মসনদে টিকে থাকাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য!

বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের শাসক ফাল্ক অ্যাঞ্জো ভেবে দেখেন যে, এ তো একটি পদক্ষেপের মাধ্যমেই অনেকগুলো লক্ষ্য বাস্তবায়নের এক বিনিময়হীন সুযোগ!

এর মাধ্যমে তিনি তার অহমিকার শোধ নিতে পারবেন এবং তিন বছর পূর্বে বারিনের যুদ্ধে যে ইমাদুদ্দিন জিনকি তাকে তিক্ত পরাজয়ের স্বাদ উপহার দিয়েছিলেন, তাকে এবার পাল্টা শিক্ষা দিতে পারবেন।

একই সঙ্গে তিনি মূল ইসলামি শক্তিকেই আঘাত করতে পারবেন আর এক্ষেত্রে তাকে সহায়তা করবে দামেশক বাহিনীর ন্যায় শক্তিশালী এক বাহিনী!

তার চেয়েও বড় কথা, এর মাধ্যমে তিনি লাভ করবেন শামের পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় পথে অতি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের অধিকারী বানিয়াস নগরীর কর্তৃত্ব।

তা ছাড়া এর মাধ্যমে দামেশক নগরীর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ এক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের সূচনা হবে, যা ভবিষ্যতে তার জন্য নগরীটি দখল করা সহজ করে দেবে বা নিদেনপক্ষে বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের উত্তর সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। কারণ, দামেশক তখন বাইতুল মুকাদ্দাস এবং আলেপ্পো ও মসুলের মুসলমানদের মাঝে প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচিত হবে।

নিঃসন্দেহে এ এক সুবর্ণ সুযোগ! রাজা ফাল্ক এ সুযোগ কেন হেলায় হারাবেন!

ক্রুসেডার বাহিনী দ্রুত দামেশকের সহায়তায় ছুটে আসে। ইমাদুদ্দিন

জিনকি অনুভব করেন যে, তিনি এক কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতে যাচ্ছেন। কারণ, তিনি যদি ক্রুসেডার বাহিনী ও দামেশক বাহিনীর মাঝে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন, তাহলে হয়তো কোনো সামরিক দুর্যোগের শিকার হবেন। আর তাই ইমাদুদ্দিন জিনকি দ্রুত অবরোধ প্রত্যাহার করে ক্রুসেডার বাহিনী দামেশকের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্বেই নিজ বাহিনী নিয়ে হাওরান অভিমুখে অগ্রসর হয়ে ক্রুসেডার বাহিনীর মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নেন।

রাজা ফাল্ক সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে থাকেন। তিনি জানতে পারেন যে, ইমাদুদ্দিন জিনকি তার বাহিনী নিয়ে হাওরান অঞ্চল অভিমুখে এগিয়ে আসছেন। রাজা ফাল্ক তাবারিয়া হ্রদের কাছে অপেক্ষা করতে থাকেন। তিনি একা তার বাহিনী নিয়ে ইমাদুদ্দিন জিনকির মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছিলেন। এদিকে মুইনুদ্দিন এবার এন্টিয়কের শাসক রেমন্ড অফ পয়টিয়ার্সের কাছে নতুন আরেকটি সাহায্যবার্তা পাঠান। রেমন্ড তৎক্ষণাৎ অবরুদ্ধ দামেশক নগরীকে উদ্ধার করার জন্য তার বাহিনী নিয়ে রওনা হন!

ইমাদুদ্দিন জিনকি অনুভব করেন, এসব বাহিনী যদি একত্রে মিলিত হয়, তাহলে তার বাহিনী বিরাট ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাবে। তাই তিনি প্রত্যাগমন করে প্রথমে হিমসে, তারপর সেখান থেকে মসুলে চলে আসেন। এদিকে মুইনুদ্দিন তার বাহিনীর একটি অংশ নিয়ে বানিয়াস নগরী অবরোধ করে নগরীটির পতন ঘটান। বানিয়াসে অবস্থানরত ইমাদুদ্দিন জিনকির অধীনস্থ প্রতিরক্ষা বাহিনী অবশ্য প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। বানিয়াস নগরীর পতন ঘটিয়েই কালবিলম্ব না করে মুইনুদ্দিন তার চুক্তি পূর্ণ করেন এবং নগরীটিকে উপাদেয় লোকমার মতো রাজা ফাল্কের মুখে তুলে দেন![৫১৫]

হায়! কী আজব কালের গল্প করছি! যে যুগে একজন মুসলমান তার সময়, প্রচেষ্টা ও জীবন ব্যয় করছে মুসলমানদের শাসন থেকে একটি মুসলিম ভূখণ্ডকে 'উদ্ধার' করতে, তারপর তা 'বন্ধু' ক্রুসেডারদের হাতে তুলে দিতে!

---

৫১৫. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩১৪ ও ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৭৪।

ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ. দামেশক অভিযানের ব্যর্থতার বেদনাকে সঙ্গী করে মসুলে ফিরে আসেন। বাস্তবতা হলো, একেবারে ক্রুসেড যুদ্ধ ইতিহাসের সূচনাকাল থেকে ইমাদুদ্দিন জিনকির পুরো জীবনকাল পর্যন্ত এমনকি এর পরও দীর্ঘকাল ধরে মহান ইসলামি নগরী দামেশক ইসলামি ঐক্য পরিকল্পনার পথে দুর্ভেদ্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। অনেক পরে বিখ্যাত মুসলিম বীর সেনাপতি নুরুদ্দিন মাহমুদ রহ.-এর শাসনামলে দামেশক-বিচ্ছিন্নতা সমস্যার সমাপ্তি ঘটে।

পূর্ণ পাঁচ বছর

মসুলে ফিরে এসে ইমাদুদ্দিন জিনকি দেখতে পান, এদিকে এক নতুন সমস্যার সূত্রপাত হয়েছে। মসুলের পূর্ব দিকে শাহরাযুর নগরীতে কাফজাক বিন আরসালান তাশ তুর্কমানি নামক জনৈক তুর্কমেন সেনাপতি সুসংহত অবস্থান গড়ে তুলেছে এবং তার চারপাশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অনুসারীকেও সমবেত করতে সক্ষম হয়েছে। কাফকাজের এ অবস্থান ছিল মসুলে ইমাদুদ্দিন জিনকির দুর্গের জন্য সরাসরি বিরাট হুমকি। বিষয়টি এ কারণেও উদ্বেগজনক ছিল যে, সুলতান মাসউদের সঙ্গে কাফজাকের অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল। তাই ইমাদুদ্দিন জিনকি আশঙ্কা করছিলেন, তিনি হয়তো সুলতান মাসউদের পক্ষ থেকে মসুল জয়ের কোনো ধরনের গোপন প্রচেষ্টার সম্মুখীন হতে যাচ্ছেন। এ কারণে ইমাদুদ্দিন জিনকি কালবিলম্ব না করে শাহরাযুর অভিমুখে অগ্রসর হন। পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত শাহরাযুর অঞ্চল ছিল অত্যন্ত দুর্গম ও সুরক্ষিত। ইমাদুদ্দিন জিনকি তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধ করেন। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাকে বিজয় দান করেন। কাফজাকের পরাজিত সৈন্যরা পালিয়ে বিভিন্ন দিকে আশ্রয় নেয়। ইমাদুদ্দিন জিনকি শাহরাযুর অঞ্চলের বিভিন্ন দুর্গ অবরোধ করে সবগুলোর পতন ঘটান এবং পাহাড়ি অঞ্চলটির সবগুলো কেন্দ্রের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর ইমাদুদ্দিন জিনকি এমন এক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যা এ জাতীয় পরিস্থিতিতে একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। তিনি কাফজাককে নিরাপত্তা প্রদান করেন এবং সে তার আনুগত্যে ফিরে এলে তার সঙ্গে সদয় আচরণ করার প্রতিশ্রুতি দেন। বাস্তবেও কাফজাক ইমাদুদ্দিন জিনকির কাছে ফিরে আসেন। ইমাদুদ্দিন জিনকি তাকে সাদরে স্বাগত জানান এবং ইতিপূর্বে

তার হাতে যে অঞ্চলের কর্তৃত্ব ছিল, তার কর্তৃত্ব তার হাতেই তুলে দিয়ে তাকে নিজের অধীনস্থ করে নেন। কাফজাক ইমাদুদ্দিন জিনকির এই সদয় আচরণের মূল্য রক্ষা করেছিলেন। তিনি ইমাদুদ্দিন জিনকির সঙ্গে এবং তার মৃত্যুর পর তার সন্তানদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলেছেন এবং আজীবন জিনকি পরিবারের সেবায় নিয়োজিত থেকেছেন। কাফজাক ও তার পুত্রগণ পরবর্তী ষাট বছরেরও অধিক সময় অর্থাৎ হিজরি ছয়শ সনের পরও নিজেদের আনুগত্যের অঙ্গীকারে অটল ছিল।[৫১৬] এভাবেই ইমাদুদ্দিন জিনকি মার্জনা, প্রজ্ঞাপূর্ণ নীতি ও সদাচরণের মাধ্যমে উক্ত অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেন।

৫৩৫ হিজরি সনে (১১৪০ খ্রিষ্টাব্দে) রুকনুদ্দৌলা দাউদ বিন সুকমান হুসামুদ্দিনের শাসিত সিলভান নগরীতে আক্রমণ করেন। হুসামুদ্দিন স্বভাবমতো ইমাদুদ্দিন জিনকির সাহায্যপ্রার্থনা করলে তিনি দ্রুত আবেদনে সাড়া দেন এবং সিলভানের ওপর থেকে চাপ সরানোর লক্ষ্যে রুকনুদ্দৌলার শাসনাধীন বিভিন্ন এলাকায় হামলা চালান। ইমাদুদ্দিন হাসানকেইফের নিকটবর্তী বাহমারুদ দুর্গকে আক্রমণের জন্য বেছে নেন। তার এ নির্বাচন ছিল বুদ্ধিদীপ্ত সামরিক চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। কারণ, দুর্গটির নিয়ন্ত্রণভার ছিল রুকনুদ্দৌলার পুত্র কারা আরসালানের হাতে। তা ছাড়া দুর্গটি ছিল হাসানকেইফের একেবারে সন্নিকটে। সংবাদ পেয়ে রুকনুদ্দৌলা দাউদ বিন সুকমান অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি একদিকে শঙ্কিত হয়ে পড়েন বাহমারুদ দুর্গে অবরুদ্ধ তার পুত্রের নিরাপত্তা নিয়ে, অপরদিকে বাহমারুদ দুর্গের নিকটে অবস্থিত তার আবাসস্থল ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ হাসানকেইফের পরিণতি নিয়ে। বাধ্য হয়ে তিনি সিলভান নগরীর অবরোধ প্রত্যাহার করে বাহমারুদ দুর্গ অভিমুখে অগ্রসর হন। কিন্তু ইমাদুদ্দিন জিনকি এর পূর্বেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে সক্ষম হন এবং গুরুত্বপূর্ণ বাহমারুদ দুর্গের অধিকার লাভ করেন।[৫১৭] এরপর দাউদ বিন সুকমান সরাসরি ইমাদুদ্দিন জিনকির

---

৫১৬. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩১৪-৩১৫।

৫১৭. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩১৭, ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৭৬, ইবনে ওয়াসিল, *মুফাররিজুল কুরুব*, ১/৮৯ ও ইবনুল আবরাক আল-ফারিকি, *তারীখুল আযরাকিল-ফারিকি আ'লা হামিশি যায়লি তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ২৬৭।

সঙ্গে সংঘর্ষে জড়াতে ভীত হয়ে পড়ায় পরিস্থিতি ইমাদুদ্দিন জিনকির অনুকূলে চলে আসে।

৫৩৬ হিজরি সনে (১১৪১ খ্রিষ্টাব্দে) ইমাদুদ্দিন জিনকি আমিদ নগরীকে তার রাজ্যভুক্ত করতে সক্ষম হন। এ সময় নগরীটির প্রশাসক আবু মানসুর ইকলিদি তার বশ্যতা স্বীকার করে নেন। এর ফলে জাযিরা অঞ্চলে ইমাদুদ্দিন জিনকির অবস্থান আরও সংহত হয়।[৫১৮] কিন্তু ইমাদুদ্দিন জিনকির এই কর্তৃত্ব নতুন করে হুসামুদ্দিন তামারতাশকে অস্থির করে তোলে। তিনি ইমাদুদ্দিন জিনকির প্রতি অবাধ্যতা প্রকাশ করে অনেক বছর পর তার প্রতিদ্বন্দ্বী রুকনুদ্দৌলা দাউদ বিন সুকমানের সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে মিত্রতা গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।[৫১৯]

বাস্তবেই জাযিরা অঞ্চল তখন ফিতনা ও মনোবৃত্তি চরিতার্থের উত্তাল তরঙ্গে হাবুডুবু খাচ্ছিল।

ইমাদুদ্দিন জিনকি প্রতিপক্ষের জোট ভাঙার উদ্দেশ্যে কূটনৈতিক পথ অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি রুকনুদ্দৌলার সঙ্গে পত্রবিনিময় করে তাকে হুসামুদ্দিনকে ছেড়ে তার সঙ্গে মিত্রতা গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন। রুকনুদ্দৌলা দাউদ ইমাদুদ্দিন জিনকির প্রস্তাব নিয়ে ভাবতে থাকেন। তিনি উপলব্ধি করেন, ইমাদুদ্দিন জিনকি হুসামুদ্দিনের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। তিনি যদি ইমাদুদ্দিন জিনকির সঙ্গে সংঘাত ও বিবাদের ওপর অটল থাকেন, তাহলে ইমাদুদ্দিন জিনকি শীঘ্রই শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে তার রাজ্য দখল করে নিতে পারবেন। তা ছাড়া ইমাদুদ্দিন জিনকি ইতিপূর্বে হুসামুদ্দিন তামারতাশের সঙ্গে মিত্রতা করার পর তার সঙ্গে কোনো ধরনের প্রতারণা করেননি; বরং তাকে উপহার ও অনুগ্রহদান হিসেবে বিভিন্ন দুর্গ প্রদান করেছেন। হুসামুদ্দিনই মূলত ইমাদুদ্দিন জিনকির সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। হতে পারে ভবিষ্যতে হুসামুদ্দিন তার সঙ্গেও প্রতারণা করবেন। সর্বদিক বিবেচনায় দাউদ বিন সুকমানের কাছে হুসামুদ্দিনের মিত্রতা ত্যাগ করে ইমাদুদ্দিন জিনকির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনই

---

[৫১৮]. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩২৪ ও *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ৬৪।

[৫১৯]. ইবনে ওয়াসিল, *মুফাররিজুল কুরূব*, ১/৮৯।

শ্রেয়তর বিবেচিত হয়।[৫২০]

এভাবে জাযিরা অঞ্চলে ইমাদুদ্দিন জিনকির শক্তি আরও বৃদ্ধি পায় আর হুসামুদ্দিন তামারতাশ মিত্রহীন ও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। ইমাদুদ্দিন জিনকি এতেই ক্ষান্ত না হয়ে এরপর দক্ষিণে তার রাজ্য সম্প্রসারিত করেন এবং প্রথমে হাদিসা[৫২১] ও পরে আনা নগরীকে[৫২২] জিনকি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এর মাধ্যমে জাযিরা অঞ্চলে তার কর্তৃত্ব আরও বিস্তৃত ও শক্তিশালী হয়।[৫২৩]

ইমাদুদ্দিন জিনকি এই স্থিতিশীল পরিস্থিতি ও আপন কেন্দ্রীয় শক্তিকে কাজে লাগানোর মনস্থ করেন। তিনি ৫৩৭ হিজরি সনে (১১৪২ খ্রিষ্টাব্দে) দিয়ারে বকরের নিম্নভূমি ও জাযিরার উচ্চভূমিতে অবস্থিত বিভিন্ন দুর্গে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি বিস্তৃত অভিযানে বের হন। এই অভিযানে তিনি এমন অনেক স্থানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে ইতিপূর্বে কোনো সেলজুক সেনাপতি বা অন্য কেউ পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। তিনি তানজা, আসআরাদ ও হিযান অঞ্চলকে তার রাজ্যভুক্ত করেন। এ ছাড়াও দিউক, মাতলিস, বানসিবা ও জুলকারনাইনের মতো বিভিন্ন দুর্গও এ অভিযানে জিনকি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনি এসব নগরী ও দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তার অধীনস্থ বিভিন্ন সেনাপতির হাতে ছেড়ে দেন।[৫২৪] এর ফলে জাযিরা অঞ্চলের স্থিতিশীলতা এমন স্তরে উপনীত হয়, যা ইতিপূর্বে কখনো হয়নি। নিশ্চিতভাবেই এখন দাবি করা যায় যে, এডেসা রাজ্যের পথ পুরোপুরি নিরাপদ ও উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। একমাত্র বাকি রয়ে গেছে হুসামুদ্দিন তামারতাশের শাসনাধীন এলাকা। তবে ইমাদুদ্দিন জিনকি জানতেন যে, তিনি যদি এডেসার উদ্দেশে অভিযান পরিচালনা করেন,

---

৫২০. Elisself: op. cit., p. 373.

৫২১. হাদিসাতুল ফুরাত' ফুরাত নদীর মাঝে একটি দ্বীপে অবস্থিত। হাদিসা নামে আরেকটি এলাকা আছে মসুলে, যা দজলা নদীর পূর্ব তীরে যাবুল আ'লা মোহনার নিকটে অবস্থিত। দেখুন: ইয়াকুত আল-হামাবি, *মুজামুল বুলদান*, ২/২৩০।

৫২২. 'আনা' রাক্কা ও হিতের মধ্যবর্তী একটি প্রসিদ্ধ নগরী। নগরীটিকে জাযিরা অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করা হয়। দেখুন: ইয়াকুত আল-হামাবি, *মুজামুল বুলদান*, ৪/৭২।

৫২৩. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩৩০, *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ৬৪ ও ইবনুল জাওযি, *আল-মুনতাযাম*, ১০/১০২।

৫২৪. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩২৯।

দুর্বল হুসামুদ্দিনের পক্ষে কিছুতেই তাকে পথে বাধাপ্রদান সম্ভব হবে না।

জাযিরা অঞ্চলে এই ব্যাপক ও বিস্তৃত অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে ইমাদুদ্দিন জিনকি কিন্তু তার সুবিশাল রাজ্যের নিরাপত্তা নিয়ে উদাসীন ছিলেন না। বরং তিনি রাজ্যের যেকোনো স্থানে শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট ফিতনা প্রচেষ্টার প্রতি সতর্ক-দৃষ্টি রাখতেন। মসুলের পূর্ব দিকে কুর্দি হাকারিয়া গোত্র অধ্যুষিত অঞ্চলে একবার বিদ্রোহ প্রচেষ্টা সংঘটিত হলে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন। অঞ্চলটির নেতা ছিলেন ইমাদুদ্দিন জিনকির মিত্র আবুল হাইজা আল-হাকারি। তার মৃত্যুর পর তার নায়েব বাউ আলারুজি অঞ্চলটির নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেন এবং পুরো অঞ্চলে সংঘাত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ইমাদুদ্দিন জিনকির আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালান। ইমাদুদ্দিন জিনকি দ্রুত সে অঞ্চলে পৌঁছে তার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে পরাভূত করেন। তিনি বিদ্রোহীদের মূল ঘাঁটি আশুব (Amadiya) দুর্গসহ এ অঞ্চলের বিভিন্ন দুর্গে পুনঃকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।[৫২৫]

ইমাদুদ্দিন জিনকির সচেতনতার আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো, তিনি একই সময় আলেপ্পোর নিকটবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রুসেডারদের হামলাও মোকাবিলা করেন। আলেপ্পোর প্রতিরক্ষা বাহিনী ক্রুসেডারদের হামলা প্রতিরোধ করে। এ সময় সাতশ ক্রুসেডার যোদ্ধা প্রাণ হারায়। মুসলমানরা লাভ করে প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ।[৫২৬]

কুর্দি মিহরানিয়া গোত্রও এ সময় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। গোত্রটি জাযিরা ইবনে উমরের নিকটবর্তী পাহাড়ি অঞ্চলের বিভিন্ন দুর্গে বসবাস করত। এসব দুর্গের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কাওয়াশি দুর্গ। সংবাদ পেয়ে ইমাদুদ্দিন জিনকি দ্রুত মিহরানিয়া গোত্রের মোকাবিলায় অগ্রসর হন এবং পূর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে তাদেরকে বশীভূত করেন। ফলে তার রাজ্যের সকল স্থানে পুনরায় শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরে আসে।[৫২৭]

এভাবে ৫৩৭ হিজরি সনের শেষে এবং ৫৩৮ হিজরি সনের শুরুর দিকে

---

৫২৫. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩২৬ ও *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ৬৪।

৫২৬. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৭৭-২৭৮।

৫২৭. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ৬৪।

ইমাদুদ্দিন জিনকি সর্বদিক থেকে পূর্ণ স্থিতিশীলতার অধিকারী হন। এখন তিনি চাইলেই সেই প্রাচীন রাজ্যটিকে জয় করার লক্ষ্যে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন, যে রাজ্যের নাম 'এডেসা ক্রুসেড রাজ্য'!

আল্লাহর সৈনিক

৫৩৩ হিজরি সন হতে ইতিমধ্যে পাঁচ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। এ দীর্ঘ সময়ে খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য কোনো সংঘাতের ঘটনা ঘটেনি। তবে এই পাঁচটি বছর বিনা কাজে অবহেলায় নষ্টও হয়নি। এ সময়টুকু অতিবাহিত হয়েছে লাগাতার প্রস্তুতি গ্রহণ ও ধারাবাহিক ব্যবস্থাপনার কাজে। ইসলামি ভূখণ্ড থেকে ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করার চিন্তা ইমাদুদ্দিন জিনকির মনমস্তিষ্ক হতে কখনোই অদৃশ্য হয়নি। বরং খোদ এডেসা নগরীর বিষয়টি এই মহান বীর সেনানীর চিন্তায় সব সময় বিরাজমান ছিল। যেমন ইবনুল কালানিসি রহ. *যায়লু তারীখি দিমাশক* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'এই নগরীটির স্মৃতি তার মানসপটে ভাস্বর ছিল; এ সম্পর্কে করণীয় চিন্তা তার মন ও হৃদয়জুড়ে ছিল।'[৫২৮]

ইমাদুদ্দিন জিনকি এবার নথিপত্র গুছিয়ে নিয়ে এডেসা রাজ্যে ব্যাপক পরিসরে সুবিন্যস্ত অভিযান পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করেন। তিনি যখন এই প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, এর মধ্যেই অর্থাৎ ৫৩৮ হিজরি সনে (১১৪৩ খ্রিষ্টাব্দে) চলমান ঘটনাপ্রবাহে এমন কিছু পরিবর্তন ঘটে, যা তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথ আরও সুগম করে দেয়।

এমনটি ভাবা মোটেও উচিত হবে না যে, এসব পরিবর্তন ছিল বিস্ময়কর কাকতালীয় ঘটনা। কারণ, পৃথিবীতে যা কিছু সংঘটিত হয়, মহান আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত তাকদির মেনেই সংঘটিত হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইমাদুদ্দিন জিনকির আন্তরিক নিষ্ঠা ও নিবিড় কর্মপ্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ করে তার জন্য পরিস্থিতি অনুকূল করে দিয়েছিলেন এবং আগামীর পথচলা সহজ করে দিয়েছিলেন। ইমাদুদ্দিন তো লড়াই করছেন ইসলামের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব পূরণ করতে, দখলদার শত্রুর নাগপাশ থেকে

---

৫২৮. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ২৮২।

মুসলমানদের ভূখণ্ড মুক্ত করার লক্ষ্যে।

আসুন, আমরা এবার ৫৩৮ হিজরি সনের শেষভাগে এবং ৫৩৯ হিজরি সনের প্রথমভাগে সংঘটিত সেসব ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, যা ইমাদুদ্দিন জিনকির জন্য এডেসা বিজয়ের পথ সুগম করে দিয়েছিল।

১. ৫৩৮ হিজরি সনে (১১৪৩ খ্রিষ্টাব্দে) বাইজান্টাইন সম্রাট ২য় জন কমনিনোস মৃত্যুবরণ করেন[৫২৯] এবং তার পুত্র ১ম ম্যানুয়েল কমনিনোস (Manuel I Komnenos) তার স্থলাভিষিক্ত হন। দীর্ঘ পঁচিশ বছর বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য শাসনকারী ২য় জন কমনিনোসের প্রয়াণ-ঘটনা নিশ্চিত করেই সাম্রাজ্যটিকে কঠিন সংকটে ফেলে দেয়। নতুন সম্রাট ম্যানুয়েল কমনিনোস তার যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টা সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বিধানেই ব্যয় করতে বাধ্য হন। এর ফলে সাম্রাজ্যটি শাম অঞ্চলের সম্ভাব্য সংঘাতের সমীকরণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পক্ষে তখন এডেসা রাজ্যের স্বার্থে অগ্রসর হওয়ার মতো সময় ও শক্তি ছিল না। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ, ইতিপূর্বে মাত্র ছয় বছর আগে ৫৩২ হিজরি সনে আমরা বাইজান্টাইন-ক্রুসেডার জোটের অস্তিত্ব দেখেছি। এডেসা রাজ্যের শাসক ২য় জোসেলিনও উক্ত জোটে শরিক ছিলেন। নিঃসন্দেহে নতুন করে এ জাতীয় কোনো জোট ও মৈত্রী তৈরি হলে ইমাদুদ্দিন জিনকির এডেসা অভিযান পরিকল্পনা আটকে যেতে পারত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ আশঙ্কা দূর করে দেন।

২. সম্রাট ২য় জন কমনিনোসের মৃত্যুর পর এন্টিয়কের শাসক রেমন্ড অফ পয়টিয়ার্স কিলিকিয়া অঞ্চল দখলে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ৫৩২ হিজরি সনে এ অঞ্চলে অভিযান পরিচালনার সময় বাইজান্টাইনরা কিলিকিয়া অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। রেমন্ড তার বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়ে কিলিকিয়া অঞ্চল দখল করে নেন। স্বভাবতই এ ঘটনা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যকে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ করে এবং কিলিকিয়া অঞ্চলকে কেন্দ্র করে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ও এন্টিয়কের মধ্যে বিবাদ-সংঘাত সৃষ্টি হয়। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ন্যায় বৃহৎ শক্তির সঙ্গে সংঘাতে জড়ানোর কারণে এন্টিয়ক শাসক রেমন্ডের চিন্তাজগৎ

---

৫২৯. Runciman: op. cit., 11, p. 224.

থেকে এডেসা রাজ্য বলতে গেলে বিস্মৃত হয়ে যায়। ফলে এডেসা রাজ্যও তার সবচেয়ে নিকটবর্তী ক্রুসেড রাজ্যের সাহায্যপ্রাপ্তির আশা হারিয়ে ফেলে।(৫৩০)

৩. হঠাৎ করেই শিকার ভ্রমণে গিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মারা যান বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের শাসক ফাল্ক অ্যাঞ্জো! মৃত্যুর পূর্বে তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক দুজন পুত্র রেখে যান। প্রথমজন ৩য় বল্ডউইন (Baldwin III)-এর বয়স তখন তেরো বছর আর দ্বিতীয়জন অ্যামালরিক (Amalric I)-এর বয়স সাত বছর। ফলে কিশোর ৩য় বল্ডউইন সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তার মা ও ২য় বল্ডউইনের কন্যা মেলিসেন্ড শাসনকার্যে তার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ফাল্কের সঙ্গে প্রতারণা করা মেলিসেন্ডের আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে করে এসেছি।(৫৩১)

এর ফলে বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের মূল কর্তৃত্ব চলে যায় এই নারীর হাতে। পুত্র ৩য় বল্ডউইনের নামে তিনিই রাজ্যশাসন করতে থাকেন। ফলে রাজ্যটির প্রভাব-প্রতিপত্তি বহুলাংশে দুর্বল হয়ে যায় এবং ক্রুসেড রাজ্যগুলোর পারস্পরিক ঐক্য কার্যত বিভক্ত হয়ে পড়ে। কারণ, দীর্ঘদিন যাবৎ বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজাই সকল ক্রুসেডার নেতাকে ঐক্যবদ্ধ রাখতেন এবং তাদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ দূর করতেন। এখন তো রেমন্ড অফ পয়টিয়ার্স ও ২য় জোসেলিনের ন্যায় সামরিক নেতৃবৃন্দ কিছুতেই একজন নারীর কথা শুনবেন না এবং একজন শিশুর কর্তৃত্ব কিছুতেই মেনে নেবেন না।(৫৩২)

৪. এডেসার শাসক ২য় জোসেলিন ও এন্টিয়কের শাসক রেমন্ড অফ পয়টিয়ার্সের মধ্যকার বিবাদ এবার প্রকাশ্য রূপ ধারণ করে। তারা আগে থেকেই একে অপরকে প্রচণ্ড ঘৃণা করতেন এবং শত্রুতা পোষণ করতেন। উভয়ের রাজত্বের মধ্যবর্তী মুসলিম শাসনভুক্ত অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা নিয়ে উভয়ের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল।(৫৩৩) ইতিপূর্বে অধিকৃত ইসলামি ভূখণ্ডে ক্রুসেডারদের সর্বোচ্চ নেতা

---

৫৩০. Brehier, op. cit., p. 328.

৫৩১. Setton: op. cit. 1, p. 444.

৫৩২. Grousset: op. cit. 11, pp. 147-175 & Setton: op. cit. 1, p. 444.

৫৩৩. Guilaume de Tyr, 1, p. 709.

হিসেবে রাজা ফাল্ক এ জাতীয় সংঘাতকে আড়াল করে রাখতেন এবং তাদের উভয়কে প্রকাশ্যে সংঘাতে জড়াতে নিষেধ করতেন। তার মৃত্যুর পর এমন কেউ ছিল না, যিনি তাদেরকে বাধা দেবেন এবং বিবাদ দূর করার চেষ্টা করবেন। এ কারণে উভয়ের মধ্যকার বিবাদ এবার প্রকাশ্য সংঘাতে রূপ নেয়।[৫৩৪]

৫. হঠাৎ করেই ইন্তেকাল করেন শক্তিশালী উরতুকি নেতা রুকনুদ্দৌলা দাউদ বিন সুকমান। যদিও শেষ সময়ে তিনি ইমাদুদ্দিন জিনকির মিত্র ছিলেন; কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব আস্থা রাখার মতো ছিল না। এমন আশঙ্কা মোটেও অমূলক ছিল না যে, রুকনুদ্দৌলা যেকোনো মুহূর্তে ইমাদুদ্দিন জিনকির বিরুদ্ধে চলে যাবেন এবং ইমাদুদ্দিন জিনকির পৃষ্ঠদেশে আঘাত হানবেন। নিজের রাজ্য ও ক্ষমতা রক্ষার প্রয়োজনে হয়তো তিনি ক্রুসেডারদের সঙ্গে মিত্রতা করতেও দ্বিধা করবেন না।

রুকনুদ্দৌলার মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত হন তার পুত্র কারা আরসালান বিন দাউদ।[৫৩৫] তিনি ছিলেন তার পিতার সম্পূর্ণ বিপরীত। পিতার ন্যায় রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও রণকুশলতা তার ছিল না। বরং দায়িত্ব গ্রহণের পর শুরুতেই তিনি এডেসার শাসক ২য় জোসেলিনের সঙ্গে জোট বাঁধার সিদ্ধান্ত নেন।[৫৩৬] যদিও এ সিদ্ধান্ত বাহ্যত অত্যন্ত ভয়াবহ ছিল; কিন্তু এর দ্বারা শুরুতেই কারা আরসালানের নীতি উন্মোচিত হয়ে যায় এবং ইমাদুদ্দিন জিনকি তার রাজ্যে আক্রমণ চালানোর জন্য উপযুক্ত যৌক্তিকতা পেয়ে যান। আর ইমাদুদ্দিন জিনকির পক্ষে তখন কারা আরসালানের রাজ্যে অভিযান পরিচালনা একেবারেই সহজতর ছিল। কারণ, কারা আরসালানের সামরিক অভিজ্ঞতার যেমন অভাব ছিল, নিজ সৈন্যদের ওপর তার প্রভাবও ছিল দুর্বল।

এভাবেই চলমান সময়ের বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন ঘটনা সম্মিলিতভাবে এডেসা

---

৫৩৪. সাইদ আশুর, *আল-হারাকাতুস সালীবিয়্যা*, ১/৪৭৯।

৫৩৫. ইবনুল আযরাক আল-ফারিকি, *তারীখুল আযরাকিল-ফারিকি আ'লা হামিশি যায়লি তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ২৬৭।

৫৩৬. শিহাবুদ্দিন আহমাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নুওয়াইরী, *নিহায়াতুল আরাব ফী ফুনূনিল আদাব*, ২৭/১৩৯ ও রানচিমান, *তারীখুল হুরুবিস সালিবিয়্যাহ*, ২/৩৭৯।

রাজ্যের পতন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে। একদিকে এডেসা রাজ্য এন্টিয়ক রাজ্য ও বাইতুল মুকাদ্দাস সাম্রাজ্যের সহায়তা হারিয়ে ফেলে, আরেকদিকে হারিয়ে ফেলে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যকে। এর পাশাপাশি জাযিরা অঞ্চল হারায় রুকনুদ্দৌলা দাউদ বিন সুকমানের মতো একজন একগুঁয়ে রাষ্ট্রনায়ককে। ফলে মহান বীর ইমাদুদ্দিন জিনকির সামনে এডেসা রাজ্যের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

ইমাদুদ্দিন জিনকির বিনম্রতা

এই তো এডেসার পথ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে!

ইমাদুদ্দিন জিনকি এবার সামরিক দৃষ্টিতে এডেসা রাজ্যের দিকে তাকান। তিনি দেখতে পান, সম্রাট ২য় জন কমনিনোস ও রাজা ফাল্ক অ্যাঞ্জোর মৃত্যু এবং এন্টিয়ক রাজ্যের সঙ্গে সংঘাতের কারণে রাজ্যটির সহায়তা-সম্পর্ক শেকড় থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এখন রাজ্যটির কেবল নতুন উরতুকি শাসক কারা আরসালান বিন দাউদের মাধ্যমে জাযিরা অঞ্চলের উরতুকিদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। এবার তাই ইমাদুদ্দিন জিনকি এই সম্পর্কটিও কেটে ফেলে এডেসা রাজ্যকে পার্শ্ববর্তী জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলার মনস্থ করেন। তখন তার জন্য এডেসা রাজ্যের ওপর আঘাত হানা আরও সহজ হবে। ইমাদুদ্দিন জিনকি সে বছরই অর্থাৎ ৫৩৮ হিজরি সনে (১১৪৩ খ্রিষ্টাব্দে) শাবিখতান অঞ্চলে বিদ্যমান বিভিন্ন ক্রুসেড দুর্গের পতন ঘটানোর লক্ষ্যে সামরিক অভিযান শুরু করেন। জাযিরা অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত শাবিখতান অঞ্চলকে এডেসা রাজ্য ও কারা আরসালানের কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলের সীমান্তরেখা বিবেচনা করা হতো। তিনি এ অভিযানের মাধ্যমে দুই মিত্রকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চাচ্ছিলেন। ইমাদুদ্দিন জিনকি জামলিন, মাওযার, তিল-মাওযান (Urkesh) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গসহ শাবিখতান অঞ্চলের বেশ কয়েকটি দুর্গের পতন ঘটান।[৫৩৭] এর মাধ্যমে তিনি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বাস্তবায়নে সক্ষম হন। এডেসা রাজ্য আশেপাশের সবার থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ইমাদুদ্দিন জিনকি এখন চাইলেই এডেসা অভিমুখে রওনা হতে পারেন।

---

[৫৩৭]. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩২৯।

ইমাদুদ্দিন জিনকি যখন এই অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ করেই তার কাছে এমন এক আকস্মিক ও আশঙ্কাজনক সংবাদ এসে পৌঁছায়, যার কারণে তার সকল পরিকল্পনা ধূলিসাৎ হওয়ার এবং সকল প্রস্তুতি ভন্ডুল হওয়ার উপক্রম হয়!

বাগদাদ থেকে সংবাদ আসে যে, সেলজুক সুলতান মাসউদ ইমাদুদ্দিন জিনকির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তার কাছ থেকে তার রাজত্ব কেড়ে নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন![৫৩৮]

এমন এক সময়ে সুলতান মাসউদের ইমাদুদ্দিন জিনকির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শখ হলো!

নিঃসন্দেহে সুলতান মাসউদ ছিলেন বিভিন্ন ধরনের আত্মিক ও চারিত্রিক ব্যাধিতে আক্রান্ত!

তিনি রাজনৈতিক বক্রতার ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি জানতেন না, কোন দিকে যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া উচিত এবং কোন পথে নিজ বাহিনীকে পরিচালিত করা উচিত!

একই সঙ্গে তিনি প্রচণ্ড পর্যায়ের ধর্মীয় দুর্বলতার ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন। আর তাই জাতির এই চরম দুর্যোগপূর্ণ সময়েও মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করতে তার বিবেকে সামান্য বাঁধেনি। তিনি এমন এক সিদ্ধান্ত নিতে সামান্য দ্বিধা করেননি, যা দ্বারা ক্রুসেডারদের প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ হবে আর মুসলমানদের ধ্বংস ত্বরান্বিত হবে!

তিনি চারিত্রিক অধঃপতনের ব্যাধিতেও আক্রান্ত ছিলেন। এ কারণেই তিনি একজন মুজাহিদের পিঠে ছুরি চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং ঈমানদারদের বাহিনীর জন্য ফাঁদ পাততে অগ্রসর হচ্ছিলেন!

যেকোনো বিবেচনায় এটি ছিল চরম দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি!

এই চরম ভীতিপ্রদ পরিস্থিতির মোকাবিলায় ইমাদুদ্দিন জিনকি এখন কী করবেন?!

যেহেতু তার এডেসা অভিযানের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে গেছে,

---

৫৩৮. প্রাগুক্ত, ৯/৩২৮।

তাহলে কি তিনি সুলতান মাসউদের বিষয়টি উপেক্ষা করার ভান করে এডেসা অভিমুখেই অগ্রসর হবেন? কিন্তু এতে তো সুলতান মাসউদের সামনে তার পৃষ্ঠদেশ উন্মুক্ত হয়ে পড়বে। তখন তো মাসউদ পেছন থেকে হামলা করে সবকিছু শেষ করে দেবেন।

নাকি তিনি সুলতান মাসউদের মোকাবিলা করবেন এবং এডেসা রাজ্য জয়ের সুযোগ নষ্ট করবেন, যার জন্য তিনি তার শাসনামলের শুরু থেকে অর্থাৎ আঠারো বছর ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছেন?!

সুলতান মাসউদ তাকে ভয়াবহ সংকটে ফেলে দিয়েছেন!

কিন্তু সুলতান মাসউদ কেন এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গেলেন?!

তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন, তার চারপাশের ভূখণ্ড দিনে দিনে সংকীর্ণ হয়ে আসছে। তিনি অনুভব করছিলেন, তার প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেক কমে গেছে। এখন চারিদিকে ইমাদুদ্দিন জিনকির জয়জয়কার। তিনি স্পষ্টতই প্রত্যক্ষ করছিলেন যে, আশেপাশের যেসব আমির ও প্রশাসক একসময় তার আনুগত্য স্বীকার করত, তারা এখন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে শুরু করেছে এবং তার আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তিনি ধারণা করছিলেন যে, এ সবকিছুই ঘটছে তার শক্তি ও ক্ষমতা দুর্বল করার লক্ষ্যে ইমাদুদ্দিন জিনকির প্রত্যক্ষ প্ররোচনায়।[৫৩৯]

সুলতান মাসউদ সব সময় তার ক্ষমতা, সালতানাত ইত্যাদি নিয়েই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। তিনি ক্রুসেডারদের বিষয়ে সর্বদা বিস্মৃতির ভান করেছেন, অজ্ঞতার ভান করেছেন মুসলমানদের বিপদ সম্পর্কে। আর এখন তিনি এমন এক পদক্ষেপ বাস্তবায়নের চেষ্টা করছেন, যা তাকে, ক্রুসেডারদেরকে ও শয়তানকে ছাড়া আর কাউকে সন্তুষ্ট করবে না! নিঃসন্দেহে এ বড় দুর্যোগ!

ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ. চিন্তার সাগরে ডুবে যান। তিনি ভাবতে থাকেন, কী করবেন?

অবশেষে তিনি এমন সিদ্ধান্তেই উপনীত হন, যা এই পরিস্থিতিতে পুরোপুরি সঠিক ছিল।

এই সংকটের সর্বোৎকৃষ্ট সমাধান ছিল যেকোনো মূল্যে এমনকি সুলতান

---

৫৩৯. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩২৮।

মাসউদের সামনে বিনীত হয়ে এবং তার সালতানাত ও ক্ষমতার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করে হলেও তার সন্তুষ্টি কিনে নেওয়া। অথচ সকলেই জানে যে, নিশ্চিতভাবেই ইমাদুদ্দিন জিনকি সুলতান মাসউদের চেয়ে অনেক গুণ শক্তিশালী। কিন্তু ইমাদুদ্দিন জিনকির সামনে পারিপার্শ্বিক কোনো যুদ্ধে জড়িয়ে সময় নষ্ট করার সুযোগ ছিল না। তা ছাড়া তিনি তো কোনো উপাধি বা সম্মানের প্রতি লালায়িত নন। তিনি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। তিনি চান তার এই প্রচেষ্টায় কোনো কিছুই যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়; তা যেকোনো বিষয়ই হোক না কেন।

ইমাদুদ্দিন জিনকির কাছে এই সংবাদ পৌঁছার অব্যবহিত পরেই তার পুত্র সাইফুদ্দিন গাজি পিতাকে একই সংবাদ অবহিত করতে বাগদাদ থেকে পালিয়ে মসুলে চলে আসেন। ইমাদুদ্দিন জিনকি তার বড় পুত্র সাইফুদ্দিন গাজিকে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে সুলতান মাসউদের খেদমতে রেখে দিয়েছিলেন। এটি ছিল তার একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। এর মাধ্যমে তিনি সুলতানের নৈকট্য অর্জন এবং অকল্যাণ থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাচ্ছিলেন। তা ছাড়া সাইফুদ্দিন গাজি সুলতানের দরবারের বিভিন্ন কর্মতৎপরতার সংবাদ তার পিতার কাছে পৌঁছিয়ে দিতেন। সাইফুদ্দিন যখন সুলতান মাসউদের দরবারের এই পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হন, তখন কালবিলম্ব না করে তার পিতাকে সতর্ক করার জন্য সেখান থেকে পালিয়ে মসুলে চলে আসেন। কিন্তু ইমাদুদ্দিন জিনকি এক বিস্ময়কর আচরণ করেন। তিনি পুত্রকে সাক্ষাতের অনুমতিদানে অস্বীকৃতি জানান এবং তাকে সুলতানের কাছে ফেরত পাঠান। ইমাদুদ্দিন জিনকি পুত্রের সঙ্গে নিজের পক্ষ থেকে একজন বার্তাবাহকও প্রেরণ করেন। বার্তাবাহক সুলতান মাসউদের কাছে ইমাদুদ্দিন জিনকির বার্তা পৌঁছিয়ে দেয়। বার্তায় ইমাদুদ্দিন জিনকি বলেন, 'আমার পুত্র সুলতানকে আমার প্রতি অপ্রসন্ন ও বিরাগভাজন হতে দেখে ভয়ে পালিয়ে চলে এসেছিল। আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেই তাকে আবার সুলতানের খেদমতে পাঠিয়ে দিলাম। সে তো আপনার গোলাম। আমার পুরো রাজ্যই তো আপনার!'

ইবনুল আছির লিখেছেন, 'তার এ আচরণ সুলতানের মনে বিরাট প্রভাব ফেলে।'[৫৪০]

ইমাদুদ্দিন জিনকির এই অবস্থানে সুলতান মাসউদ অত্যন্ত প্রভাবিত হন। হয়তো তিনি মনে করেছিলেন যে, এটি তার প্রতি ইমাদুদ্দিন জিনকির বাস্তব আনুগত্য অথবা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, এটি সম্পূর্ণই একটি কূটনৈতিক প্রতারণা। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তার পক্ষে এরপরও ইমাদুদ্দিন জিনকির বিরুদ্ধে যুদ্ধের লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া তিনি ইমাদুদ্দিন জিনকির শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। এরপরও যদি তিনি জিনকির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন, তাহলে সাধারণ মুসলিম জনগণ কিছুতেই তার প্রতি দয়া করবে না। কারণ, ইমাদুদ্দিন জিনকি তার প্রতি সুস্পষ্ট ভাষায় আনুগত্য প্রকাশ করায় তিনি বাহ্যত যুদ্ধের বৈধতা ও যৌক্তিকতা হারিয়ে ফেলেছেন।

এভাবেই সুলতান মাসউদ তার পরিকল্পনা থেকে সরে আসেন এবং ইমাদুদ্দিন জিনকি এই আকস্মিক দুর্যোগ হতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। এবার তিনি পূর্ণ মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেন এডেসা অভিমুখে।

আল্লাহপ্রদত্ত মহান বিজয়

ইমাদুদ্দিন জিনকি ছিলেন বাস্তববাদী। তিনি জানতেন, এডেসার দুর্গগুলো অত্যন্ত দুর্ভেদ্য ও সুরক্ষিত। তিনি এও জানতেন যে, ২য় জোসেলিন ও তারা সৈন্যরা চাইলেই এসব মজবুত দুর্গে অবস্থান গ্রহণ করে তার আক্রমণ মোকাবিলা করে টিকে থাকতে পারবে। বিগত পঞ্চাশ বছরের মুসলিম নেতৃবৃন্দের পূর্ব অভিজ্ঞতাও একে সমর্থন করছিল। আর তাই মৌলিকভাবে ইমাদুদ্দিন জিনকির পরিকল্পনা ছিল এমন আকস্মিক সময়ে এডেসায় হামলা চালানো, যখন নগরীটি শাসক ও সৈন্যবাহিনীশূন্য থাকবে। কিন্তু ইমাদুদ্দিন জিনকি কি এমন সুযোগ আসার প্রতীক্ষায় বসে থাকবেন? এর জন্য তো দীর্ঘ দিনও দেরি করতে হতে পারে। তিনি তো জানেন না, আগামী দিনগুলো তার জন্য কী বার্তা নিয়ে অপেক্ষা করছে!

ইমাদুদ্দিন জিনকির এমন কিছু করতে হবে, যাতে ২য় জোসেলিন দুর্গ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে প্ররোচিত হন। কিন্তু তাকে মোটেও ঘাবড়ে দেওয়া

---

৫৪০. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩২৮-৩২৯।

যাবে না। কারণ, ২য় জোসেলিন যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রতি মোটেও আগ্রহী নন; তিনি পছন্দ করেন আরাম ও বিলাসিতা।

কী করা যায় তাহলে?!

ইমাদুদ্দিন জিনকি সিদ্ধান্ত নেন, তিনি প্রথমে ২য় জোসেলিনের তৎকালীন মিত্র কারা আরসালানের শাসনাধীন কোনো দুর্গে আক্রমণ করতে যাওয়ার ভান করবেন। বাস্তবেও তিনি এডেসার নিকটবর্তী সে অঞ্চলে বাহিনী নিয়ে রওনা হবেন। এর পাশাপাশি তিনি বাতাসে খবর ছড়িয়ে দেবেন যে, তার সহায়তায় শীঘ্রই আলেপ্পো থেকে একটি বাহিনী রওনা হবে। তিনি আশা করছিলেন, এ সংবাদ পেয়ে ২য় জোসেলিন আলেপ্পো থেকে আগত সামরিক সহায়তার পথ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য নিজ দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসতে প্ররোচিত হবেন। ২য় জোসেলিন যখন এডেসা থেকে বের হয়ে দূরে চলে আসবেন, তখন হঠাৎ করেই ইমাদুদ্দিন জিনকি তার গতিপথ পরিবর্তন করবেন এবং উরতুকিদের অঞ্চল রেখে সরাসরি এডেসায় পৌঁছে নগরীটি অবরোধ করবেন। আর এভাবে হয়তো এডেসা নগরীর পতন ঘটানোর সুযোগ সৃষ্টি হবে![৫৪১]

এটি ছিল একটি মানবিক পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা। ইমাদুদ্দিন জিনকির পক্ষে এতটুকুই করার ছিল। দার্শনিক দৃষ্টিতে চিন্তা করলে এক্ষেত্রে এমন হাজারো প্রতিবন্ধকতা ছিল, যা তার পরিকল্পনায় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং সফলতার পথ বন্ধ করে দিতে পারে। হতে পারে ২য় জোসেলিন দ্বিধান্বিত হয়ে আর বের হবেন না। হতে পারে তিনি ইচ্ছা করেই তার মিত্রকে সাহায্য করার বিষয়টি মনে না থাকার ভান করবেন। হতে পারে কারা আরসালান ইমাদুদ্দিন জিনকির পথ রুখে দাঁড়াবেন; ফলে তিনি উপযুক্ত সময়ে এডেসায় পৌঁছতে ব্যর্থ হবেন। এমন আরও অনেক কিছুই হওয়ার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু এগুলোর কোনোটিই আল্লাহ তাআলা চাননি। আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন, তার মুমিন বান্দাদের ওপর নুসরত ও সহায়তা অবতীর্ণ করবেন। তাই তিনি যাবতীয় অবস্থান ও পরিস্থিতিকে মুসলমানদের কল্যাণের দিকেই পরিচালিত করেন এবং পথের সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে দেন। ফলে সবকিছুই পরিচালিত হয় ইমাদুদ্দিন

---

৫৪১. শিহাবুদ্দিন আহমাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নুওয়াইরী, *নিহায়াতুল আরাব ফী ফুনূনিল আদাব*, ২৭/১৪৩।

জিনকির পরিকল্পনামতো তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে।

এ তো জগৎ-সংসারের প্রতিপালকের সিদ্ধান্ত! পবিত্র কুরআনের ভাষায়—

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

তার ব্যাপার তো এই যে, তিনি যখন কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন কেবল বলেন, 'হয়ে যাও'। অমনি তা হয়ে যায়।

[সুরা ইয়াসিন : ৮২]

৫৩৯ হিজরি সনের রবিউস সানি মাসের শেষ দিকে (১১৪৪ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে) ইমাদুদ্দিন জিনকি বিশাল এক বাহিনী নিয়ে মসুল থেকে এডেসা রাজ্য অভিমুখে রওনা হন। তিনি তার সকল সেনাপতি ও সৈন্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, কেউ যেন এই গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে যোগদানে বিরত না থাকে। আর তাই সকলে তার সঙ্গে এ অভিযানে বের হয়। তিনি তার সেই বাহিনী নিয়ে রওনা হন, যা প্রস্তুত করার জন্য তার পুরো জীবন ব্যয় করেছেন।

২য় জোসেলিন ও তার গুপ্তচররা যেন মনে করে যে, তিনি এডেসার উদ্দেশে বের হননি এবং এডেসায় অভিযান পরিচালনার চিন্তাও করছেন না, এজন্য তিনি তার বাহিনী নিয়ে উরতুকিদের শাসনাধীন আমিদ নগরী অভিমুখে অগ্রসর হন। ২য় জোসেলিন পুরোপুরি প্রতারিত হন। ইমাদুদ্দিন জিনকি তো বিগত ছয় বছর করে জাযিরা অঞ্চলে উরতুকিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেই পুরোপুরি ব্যস্ত ছিলেন। আর তাই এ অভিযান নতুন কিছু নয়; আরেকটি উরতুকি দমন অভিযান! ইমাদুদ্দিন জিনকি যেভাবে পরিকল্পনা সাজিয়েছিলেন, ঠিক সেভাবেই ২য় জোসেলিন তার বাহিনী নিয়ে বের হয়ে পড়েন এবং আলেপ্পো থেকে আগত সামরিক সহায়তার পথ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার লক্ষ্যে দক্ষিণে অগ্রসর হন। ইমাদুদ্দিন জিনকির গোয়েন্দারা দ্রুত এ সংবাদ তার কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। তিনি তৎক্ষণাৎ গতিপথ বদলে ফেলেন এবং এডেসা অভিমুখে অগ্রসর হন।

ইমাদুদ্দিন জিনকি নিজে এক পথে রওনা হন আর তার হাজিব সালাহুদ্দিন ইয়াগিসিয়ানিকে অন্য পথে প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল, পথে যদি ক্রুসেডার গুপ্তচররা ওত পেতে থাকে, তবে তাদেরকে বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করে ফেলা। মুসলিম বাহিনী অধিকাংশ সময় রাতের অন্ধকারে পথ চলে।

যে রাতে মুসলিম বাহিনী এডেসার কাছাকাছি পৌঁছায়, সে রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। শীতও ছিল প্রচণ্ড। কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়া মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রায় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি; বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ক্রুসেডার গুপ্তচরদের নজরদারির ক্ষেত্রে।

একসময় রাতের ঘন অন্ধকার দূরীভূত হয়; ভোরের উষায় উদ্ভাসিত হয় দিগ্‌দিগন্ত।

৫৩৯ হিজরি সনের ২৮ রবিউস সানি।

১১৪৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ নভেম্বর।[৫৪২]

ভোরের আলো প্রস্ফুটিত হতেই এডেসা নগরীর অভ্যন্তরে অবস্থানরত ক্রুসেডার সৈন্যরা আবিষ্কার করে, মুসলিম বাহিনী চতুর্দিক থেকে এডেসা ঘিরে ফেলেছে![৫৪৩]

এই ভীতিকর সংবাদ এডেসার শাসক ২য় জোসেলিনের কাছেও পৌঁছে যায়। তবে বড় দেরি করে! তিনি এডেসায় ফিরে সুবিশাল মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখি হতে ভীত হয়ে পড়েন। এর পরিবর্তে তিনি এডেসা রাজ্যভুক্ত তিল-বাশির নগরীতে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এডেসা নগরী ও তিল-বাশির নগরীর মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে ছিল ফুরাত নদী। ২য় জোসেলিন চাচ্ছিলেন ঘটনাপ্রবাহের যথাসম্ভব নিকটে অবস্থান করে শুরু থেকে প্রতিটি পরিবর্তন সম্পর্কে দ্রুত অবগত হতে এবং সুযোগমতো উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। অধিকন্তু ফুরাত নদীর প্রতিবন্ধকতার কারণে তিল-বাশির অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিল। পরিস্থিতির দাবি মেনে তাকে যদি পালাতেও হয়, ফুরাত তাকে পালানোর যথেষ্ট সময়ের ব্যবস্থা করে দেবে![৫৪৪]

২য় জোসেলিন এর পাশাপাশি আরও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যদিও এন্টিয়কের শাসক রেমন্ড অফ পয়টিয়ার্সের সঙ্গে তার বিরোধ চলছিল; কিন্তু তিনি তার কাছে দ্রুত সাহায্যবার্তা প্রেরণ করেন। ওদিকে বাইতুল

---

৫৪২. অগ্রগণ্য মতানুসারে এডেসা অবরোধ শুরু হয় ১ জুমাদাল উখরা (২৮ নভেম্বর)। [সম্পাদক]

৫৪৩. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩৩১ ও Eliasseff: op. cit. 11, pp. 379-380.

৫৪৪. উইলিয়াম সুরি, *তারীখুল হুরূবিস সালিবিয়্যাহ*, ২/৭৩৭-৭৩৮।

মুকাদ্দাস রাজ্যের অবস্থান যদিও এডেসা থেকে অনেক দূরে, অধিকন্তু রাজ্যটি তখন ছায়াশাসক মেলিসেন্ডের দুর্বল শাসনে পরিচালিত হচ্ছিল, তথাপি তিনি মেলিসেন্ডের কাছেও একটি সাহায্যবার্তা প্রেরণ করেন।[৫৪৫]

এন্টিয়কের শাসক রেমন্ড অফ পয়টিয়ার্স অবশ্য কিলিকিয়া অঞ্চলে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে ২য় জোসেলিনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন।[৫৪৬] আর বাইতুল মুকাদ্দাস প্রশাসনের হর্তাকর্তা মেলিসেন্ড তার অধীনস্থ নাবলুস অঞ্চলের প্রশাসক ফিলিপ ও জালিল অঞ্চলের প্রশাসক অ্যালিন্যান্ড (Elinand)-এর নেতৃত্বে দ্রুত একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু দীর্ঘ দূরত্বের কারণে তারা যতক্ষণে এ অঞ্চলে পৌঁছায়, ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে![৫৪৭]

ইমাদুদ্দিন জিনকির জিহাদি অভিযান সাধারণ মুসলমানদের মাঝে ব্যাপকভাবে জিহাদি চেতনা জাগিয়ে তুলেছিল। আর তাই ইরাকের উত্তরাঞ্চল থেকে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবী মুজাহিদ মুসলিম বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। ফলে মুসলিম বাহিনীর সদস্যসংখ্যা গণনাতীত পর্যায়ে পৌঁছেছিল।

নগরীর অভ্যন্তরে যেন কোনো ধরনের সাহায্য-সহায়তা পৌঁছতে না পারে, এ উদ্দেশ্যে ইমাদুদ্দিন জিনকি এডেসায় পৌঁছার সকল পথ বন্ধ করে দেন। এই মহান দুঃসাহসী বীর নগরপ্রাচীরের পাশে ভারী ভারী অবরোধসামগ্রী স্থাপন করেন, যার মধ্যে ছিল গোটা দশেক মিনজানিক। এরপর তার নির্দেশে নগরপ্রাচীর লক্ষ্য করে একটানা গোলাবর্ষণ শুরু হয়। অবরোধের দিনগুলোতে এক মুহূর্তের জন্যও গোলাবর্ষণ বন্ধ রাখা হয়নি।[৫৪৮]

নগরপ্রাচীরের ভেতরে অবস্থানরত এডেসাবাসী প্রমাদ গুনতে থাকে। তারা অনুভব করে, চতুর্দিক থেকে তারা কঠিন বিপদে আটকে গেছে। অধিকাংশ যোগ্য সেনাপতিই শাসক জোসেলিনের সঙ্গে নগরের বাইরে

---

৫৪৫. Stevenson: op. cit., p. 149.

৫৪৬. রানচিমান, *তারীখুল হুরুবিস সালিবিয়্যাহ*, ২/৩৮০।

৫৪৭. উইলিয়াম সুরি, *তারীখুল হুরুবিস সালিবিয়্যাহ*, ২/৭৩৯।

৫৪৮. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩৩১-৩৩২ ও ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৭৯।

রয়ে গেছে। নগরের অভ্যন্তরে এমন কোনো সামরিক যোগ্যতাসম্পন্ন সেনাপতি নেই, যে এই কঠিন মুহূর্তে সকলকে নেতৃত্ব দিতে পারে। অবশেষে খ্রিষ্টান ধর্মযাজকরাই প্রতিরোধে নেতৃত্ব দিতে অগ্রসর হয়। স্বাভাবিকভাবেই তাদের নেতৃত্বে ছিলেন ক্যাথলিক বিশপ ২য় হিউ। তার সঙ্গে ছিলেন আর্মেনীয় বিশপ জন ও ইয়াকুব গোষ্ঠীয় বিশপ বাসিল। সম্ভবত মুসলিম সেনাপতি ইমাদুদ্দিন জিনকি এডেসা নগরীর অভ্যন্তরে নিজস্ব গুপ্তচর রেখেছিলেন। তাদের মাধ্যমে এ সংবাদ অবগত হয়ে তিনি খ্রিষ্টানদের এই জোট ভেঙে ফেলার মনস্থ করেন।[৫৪৯] ইমাদুদ্দিন জিনকি প্রাচ্যকেন্দ্রিক দুই বিশপ অর্থাৎ আর্মেনীয় ও ইয়াকুবি বিশপের কাছে গোপনে বার্তা পাঠিয়ে তাদেরকে নিরাপত্তার বিনিময়ে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেন। তারা উভয়ে প্রথমে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও শেষদিকে আত্মসমর্পণে রাজি হয়। কিন্তু ক্যাথলিক বিশপ ২য় হিউ প্রতিরোধের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন এবং তাদের দুজনকেও সামরিক দায়িত্ব পালনে বাধ্য করেন।[৫৫০]

দিনে দিনে আহারসামগ্রী ও রসদসম্ভার ফুরিয়ে যেতে থাকে। এডেসা নগরী উপনীত হয় অতি কঠিন এক পর্যায়ে। অবরোধও এত দুর্ভেদ্য ছিল যে, না বাইরে থেকে শাসক ২য় জোসেলিনের ভেতরে প্রবেশ করা সম্ভব ছিল, না ভেতরের কারও সূক্ষ্ম সামরিক প্রহরা ভেদ করে বের হওয়া সম্ভব ছিল। ইমাদুদ্দিন জিনকি নগরীতে প্রবেশের সকল পয়েন্টে কঠিন প্রহরার ব্যবস্থা করেছিলেন।

ইমাদুদ্দিন জিনকির সঙ্গে নগরপ্রাচীর ধ্বংস করার জন্য 'খননকারী ফোর্স' নামে একটি বিশেষ বাহিনী ছিল। এবার এই বিশেষ বাহিনীটি অগ্রসর হয়ে প্রচণ্ড উদ্যমে নিজেদের কাজ শুরু করে। গোলাবর্ষণকারীরা তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছিল। সময়ের পরিক্রমায় বিজয়ের সুবাতাস বইতে শুরু করে। প্রতিপক্ষের প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখেও একসময় নগরপ্রাচীরের একটি অংশ দুর্বল হয়ে পড়ে। আল্লাহর পথের মুজাহিদরা এবার দ্বিগুণ উৎসাহে তাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। এক মুহূর্তের জন্যও কাজ বন্ধ ছিল না। আপন আপন সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয়ে

৫৪৯. Nerses, Shnorhail: Sur la Prised`Edesse Doc. Arm Vol. 1, pp. 247-255.

৫৫০. উইলিয়াম সুরি, *তারীখুল হুরূবিস সালিবিয়্যাহ*, ২/৭৩৮-৭৩৯।

কেউ সামান্য ক্রটি করছিল না।

অবরোধ শুরু হওয়ার আটাশ দিন পর[৫৫১] ৫৩৯ হিজরি সনের ২৬ জুমাদাল উখরা (১১৪৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর)[৫৫২] আল্লাহর হুকুমে নগরপ্রাচীরের একটি অংশ ধসে পড়ে।[৫৫৩]

মুসলিম বাহিনীর উদ্দীপনা যেন নবোদ্যমে জেগে ওঠে। চতুর্দিক থেকে তাকবিরধ্বনি উচ্চারিত হতে থাকে। প্রাচীরের ভাঙা অংশ দিয়ে মুসলিম বাহিনীর সদস্যরা স্রোতের ন্যায় সুরক্ষিত নগরীর ভেতরে প্রবেশ করতে থাকে। অল্প সময়ের মধ্যেই ভেতর থেকে নগরদ্বারগুলো খুলে দেওয়া হয়। এবার সুবিশাল মুসলিম বাহিনী বীর সেনাপতি ইমাদুদ্দিন জিনকির নেতৃত্বে ভেতরে প্রবেশ করে। মুসলিম বাহিনী নগরীর ভেতরে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালনরত ক্রুসেডার বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সবার আগে ক্রুসেডারদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন স্বয়ং ইমাদুদ্দিন জিনকি।[৫৫৪] অল্প সময়ের মধ্যেই নগরজুড়ে বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। ধুলোমেঘে ঢেকে যায় সবকিছু। পথে-ঘাটে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। এখানে সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে লাশ পড়ে থাকে। অল্প সময়ের মধ্যেই মুসলমানরা প্রতিটি প্রাচীর, নিরাপত্তা-চৌকি ও নগরদ্বারে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। নগরীর অভ্যন্তরে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রেও মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। হাজার হাজার নিহত ক্রুসেডারের মৃতদেহ বিভিন্ন স্থানে পড়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেন।

﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ﴾

(সুতরাং হে মুসলিমগণ! প্রকৃতপক্ষে) তোমরা তাদেরকে (অর্থাৎ কাফিরদেরকে) হত্যা করোনি; বরং আল্লাহ-ই তাদেরকে হত্যা করেছিলেন। এবং (হে নবী!) আপনি যখন তাদের ওপর মাটি নিক্ষেপ করেছিলেন, তখন তা আপনি নিক্ষেপ করেননি; বরং আল্লাহ-ই নিক্ষেপ করেছিলেন।

[সুরা আনফাল : ১৭]

---

৫৫১. মূলত ছাব্বিশ দিন পর। [সম্পাদক]

৫৫২. আরেক মতানুসারে এডেসার পতন ঘটে ৬ জুমাদাল উখরা (৩ ডিসেম্বর)। [সম্পাদক]

৫৫৩. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩৩২।

৫৫৪. প্রাগুক্ত, ৯/৩৩১।

বিশপ ২য় হিউ নিহত হয়ে সৈন্যদের পদতলে পিষ্ট হতে থাকেন। তার পতনের ফলে ক্রুসেডারদের মনোবল পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে যায় এবং তারা পালিয়ে নগরের অভ্যন্তরে বিদ্যমান দুর্গে আশ্রয় নেয়। মুসলিম সৈন্যরা নগরীর প্রতিটি স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। তারা প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও বন্দি লাভ করে। মুসলিম বাহিনীর একটি শক্তিশালী রেজিমেন্ট দুর্গ অবরোধ করার জন্য অগ্রসর হয়। দুদিন না যেতেই দুর্গটিরও পতন ঘটে। ইমাদুদ্দিন জিনকি দুর্গে অবস্থানকারী ক্রুসেডারদের হত্যা করার নির্দেশ দেন। অপরদিকে আর্মেনীয় ও ইয়াকুবিদের ছেড়ে দেওয়া হয়।[৫৫৫]

নিঃসন্দেহে দিনটি ছিল মহান আল্লাহর অনুগ্রহ-দানে সিক্ত একটি দিন।

ইসলামি ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় দিন!

যখন নগরজুড়ে মুসলমানদের সুস্পষ্ট প্রাধান্য প্রতিভাত হয় এবং পুরো নগরীতে ইমাদুদ্দিন জিনকির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে তিনি দমন অভিযান বন্ধ করার নির্দেশ দেন এবং সামরিক ক্রুসেডারদের ব্যতীত সবাইকে নিরাপত্তা প্রদান করেন। যোদ্ধা ক্রুসেডারদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, তাদের নারী ও শিশুদের বন্দি করা হয়।

আর্মেনীয় ও ইয়াকুবিদের ক্ষেত্রে ইমাদুদ্দিন জিনকি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। অথচ তারাও ক্রুসেডারদের সঙ্গে নগরীর প্রতিরক্ষায় শরিক ছিল। তবে ইমাদুদ্দিন জিনকি তাদের অবস্থান বিবেচনা করে উপলব্ধি করেন যে, তারা বাধ্য হয়ে এতে শরিক ছিল। এ কারণেই ইমাদুদ্দিন জিনকি তাদের প্রতি মার্জনার আচরণ করেন।[৫৫৬]

---

৫৫৫. L'AnoymeSyriaque, p. 282.

৫৫৬. উইলিয়াম সুরি, *তারীখুল হুরূবিস সালিবিয়্যাহ*, ২/৭৩৯ ও ইবনুল ইবরি, *তারীখুয-যামান*, পৃষ্ঠা : ১৫৬-১৫৭।

সুদৃঢ় কিছু সিদ্ধান্ত

এডেসা বিজয় সমাপ্ত হওয়ার পর ইমাদুদ্দিন জিনকি তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ ঘটান। তিনি বলেন, 'এমন একটি নগরীকে ধ্বংস করে ফেলা রাজনৈতিক দৃষ্টিতে বৈধ নয়।'[৫৫৭] ইমাদুদ্দিন জিনকি উপলব্ধি করেন যে, এডেসার মতো একটি সুপ্রাচীন বৃহৎ নগরীকে ধ্বংস করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া সমীচীন হবে না। বরং তার কর্তব্য একে সংরক্ষণ করে যথার্থ তত্ত্বাবধান করা। আর তাই তিনি এমন কিছু মানবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, একজন বিজয়ী সেনাপতির পক্ষে এর চেয়ে চমৎকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়।

১. তিনি আর্মেনীয় ও ইয়াকুবিদের সম্পদে হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করেন।[৫৫৮]

২. আর্মেনীয় ও ইয়াকুবি গোষ্ঠীর যেসব ব্যক্তিকে মুসলমানরা বন্দি করেছিল বা তাদের ধনসম্পদ যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছিল, তিনি তা ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দেন। প্রাচ্যের এসব খ্রিষ্টান নাগরিক ছিল এখানকার স্থানীয় অধিবাসী, যারা বহু বছর ধরে এ অঞ্চলে বসবাস করছিল। ইমাদুদ্দিন জিনকির নির্দেশে সৈন্যরা সবকিছু ফেরত দিয়ে দেয়। ফলে এডেসা নগরী আবারও সেই অবস্থায় ফিরে আসে, যেমনটি ইসলামি বিজয়ের পূর্বে ছিল![৫৫৯]

৩. সকলকে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। খ্রিষ্টানদের গির্জাগুলোতে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করা হতে বিরত থাকা হয়।[৫৬০]

৪. আর্মেনীয় ও ইয়াকুবিদের নগরীর অভ্যন্তরে নিজেদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে তাদের মুসলমানদের শরণাপন্ন হতে হবে না। অবশ্য তারা ইসলামি কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনস্থ থাকবে।[৫৬১]

---

৫৫৭. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩৩২।

৫৫৮. L'AnoymeSyriaque, p. 282.

৫৫৯. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩৩২ ও ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৭৯।

৫৬০. Runciman: op. cit., 11, p. 237.

৫৬১. Grousset: Hist. des Croisades, 11, p. 190.

৫. বিশপ ও ধর্মযাজকদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি, তত্ত্বাবধান ও উপঢৌকন প্রদান করা হয়। কারণ, তারাই সাধারণ জনগণকে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে।

৬. যেসব আর্মেনীয় নাগরিক ইতিপূর্বে ক্রুসেডারদের নিপীড়নে দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছিল, তাদেরকে ইসলামি শাসনের অধীনে শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে বসবাসের জন্য পুনরায় এডেসায় ফিরে আসার আহ্বান জানানো হয়।[৫৬২]

এভাবে প্রজ্ঞাপূর্ণ প্রশাসননীতি ও উদার চেতনার বাস্তবায়নের কারণে এডেসা নগরীতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরেরও অধিক সময় পর এডেসা আবারও ফিরে আসে মুসলমানদের হাতে। ফিরে আসে ক্রুসেডাররা দখল করার পূর্বের সেই পুরোনো চেহারায়; অর্থাৎ একটি ইসলামি শাসনাধীন খ্রিষ্টান অধ্যুষিত নগরীর অবয়বে।

নিঃসন্দেহে এটি ছিল এক অমর বিজয়। আল্লাহ তাআলা মহান বীর ইমাদুদ্দিন জিনকির অনন্যসাধারণ প্রচেষ্টাকে এই বিজয়মাল্যে ভূষিত করেন। এ বিজয়ের মাহাত্ম্য বোঝাতে আমরা এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইবনুল আছিরের মন্তব্য তুলে ধরাই যথেষ্ট মনে করছি। তিনি বলেন,

> “মুসলমানরা এরূপ বিজয় কখনো উপভোগ করেনি। চারিদিকে এর আলোচনা ছড়িয়ে পড়ে, জনেজনে চর্চিত হতে থাকে এবং লোকসমাবেশ এর প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে। এটি ছিল শ্রেষ্ঠতম বিজয়। সত্যই একে তুলনা করা যেতে পারে বদরের বিজয়ের সঙ্গে।”[৫৬৩]

ইমাদুদ্দিন জিনকি এডেসা নগরীর পতন ঘটিয়েই ক্ষান্ত হননি। তিনি এরপর দ্রুত এডেসা রাজ্যের অধীনস্থ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দুর্গে অভিযান পরিচালনা করে সেগুলোরও পতন ঘটান। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় সারুজ নগরীর দুর্গের কথা। এডেসা বিজয়ের এক মাসেরও কম সময় পর ৫৩৯ হিজরি সনের রজব মাসে (১১৪৫ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি

---

৫৬২. Michel Le Syrien. L11. pp. 262-268.

৫৬৩. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ৬৯।

মাসে) দুর্গটির পতন ঘটে।[৫৬৪] এরপর অবিজিত থেকে যায় এডেসা রাজ্যের অধীনস্থ ফুরাতের পশ্চিম তীরের ছোট ছোট কয়েকটি নগরী, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তিল-বাশির নগরী। ২য় জোসেলিন সেখানেই ঘাঁটি গেড়েছিলেন।

এভাবেই এডেসা রাজ্যের পতন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। যে ক্রুসেড রাজ্যটি প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, পতনের মিছিলেও সে যোগ দেয় সবার আগে!

এডেসা পতনের প্রভাব ও ফলাফল

নিঃসন্দেহে এ জাতীয় একটি মহান বিজয়ের অসংখ্য প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল থাকে। এডেসা বিজয়ও তার ব্যতিক্রম ছিল না। আমরা নির্দিষ্ট করে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রভাবের কথা উল্লেখ করতে পারি।

১. মুসলমানদের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস বহুগুণে সমুন্নত হয়। কেবল ইমাদুদ্দিন জিনকির রাজত্বের মুসলমানগণ নয়; বরং পুরো বিশ্বের মুসলমানদের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। বিভিন্ন স্থানে বিজয় উদ্‌যাপন করা হয়, প্রশস্তিমূলক কবিতা রচিত হয়, বক্তা ও খতিবদের আলোচনাজুড়ে থাকে এই বিজয়গাথা। এটি তো বিজয়ের আশা ও স্বপ্ন ছিল না, ছিল না সাফল্যের প্রতিশ্রুতি; এ তো প্রকৃত ফলাফল, অনুভবযোগ্য প্রভাব।

২. বিপরীত দিকে ক্রুসেডারদের আত্মবিশ্বাসে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। ২য় জোসেলিন কল্পনাও করেননি যে, সুরক্ষিত এডেসা রাজ্যের দুর্গগুলোর পতন ঘটতে পারে। তিনি মনে করেছিলেন, ইমাদুদ্দিন জিনকির এ অভিযান বিগত বছরগুলোর আর দশটা অভিযানের মতোই সাধারণ কোনো অভিযান। এই অবিশ্বাস্য অভিযান তাকে বলতে গেলে নিশ্চল করে দেয়। আর তাই তিনি তার বাহিনী নিয়ে নগরীর প্রতিরক্ষায় অগ্রসর হওয়ার সাহসই করেননি। নিঃসন্দেহে এটি তার, তার সঙ্গী ও সেনাপতিদের মনোজগতে গভীর ব্যর্থতার ক্ষত সৃষ্টি করে, যা তাদের ভবিষ্যৎ কর্মধারায় ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। তদ্রূপ আমরা এই ঐতিহ্যবাহী রাজ্যটিকে উদ্ধার করার জন্য অন্যান্য ক্রুসেড রাজ্যের

---

৫৬৪. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩৩২, *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ৭০ ও ইবনে ওয়াসিল, *মুফাররিজুল কুরুব*, ১/৯৪।

পক্ষ থেকেও কোনো ধরনের প্রচেষ্টা লক্ষ করিনি। এতে প্রমাণিত হয় যে, তারা বিজয়ের সম্ভাবনার বিষয়ে পুরোপুরি নিরাশ হয়ে গিয়েছিল।

৩. এই সুস্পষ্ট বিজয়ের পর এ অঞ্চলের মুসলমানরা ক্রুসেডারদের সঙ্গে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে উপনীত হয়। পূর্বের পঞ্চাশ বছর সব সময়ই ক্রুসেডারদের শক্তির পাল্লা ভারী ছিল। এমনকি এ সময় মুসলমানরা বিভিন্ন যুদ্ধে জয়লাভ করলেও সেসব যুদ্ধ হয়েছিল কোনো বাহিনী বা সীমিত জনশক্তির সঙ্গে। যুদ্ধ শেষে দু-পক্ষ আপন আপন নগরীতে ফিরে যেত, কাউকে কিছু হারাতে হতো না। মুসলমানরা কোনো নগরী বা দুর্গ পুনরুদ্ধার করলেও ক্রুসেডাররা দ্রুতই তা পুনর্দখল করে ফেলত। কিন্তু এখন শক্তিতে ভারসাম্য এসেছে। মুসলমানদের এখন ক্রুসেডারদের সঙ্গে মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়ানোর শক্তি অর্জিত হয়েছে। মুসলমানদের কৌশলও এখন বদলে গেছে। এতদিন কৌশল ছিল—'প্রতিপক্ষ আক্রমণ করলে প্রতিরোধ প্রচেষ্টা'। আর এখন কৌশল হলো—'আক্রমণই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিরক্ষা'!

৪. ক্রুসেডারদের এই ভীতিপ্রদ পরাজয় পশ্চিম ইউরোপকে জাগিয়ে তোলে। এতদিন তারা প্রাচ্যে ক্রুসেডারদের পরিস্থিতি নিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল। এবার ক্রুসেড রাজ্যগুলোতে বসবাসকারী ক্রুসেডারদের উদ্ধারের লক্ষ্যে পশ্চিম ইউরোপে নতুন করে প্রচারণা শুরু হয়। বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের রানী মেলিসেন্ড রোমে পোপের কাছে একটি সাহায্যবার্তা প্রেরণ করে ক্রুসেডারদের সহায়তায় বড় ধরনের সৈন্যসমাবেশের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। ইউরোপীয় এই জাগরণই ছিল অল্প কয়েক বছর পর সংঘটিত হওয়া দ্বিতীয় ক্রুসেড যুদ্ধের বীজ।[৫৬৫]

৫. এই বিজয়ের ফলে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সঙ্গে এন্টিয়ক রাজ্যের নীতিও বদলে যায়। যে রেমন্ড কিছুদিন পূর্বেও বাইজান্টাইনদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে কিলিকিয়া অঞ্চল দখল করে নিয়েছিলেন, তিনি হঠাৎ করেই অনুভব করেন যে, এ অঞ্চলে নতুন করে জেগে ওঠা ইসলামি শক্তির সামনে তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন। এই অনুভূতি থেকেই তিনি বাইজান্টাইন সম্রাট ম্যানুয়েল কমনিনোসের সঙ্গে সমঝোতা

৫৬৫. রানচিমান, *তারীখুল হুরূবিস সালিবিয়্যাহ*, ২/৩৯৭।

আলোচনা শুরু করেন এবং মুসলমানদের মোকাবিলায় পারস্পরিক সহযোগিতা বিনিময়ের প্রস্তাব দেন। তার এ প্রস্তাবই পরবর্তী সময়ে আরও একবার বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যকে হিলাল-ছালিব চলমান সংঘাত-ক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনতে ভূমিকা পালন করে।[৫৬৬]

৬. এই মহান বিজয়ের পর সুলতান মাসউদের পক্ষ থেকে ইমাদুদ্দিন জিনকিকে ক্ষমতা ও রাজত্ব হতে অপসারণ করার প্রচেষ্টা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এই মহান বীরের তুলনায় নিজের আয়তন কতটা ক্ষুদ্র, তিনি তা অনুমান করতে সক্ষম হন। তিনি বুঝতে পারেন যে, ইমাদুদ্দিন জিনকিকে অপসারণের কোনো চেষ্টা মুসলিম জনসাধারণ কিছুতেই বরদাশত করবে না। আর তাই ইমাদুদ্দিন জিনকির শাসনামলের শেষ সময় পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক বিরাজমান ছিল।

৭. এ মহান বিজয় আব্বাসি খলিফা মুকতাফি লি-আমরিল্লাহর চেতনা ও অনুভূতিতেও নাড়া দিতে সক্ষম হয়। মুকতাফি লি-আমরিল্লাহ ছিলেন খোদাভীরু ও সচ্চরিত্রবান একজন খলিফা। বিজয়ের সংবাদ পেয়ে তিনি ইমাদুদ্দিন জিনকির জন্য সম্মানসূচক বিভিন্ন উপহার প্রেরণ করেন এবং এতেই সীমাবদ্ধ না থেকে তাকে এমন সব উপাধি প্রদান করেন, যা সাধারণত কোনো প্রশাসক বা সেনাপতিকে প্রদান করা হতো না। ফলে ইমাদুদ্দিন জিনকি নতুন রূপে পরিচিত হতে থাকেন। এসব উপাধির মধ্যে ছিল—আল-মালিকুল আদিল (ন্যায়পরায়ণ শাসক), রুকনুল ইসলাম (ইসলামের স্তম্ভ), আল-আমিরুল মুযাফফার (বিজয়ী শাসক), উমদাতুস সালাতিন (শ্রেষ্ঠতম সুলতান), মুসলিম বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক, মালিকুল উমারা (শাসক-প্রধান) ইত্যাদি।[৫৬৭] খলিফাপ্রদত্ত এসব উপাধির মাধ্যমে মূলত ইমাদুদ্দিন জিনকির স্বাধিকার, স্বাধীন রাজত্ব, একক নেতৃত্ব ও কারও অধীনস্থ না হওয়ার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে ইমাদুদ্দিন জিনকির কাঁধে আগের দায়িত্বসমূহের পাশাপাশি আরও অনেক বড় দায়িত্ব অর্পিত হয়।

---

[৫৬৬]. মুহাম্মাদ সুহাইল তাকূশ, *তারীখুয-জিনকিয়্যীন ফিল-মাওসিলি ওয়া বিলাদিশ-শাম*, পৃষ্ঠা : ১৫৫।
[৫৬৭]. ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ২৮৩।

৮. এসব মহিমান্বিত বিজয় এবং সুলতান মাসউদ ও খলিফা মুকতাফি লি-আমরিল্লাহর এই পরিবর্তিত অবস্থান মূলত স্বাধীন জিনকি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘোষণা করছিল। ইমাদুদ্দিন জিনকিই হলেন এই সুমহান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। তার মৃত্যুর পর তার উত্তরসূরিগণ এ রাষ্ট্র শাসন করে। বহু শাসকপরিবার জিনকি রাজপরিবারের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। পরবর্তীকালে এই জিনকি পরিবারই ইসলামি বিশ্বের পথিকৃৎ ও নেতৃত্বের আসন অলংকৃত করে। মুসলিম বিশ্বের অভিভাবকত্বের পতাকা সেলজুক রাষ্ট্রের কাছ থেকে স্থানান্তরিত হয় জিনকি রাষ্ট্রের কাছে। আবারও বাস্তবায়িত হয় যুগে যুগে হাজার বার বাস্তবায়িত হওয়া সেই অমোঘ বিধান—

﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾

এ তো দিন-পরিক্রমা, যা আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে বদলাতে থাকি। [সুরা আলে-ইমরান : ১৪০]

৯. এই বিজয়ের পর জাযিরা অঞ্চলে উরতুক পরিবারের কর্মতৎপরতা পুরোপুরি থেমে যায়। যদিও কারা আরসালান বিন দাউদ ও হুসামুদ্দিন তামারতাশ প্রকাশ্যে ইমাদুদ্দিন জিনকির পতাকাতলে শামিল হওয়ার কথা ঘোষণা করেননি; কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমরা তাদের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের আপত্তি বা বিদ্রোহের কথাও শুনিনি। এই মহান ও প্রভাবক বিজয়ের কারণে তারা উভয়ে ইমাদুদ্দিন জিনকির শক্তির পরিধি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। আর তাই তারা আপন আপন শাসনাধীন ভূখণ্ড নিয়ে তুষ্ট থাকেন আর অপেক্ষা করতে থাকেন আগামী দিন কী বার্তা নিয়ে আসে, তা জানার জন্য!

১০. সামরিক দিক থেকে বিবেচনা করলে এই বিজয়ের ফলে মসুল ও শাম অঞ্চলের মধ্যবর্তী সকল পথ ক্রুসেডার-মুক্ত হয়ে যায়। ইরাক এবার তার পুরো সামর্থ্য ও সম্ভাবনা নিয়ে মুসলিম-ক্রুসেডার সংঘাতের অঙ্গনে প্রবেশ করার সুযোগ পায়। ইরাক ও পারস্য থেকে নিরাপদে সৈন্যরা শাম অঞ্চলে আসতে থাকে। তা ছাড়া সমৃদ্ধ এডেসা নগরী মুসলমানদের শাসনাধীনে চলে আসায় ইসলামি রাষ্ট্র লাভ করে বিশাল অর্থনৈতিক সম্পদ। পুরো ফুরাত উপত্যকা ইসলামি উপত্যকায় পরিণত হওয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশও বহুগুণ সমৃদ্ধ হয়।

এডেসা বিজয়ের ফলে যেসব প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল, এগুলো তার কয়েকটি। ক্রুসেড রাজ্য এডেসা সমকালীন মুসলিম সমাজ-জীবনে অনেক লাঞ্ছনা বয়ে এনেছিল। কিন্তু নিঃসন্দেহে প্রত্যেক অত্যাচারীর পতন আছে; প্রতিটি অন্ধকার রাতের শেষেই আছে সুহাসিনী প্রভাত।

﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

আল্লাহ তো আপন কর্মে পূর্ণ ক্ষমতাবান। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। [সুরা ইউসুফ : ২১]

* * *

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

গল্পের সমাপ্তি

ইমাদুদ্দিন জিনকির দিক থেকে বিবেচনা করলে এ বিজয়ের অর্থ স্থায়ী অবসর বা দীর্ঘ কয়েক বছরের ক্লান্তির পর কিছু সময়ের বিশ্রাম ছিল না। বরং পূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, এডেসার পতন ঘটানোর পরই তিনি নবোদ্যমে অগ্রসর হন এবং ফুরাত নদীর পূর্ব দিকে অবস্থিত সকল দুর্গ ও নগরী পুনরুদ্ধার করেন। এরপর তিনি অগ্রসর হন আলবেরা নগরী অভিমুখে। প্রাচ্যীয় খ্রিষ্টান জন-অধ্যুষিত নগরীটি তখন ক্রুসেডার-শাসিত ছিল। তিনি নগরীটির পতন ঘটানোর প্রস্তুতি হিসেবে চারপাশে কঠিন অবরোধ আরোপ করেন।[৫৬৮] বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেই আলবেরা নগরী বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী ছিল। যেমন :

১. নগরীটি ফুরাত নদীতে অবস্থিত অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি চর এলাকা নিয়ন্ত্রণ করত। চরটির নিয়ন্ত্রণ যাদের হাতে থাকত, তাদের বাহিনী সহজে পূর্ব থেকে পশ্চিমে এবং পশ্চিম থেকে পূর্বে আসা-যাওয়া করতে পারত।

২. নগরীটি ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত। আলবেরার নিয়ন্ত্রণ ক্রুসেডারদের হাতে থাকায় মুসলমানদের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় তাদের পক্ষে একে একটি শক্তিশালী প্রত্যাবর্তনঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ ছিল।

৩. ২য় জোসেলিন যে তিল-বাশির নগরীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, আলবেরা নগরী ছিল তার সবচেয়ে নিকটবর্তী কেন্দ্র। আর তাই আলবেরায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পূর্বে ইমাদুদ্দিন জিনকির পক্ষে জোসেলিনের আস্তানায় হানা দেওয়া সম্ভব ছিল না।[৫৬৯]

---

৫৬৮. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩৩৩-৩৩৪।

৫৬৯. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ৭০।

ব্যর্থ বিদ্রোহ প্রচেষ্টা!

সবদিক বিবেচনা করে ইমাদুদ্দিন জিনকি ৫৩৯ হিজরি সনের রমজান মাসে (১১৪৫ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে) আলবেরা নগরীর চারপাশে মজবুত অবরোধ আরোপ করেন এবং বাইরে থেকে সব ধরনের রসদ বা সংবাদ প্রবেশের পথ পুরোপুরি বন্ধ করে দেন। রসদের অভাবে একসময় নগরবাসী ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় উপনীত হয় এবং আত্মসমর্পণের কাছাকাছি চলে যায়।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এই নাজুকতর মুহূর্তে মসুল থেকে সংবাদ আসে, মসুলে ইমাদুদ্দিন জিনকির নায়েব মহান আমির নাসিরুদ্দিন জাকারকে হত্যা করা হয়েছে। প্রয়াত সেলজুক সুলতান মাহমুদের পুত্র ও বর্তমান সুলতান মাসউদের ভ্রাতুষ্পুত্র আলপ আরসালান বিন মাহমুদের এক বিদ্রোহ প্রচেষ্টায় এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। অবশ্য এই বিদ্রোহ প্রচেষ্টা ছিল সম্পূর্ণই তার নিজস্ব পরিকল্পনা। এতে সুলতান মাসউদের কোনো ধরনের সম্পৃক্তি বা ইন্ধন ছিল না। আলপ আরসালানের সহযোগীরা তাকে বুঝিয়েছিল যে, এখন ষড়যন্ত্র সফল হওয়ার সম্ভাবনা শতভাগ। যদি নাসিরুদ্দিন জাকারকে হত্যা করা যায়, তাহলে তিনি সহজেই মসুলের ক্ষমতা লাভ করতে পারবেন।[৫৭০] আর মসুল তার হাতে চলে এলে ইমাদুদ্দিন জিনকির কর্তৃত্বাধীন পুরো অঞ্চল তার অধিকারে চলে আসবে। তখন তিনি পরিণত হবেন ইসলামি বিশ্বের সর্বোচ্চ নেতায়!

তারা ধারণা করেছিল, গৌরব ও মর্যাদা একটিমাত্র পদক্ষেপেই রচনা করা যায় এবং যুগ-যুগান্তের অর্জন মাত্র একটি আঘাতে বা সাময়িক একটি অবস্থানের মাধ্যমে চুরি করা যায়!

আলপ আরসালান নাসিরুদ্দিন জাকারকে হত্যা করতে সক্ষম হন। কিন্তু জিনকি রাষ্ট্রের প্রশাসনে ইমাদুদ্দিন জিনকির প্রতি নিষ্ঠাবান ব্যক্তির সংখ্যা ছিল আলপ আরসালানের কল্পনার চেয়েও বেশি। তার রাষ্ট্রের প্রশাসনিক নেতৃবৃন্দ, সৈন্যসামন্ত, সাধারণ জনগণ সকলে তাকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসত। ইমাদুদ্দিন জিনকি সকলের সঙ্গে অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করতেন, সবার সঙ্গে প্রজ্ঞাপূর্ণ আচরণনীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটাতেন।

---

৫৭০. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩৩৩, *আল-তারীখুল বাহির*, পৃষ্ঠা : ৭১ ও ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৮০-২৮১।

ঐতিহাসিক ইবনুল আছির যেমন বলেছেন, 'ইমাদুদ্দিন জিনকির রাষ্ট্র ছিল যোগ্য-অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ও সৈন্যসামন্তে সমৃদ্ধ একটি রাষ্ট্র।' তাদেরই একজন মসুলের কাজি তাজুদ্দিন ইয়াহইয়া বিন শাহরাযুরি কৌশলে আলপ আরসালান ও তার সহযোগীদের নগরীর দুর্গে বন্দি করে ফেলতে সক্ষম হন। এরপর তিনি কালবিলম্ব না করে এ সংবাদ ইমাদুদ্দিন জিনকির কাছে পাঠিয়ে দেন।[৫৭১]

এই দুঃখজনক সংবাদ শুনে ইমাদুদ্দিন জিনকি আলবেরা নগরীর অবরোধ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন এবং রাজধানীতে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কায় দ্রুত প্রত্যাবর্তনের পথ ধরেন। মসুলে পৌঁছেই তিনি যথোচিত পন্থায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি প্রয়াত সেনাপতি নাসিরুদ্দিন জাকারের স্থানে যায়নুদ্দিন আলি বিন বুকতেকিনকে মসুলের আমির নিযুক্ত করেন। মসুল পরিস্থিতি আবারও স্বাভাবিক হয়ে যায়। মাঝখান থেকে নষ্ট হয়ে যায় আলবেরা নগরীর পতন ঘটানোর সুবর্ণ সুযোগ।[৫৭২]

এদিকে আলবেরাবাসী ইমাদুদ্দিন জিনকির পুনরায় ফিরে আসার আশঙ্কায় নিজেদের নগরী ইমাদুদ্দিন জিনকির প্রতিপক্ষ হুসামুদ্দিন তামারতাশের কাছে সমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয়। তারা আশা করছিল, হুসামুদ্দিন তাদের প্রতিরক্ষায় ভূমিকা রাখবেন। কারণ, তারা আশঙ্কা করছিল, অবরোধের সময় তারা যেভাবে ইমাদুদ্দিন জিনকিকে প্রতিরোধ করেছে, তিনি হয়তো নগরীটির পতন ঘটাতে পারলে তার কঠিন প্রতিশোধ নেবেন। আলবেরাবাসীর এই সিদ্ধান্তের ফলে নগরীটি জিনকি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত না হলেও সেখানে ক্রুসেড শাসনের বিলোপ ঘটে এবং মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৭৩]

ইমাদুদ্দিন জিনকি উপলব্ধি করেন, এই মহান বিজয়ই চূড়ান্ত মনজিল নয়। পথ এখনো শেষ হয়নি। এখনো শাম ও ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে কয়েকটি ক্রুসেড রাজ্য রয়ে গেছে। আর তাই তিনি দ্রুত নতুন করে জিহাদি

---

৫৭১. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩৩৩।

৫৭২. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩৩৩ ও ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৮১।

৫৭৩. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩৩৪।

তৎপরতা শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন এবং এন্টিয়ক নগরীসহ রাজ্যটির অধীনস্থ অন্যান্য অধিকৃত ইসলামি নগরী পুনরুদ্ধার করাকে পরবর্তী লক্ষ্য নির্ধারণ করেন। এ লক্ষ্য বাস্তবায়িত হলে এ অঞ্চলে ক্রুসেডারদের দ্বিতীয় রাজ্যের পতন ঘটবে।

কিন্তু এ লক্ষ্যের দাবি ছিল, বিশেষ করে ফুরাতের পশ্চিম তীরসহ পুরো শাম অঞ্চলে বিস্তৃত ক্ষেত্রজুড়ে লড়াই করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন ছিল বিশেষ প্রস্তুতি ও সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা। তবে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি ইমাদুদ্দিন জিনকির চিন্তাজগৎজুড়ে ছিল, তা হলো দামেশক নগরীর অবস্থান।

মহান নেতার জীবনাবসান

ইতিপূর্বে ইমাদুদ্দিন জিনকির বিরুদ্ধে যুদ্ধে দামেশক সুস্পষ্টভাবে ক্রুসেডারদের সঙ্গে সহযোগিতা বিনিময় করেছিল। দামেশক ইমাদুদ্দিন জিনকির নিয়ন্ত্রিত বানিয়াস নগরী দখলের চেষ্টা করতে এবং নগরীটির মুসলিম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে নগরীটি ক্রুসেডারদের হাতে তুলে দিতে দ্বিধা করেনি! আর তাই দামেশক জয় না করে ক্রুসেডারদের সঙ্গে লড়াইয়ে উপনীত হলে বিরাট ঝুঁকির আশঙ্কা ছিল। তা ছাড়া পশ্চিমে এতটা গভীরে পৌঁছে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এমন কোনো নিকটবর্তী সামরিক ঘাঁটির প্রয়োজন ছিল, যেখান থেকে জিনকি বাহিনী বের হয়ে অভিযানে যেতে পারবে এবং প্রয়োজনে ফিরে এসে আশ্রয় নিতে পারবে। শাম অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়ায় এবং ঐতিহ্যবাহী নিরাপত্তাব্যবস্থার কারণে দামেশক নগরী এই প্রয়োজন পূরণের একটি আদর্শ কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হচ্ছিল।

আর তাই ৫৪০ হিজরি সনের শাবান মাসে (১১৪৬ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে) ইমাদুদ্দিন জিনকি তার বাহিনী নিয়ে দামেশক অবরোধের লক্ষ্যে রওনা হন।[৫৭৪]

কিন্তু দামেশকের পথে থাকা অবস্থায়ই তার কাছে সংবাদ পৌঁছায় যে, এডেসা রাজ্যে একটি গোপন ষড়যন্ত্র পরিকল্পনা করা হচ্ছে। সেখানকার

---

৫৭৪. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৮১ ও ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ২৮২।

কিছু আর্মেনীয় নেতা ২য় জোসেলিনের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করেছে যে, এডেসায় অবস্থানকারী মুসলিম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে ধ্বংস করে সেখানে পুনরায় ক্রুসেড রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হবে!

সংবাদ পাওয়ামাত্র ইমাদুদ্দিন জিনকি তার গতিপথ পরিবর্তন করে এডেসা অভিমুখে অগ্রসর হন। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে তিনি ফিতনা দমন করতে সক্ষম হন। ষড়যন্ত্রকারীদের কয়েকজনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, বাকিদের এডেসা থেকে বিতাড়িত করা হয়। ইমাদুদ্দিন জিনকি তাদের পরিবর্তে তিনশ ইহুদি পরিবারকে নিয়ে এসে এডেসায় বসবাস করতে দেন।[৫৭৫] তিনি জানতেন, ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে পরস্পর প্রচণ্ড ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা কাজ করে। আর তাই তার বিরুদ্ধে উভয় দলের সম্মিলিত যোগসাজশ ও আঁতাতের আশঙ্কা ছিল না। বরং আশা করা যায়, উভয় দল একে অপরের বিরুদ্ধে গুপ্তচরের কাজ করবে। ফলে পরিস্থিতি কখনোই গুরুতর আকার ধারণ করবে না এবং এমন পর্যায়ে উপনীত হবে না, যা ঘটনাপ্রবাহে প্রভাব ফেলতে পারে।

এডেসার পরিস্থিতি স্থিতিশীল হওয়ার পর ইমাদুদ্দিন জিনকি পুনরায় দামেশক অভিমুখে রওনা হওয়ার মনস্থ করেন। তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তিনি দেখতে পান, দামেশক গমনের পথে জাবার নামক একটি সামরিক দুর্গ বনু উকায়লের নিয়ন্ত্রণে আছে। দুর্গটি ফুরাত নদীর তীরে বালিস ও রাক্কার মাঝে সিফফিনের কাছে অবস্থিত। জাবার দুর্গের প্রশাসক ইযযুদ্দিন আলি বিন মালিক আল-উকায়লি ইমাদুদ্দিন জিনকির আনুগত্য স্বীকারে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। ফলে জিনকি রাষ্ট্রের মধ্যখানে এই দুর্গটি অবিজিত অবস্থায় থেকে যায়। তা ছাড়া দুর্গটি জয় না করে সামনে অগ্রসর হলে ইমাদুদ্দিন জিনকির বাহিনীর নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে যেতে পারে।

ইমাদুদ্দিন জিনকি অবরোধ করে দুর্গটির পতন ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেন। ৫৪০ হিজরি সনের শেষ দিকে (১১৪৬ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে) দুর্গটি

---

৫৭৫. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৮১ ও ইবনুল কালানিসি, *যায়লু তারীখি দিমাশক*, পৃষ্ঠা : ২৮২ ও Setton: op. cit. 1, pp. 462.

অবরোধ করা হয়।[৫৭৬]

যেহেতু দুর্গটির নিরাপত্তাব্যবস্থা ছিল যথেষ্ট মজবুত, তাই অবরোধ কয়েক মাস স্থায়ী হয়। তা ছাড়া ইমাদুদ্দিন জিনকি তার পুরো বাহিনী নিয়ে দুর্গটি অবরোধ করেননি। তার বাহিনীর বিভিন্ন অংশ তার সুবিস্তৃত রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের নিরাপত্তা রক্ষায় দায়িত্ব পালন করছিল। বিশেষত মসুলের উত্তরে তখন কিছুটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। বাশনাবিয়া শাখাগোত্রের কুর্দিরা সেখানে হুসামুদ্দিন তামারতাশের নেতৃত্বে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা করছিল। তাদের কর্তৃত্বাধীন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ ছিল দজলার তীরে অবস্থিত কানাক দুর্গ। ইমাদুদ্দিন জিনকি তাদেরকে বশীভূত করার লক্ষ্যে কানাক দুর্গ অবরোধ করার জন্য তার বাহিনীর একটি অংশকে প্রেরণ করেছিলেন।[৫৭৭]

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অতিবাহিত হতে থাকে। ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ. ধৈর্য ও অটলতার সঙ্গে অবরোধ অব্যাহত রাখেন। তিনি না বিরক্ত হচ্ছেন, না ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। তিনি তো কখনো বিশ্রাম তালাশ করেননি, আরাম খুঁজে ফিরেননি। অবরোধ চলাকালে এক রাতে, নির্দিষ্ট করে বললে ৫৪১ হিজরি সনের ৬ রবিউস সানি (১১৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর) রাতে আল্লাহ পাক তার ক্লান্ত দেহকে বিশ্রাম গ্রহণের এবং চিরব্যস্ত আত্মাকে আপন প্রভুপানে পরিভ্রমণের অনুমতি দান করেন!

ইমাদুদ্দিন জিনকি সেদিন রাতে তাঁবুতে প্রবেশ করে ঘুমিয়ে পড়েন। এ সময় ইয়ারনাকুশ নামক তার জনৈক ভৃত্য তাঁবুতে ঢুকে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করে! সমাপ্ত হয় সেই মহান বীরের জীবনসফর, যিনি ক্রুসেডারদের বশীভূত করেছিলেন এবং দীর্ঘ অনেক বছরের লাঞ্ছনা ও অবসন্নতার পর মুসলমানদের শির সমুন্নত করেছিলেন।

ভৃত্যটি নিজ সর্দার ও মুসলমানদের সর্দারকে হত্যা করার পর দ্রুত বাইরে এসে দুর্গবাসীকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করে বলতে থাকে, 'সুসংবাদ গ্রহণ করো! আমি তো ইমাদুদ্দিন জিনকিকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছি।' কিন্তু

---

৫৭৬. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩৩৮ ও ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৮১।

৫৭৭. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩৩৯ ও ইবনে ওয়াসিল, *মুফাররিজুল কুরূব*, ১/৯৮-৯৯।

অবরুদ্ধ দুর্গবাসীর প্রতিক্রিয়া ছিল বড় বিস্ময়কর! তারা একযোগে বলে ওঠে, 'তাকে হত্যা করে তো তুমি সকল মুসলমানকেই হত্যা করেছ!'[৫৭৮]

অথচ এই ইমাদুদ্দিন জিনকি বিগত কয়েক মাস ধরে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন!

বাস্তবেই ইমাদুদ্দিন জিনকির হত্যাকাণ্ড ছিল উম্মাহর জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। মুসলিম উম্মাহ হারিয়েছিল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ-এর এক অনন্যসাধারণ সেনাপতিকে, রাজনীতি ও নেতৃত্বজগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রকে, ইসলামের এক প্রকৃত সংস্কারককে এবং ব্যতিক্রমী ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এক ক্ষণজন্মা ব্যক্তিকে। তিনি এমন এক যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যখন যোগ্য ব্যক্তির বড় অভাব ছিল।

অমার্জনীয় এই অপরাধের অনুপ্রাণিকা ও কার্যকারণ

নিঃসন্দেহে সকলের মনে প্রশ্ন জেগেছে, এই কাপুরুষ ভৃত্যটি কেন জাতি-জীবনের এই যুগসন্ধিক্ষণে মুসলমানদের মহান নেতা ও সুমহান সেনাপতিকে হত্যা করল?!

বাস্তবতা হলো, ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ.-এর হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ইসলামি ইতিহাসের এক বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন ও অমীমাংসিত রহস্য। প্রাচীন ও আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এর কারণ নির্ণয়ে বিভিন্ন মত পেশ করেছেন। কোনো কোনো গ্রন্থে এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ. যখন ঘুমাতে গিয়েছিলেন, তখন উক্ত ভৃত্য প্রয়োজনের চেয়ে অধিক উচ্চ আওয়াজে কথা বলছিল। এতে তার ঘুমে সমস্যা হচ্ছিল বিধায় তিনি ভৃত্যটিকে কঠিন ভাষায় তিরস্কার করেন। এতে ভয় পেয়ে ভৃত্যটি কিছুক্ষণ পর নিদ্রায় নিমগ্ন ইমাদুদ্দিন জিনকিকে হত্যা করে!

আমার দৃষ্টিতে এ সম্ভাবনাটি একেবারেই দূরবর্তী। কারণ, ভৃত্যটি যদি এমন কোনো অপরাধ করেও থাকে, তার জন্য তো কঠিন কোনো শাস্তির ভয় পাওয়ার কথা নয়। এর শাস্তি যত বড়ই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত কোনো সাধারণ কিছুই হবে। কারণ, ইমাদুদ্দিন জিনকি সম্পর্কে প্রসিদ্ধ

---

৫৭৮. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩৩৯, ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৮১-২৮২ ও ইবনে ওয়াসিল, *মুফাররিজুল কুরূব*, ১/৯৯।

ছিল, তিনি তার ভৃত্য ও অনুচরদের সঙ্গে সদয় ও কোমল আচরণ করতেন। পুরো জীবনে তিনি কোনো ভৃত্যকে প্রহার করেছেন বা শাস্তি দিয়েছেন, এমন কোনো বিবরণ ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায় না। ভৃত্যটি তো জানত যে, সাধারণ শাস্তি থেকে বাঁচতে সে যে অন্যায় করতে যাচ্ছে, তার শাস্তি নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড। তাহলে কীভাবে সে একটি আনুমানিক শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার জন্য নিজের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলার দুঃসাহস দেখাবে?!

এসব দিক বিবেচনা করে আমরা এই সম্ভাবনাটিকে একেবারেই সুদূরপরাহত মনে করছি। অবশ্য এই মতটি বিভিন্ন গ্রন্থে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে এবং কতিপয় প্রাচ্যবিদ ও তাদের অনুসারীরা তা বর্ণনাও করেছে। কারণ, এ বর্ণনাটিকে মেনে নিলে শেষ পর্যন্ত ইমাদুদ্দিন জিনকির চরিত্র কলুষিত হয় এবং তাকে এমন একজন দাম্ভিক, উদ্ধত ও জালিম মনিবরূপে উপস্থাপন করা যায়, যিনি তার ভৃত্যকে এত ভয়াবহ শাস্তির হুমকি দিয়েছিলেন যে, বেচারা ভৃত্য নিরুপায় হয়ে তাকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছে! অথচ পূর্বে আলোচিত বিবরণ অনুযায়ী এটি সম্পূর্ণই বাস্তবতাবিবর্জিত।

আমার বিশ্বাস, এই হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপট ও অনুপ্রাণিকা কিছুতেই নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের বাইরে হতে পারে না। তিনটিই ছিল বাইরের কারণ, যা উক্ত ভৃত্যকে প্রভাবিত করেছিল এবং উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে তাকে ব্যবহার করেছিল। অভিন্ন লক্ষ্য বাস্তবায়নে উক্ত কারণ-তিনটির একাধিক বা সবগুলোর অস্তিত্ব এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বিনিময়ের সম্ভাবনাও অসম্ভব নয়।

১. কতিপয় ঐতিহাসিক উক্ত ভৃত্যের ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত হওয়ার সম্ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ, সে ছিল মামলুক বা ক্রীতদাস। সম্ভবত ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ইমাদুদ্দিন জিনকির উপর্যুপরি বিজয়, বিশেষ করে তার সর্বশেষ বিজয় ও এডেসা রাজ্যের পতনের কারণে ভৃত্যটি তার প্রতি কঠিন বিদ্বেষ পোষণ করত। আর তাই সে ইমাদুদ্দিন জিনকিকে হত্যা করে স্বজাতির পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছিল।

২. উক্ত ভৃত্য শিয়া বাতিনি মতাদর্শী ছিল। সম্প্রদায়টির হিংস্রতা ও বর্বরতার পরিধি সম্বন্ধে আমাদের জানা আছে। আমাদের আলোচ্য কালের অসংখ্য হত্যা, গুপ্তহত্যা, হত্যাপ্রচেষ্টাসহ নানাবিধ অপরাধের সঙ্গে বাতিনি গোষ্ঠীর নাম জড়িয়ে আছে। বিশেষত রাজনৈতিক গুপ্তহত্যায় তারা বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেছিল। আর ইমাদুদ্দিন জিনকির কর্মপ্রচেষ্টা ও কর্মতৎপরতায় বাতিনিদের বিক্ষুব্ধ হওয়ার বিষয়টি তো সর্বজ্ঞাত। কারণ, সন্দেহাতীতভাবেই এই মহান মুসলিম নেতা ছিলেন ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা দমনকারী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইকারী এবং পুরো রাজ্যে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী। এ সবকিছু ছিল দাঙ্গা-ফ্যাসাদ ও সন্ত্রাসপ্রিয় বাতিনিদের কর্মক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধক। অধিকন্তু ইমাদুদ্দিন জিনকি ছিলেন একজন সুন্নি নেতা। তিনি ইসলামি শরিয়তের পাবন্দ ছিলেন। স্বভাবতই এসব দুষ্ট ইসমাইলিরা তার প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করত। তাই তাদের পক্ষে তাকে হত্যা করা বা ঘাতককে হত্যাকাণ্ডে প্ররোচিত করা মোটেও অসম্ভব বা সুদূরপরাহত ছিল না।

৩. তৃতীয় সম্ভাবনাটিই আমার কাছে সবচেয়ে প্রবল মনে হয়। আর তা হলো, উক্ত ভৃত্যের সঙ্গে অবরুদ্ধ জাবার দুর্গের প্রশাসক ইযযুদ্দিন বিন মালিক আল-উকায়লির গোপনে চুক্তি হয়েছিল। ইযযুদ্দিন অর্থসম্পদ, জায়গির, পদ-পদবি বা অন্য কিছুর লোভ দেখিয়ে তাকে প্ররোচিত করেছিল। এই সম্ভাবনার স্বপক্ষে দুটি প্রমাণ রয়েছে।

ক. ভৃত্যটি ইমাদুদ্দিন জিনকিকে হত্যা করেই দ্রুত দুর্গের কাছে চলে গিয়ে দুর্গবাসীকে হত্যাকাণ্ডের সুসংবাদ জানিয়েছিল। এটি তার ও তাদের মধ্যকার গোপন চুক্তির ইঙ্গিত বহন করে।[৫৭৯]

খ. ঐতিহাসিক ইবনুল আদিম দুর্গ-অধিপতি ইযযুদ্দিন আলি বিন মালিক ও মানবিজের অধিপতি হাসসান আল-বালাবাক্কির মধ্যকার একটি কথোপকথন উল্লেখ করেছেন। মানবিজ অধিপতি হাসসান ইযযুদ্দিনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কীভাবে আপনি ইমাদুদ্দিন জিনকির এই অবরোধ থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারেন?!' তখন ইযযুদ্দিন উত্তর দিয়েছিলেন, 'মানবিজ অবরুদ্ধ

---

৫৭৯. আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, ৯/৩৩৯-৩৪০।

হওয়ার পর যা আপনাকে নিষ্কৃতি দিয়েছিল, আমাকেও ...!'(৫৮০)

মহান বীর বাল্ক বিন বাহরাম মানবিজে হাসসানকে অবরোধ করেছিলেন। তখন অজ্ঞাত আততায়ীর নিক্ষিপ্ত তিরে বাল্ক বিন বাহরাম নিহত হয়েছিলেন এবং হাসসান নিষ্কৃতি লাভ করেছিলেন। ইযযুদ্দিন যেন ইঙ্গিত করেছিলেন যে, ইমাদুদ্দিন জিনকির হত্যাকাণ্ডই তাকে এই অবরোধ থেকে নিষ্কৃতি দান করবে। এতে ইঙ্গিত মেলে যে, তিনি এ সংক্রান্ত ষড়যন্ত্র তৎপরতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

বাস্তব কারণ যাই হোক, এ জঘন্য অন্যায়ের কারণ, কার্যকারণ ও অনুপ্রাণিকার কথা বাদ দিয়ে আসল কথা হলো, এই মহান বীরযোদ্ধা বিদায় নিয়েছেন। এর মাধ্যমে কর্ম-অবদানে সমৃদ্ধ এক মহান জীবনে সমাপ্তি-পর্দা নেমে এসেছে; যে জীবন ছিল প্রতিরোধ ও সংগ্রামের চেতনায় পরিপূর্ণ। আমাদের এই মহান বীর তার জীবনের প্রতিটি ছত্রে প্রমাণ করেছেন যে, পৃথিবীতে এমন মানুষও আগমন করেন, যাদের প্রভাব কেবল একটি সমাজ বা একটি রাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ থাকে না; তাদের অস্তিত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয় পুরো মানবতা ও সমগ্র মানবজাতি।

আল্লাহ ইমাদুদ্দিন জিনকির প্রতি রহম করুন, তার সকল কর্ম-অবদান দ্বারা তার সৎকর্মের পাল্লাকে সমৃদ্ধ করুন। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আল্লাহ আমাদেরকে তার মতো আরও অনেক মহান পুরুষ দান করুন এবং যারা তার পথ অনুসরণ করবে, তাদের সকলের পদক্ষেপে বরকত দান করুন।

* * *

৫৮০. ইবনুল আদিম, *যুবদাতুল হালাব*, ২/২৮৩।

বিংশ পরিচ্ছেদ

শেষ দৃশ্যের পরের কথা

প্রিয় পাঠক, আমরা এতক্ষণের এই দীর্ঘ পরিভ্রমণে একসঙ্গে ইসলামি ইতিহাসের কিছু পাতায় বিচরণ করেছি। নিঃসন্দেহে মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ স্তরের বিবরণ ও বিশ্লেষণ আমরা যা উল্লেখ করেছি তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি। তথ্য-তত্ত্ব ও পৃষ্ঠার বিশাল কলেবরে পাঠক ভার বোধ করবেন, এই আশঙ্কা না থাকলে আমরা গ্রন্থের কলেবর আরও কয়েক গুণ বড় করতাম।

নিঃসন্দেহে এটি ইতিহাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। ইতিহাসের এই অংশে সাক্ষাৎ মেলে বিচিত্র চরিত্রের হাজারো মানুষের। এ ইতিহাসে আমরা যেমন পেয়েছি সৎ ব্যক্তির দেখা, পেয়েছি অসৎ ব্যক্তির দেখাও। পেয়েছি আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের বিবরণ, তেমনই পেয়েছি ক্ষমতা ও গদির মোহে লড়াইকারী নেতাদের বিবরণও। এ তো মানবপ্রকৃতির বৈচিত্র্যেরই চিত্র।

﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾

তাদের মধ্যে কতক তো নিজের প্রতি অত্যাচারী, কতক মধ্যপন্থী এবং কতিপয় এমন, যারা আল্লাহর তাওফিকে সৎকর্মে অগ্রগামী।

[সুরা ফাতির : ৩২]

শিক্ষা ও উপদেশ

এ বিষয়টি কারও অজানা নয় যে, আমাদের এই মানববৈচিত্র্য অধ্যয়ন ও ইতিহাস পঠনের উদ্দেশ্য কেবল তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বা ঐতিহাসিক বিবরণ উপভোগ করা নয়। আমাদের ইতিহাস পঠন-অধ্যয়নের মৌলিক লক্ষ্য হচ্ছে এতে নিহিত শিক্ষা অনুসন্ধান, উপদেশ

আহরণ এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এই শাশ্বত বাণীর প্রায়োগিক রূপায়ণ—

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾

নিশ্চয়ই তাদের ঘটনায় বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষাগ্রহণের উপাদান আছে। [সুরা ইউসুফ : ১১১]

আর তাই ক্রুসেড যুদ্ধ ইতিহাসের ধারাবিবরণীর এ পর্যায়ে এসে আমরা এবার একটি বিরতি নিতে চাই। পেছনে বর্ণিত পুরো ইতিহাসের ওপর আমরা একবার সামগ্রিক দৃষ্টি বোলাতে চাই এবং সেখান থেকে অর্জিত শিক্ষা ও উপদেশগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরতে চাই। আমাদের বিশ্বাস, হয়তো এসব উপদেশ ও শিক্ষা উম্মাহর চলার পথে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে এবং মুসলমানদের জাগরণের অনুপ্রাণিকারূপে বিবেচিত হবে। হ্যাঁ, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আমরা সামনে যেসব শিক্ষা ও উপদেশ উল্লেখ করব, তা-ই আলোচ্য ইতিহাস হতে অর্জিত সকল উপদেশ নয়। প্রকৃতপক্ষে এতে নিহিত শিক্ষা ও উপদেশ তো অসংখ্য-অগণিত। আমরা কেবল পাঠকসমাজের সামনে চিন্তা ও গবেষণার একটি দ্বার উন্মোচিত করে দিতে চাই। বিষয়টি এরপর সকল মুসলমানের জন্য উন্মুক্ত হয়ে থাকবে। প্রত্যেকেই আল্লাহপ্রদত্ত তাওফিক অনুযায়ী আলো ও পাথেয় সংগ্রহ করতে পারবে।

প্রথম শিক্ষা : প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের ইতিহাস জানি না!

আমরা একসঙ্গে মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের মাত্র পঞ্চাশ বছরের বিবরণ পর্যবেক্ষণ করেছি। তাও পঞ্চাশ বছরের জাতি-ইতিহাসের একটিমাত্র দিক—ক্রুসেড যুদ্ধ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি। পঞ্চাশ বছরের পুরো মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসও নয়; মুসলিম বিশ্বের একটিমাত্র অঞ্চলের ইতিহাস—শাম ও ইরাক অঞ্চল। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও আমরা পূর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করতে পারি যে, অধিকাংশ পাঠক এসব ঘটনাপ্রবাহ জীবনে এই প্রথমবার পাঠ করেছেন!

পাঠকদের মাঝে কে ইতিপূর্বে মওদুদ বিন তুনতেকিনের নাম শুনেছেন?!

কে শুনেছেন সুকমান বিন উরতুক, ইলগাজি বিন উরতুক বা বালক বিন বাহরামের নাম?

কে জানেন মালিকশাহ ও নিজামুল মুলকের জীবনকথা?

কে ইতিপূর্বে পাঠ করেছেন বারিনের বিজয়াভিযান বা শাইজার অবরোধের ইতিহাস?

বরং বলুন, এমনকি কে কে জানতেন স্বয়ং ইমাদুদ্দিন জিনকিকে?!

জানা মানে শুধু নাম জানা নয়; আমরা বলতে চাচ্ছি ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য, সংস্কার ও সংগ্রামের পদ্ধতি, জীবনের পথ ও পন্থা এবং সংগ্রামী জীবনের বিবরণ জানার কথা।

প্রিয় পাঠক, কেউ কি পারবেন আপন সন্তান ও সমাজের সামনে সেই পদ্ধতির বিশ্লেষণ করতে, যার মাধ্যমে গড়ে উঠেছেন একজন ইমাদুদ্দিন জিনকি; যার ছোঁয়ায় পৌঁছে গেছেন কর্ম-অবদানের সর্বোচ্চ শিখরে?! আমরা তো তার প্রতিপালন ও শিক্ষাগ্রহণের সুস্পষ্ট কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেছি, প্রত্যক্ষ করেছি তার তত্ত্বাবধান ও পরিচর্যার সুদৃঢ় পদ্ধতি। আমরা যদি আমাদের জাতির জন্য ইমাদুদ্দিন জিনকির ন্যায় ব্যক্তি তৈরি করতে চাই, তাহলে অবশ্যই আমাদের প্রয়োজন তার জীবন ও জীবনীর প্রতিটি অধ্যায়ের গভীর ও বিস্তৃত অধ্যয়ন।

তারপর দেখুন, আমরা এ গ্রন্থে শুধু ক্রুসেড অভিযান সংশ্লিষ্ট ঘটনাপ্রবাহ আলোচনা করেছি। আমরা আলোচনা করিনি সমকালীন আলিম-উলামা ও জ্ঞানী-গুণীজনের বিস্তারিত জীবন সম্পর্কে; আলোচনা করিনি সে যুগের মুসলমানদের চিকিৎসা, প্রকৌশল, জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোলসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন অঙ্গনের আবিষ্কার ও অবদান সম্পর্কে; আলোচনা করিনি স্থাপত্যশৈলি এবং শিল্প ও প্রযুক্তিগত অবদান সম্পর্কে; আলোচনা করিনি অর্থনৈতিক জীবনধারা বা বাণিজ্যিক প্রকল্প-পরিকল্পনা সম্পর্কে; আলোচনা করিনি সাংস্কৃতিক আন্দোলন বা সাহিত্য জাগরণ সম্পর্কেও।

এভাবে আমরা সভ্যতার হাজারো দিকের আলোচনা ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেছি। কারণ, ক্রুসেড যুদ্ধ ইতিহাসের সঙ্গে সেসব বিষয়ের মজবুত কোনো যোগসূত্র নেই। যদি আমরা সেসব অঙ্গন নিয়েও আলোচনার ক্ষেত্র উন্মুক্ত করি, তাহলে অবাক বিস্ময়ে এমন সব উজ্জ্বল ও অত্যুজ্জ্বল চিত্র প্রত্যক্ষ করব, যার বিশ্লেষণ ও গবেষণার জন্য প্রয়োজন এমন দশ-বিশ খণ্ড বিশিষ্ট গ্রন্থের।

অধিকন্তু আমরা এতক্ষণ যা কিছু উল্লেখ করেছি, তা ছিল কেবল শাম ও ইরাক অঞ্চলের জীবনযাত্রার অবদান!

আমরা যদি দৃষ্টি আরও প্রসারিত করে সে যুগের প্রতিটি ইসলামি জনপদের ঐতিহাসিক পরিস্থিতিকেও আলোচনার পরিধিতে অন্তর্ভুক্ত করে নিই; আলোচনা করি আন্দালুস, মাগরিব ভূমি ও পশ্চিম আফ্রিকা সম্পর্কে, মিশর, সুদান ও পূর্ব আফ্রিকা সম্পর্কে, ইয়ামেন, মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান, ইন্দোনেশিয়া ও ভারতবর্ষ সম্পর্কে এবং তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য নগর ও জনপদ সম্পর্কে, তাহলে?!

প্রতিটি জনপদেই তো ঘটেছে উত্তপ্ত সংঘাত ও মনোমুগ্ধকর ঘটনাবলি। আমরা যদি এভাবে দৃষ্টিকে বিস্তৃত করি, নিশ্চিত উপলব্ধি করতে সক্ষম হব যে, আমাদের ইতিহাস এমন এক সম্পদভান্ডার, যার কোনো সীমানা নেই এবং অমূল্য সেই জ্ঞানসম্পদ হতে আমরা যে শিক্ষা ও উপদেশ আহরণ করতে পারব, তা গণনাতীত। একই সঙ্গে আমরা আমাদের যাপিত জীবনের শিক্ষা-দীক্ষা ও পরিচর্যা-প্রতিপালনের অঙ্গনে ত্রুটি ও অবহেলার পরিমাণও অনুমান করতে পারব। ধারণা করতে পারব যে, কতটা উদাসীনতার পর আমরা আমাদের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অবহেলার এই নিম্নতম স্তরে উপনীতি হয়েছি!

নিঃসন্দেহে দুর্যোগ ও সংকট এক ক্ষেত্রে নয়; অনেকগুলো বিষয়ের সমন্বয়ে তৈরি!

আমাদের সংকট আমরাই তৈরি করেছি!

শিক্ষাব্যবস্থা, পাঠক্রম-কারিকুলাম, তথ্য ও প্রচার অঙ্গন, প্রচারণামূলক কর্মকাণ্ড ইত্যাদির ব্যাপক নিরীক্ষণ অতীব জরুরি। তদ্রূপ শরিয়তবোদ্ধা আলিমসমাজ এবং জাতির চিন্তাবিদ ও সংস্কারকদেরও উচিত নিজেদের কর্মপন্থার পুনর্বিন্যাস ও নবপরিকল্পনা প্রণয়ন। ইসলামি ইতিহাসকেও শিক্ষা-কারিকুলাম ও প্রচারণামূলক কর্মতৎপরতার অন্তর্ভুক্ত করা এবং সামাজিক সংস্কারকার্যে যুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি। তখন ইতিহাস অবশ্যই আমাদের জন্য সুপ্ত সব মণিমুক্তা বের করে আনবে, কর্মের বিভিন্ন অঙ্গনে উত্থাপিত সব সংশয়-সন্দেহ হতে রক্ষা করবে, সৎ আদর্শ ও দৃষ্টান্ত প্রকাশ করবে এবং মহান শিক্ষা ও উপদেশ দান করবে।

নিঃসন্দেহে এর জন্য একজন বা গুটিকয়েক ব্যক্তির প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়; এর জন্য প্রয়োজন জাতির সম্মিলিত প্রয়াস-প্রচেষ্টা!

দ্বিতীয় শিক্ষা : পারস্পরিক সংঘাত একটি বিশ্বজনীন রীতি!

আলোচ্য ইতিহাসে আমরা দেখেছি, ক্রুসেডাররা বিভিন্ন অসত্য, অমূলক ও ভিত্তিহীন যুক্তিতে পশ্চিম ইউরোপ থেকে এসে ইসলামি ভূখণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং কয়েক দশক ধরে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল। আমরা আরও প্রত্যক্ষ করেছি, ক্রুসেডাররা ইসলামি ভূখণ্ডে পা রাখার প্রথম দিন থেকে যে সংঘাত ও সংঘর্ষের সূচনা হয়েছিল, আলোচ্য সময়ে এক মুহূর্তের জন্যও তা স্তিমিত হয়নি। এই পুরো সময়ে কোনো অবস্থাতেই এমন কোনো মাধ্যম ছিল না, যার মাধ্যমে তাদেরকে তুষ্ট করে ইসলামি ভূখণ্ড ত্যাগ করে নিজেদের দেশে ফিরে যেতে রাজি করানো সম্ভব হতো। আর তাই সামরিক সংঘাতই ছিল অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। যা ঘটেছে, তা ছিল পৃথিবীর এক শাশ্বত রীতি ও নিয়মের বাস্তবায়ন। কারণ, প্রতিযুগেই থাকবে ভালো ও মন্দ, সত্য ও মিথ্যা, ন্যায় ও অন্যায় এবং ঈমান ও কুফর। এ সবকিছুই থাকবে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত। আর এই দ্বিমুখী গুণ ও বৈশিষ্ট্য যখন স্থায়ী, যুদ্ধ ও লড়াই এবং সংঘাত ও হানাহানিও থাকবে চিরকাল। রাজনীতিবিদ ও কূটনৈতিক নেতৃবৃন্দ যতই স্মিত হাসি বিনিময় করুন না কেন, এই বাস্তবতা থেকে নিষ্কৃতির কোনো পথ নেই! যতই তারা হৃদ্যতা, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সহাবস্থানের বুলি আওড়ান না কেন, দিন শেষে সবাই ফিরে যান এই অমোঘ বাস্তবতা ও বিশ্বজনীন নিয়মের দিকে!

নিঃসন্দেহে এটি এক শাশ্বত রীতি। এর নাম 'পারস্পরিক প্রতিরোধ' নীতি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ﴾

> আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের কতকের মাধ্যমে কতককে প্রতিহত না করতেন, তবে পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু আল্লাহ জগৎসমূহের প্রতি অতি অনুগ্রহশীল। [সুরা বাকারা: ২৫১]

আল্লাহ আরও ইরশাদ করেন—

﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا﴾

তারা ক্রমাগত তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে সম্ভব হলে তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে সরিয়ে দিতে পারে। [সুরা বাকারা : ২১৭]

আমরা মুসলমানদেরকে যুদ্ধ ও লড়াইয়ের প্রতি উত্তেজিত করার জন্য কিংবা তাদেরকে হিংস্র আচরণে প্ররোচিত করার জন্য এ বাস্তবতার কথা আলোচনা করছি না। আমরা এই বাস্তবতা এজন্য তুলে ধরেছি, যেন মুসলমানরা সতর্কতা অবলম্বন করে এবং নিজেদের শত্রুদের বুঝতে পারে; যেন কোনো প্রতারক-প্রবঞ্চক মিষ্টি বুলি ও ভালো ভালো কথার মাধ্যমে আমাদেরকে প্রতারিত করার সুযোগ না পায়। আমরা এ বিশ্বজনীন বাস্তবতা এজন্য তুলে ধরেছি, যেন মুসলমানরা সদা প্রস্তুত থাকে এবং সার্বক্ষণিক তৎপরতা বজায় রাখে। কারণ, সামান্য একটু নিদ্রা, আরাম বা শিথিলতা হয়তো এমন দখলদারিত্ব ও জবরদখলের পরিণতি ডেকে আনবে, যার ফল ভোগ করতে হবে দশকের পর দশক!

তৃতীয় শিক্ষা : আমরা তাদের শক্তির কারণে পরাজিত হই না; পরাজিত হই নিজেদের দুর্বলতার কারণে।

এই প্রভাবক ইতিহাসে আমরা দেখেছি, মুসলমানরা কাফিরদের সংখ্যাধিক্যের কারণে বা তাদের সাজ-সরঞ্জামের শক্তির কারণে পরাজিত হয়নি; মূলত পরাজিত হয়েছে বিভিন্ন দিক থেকে নিজেদের দুর্বলতার কারণে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নিজেদের কৃত বিভিন্ন অপরাধ-ত্রুটি ও ভয়াবহ বিভিন্ন ব্যাধির কারণেই আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে কাফিরদের হাতে ছেড়ে দেন।

ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাসে আমরা মুসলমানদের চরম দ্বীন-বিচ্ছিন্নতা, শরিয়তের প্রতি উদাসীনতা, ফ্যাসাদ-জুলুম ও অন্যায়কর্মে অবিচলতা এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় পরিচালিত অসুস্থ চিন্তাধারী ব্যক্তিদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখেছি। আমরা আরও দেখেছি পরকালের ওপর পার্থিব চাহিদাকে প্রাধান্যদান, যৎসামান্য সহায়সম্পত্তির ন্যায় তুচ্ছ সামগ্রীকে আঁকড়ে ধরা, জীবন ও ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার তাড়নায় দ্বীন-ধর্ম এবং

ভূমি ও সম্পদকে সরাসরি বিকিয়ে দেওয়া। আমরা মুসলিম জনসাধারণকে জালিম ক্রুসেডারদের হাদিয়া-তোহফা ও পুষ্পমালা নিয়ে স্বাগত জানাতে দেখেছি। এই লাঞ্ছনাকর আচরণ ও এই অবমাননাকর তোষণ-নীতি ছিল কেবল এই আশায় যে, ক্রুসেডাররা তাদেরকে বেঁচে থাকতে দেবে। হ্যাঁ, শুধু বেঁচে থাকার জন্য। হোক সে জীবন লাঞ্ছনা ও অবমাননার, হোক সে জীবন দাসত্ব ও পরাধীনতার।

আমরা আমাদের এই ইতিহাসে দেখেছি মুসলমানদের পারস্পরিক বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা, হানাহানি-সংঘাত ও বিবাদ-বিসংবাদ। দেখেছি, কীভাবে বিভিন্ন মুসলিম ক্ষুদ্র রাজ্য অনুমানপ্রসূত সীমানা বা একটি দুর্গের জন্য আরেক মুসলিম ক্ষুদ্র রাজ্যের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে। আর ক্রুসেডাররা উদ্যোগ ও পদক্ষেপ থেকে দূরে থেকেও ইসলামি অনৈক্যের 'সুফল' ভোগ করেছে!

বর্তমান সিরিয়াভূমি তৎকালে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছিল। জাযিরা অঞ্চল গোটা দশেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। কেবল ভূমধ্যসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলই প্রতিনিধিত্ব করছিল দশ-পনেরোটি বিচ্ছিন্ন ইসলামি রাষ্ট্রের। প্রতিটি নগরী একেকটি ইমারত ও ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। প্রতিটি অঞ্চল একেকটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। ভার ও ভারসাম্যহীন একেকজন নেতা পরিণত হয়েছিল মুসলমানদের শাসকে। এই বেদনাদায়ক পরিবেশে ইসলামি ভূখণ্ডে ঘৃণ্য দখলদারিত্ব প্রচেষ্টার সফলতা এবং মুসলিম শাসক ও সেনাপতিদের ওপর কর্তৃত্ব বিস্তার ছিল অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

আলোচ্য ঘটনাপ্রবাহে আমরা আরও দেখেছি, বিশেষ করে শাম ও ফিলিস্তিন অঞ্চলের মুসলিম শাসকদের অনেকের সুস্পষ্ট, প্রত্যক্ষ ও সরাসরি দালালি। এই দালালি নীতিই টেনে এনেছিল সেই কলঙ্কজনক দুর্যোগ, যার বিবরণ আমরা পাঠ করে এসেছি। যদিও আমরা ইসলামি ভূখণ্ডের ধ্বংস ও সম্পদ নিঃশেষ হওয়ার বিরাট দায়ভার এসব শাসকদের কাঁধে চাপিয়ে দিচ্ছি; কিন্তু বাস্তবতা হলো, আমাদের পক্ষে সেসব জনগণকেও কক্ষনো ক্ষমা করা সম্ভব নয়, যারা এসব নেতার অস্তিত্ব ও উপস্থিতি মেনে নিয়েছিল; বরং অনেক ক্ষেত্রেই তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়ে এবং উম্মাহর সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের ঐক্য প্রচেষ্টায় বাধা দিয়ে

তাদেরকে সহায়তা করেছিল। আমরা দেখেছি, কীভাবে দামেশক ও হিমসের জনগণ ক্রুসেডারদের মোকাবিলায় একক সংঘবদ্ধ কাঠামোতে একীভূত হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করতে জঘন্য ও নির্লজ্জভাবে অটল থেকেছিল। আর এ কারণেই ক্রুসেডারদের দখলদারিত্ব স্থায়ী হয়েছিল আরও অনেক বছর।

সুতরাং এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এ সকল পর্যবেক্ষণ এ কথাই প্রমাণ করে যে, মুসলমানরা তাদের দুশমনদের শক্তি দ্বারা পরাজিত হয় না; পরাজিত হয় নিজেদের দুর্বলতার কারণে। আর তাই পরিবর্তন শুরু করতে হবে নিজেদের ভেতর থেকে। একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, আমরা কখনোই প্রতিপক্ষের সংখ্যাধিক্য ও বিরাট বাহিনী দেখে ভীত হব না। কারণ, আমরা যদি ইসলামের সঙ্গে জুড়ে থাকি, শরিয়তকে আঁকড়ে ধরি, তাহলে বিজয় আমাদের পক্ষেই লেখা হবে। দেখুন, কত মূল্যবান ও অলংকারপূর্ণ মন্তব্য করেছেন উম্মাহর দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.। জয়-পরাজয়ের চাবিকাঠিতে হাত রেখে তিনি বলেছেন—

> "নিঃসন্দেহে তোমরা সংখ্যা ও সরঞ্জামের আধিক্যে তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়লাভ কর না; তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করা হয় তোমাদের আপন রবের প্রতি আনুগত্য ও তাদের অবাধ্যতার কারণে। যদি অন্যায় ও অবাধ্যতায় তোমরা তাদের সমান হয়ে যাও, তাহলে সংখ্যা ও শক্তি এবং উপায় ও সরঞ্জামের প্রাচুর্যের কারণে তোমাদের বিরুদ্ধে জয় তাদেরই হবে।" (৫৮১)

চতুর্থ শিক্ষা : ইসলামি ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারে জিহাদের কোনো বিকল্প নেই।

মুসলিম উম্মাহর সৎ ও যোগ্য সন্তানেরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, মুসলমানদের ভূখণ্ড থেকে ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করার একমাত্র পথ হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। জবরদখলকারী বাহিনী স্বেচ্ছায় যেতে রাজি হবে না; বরং যেতে বাধ্য করতে হবে! এ কারণেই তাদের জীবনের

---

৫৮১. শিহাবুদ্দিন আহমাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নুওয়াইরি কৃত *নিহায়াতুল আরাব ফী ফুনূনিল আদাব*-এর সূত্রে মাহমুদ শিদ খাত্তাব, *আল-ফারুক আল-কায়িদ*, পৃষ্ঠা : ১৫৫।

প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত জিহাদি তৎপরতা অব্যাহত ছিল। আমাদের আলোচ্য ইতিহাসে সম্ভবত আমরা এর সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লক্ষ করেছি মওদুদ বিন তুনিকতিন রহ.-এর ক্ষেত্রে, এরপর শক্তিশালী বীরযোদ্ধা ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ.-এর ক্ষেত্রে। এই দুই মহান নেতার ইতিহাসে সবচেয়ে উজ্জ্বলরূপে যে বিষয়টি আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়, তা হলো—তারা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহকে নিজেদের জীবনের মূল ব্যস্ততা বানিয়ে নিয়েছিলেন। আর তাই তাদের উভয়ের শাসনক্ষমতা লাভের সময় থেকে নিয়ে নিজেদের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একটি মুহূর্তও জিহাদি চিন্তা দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হয়নি।

আর জিহাদও হতে হবে একমাত্র আল্লাহর পথে। অন্য কোনো নিয়ত ও মনোবাঞ্ছা বা দ্বৈত কোনো লক্ষ্য এক্ষেত্রে বৈধ নয়। সুতরাং ক্ষমতার মসনদ লাভের জন্য, অর্থসম্পদ অর্জনের জন্য, মালিকানাধীন ভূসম্পদ বিস্তৃত করার জন্য, গোত্র বা জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, এমনকি শাসক বা সুলতানের স্বার্থ রক্ষার জন্য জিহাদও সঠিক জিহাদ নয়। অনেক বাহিনী কেবল এ কারণে যুদ্ধ করে যে, তাদের সেনাপতি যুদ্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এমন বাহিনীর সদস্যদের লড়াই হয় বিক্ষিপ্ত; তাদের কোনো লক্ষ্য থাকে না। আর সাধারণত এ জাতীয় বাহিনী জয়লাভও করে না। কারণ, তারা আল্লাহর জন্য কাজ করে না। আর আল্লাহ কেবল তাদেরকেই সাহায্য করেন, যারা তাকে সাহায্য করে; আল্লাহ কেবল তাদেরকে সহায়তা করেন, যারা তাদের কর্ম-ইচ্ছা পুরোপুরি আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ﴾

> আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন, যে তার (দ্বীনের) সাহায্য করবে। [সুরা হজ্জ: ৪০]

মওদুদ ও ইমাদুদ্দিন জিনকি এই বাস্তবতা উপলব্ধি করেছিলেন বলেই আপন আপন সেনাবাহিনী ও জনসাধারণকে এই মর্মকথা শিক্ষাদানে সচেষ্ট ছিলেন। আর এ কারণেই তাদের আমলে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর প্রকৃত ঝান্ডা এবং বিদ্বেষ-শত্রুতা ও অস্বচ্ছতা-

মুক্ত নির্ভেজাল একনিষ্ঠতা। যেদিন মুসলিম উম্মাহ মওদুদ ও ইমাদুদ্দিনের ন্যায় নিষ্ঠাবান ও সচেতন নেতা জন্ম দিতে পারবে, আল্লাহর হুকুমে সেদিন আমরা নুসরত ও বিজয় প্রত্যক্ষ করব। আর আল্লাহর পক্ষে তা মোটেও কঠিন নয়।

পঞ্চম শিক্ষা : বিজয় নিশ্চিত করার জন্য ঐক্য জরুরি।

মুসলিম উম্মাহর সৎ ও যোগ্য সন্তানগণ এ বিষয়টিও উপলব্ধি করেছিলেন যে, ঐক্য ব্যতীত জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ কার্যকর হয় না। এ কারণেই রণাঙ্গনের কঠিন লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই তারা জাতিকে এক ও অভিন্ন কাঠামোতে ঐক্যবদ্ধ করতে সর্বোচ্চ সচেষ্ট থেকেছেন এবং নিজেদের পূর্ণ সময় ও প্রচেষ্টা এ উদ্দেশ্যে ব্যয় করেছেন। এ পথে তারা প্রচুর সংকট অতিক্রম করেছেন, কঠিন সব বিপদ-আপদ মোকাবিলা করেছেন; কিন্তু তবুও এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পুরো জীবন আগ্রহী ও সচেষ্ট থেকেছেন। কারণ, তারা প্রকৃতই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, বিভেদ-বিচ্ছিন্নতাই ব্যর্থতার কারণ এবং কলহ-বিবাদের সঙ্গেই পরাজয় সংশ্লিষ্ট। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন—

﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

এবং পরস্পরে কলহ করবে না, অন্যথায় তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব বিলুপ্ত হবে। আর ধৈর্যধারণ করবে। বিশ্বাস রাখো, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।

[সুরা আনফাল: ৪৬]

ঐক্য ও একক ইসলামি কাঠামো সকল নেতা ও শাসকের চাহিদা ছিল না। অনেকেই অতি সামান্য ভূখণ্ডের ব্যক্তিক্ষমতার লোভে ঐক্যের বিরোধিতা করেছে, ঐক্যপ্রচেষ্টায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। একে কেন্দ্র করেই সংঘটিত হয়েছে মোকাবিলা, সংঘর্ষ ও সংঘাত। আর তাই অর্থহীন ফাঁপা নেতৃত্বের প্রত্যাশী যেসব নেতা কেবল নিজেদের স্বার্থ অনুসন্ধান করে, তাদের মোকাবিলার জন্য সকল পন্থায় চেষ্টা করা অপরিহার্য ছিল।

সৎ ও নিষ্ঠাবান নেতৃবৃন্দ কখনো আলোচনা ও সংলাপের মাধ্যমে, কখনো অর্থসম্পদ বা জায়গিরের প্রস্তাব দিয়ে, কখনো-বা হুমকি-ধমকির মাধ্যমে তাদেরকে ঐক্যের পথে আনতে চেষ্টা করেছেন; আবার কখনো

এসব পন্থায় কাজ না হওয়ায় বাধ্য হয়ে সামরিক লড়াইয়ের মাধ্যমে সমাধানে সচেষ্ট হয়েছেন। এভাবে তাদের প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। যদিও বৃহত্তর জাতির বিবেচনায় তা ছিল আংশিক ঐক্য; কিন্তু তার মাধ্যমেই বিজয় নিশ্চিত হয়েছে এবং আমরা স্বস্তি ও আনন্দ প্রত্যক্ষ করেছি।

আমরা আমাদের পঠিত ইতিহাসে দেখেছি, আমাদের ইসলামি ইতিহাসের মহান বীর ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ. দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য মাত্রায় ঐক্যের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তিনি অর্থসম্পদ বা জায়গির প্রদান করে, কাউকে ক্ষমতা প্রদান করে ঐক্যের পথে আনতে চেয়েছেন; জাতির যৌথ নেতৃত্বের নিদর্শন হিসেবে কারও হাতে হাত রেখেছেন। আবার কখনো তিনি দুটি রাজ্যকে একীভূত করার জন্য বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ সারি যেন বিভক্ত না হয়ে যায়, এজন্য তিনি সুলতান মাসউদ বা অন্যদের কষ্টদায়ক আচরণও উপেক্ষা করেছেন। এসব আচরণ তিনি করেছেন সেলজুক, আব্বাসি, উরতুক, তুর্কমেন, আরব, বনু মুনকিয, বনু দানিশমান্দসহ সকলের সঙ্গে। ঐক্য প্রত্যাখ্যানকারী কোনো নগরী তিনি মাসের পর মাস এমনকি বছরের পর বছর অবরোধ করে রেখেছেন। উম্মাহর ঐক্যের অতি মূল্যবান স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তিনি তার জীবনের শুরু থেকে শেষ পুরোটাই ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। আর এভাবেই তিনি মৃত্যুর সময় রেখে যেতে পেরেছেন এক বিরাট একক রাষ্ট্রকাঠামো, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল মসুল, আলেপ্পো, হাররান, নুসায়বিন, হিমস, হামা ও বালাবাক্কু নগরী।

নিঃসন্দেহে এ এক কঠিন জীবন। কিন্তু যেহেতু তার সামনে এর লক্ষ্য সুস্পষ্ট ছিল, আর দৃষ্টি ছিল একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি, তাই এই সুকঠিন কাজও তার জন্য সহজ কাজে পরিণত হয়েছিল।

ষষ্ঠ শিক্ষা : আদর্শ নমুনা ব্যতীত পরিবর্তন ও সংস্কারের আশা নেই।

পেছনের আলোচনায় আমরা অনুধাবন করেছি, মুসলিম জনগণের মধ্যে কল্যাণের অনেক উপাদান রয়েছে, আছে সুস্থ ও সঠিক প্রকৃতি ও স্বভাব। কিন্তু জাতির জন্য প্রয়োজন এমন সুস্পষ্ট ও সুন্দর আদর্শ নমুনা, সকলে যার অনুসরণ করবে। এমন আদর্শ নমুনা সামনে থাকলেই অন্তরে অন্তরে সুপ্ত কল্যাণ উদ্ভাসিত হবে এবং সততা ও কল্যাণের আগ্রহ ও প্রবণতা

জনসাধারণের মাঝে স্পন্দিত হবে।

স্বভাবগতভাবেই মানুষ অনুসরণযোগ্য আদর্শের মুখাপেক্ষী। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্য হতে রাসুল প্রেরণ করেছেন, যেন তারা মানুষের জন্য সৎ ও উত্তম নমুনা হতে পারেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

> বস্তুত আল্লাহর রাসুলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ—এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।
>
> [সুরা আহযাব: ২১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় মানুষ যখন নবীজিকে নিজেদের মাঝে প্রত্যক্ষ করেছে এবং দেখেছে যে, তিনি তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন নন, তিনি তাদের পরিচর্যা ও দীক্ষাদান করছেন, জিহাদ করছেন, দান করছেন, হক ও ন্যায়ের কথা বলছেন, মজলুমের পক্ষে প্রতিরক্ষা করছেন, কল্যাণ কাজ করছেন ও অন্যায় হতে দূরে থাকছেন, তখন সাধারণ মানুষও স্পন্দিত হয়েছে। মানুষ দেখেছে, তিনি তাদেরকে যা বলেন, তা বাস্তব, জীবন্ত এবং তার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে প্রতিফলিত হয়েছে, তখন তারা তাকে সত্যায়ন করেছে এবং তার নির্দেশিত পথ অনুসরণ করেছে।

মুসলিম উম্মাহর সৎ ও ন্যায়বান ব্যক্তিগণও এমনই ছিলেন।

তাদের কথা-কাজে ভিন্নতা ছিল না।

তাদের ভেতর-বাহির অভিন্ন ছিল।

মানুষকে তারা যে উপদেশ দিতেন, তা অন্যদের কাছে দাবি করার পূর্বে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতেন।

আমরা ইমাদুদ্দিন জিনকিকে দেখেছি, তিনি নিজের জন্য কোনো ভূসম্পদ বা অর্থসম্পদ গ্রহণ করেননি। এ কারণেই তিনি তার সৈন্যদের এবং সেনাপতি ও প্রশাসকদের মানুষের ভূসম্পত্তি ও সম্পদ গ্রহণে নিষেধ করতে পারতেন।

আমরা তাকে আরও দেখেছি, তিনি প্রতিদিন তার সম্পদ দরিদ্র-অসহায়দের দান করতেন। আর তাই তিনি তার সঙ্গীদেরকেও কৃষকসমাজ ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে সদয় আচরণ করার নির্দেশ প্রদানের শক্তি রাখতেন।

আমরা দেখেছি, তিনি সবার আগে লড়াই শুরু করতেন, অন্যান্য সৈন্যের তুলনায় তিনি সবার আগে শত্রুর কাছে পৌছে যেতেন। আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, এডেসা নগরদ্বারে তিনিই সবার পূর্বে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এ কারণেই তিনি তার সৈন্যদেরকেও জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন।

আমরা তাকে দেখেছি, তিনি আলিম ও ফকিহগণের কাছে শরিয়তের বিধান জিজ্ঞেস করতেন, তাদের মতামত-পরামর্শ শুনতেন ও গ্রহণ করতেন। এ কারণেই তিনি তার জনগণকে আলিমদের কথা শ্রবণের ও অনুসরণের আদেশ করতে পেরেছিলেন।

দাঈ ও দ্বীনপ্রচারক, আলিম-উলামা, মুজাহিদ-সেনাপতি এবং শাসক ও নেতৃবৃন্দের জেনে রাখা উচিত, এক ব্যক্তির সামনে হাজারজনের কথার চেয়ে হাজারজনের মাঝে একজনের কাজ বেশি কার্যকর ও কল্যাণকর!

সপ্তম শিক্ষা : পরিবর্তন ও সংস্কারের চাবিকাঠি উলামায়ে কেরামের হাতে

এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, আমাদের আলোচ্য ইতিহাসে সর্বদা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে মসুল ও উত্তর ইরাক থেকে। আমরা আরও দেখেছি, বাগদাদের জনগণের স্বভাব-প্রকৃতি দামেশক, হিমস বা কায়রোর জনগণের স্বভাব-প্রকৃতির চেয়ে বহুগুণে শ্রেয় ছিল। এর একমাত্র কারণ ছিল—ইরাক অঞ্চলে উলামায়ে কেরাম অব্যাহত মেহনত চালিয়ে গিয়েছিলেন। একই কথা প্রযোজ্য পারস্য ও আশেপাশের এলাকার ক্ষেত্রেও।

বরং এর সূচনা আরও আগে থেকে। ক্রুসেড অভিযানেরও কয়েক দশক পূর্ব থেকে। মহান উজির নিজামুল মুলক এই বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণের সূচনা করেছিলেন। নিজামুল মুলক ছিলেন প্রথমে সেলজুক সুলতান আলপ আরসালান এবং পরবর্তী সময়ে তার পুত্র মালিকশাহর উজির। জ্ঞানচর্চার অঙ্গনে তার অন্যতম সুকীর্তি হলো—তিনি পারস্য ও ইরাকের প্রতিটি

অঞ্চলে নিজামিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সমকালীন যুগশ্রেষ্ঠ সংস্কারক উলামায়ে কেরামকে এসব মাদরাসায় অধ্যাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন। নিঃসন্দেহে তার এই পদক্ষেপ অঞ্চলটির জনসাধারণের চরিত্র ও আচার-আচরণে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করেছিল, তাদের আকিদা ও বিশ্বাসকে সব ধরনের প্রান্তিকতা ও সংশয়-সন্দেহ হতে পরিচ্ছন্ন রেখেছিল এবং তাদের চিন্তা-চেতনাকে সব ধরনের ভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তি-বিভ্রান্তি হতে মুক্ত রেখেছিল। এভাবেই তাদের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছিল একটি বোধসম্পন্ন, সচেতন, সতর্ক, জিহাদপ্রিয়, দ্বীনের প্রতি উদ্যমী, কল্যাণকর্মে অগ্রগামী, সৎকর্মে উদ্বুদ্ধকারী এবং অসৎকর্ম অপছন্দকারী ও নিষেধকারী এক জাতি। তদ্রূপ সে জাতি এমন সব জিহাদি অভিযানে শরিক হয়েছে, যার বিবরণ আমরা পাঠ করেছি। এই অভিযানপ্রবাহের সূচনা হয়েছিল কারবুগার অভিযানের মাধ্যমে, এরপর একে একে জাকারমিশ, আক সুনকুর আল-বুরসুকি, বুরসুক বিন বুরসুক ও মওদুদ বিন তুনতেকিনের অভিযান এবং সবশেষে অনন্যসাধারণ বীরযোদ্ধা ইমাদুদ্দিন জিনকির অভিযানসমূহ।

নিজামুল মুলক ইলমি অঙ্গনে যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, তা নিষ্ফল হয়নি। সমকালীন উলামায়ে কেরাম জাতির পরিচর্যা ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যে গুরুত্ব প্রদান করেছেন, তা অর্থহীন প্রমাণিত হয়নি। 'তার' এবং 'তাদের' প্রচেষ্টা ও গুরুত্ব তাদের ইন্তেকালের অনেক বছর পরে হলেও অতি উত্তম ও পরিপক্ক ফল প্রদান করেছে।

অষ্টম শিক্ষা : সুপরিণতি কেবল ঈমানদার-মুত্তাকিদের ভাগ্যে জোটে!

এডেসা নগরী এবং তার আশেপাশের অঞ্চল দীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বছর ক্রুসেডারদের অধিকৃত ছিল। সেখানে এমন একটি খ্রিষ্টান প্রজন্ম বেড়ে উঠেছিল, যারা বিশ্বাস করত যে, এই ভূমি কেবল তাদেরই। অনেক মুসলমান মনে করেছিল, এ ইস্যুর পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং এ ভূখণ্ড চিরদিনের জন্য মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। এডেসা ভূমি আর কোনো দিন ইসলামি শাসনে ফিরে আসবে না; এসব নগরী ও দুর্গের প্রাচীরে আর কোনো দিন ইসলামি পতাকা উড্ডীন হবে না। মুসলমানদের অনেকেই এডেসা পুনরুদ্ধার অসম্ভব মনে করেছিল এবং হতাশা ও নিরাশার পাতালকুঠুরিতে ঢুকে পড়েছিল।

কিন্তু যে বাস্তবতা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, তা হলো—প্রায় পঞ্চাশ বছর পর ক্রুসেড রাজ্য এডেসার পতন ঘটেছে, অন্ধকারের বুক চিরে আলো উদিত হয়েছে, উষার দুয়ারে আঘাত হেনে দ্বীনের সৈনিকগণ রাঙা প্রভাতের বার্তা নিশ্চিত করেছে। পূর্বের ন্যায় এসব দুর্গ ও নগরী ইসলামি দুর্গ ও নগরে পরিণত হয়েছে, নগরপ্রাচীরের শীর্ষদেশে পতপত করে উড়েছে ইসলামের পতাকা।

পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ মুমিনদেরকে নুসরত ও বিজয়দানের খোদায়ি প্রতিশ্রুতি এমন সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, তা কোনো মুমিনের কাছে অবোধগম্য নয়। এ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিসসমূহ এত অধিক যে, সুনির্দিষ্ট সংখ্যার আয়ত্তে নিয়ে আসা অত্যন্ত কঠিন কাজ। আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾

নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, আমি আমার রাসুলগণকে এবং মুমিনদেরকে পার্থিব জীবনেও সাহায্য করি এবং সেই দিনও করব, যেদিন সাক্ষীগণ দাঁড়িয়ে যাবে। [সুরা মু'মিন : ৫১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

«إِنَّ اللهَ زَوَى لِيَ الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِيْ سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِيْ مِنْهَا»

আল্লাহ তাআলা আমার জন্য পৃথিবী সংকুচিত করে দিয়েছিলেন। তখন আমি পূর্ব প্রান্ত হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত জমিনের সবকিছু প্রত্যক্ষ করেছি। পৃথিবীর যতটুকু আমার জন্য সংকুচিত করে দেওয়া হয়েছিল, আমার উম্মতের সাম্রাজ্য অচিরেই ততদূর পর্যন্ত পৌঁছবে।[৫৮২]

প্রকৃত মুমিন তো সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং সত্যায়ন করে। আর যে আল্লাহর নুসরত ও

---

৫৮২. ইমাম মুসলিম, *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২৮৮৯, ইমাম আবু দাউদ, *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪২৫২, ইমাম তিরমিজি, *সুনানে তিরমিজি*, হাদিস নং ২১৭৬ ও ইমাম ইবনে মাজা, *সুনানে ইবনে মাজা*, হাদিস নং ৩৯৫২।

সাহায্যের বিষয়ে সংশয়-সন্দেহ পোষণ করে, তার পক্ষে বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছা অসম্ভব। আশাহীন জাতি তো প্রাণহীন দেহের ন্যায়। আর তাই উম্মাহর দ্বীনপ্রচারক ও সমাজসংস্কারকদের কর্তব্য হলো, তারা মুসলমানদের হৃদয়ে আশা পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং তাদের অন্তর্জগৎকে এ বিষয়ে আশ্বস্ত করবেন যে, জুলুম ও অন্যায় এবং সীমালঙ্ঘন ও স্বেচ্ছাচারিতা যতই প্রবল ও প্রচণ্ড হোক না কেন, হক ও ন্যায় অবশ্যই বিজয়ী হবে। আর আল্লাহ তো আপন কর্মে পরাক্রমশালী; যদিও অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

নবম শিক্ষা : সংস্কারকদের জীবনযাত্রা সাধারণ দায়িত্বশীলদের তুলনায় অনেক ব্যতিক্রম

এ কারণেই মুজাদ্দিদ ও সমাজের দ্বীনি সংস্কারক হওয়া সহজ কোনো দায়িত্ব নয়। সহজ নয় মুসলিহ ও সংশোধনকারী হওয়া। সাধারণ মুমিনগণ ভালোকে মন্দের সঙ্গে এবং সঠিক বিষয়কে ভুল বিষয়ের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে। সাধারণ মুসলমানগণ সময়কে কখনো ব্যয় করে উম্মাহর কল্যাণ-চিন্তায়, আবার কখনো ব্যয় করে নিজের জন্য, নিজের স্বার্থ ও কল্যাণের জন্য। কিন্তু মুজাদ্দিদ ও সমাজসংস্কারক যারা, মুসলিহ ও সংশোধনকারী যারা, তাদের জীবন হয় সম্পূর্ণই ভিন্ন!

ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ.-এর জীবনী পুনঃনিরীক্ষণ করে দেখুন!

নিঃসন্দেহে মুজাদ্দিদ এমন ব্যক্তি হন, যিনি তার পুরো জীবন একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য ওয়াকফ করে দেন। তিনি তার সময় বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার ন্যায় অর্থহীন কোনো কাজে নষ্ট করেন না। তদ্রূপ তিনি একবার এই কাজে, আরেকবার ওই কাজে; বা কখনো এক লক্ষ্যের পেছনে, আবার কখনো আরেক লক্ষ্যের পেছনে বিক্ষিপ্ত ছুটোছুটি করেন না। একজন মুজাদ্দিদ হন সুস্পষ্ট কর্মলক্ষ্যের অধিকারী, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারী এবং সঠিক ও সুনির্ধারিত পথে গমনকারী।

তার জীবনে কোনো কর্মহীন-বেকার সময়ের অস্তিত্ব থাকে না।

তার জীবনে সময়ের চেয়ে কাজের পরিমাণ অনেক অনেক গুণ বেশি হয়। আর তাই তার জীবনীতে পাওয়া যায় যে, তিনি একেবারেই সামান্য সময়ের জন্য নিদ্রাগমন করতেন, অতি স্বল্প সময়ের জন্য বিশ্রাম করতেন।

একজন দ্বীনি সংস্কারক সর্বদা থাকেন চিন্তামগ্ন, নীরব-নিমগ্ন, গভীর চিন্তা ও ধ্যানের অধিকারী ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির অধিকারী।

ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ.-কে আমরা ছুটে বেড়াতে দেখেছি মসুল ও আলেপ্পোর মাঝে, হিমস ও দামেশকের মাঝে, এরপর এন্টিয়ক ও এডেসার মাঝে। তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন কোনো প্রশাসনিক সমস্যার সমাধান করতে, আবার রাজনৈতিক পরিকল্পনা থেকে ছুটে যেতেন কোনো কৌশলগত মিত্রতা সম্পাদন করতে।

একান্ত বাধ্য ও নিরুপায় না হলে তিনি ঘুমাতেন না; পথের পূর্ণতার উদ্দেশ্য ছাড়া বিশ্রাম করতেন না!

এমনকি এডেসা বিজয়ের মতো সুকঠিন অভিযানের পরও সরাসরি তিনি ছুটে গেছেন সারুজ নগরীর দিকে; এরপর সেখান থেকে ফুরাতের পূর্ব তীরের প্রতিটি নগরী ও দুর্গ অভিমুখে; তারপর আলবেরার উদ্দেশে। এরপর আবার মসুলে ফিরে এসেছেন নাসিরুদ্দিন জাকারের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় উপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। এরপর আবার এডেসায় ছুটে গেছেন ষড়যন্ত্রের মূলোৎপাটন করতে। তারপর দামেশক অভিমুখে রওনা হয়েছেন এবং পথে জাবার দুর্গের পতন ঘটানোর জন্য কয়েক মাস অবরোধ করে রেখেছেন!

এভাবেই অবিরাম কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে তিনি এমন সব লক্ষ্য বাস্তবায়ন করেছেন, যা তার পূর্ববর্তীরা করতে সক্ষম হয়নি। তিনি একটি ক্রুসেড রাজ্যের পতন ঘটিয়েছেন এবং অনেক বছরের নির্যাতন-নিপীড়নের পর সেখানে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করেছেন।

তিনি কৃত্রিম ব্যস্ততা দেখাননি, মিথ্যা কর্মের ভান করেননি।

তিনি ছিলেন বাস্তবেই ব্যস্ত; তার কর্ম ও কর্মব্যস্ততা ছিল অনেক।

আর এটিই হলো মুজাদ্দিদ ও সংস্কারকদের জীবন!

এমনকি সামান্য অবসরের সময়টুকুও তিনি শিকার ও অশ্বচালনার অনুশীলনে ব্যয় করতেন কিংবা দজলার তীরে একাকী বিচরণ করতেন আর আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে ভাবনায় নিমগ্ন হতেন।

নিঃসন্দেহে এটি বড় কঠিন জীবন—তবে উপভোগ্য জীবন; ক্লান্তিকর জীবন—তবে হিতকর জীবন। এ জীবনের কল্যাণ ও অবদান

ব্যক্তিবিশেষ বা কয়েকজনে সীমাবদ্ধ নয়; এর ব্যাপ্তি পুরো জাতির জীবনজুড়ে। এর প্রভাব এক-দুই বছরে সীমিত নয়; বরং কখনো কখনো দশকের পর দশক, এমনকি শতাব্দীর পর শতাব্দীজুড়ে।

এ কারণেই মুজাদ্দিদ ও সমাজসংস্কারকের সংখ্যা হাতেগোনা, অতি অল্প।

কত সৌভাগ্যবান সেই প্রজন্ম, যাদের মাঝে আত্মপ্রকাশ ঘটে একজন মুজাদ্দিদের।

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি—তিনি যেন মুসলিম উম্মাহকে এমন ক্ষণজন্মা মুজাদ্দিদ মনীষী অনেক অনেক দান করেন। কারণ, তাদের একজনই একটি জাতির সমান।

দশম শিক্ষা : সংস্কারকগণের মৃত্যুতে ইসলামের ঝান্ডা অবনমিত হয় না!

জাতি যখন একজন ক্ষণজন্মা মুজাদ্দিদকে হারায়, তখন তার বিয়োগ বেদনায় অনেক বেশি ব্যথিত হয়। অবশ্য এ ধরনের একজন মহান ব্যক্তির মৃত্যুতে ব্যথিত হওয়াই জাতির দায়িত্ব। কারণ, তার অস্তিত্ব পুরো জাতির জন্য জীবনীশক্তির ন্যায়। কিন্তু তার মৃত্যুতে ব্যথিত হলেও নিরাশ হওয়া জাতির জন্য সমীচীন নয়। কারণ, আল্লাহ তাআলা সর্বদাই মুসলিম উম্মাহর মাঝ থেকে এমন কারও আত্মপ্রকাশ ঘটান, যিনি ইসলামের ঝান্ডা বহন করেন। ফলে এ ঝান্ডার কখনো পতন ঘটে না। আল্লাহ তাআলা সর্বদাই জাতির নেতৃত্বদানের জন্য এমন কারও উদ্ভব ঘটান, যার কারণে জাতি পথহারা হয় না।

মওদুদ রহ.-এর মৃত্যুতে আমরা অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়েছিলাম; হয়েছিলাম ব্যথায় কাতর। কারণ, তিনি জিহাদের যে ঝান্ডা বহন করেছিলেন, তা বহন করার জন্য তার সমকক্ষ কেউ বিদ্যমান ছিল না। কিন্তু এরপর হঠাৎ করেই আমরা আবিষ্কার করি যে, জিহাদের জগতে এক নবতারকা উদিত হয়েছে! তিনি দ্বীনের ঝান্ডা বহন করেছেন এবং জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। তিনি হলেন ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ.। জাতি তার নেতৃত্বে বাস্তবেই একটি সৌভাগ্যপূর্ণ কাল অতিবাহিত করেছে। সে সময় নতুন করে বিজয়ের সুবাতাস প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। এরপর আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে জাতি এডেসা পুনরুদ্ধার এবং ক্রুসেডারদের পরাভূত করতে সক্ষম হয়েছে। ইতিহাসের পাতায় মর্যাদা ও গৌরব প্রভাব বিস্তার করেছে।

এরপর নিহত হলেন ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ.!

আমরা প্রচণ্ড ভারাক্রান্ত হলাম, উদ্বেগে আচ্ছন্ন হলাম, ব্যথায় কাতর হলাম। নিঃসন্দেহে এ ঘটনা ছিল জাতির জন্য এক বিরাট আঘাত। বরং এখন আমাদের জন্যও বিরাট আঘাত। অথচ আমরা এ ইতিহাস পাঠ করছি ঘটনাপ্রবাহের কয়েকশ বছর পর!

কিন্তু তার হত্যাকাণ্ডের পর কী ঘটেছে?!

তার হত্যাকাণ্ড ছিল আরেক নবতারকা আত্মপ্রকাশের পূর্বাভাস! তার নাম নুরুদ্দিন মাহমুদ। নুরুদ্দিন ছিলেন প্রয়াত মহান বীর ইমাদুদ্দিন জিনকির মহান সন্তান। তিনি প্রমাণ করেছিলেন, তার পিতা মৃত্যুবরণ করেননি; বরং এমন সৎ ও যোগ্য বংশধর রেখে গেছেন, যিনি জাতির মর্যাদা ও সম্মানকে তার নাম ও জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছেন।

নুরুদ্দিন মাহমুদ রহ.!

ইসলামি ইতিহাসের অন্যতম আকর্ষণীয় চরিত্র, অন্যতম পূর্ণাঙ্গ ও পরিব্যাপ্ত ব্যক্তি। প্রতিটি অঙ্গনে তিনি উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রেখেছিলেন—দ্বীনের ক্ষেত্রে, আখলাক ও চরিত্রগুণে, ইবাদত, জিহাদ, প্রশাসন পরিচালনা, শাসন, আচার-আচরণ ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা সবকিছুতে।

তিনি এক মহান বীর! কীর্তির বিশালতায় সমৃদ্ধ জীবন তার!

আমার প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল, জিনকি রাষ্ট্র সম্পর্কে একটি গ্রন্থ লিখব এবং তাতে তার পিতার জীবনেতিহাসের সঙ্গে তার জীবন ও কর্ম সম্পর্কেও আলোকপাত করব। কিন্তু পরে উপলব্ধি করলাম, এতে তার হক ও অধিকারের প্রতি অসম্মান করা হবে এবং তাকে যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করা হবে না। আর তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমি আমার সময় ও কর্মপ্রচেষ্টা তার জন্য অবসর করে তার জীবনের ক্ষণগুলোকে একত্র করার চেষ্টা করব, যেন তা আমাদেরকে এবং সমগ্র মানবজাতিকে সৌভাগ্যবান করে। কারণ, এ জাতীয় মহান ব্যক্তিদের কর্ম ও কীর্তির কল্যাণ কেবল আপন সমাজ নয়; বরং পুরো পৃথিবীতেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অব্যাহত থাকে।

আর তাই আমাদের পরবর্তী গ্রন্থ হবে এই মহান মনীষী সম্পর্কে। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে তার ন্যায়, তার পিতার ন্যায় এবং তার পিতামহের ন্যায় মহান ব্যক্তি দান করেন। তারা কতই না মহান পরিবার! কতই না উত্তম আদর্শ!

মোটামুটি এই হলো এই অমর ইতিহাস হতে অর্জিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষা।

এই হলো পূর্ণ দশ!

নিঃসন্দেহে প্রকৃত শিক্ষা ও উপদেশ আরও অনেক অনেক বেশি। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য খুঁজে খুঁজে সবগুলো বের করে মোট সংখ্যা নির্ণয় করা নয়। আমরা চেষ্টা করেছি চিন্তা-ভাবনার দুয়ার খুলে দিতে। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন সকল মুসলমানকে দ্বীনের সঠিক ও সুন্দর উপলব্ধিজ্ঞান দান করেন এবং নিজেদের ইতিহাসের সঠিক মর্মজ্ঞান দান করেন। আল্লাহই তাওফিকদাতা; তিনিই সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

* * *

উপসংহার

এমনটি হওয়া সমীচীন নয় যে, আমাদের ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস অধ্যয়ন আমাদের যাপিত জীবনের বাস্তবতা হতে বিচ্ছিন্ন থেকে যাবে। বরং এমনটিই হওয়া সমীচীন যে, আমরা যখন এই ইতিহাস পাঠ করব, তখন আমাদের চিন্তাজগৎজুড়ে বিচরণ করবে ফিলিস্তিন, ইরাক, আফগানিস্তান, চেচনিয়া, কাশ্মীর ও মুসলিম উম্মাহর কাছ থেকে লুণ্ঠিত প্রতিটি জনপদ।

ইহুদি, আমেরিকান, রুশ ও হিন্দুদের কাছে আমাদের এসব ভূখণ্ড হারানোর কারণ ও কার্যকারণ সেগুলোই, যেগুলো ছিল ক্রুসেডারদের হাতে শাম ও ফিলিস্তিন পতনের কারণ। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো, আমাদের এই বর্তমান সংকট হতে উত্তরণের পথ ও পদ্ধতি ঠিক সেটিই, যে পথে উম্মাহর সংগ্রামী যোদ্ধাগণ এবং সংস্কারকগণ চলেছেন।

আমরা এ গ্রন্থে ক্রুসেড যুদ্ধের সূচনা-ইতিহাস ও ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ.-এর ইতিহাস আলোচনা করেছি; এখনো রয়ে গেছে নুরুদ্দিন মাহমুদ, সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ও তাদের পরবর্তী অনেক মুজাদ্দিদ ও সমাজ সংস্কারকের ইতিহাসের অনেক পৃষ্ঠা। আমাদের এই পরিভ্রমণের দৈর্ঘ্য তো দুইশ বছর; আমরা অতিক্রম করেছি মাত্র পঞ্চাশ বছর!

নিঃসন্দেহে ইতিহাস অত্যন্ত উপভোগ্য ও আগ্রহ সৃষ্টিকারী, কৌতূহলোদ্দীপক ও মুগ্ধকর। কিন্তু ইতিহাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তার উপভোগ্যতায় বা মুগ্ধতা সৃষ্টি করায় নয়। ইতিহাসের 'অমূল্য' মূল্যমানের কারণ ইতিহাসের বারংবার পুনরাবৃত্তি। আর তাই ইতিহাস অধ্যয়নের অর্থ কল্যাণ ও উপকারের পুনরাবৃত্তি, ভুলত্রুটি ও সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি। ইতিহাস এক অনিঃশেষ

সম্পদভান্ডার, কূল-কিনারাহীন এক সাগর। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের জন্য সকল কাঙ্ক্ষিত বিষয় বাস্তবায়ন করেন, ইতিহাসের শিক্ষা-উপদেশ ও কল্যাণ-ছোঁয়ায় আমাদেরকে সংকট ও দুর্যোগ থেকে উদ্ধার করেন।

নিঃসন্দেহে তিনি তা বাস্তবায়নে সক্ষম। তিনি বান্দার আহ্বানে সাড়াদানে ক্ষমতাবান।

আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে সম্মান ও মর্যাদা দান করেন।

—ড. রাগিব সারজানি
কায়রো
১ মার্চ, ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ

* * *

পরিশিষ্ট[৫৮৩]

ইমাদুদ্দিন জিনকি-পরবর্তী সময়ের ইসলাম-খ্রিষ্টবাদ সংঘাতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

যদিও ইসলামি ভূখণ্ডে ক্রুসেডারদের আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর থেকে যুগে যুগে বিভিন্ন মুসলিম শাসক-প্রশাসক ক্রুসেডারদের প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন; কিন্তু ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ.-ই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি বিষয়টিকে নিয়ে গঠনমূলক চিন্তা করেছিলেন, ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করাকে জীবনের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নিয়েছিলেন এবং আজীবন এ পথে লড়াই ও সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছিলেন। ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ.-এর ইন্তেকালের পর এ দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন তার পুত্র নুরুদ্দিন মাহমুদ জিনকি রহ.। ক্রুসেডারবিরোধী সংগ্রামের পরবর্তী স্তর বলতে গেলে পুরোটাই নুরুদ্দিনকেন্দ্রিক। তাই আমাদের সামনের আলোচনা তাকে ঘিরেই আবর্তিত হবে।

ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ. চারজন পুত্র রেখে মারা যান। তাদের নাম যথাক্রমে সাইফুদ্দিন গাজি, নুরুদ্দিন মাহমুদ, কুতুবুদ্দিন মওদুদ ও নুসরতুদ্দিন। তার মৃত্যুর পর জিনকি রাষ্ট্র দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। পূর্ব অংশের শাসনভার গ্রহণ করেন তার জ্যেষ্ঠ পুত্র সাইফুদ্দিন গাজি। মসুলকেন্দ্রিক এ অংশে মসুল ছাড়াও ছিল হিমস ও জাযিরা অঞ্চল। অপরদিকে পশ্চিম অংশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তার দ্বিতীয় পুত্র নুরুদ্দিন মাহমুদ। এ অংশে ছিল আলেপ্পো ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকা। দুই ভাইয়ের রাজ্যের সীমানা ছিল জাযিরা অঞ্চলের খাবুর নদী (The Khabur River)। তৃতীয় ভাই কুতুবুদ্দিন মওদুদ বড় ভাই সাইফুদ্দিনের তত্ত্বাবধানে থাকেন। আর ছোট ভাই নুসরতুদ্দিন নুরুদ্দিনের অধীনে হাররান নগরীর প্রশাসনিক দায়িত্ব লাভ করেন।

---

৫৮৩. পরিশিষ্টটি মূল গ্রন্থের অংশ নয়; সম্পাদনা-পর্ষদ কর্তৃক সংযোজিত।

নুরুদ্দিন জিনকির জন্ম ৫১১ হিজরি সনের ১৭ শাওয়াল (১১১৮ খ্রিষ্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি)। ইমাদুদ্দিন জিনকি তার এই পুত্রের স্বভাবজাত যোগ্যতা প্রত্যক্ষ করে সব সময় তাকে নিজের সঙ্গে রেখেছিলেন এবং নিজের মতো করে গড়ে তুলেছিলেন। পিতার মৃত্যুর সময় নুরুদ্দিন মাহমুদ জিনকির বয়স ছিল ত্রিশ বছর। এ সময় তিনি পিতার সঙ্গেই জাবার দুর্গ অবরোধে শরিক ছিলেন। পিতার মতোই নুরুদ্দিন জিনকি দুটি বিষয়কে তার জীবনের মূল লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছিলেন—ঐক্যবদ্ধ ইসলামি শক্তি প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামি ভূখণ্ড হতে ক্রুসেডারদের বিতাড়ন।

পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে, এডেসার পতনের পর ২য় জোসেলিন তিল-বাশিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ইমাদুদ্দিন জিনকির ইন্তেকালের পরপরই ২য় জোসেলিন এডেসা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালান। এডেসা নগরীর অভ্যন্তরে বসবাসরত কতিপয় আর্মেনীয় নেতা এক্ষেত্রে তাকে সহায়তা করে। ২য় জোসেলিন ৫৪১ হিজরি সনের রবিউস সানি মাসে (১১৪৬ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে) এডেসায় প্রবেশ করেন। এডেসায় নিয়োজিত মুসলিম প্রতিরক্ষা বাহিনী এ সময় নগর-দুর্গে আশ্রয় নেয় এবং মজবুত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তারা দ্রুত সাইফুদ্দিন গাজি ও নুরুদ্দিন মাহমুদের কাছে সাহায্যবার্তা প্রেরণ করে। সংবাদ পেয়ে দুজনই নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে রওনা হয়ে যান। তবে নুরুদ্দিন তার ভাইয়ের পূর্বে এডেসায় পৌঁছতে সক্ষম হন এবং জোসেলিনের বাহিনীকে অবরোধ করেন। ভীত জোসেলিন পলায়ন করলে তিনি তার বাহিনী নিয়ে ক্রুসেডারদের তাড়া করেন। সুমাইসাতে পৌঁছে নুরুদ্দিন জোসেলিনের বাহিনীর নাগাল পেয়ে যান এবং তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। ২য় জোসেলিন অবশ্য পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। এরপর নুরুদ্দিন মাহমুদ তার ভাই সাইফুদ্দিন গাজির সন্তুষ্টিতে এডেসাকে তার রাজ্যভুক্ত করে নেন।

৫৪১ হিজরি সনেই দামেশক রাজ্যের অধীনস্থ বুছরা নগরীর প্রশাসক দামেশক প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং ক্রুসেডারদের সহায়তা কামনা করে। ক্রুসেডাররাও সোৎসাহে বুছরা অভিমুখে অগ্রসর হয়। সংবাদ পেয়ে দামেশক প্রশাসনের হর্তাকর্তা মুইনুদ্দিন আনুর উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং ক্রুসেডারদের মোকাবিলায় নুরুদ্দিনের সহায়তা প্রার্থনা করেন। পিতার সঙ্গে দীর্ঘদিন থাকার সুবাদে নুরুদ্দিন যেহেতু দামেশক প্রশাসনের নীতি-আদর্শ সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন, তাই তিনি এ

সময় এক অভিনব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি মুইনুদ্দিনের আবেদনে সাড়া দিয়ে দামেশক অভিমুখে রওনা হন, এরপর মুইনুদ্দিনের কাছে তার কন্যার পাণিপ্রার্থনা করে প্রস্তাব পাঠান। আগেও বলা হয়েছে, সে যুগে শাসক ও রাজন্যবর্গ নিজেদের ক্ষমতার ভিত্তি মজবুত করতে মিত্রদের সঙ্গে এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে শত্রুদের সঙ্গেও আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তুলত। এর ফলে মিত্রতা আরও সুদৃঢ় ও শক্তিশালী হতো, অপরদিকে শত্রুর সঙ্গে স্বাভাবিক শত্রুতা দূর হয়ে যেত। নুরুদ্দিনও এই বিয়ের মাধ্যমে ভবিষ্যতে মুইনুদ্দিনের প্রতারণামূলক আচরণ থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাচ্ছিলেন।

মুইনুদ্দিন আনুর এ প্রস্তাব গ্রহণ করে নিলে ৫৪১ হিজরি সনের ২৩ শাওয়াল তার কন্যা ইসমাতুদ্দিন খাতুনের নুরুদ্দিনের সঙ্গে বিয়ে সম্পন্ন হয়।

এরপর নুরুদ্দিন ও মুইনুদ্দিনের বাহিনী একসঙ্গে বুছরার বিদ্রোহ দমনে রওনা হয়। তারা সফলভাবে বিদ্রোহ দমন করার পর ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে অগ্রসর হয়। নুরুদ্দিনের আগমন সংবাদ পেয়েই ভীত ক্রুসেডাররা বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রস্থান করে।

৫৪২ হিজরি সনে নুরুদ্দিন মাহমুদ পুনরায় ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং শাম অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা জয় করেন।

দ্বিতীয় ক্রুসেড যুদ্ধ

[৫৪০-৫৪৩ হিজরি/১১৪৫-১১৪৮ খ্রিষ্টাব্দ]

ইসলামি প্রাচ্য অঞ্চলে ক্রুসেড রাজ্যগুলোর স্থিতিশীলতায় ইউরোপ অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু ইমাদুদ্দিন জিনকির হাতে এডেসা নগরীর পতন ঘটলে ইউরোপ নতুন করে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। অবশেষে ১১৪৫ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন পোপ ৩য় ইউগেন (Pope Eugene III) দ্বিতীয় ক্রুসেডের ডাক দেন। ইউরোপ থেকে পরিচালিত দ্বিতীয় ক্রুসেডের উদ্দেশ্য ছিল ক্রুসেডারদের হাত থেকে মুসলমানরা এডেসাসহ যে সমস্ত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেছিল, সেখানে পুনরায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং জিনকি পরিবারের কর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থানের মোকাবিলা করে শাম অঞ্চলে ক্রুসেডারদের অবস্থান সুদৃঢ় করা।

অবশ্য প্রথম ক্রুসেড অভিযানের আহ্বায়ক পোপ ২য় আরবানের মতো পোপ ৩য় ইউগেনও ক্রুসেড অভিযানের মাধ্যমে নিজের আখের গোছানোর স্বপ্ন দেখছিলেন। রোমের পোপ হলেও ৩য় ইউগেনের রোমে কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। তিনি বাস করতেন ভিটারবো (Viterbo) নগরীতে। পোপ স্বপ্ন দেখছিলেন, ক্রুসেড অভিযানের মাধ্যমে তিনি নিজের ক্ষমতালিপ্সা চরিতার্থ করতে পারবেন এবং প্রাচ্যের ক্রুসেড রাজ্যগুলোতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। ২য় আরবানের মতো তিনিও অভিযানে অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য পাপমোচন ও স্বর্গপ্রাপ্তির ঘোষণা প্রদান করেন।

এবারের অভিযানে ইউরোপের দুজন রাষ্ট্রপ্রধানও যোগদান করে। ফরাসি বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন ফ্রান্সের রাজা ৭ম লুই (Louis VII) আর জার্মান বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন জার্মানির রাজা ৩য় কনরাড (Conrad III)। এ ছাড়াও সমকালীন ইউরোপের বিশিষ্ট রাজন্যবর্গ অভিযানে যোগ দেয়। ফ্রান্স ও জার্মানির বাহিনীদুটি ছাড়াও সাধারণ কৃষক ও উচ্ছৃঙ্খল জনতার বিভিন্ন বাহিনীও অভিযানে শরিক হয়।

সার্বিক প্রচারণা ও প্রস্তুতি শেষে ১১৪৭ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসের শেষ দিকে জার্মান বাহিনী কনস্টান্টিনোপল অভিমুখে রওনা হয়। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে পা রাখার পরই তারা লুটতরাজ ও বিশৃঙ্খলা শুরু করায় বাধ্য হয়ে বাইজান্টাইন সম্রাট ১ম ম্যানুয়েল কমনিনোস সামরিক হস্তক্ষেপ করেন। একে কেন্দ্র করে রাজা ৩য় কনরাড বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং আগামী বছর কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করার হুমকি দেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হয়। কনস্টান্টিনোপলেই যেন জার্মান ও ফরাসি বাহিনীর পরস্পর সাক্ষাৎ না হয়ে যায়, এ উদ্দেশ্যে সম্রাট ম্যানুয়েল দ্রুত জার্মান বাহিনীকে এশিয়া মাইনর অভিমুখে রওনা করিয়ে দেন।

বাইজান্টাইন পথপ্রদর্শকদের সহায়তায় জার্মান বাহিনী বসফরাস পাড়ি দিয়ে এশিয়া মাইনর অঞ্চলে পা রাখে। নিকিয়ায় পৌঁছে কনরাড তার বাহিনীকে দু-ভাগে ভাগ করে নেন। তিনি নিজে একটি অংশ নিয়ে নিকিয়া ত্যাগ করেন এবং দশ দিন পর দোরিলায়ুমে পৌঁছান। এ সময় রোমান সেলজুক শাসক (১ম কিলিজ আরসালানের পুত্র) রুকনুদ্দিন

মাসউদ তার বাহিনী নিয়ে জার্মান ক্রুসেডার বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। সেলজুকদের আক্রমণে জার্মান বাহিনী কার্যত বিধ্বস্ত হয়ে যায়। বিশ হাজার সৈন্যের মধ্যে আঠারো হাজার সৈন্যই এ সময় নিহত হয়। ৫৪২ হিজরি সনের ২৮ জুমাদাল উলা (১১৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ অক্টোবর) সংঘটিত এ যুদ্ধ ইতিহাসে ২য় দোরিলায়ুমের যুদ্ধ নামে খ্যাত। রাজা ৩য় কনরাড অবশিষ্ট দুই হাজার সৈন্য নিয়ে কোনোমতে নিকিয়ায় ফিরে যান এবং ফরাসি বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন।

জার্মান বাহিনীর অপর অংশ দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের উপকূলীয় নগরী আনতালিয়া (Antalya) অভিমুখে রওনা হয়েছিল। ১১৪৮ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতে তারাও প্রায় একই পরিণতি বরণ করে।

৭ম লুই-এর নেতৃত্বে ফরাসি বাহিনী ১১৪৭ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে কনস্টান্টিনোপল অভিমুখে রওনা হয় এবং অক্টোবরে কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছায়। কিন্তু ফরাসি বাহিনীর বিভিন্ন অসদাচরণের কারণে বাইজান্টাইন সম্রাট তাদের জন্য নগরদ্বার খুলে দিতে অসম্মতি জানান। স্বভাবতই রাজা লুই প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এ সময় কেউ কেউ তাকে সিসিলির রাজা ২য় রজারের সহায়তা নিয়ে কনস্টান্টিনোপল দখলের জন্য প্ররোচিত করে। অবশ্য বাইজান্টাইন সম্রাট ম্যানুয়েল কৌশলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। এ সময় সম্রাট প্রচার করেন, জার্মান বাহিনী এশিয়া মাইনর অঞ্চলে বিভিন্ন যুদ্ধে জয়লাভ করেছে এবং ইতিমধ্যে কয়েকটি এলাকায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে! এ সংবাদ শুনে রাজা লুই কালবিলম্ব না করে ইসলামি ভূখণ্ড অভিমুখে রওনা হয়ে যান। নিকিয়ায় পৌঁছে লুই দেখতে পান, পরাজিত জার্মান রাজা কনরাড তার প্রতীক্ষায় বসে আছেন!

এরপর ফরাসি-জার্মান সম্মিলিত বাহিনী ভূমধ্যসাগরের উপকূলীয় পথ ধরে অগ্রসর হয়। এফসুস (Ephesus) নগরীতে পৌঁছার পর রাজা কনরাড অসুস্থ হয়ে পড়ায় চিকিৎসার জন্য কনস্টান্টিনোপলে ফিরে যান। রাজা লুই তার জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করার পর তার ফিরতে বিলম্ব হওয়ায় সামনে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে ফরাসি বাহিনী বেশ কয়েকবার রোমান সেলজুক বাহিনীর হামলার শিকার হয় এবং বহু দুর্ভোগ পেরিয়ে ১১৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ২০ জানুয়ারি আনতালিয়া নগরীতে পৌঁছায়। ফরাসি বাহিনী

সেলজুকদের হামলার ভয়ে সেখানে দেরি না করে সমুদ্রপথে রওনা হয়ে যায় এবং ১৯ মার্চ পৌছায় এন্টিয়কের নিকটবর্তী সেন্ট সাইমন নৌবন্দরে।

এন্টিয়কের শাসক রেমন্ড অফ পয়টিয়ার্স আগত ক্রুসেডার বাহিনীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। এরপর ফরাসি বাহিনীকে নিয়ে শুরু হয় টানাহ্যাঁচড়া! রাজা লুই-এর সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে রেমন্ড আশা করছিলেন, তিনি ফরাসি বাহিনীকে ব্যবহার করে এন্টিয়ক রাজ্যের মূল হুমকি আলেপ্পো নগরী দখল করবেন। ওদিকে ২য় জোসেলিন দাবি করেন, ফরাসি বাহিনী যেহেতু এডেসা নগরীর পতনের পর নগরীটি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে আগমন করেছে, তাই তিনি তাদেরকে নিয়ে এডেসা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করবেন। ত্রিপোলির শাসক ২য় রেমন্ড বসে থাকবেন কেন। তার দাবি হলো, ফরাসি বাহিনীকে নিয়ে তিনি বারিন দুর্গ পুনরুদ্ধারে চেষ্টা চালাবেন। কিন্তু রাজা লুই সবাইকে সাফ জানিয়ে দেন, তিনি এ অঞ্চলে ক্রুসেডারদের সর্বোচ্চ নেতা বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজার সঙ্গে কথা না বলে কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না। রাজা লুই জানতে পেরেছিলেন, জার্মানির রাজা ৩য় কনরাড ইতিমধ্যে কনস্টান্টিনোপল থেকে সমুদ্রপথে আক্কা হয়ে আল-কুদসে পৌছে গেছেন। তাই তিনি দ্রুত সেখানে পৌঁছতে উদগ্রীব ছিলেন।

আগত ক্রুসেডার বাহিনীর কর্মসূচি নির্ধারণে ১১৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ জুন আক্কা নগরীতে বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের মূল নিয়ন্ত্রক মেলিসেন্ডের তত্ত্বাবধানে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বাকি তিন রাজ্যের শাসকই অনুপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, ক্রুসেডার বাহিনী দামেশক নগরী দখলের চেষ্টা করবে!

হ্যাঁ, যে দামেশক নগরী ক্রুসেড অভিযানের শুরু সময় থেকেই ক্রুসেডারদের সহযোগিতা করে আসছিল এবং জিহাদি তৎপরতার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেই দামেশক এবার শিকার হতে যাচ্ছে ক্রুসেড আগ্রাসনের।

ষাট হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধা ও আট হাজার পদাতিক যোদ্ধার সমন্বয়ে গঠিত বিরাট ক্রুসেডার বাহিনী দামেশক অভিমুখে রওনা হয়। ২৩ জুলাই ক্রুসেডার বাহিনী দামেশক অবরোধ করে।

মুইনুদ্দিন আনুর কল্পনাও করতে পারেননি, দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত মিত্র ক্রুসেডাররা দামেশক দখলের চেষ্টা করতে পারে। তিনি দ্রুত আলেপ্পোর অধিপতি নুরুদ্দিন মাহমুদ ও তার ভাই মসুলের শাসক সাইফুদ্দিন গাজির কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করেন। তারা দুজন দ্রুত দামেশক অভিমুখে রওনা হয়ে হিমসে অবতরণ করেন। হিমসে পৌঁছে নুরুদ্দিন মুইনুদ্দিনের কাছে নিম্নোক্ত বার্তা প্রেরণ করেন—

> আমার অঞ্চলের অস্ত্রধারী সৈন্যদের নিয়ে আমি চলে এসেছি। আমি চাচ্ছি আমার প্রতিনিধিগণ দামেশকে চলে যাক আর আমি খ্রিষ্টানদের মুখোমুখি হই। যদি আমি পরাজিত হই, তাহলে আমি আমার বাহিনী নিয়ে দামেশকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নগরীর প্রতিরক্ষার চেষ্টা করব; আর যদি বিজয়ী হই, তাহলে নগরীর কর্তৃত্ব তোমাদের হাতেই থাকবে। আমরা দামেশকের কর্তৃত্ব নিয়ে তোমাদের সঙ্গে কোনো বিরোধে জড়াব না।

কিন্তু নুরুদ্দিনের বার্তা পেয়ে দামেশকের অধিপতি মুজিরুদ্দিন ও ক্ষমতার মূল নিয়ন্ত্রক মুইনুদ্দিন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা আশঙ্কা করে, নুরুদ্দিন দামেশক দখল করার মনস্থ করেছেন। তাদের নির্দেশে দামেশকের নগরদ্বার বন্ধ করে দিয়ে নুরুদ্দিন ও সাইফুদ্দিনের প্রবেশের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়।

এরপর মুইনুদ্দিন দুটি বার্তা তৈরি করে একটি আগত ক্রুসেডার বাহিনীর নেতৃবৃন্দের কাছে প্রেরণ করেন, অপরটি প্রেরণ করেন তাদেরকে সহায়তাকারী স্থানীয় খ্রিষ্টান নেতৃবৃন্দের কাছে। প্রথম বার্তায় তিনি লেখেন, প্রাচ্যের অধিপতি এসে পড়েছেন। তোমরা স্বেচ্ছায় কেটে পড়ো, আর না হয় আমি তার হাতে আমার রাজ্য তুলে দেবো। তখন তোমাদের পস্তাতে হবে। আর দ্বিতীয় বার্তায় লেখেন, তোমরা কোন বুদ্ধিতে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাদের কাছে সাহায্য চাইলে?! তোমরা তো ভালো করেই জানো যে, তারা যদি দামেশক দখল করতে পারে, তাহলে তোমাদের কর্তৃত্বে থাকা উপকূলীয় অঞ্চলগুলোও ছিনিয়ে নেবে। অপরদিকে আমি যদি আমার রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষায় দুর্বলতা বোধ করি, তাহলে সামান্য দ্বিধা না করে দামেশকের নিয়ন্ত্রণ সাইফুদ্দিনের হাতে ছেড়ে দেবো। আর তোমরা জানো, যদি তিনি দামেশকের কর্তৃত্ব

লাভ করেন, তাহলে শাম অঞ্চলে তার সামনে টিকে থাকার মতো শক্তি তোমাদের নেই।

মুইনুদ্দিন আনুর ক্রুসেডার বাহিনীকে অবরোধ তুলে নেওয়ার বিনিময়ে বানিয়াস দুর্গের কর্তৃত্ব প্রদানের প্রস্তাবও দেন। পাশাপাশি তিনি স্থানীয় ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দকে অর্থ প্রদান করে অবরোধ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিতে প্ররোচিত করেন।

করণীয় নির্ধারণে ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দ এবার বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ মুইনুদ্দিন আনুরের প্রস্তাব মেনে নিয়ে অবরোধ তুলে নেওয়ার পক্ষে মত দেয়। তাদের সমর্থন না পেয়ে অবরোধ শুরুর মাত্র চারদিন পরই রাজা লুই ও কনরাড অবরোধ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। এরপর ক্রুসেডার বাহিনী ফিরে যায় বাইতুল মুকাদ্দাসে। ফেরার সময় মুসলিম বাহিনী তাদেরকে তাড়া করে এবং ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। অবরোধ চলাকালেও দামেশকের প্রতিরক্ষা বাহিনীর আক্রমণে ক্রুসেডারদের প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয়েছিল।

এরপর জার্মান রাজা কনরাড আসকালান জয়ের চেষ্টা চালান। কিন্তু অন্যরা তাকে সাহায্য না করায় তার এ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। অবশেষে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে তিনি ৮ সেপ্টেম্বর নিজ দেশে ফিরে যান। অপরদিকে ফরাসি রাজা ৭ম লুই বাইতুল মুকাদ্দাস ত্যাগ করেন ১১৪৯ খ্রিষ্টাব্দের গ্রীষ্মে।

এভাবেই ক্রুসেডার বাহিনীর দ্বিতীয় ক্রুসেড অভিযান শেষ হয় শোচনীয় ব্যর্থতাকে সঙ্গী করে। কোনো অর্জন দূরে থাক, এ অভিযানের কারণে ক্রুসেডাররা হারায় শাম অঞ্চলে তাদের দীর্ঘদিনের মিত্র দামেশককে!

অবশ্য ইসলামি প্রাচ্যে দ্বিতীয় ক্রুসেড অভিযান চলাকালেই পোপ ৩য় ইউগেন ১১৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামি বিশ্বের প্রতীচ্যে আন্দালুসেও ক্রুসেড অভিযান প্রসারিত করার নির্দেশ দেন। এ সময় ইংল্যান্ডসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রচুর সৈন্য আন্দালুসে গমন করে। তাদের সহায়তায় আন্দালুসের খ্রিষ্টরাজ্য লিওন ও ক্যাস্টোলার রাজা ৭ম আলফোন্সো (Alfonso VII of León and Castile) (বর্তমান পর্তুগালের অন্তর্গত) লিসবন (Lisbon), সিন্টরা (Sintra), পালমেলা (Palmela), সেটুবাল (Setúbal) প্রভৃতি নগরী দখল করে নেন। অভিযান শেষে আগত

ক্রুসেডার সৈন্যদের অধিকাংশই লিসবনে বসতি স্থাপন করে। বাকিরা চলে যায় শাম অঞ্চলে ক্রুসেড অভিযানে যোগ দিতে।

এর কিছুদিন পর আন্দালুসের খ্রিষ্টান শক্তি উত্তর-পূর্ব আন্দালুসের জারাগোজা রাজ্যে অবস্থিত তুরতুশা ও লারেডা নগরী দখল করে নেয়। বরং এরপর তারা আন্দালুসের সীমা অতিক্রম করে সুদূর মাগরিবেও হামলা চালাতে শুরু করে।

অর্থাৎ দ্বিতীয় ক্রুসেড অভিযান ইসলামি প্রাচ্যে কার্যত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও প্রতীচ্যে সফল হয় এবং ক্যাস্টোলা, পর্তুগাল ও অ্যারাগোন রাজ্যের সামনে পুরো আন্দালুস উপদ্বীপ দখলের পথ সুগম হয়।

দ্বিতীয় ক্রুসেড-পরবর্তী সময়

ইউরোপ থেকে আগত ক্রুসেডার বাহিনীর প্রস্থানের পরও নুরুদ্দিন জিনকি রহ. তার ক্রুসেডবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখেন। তিনি একের পর এক প্রতিটি ক্রুসেড রাজ্যে হানা দিয়ে বিভিন্ন নগরী ও দুর্গ পুনরুদ্ধার করেন। পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে শাম অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা নুরুদ্দিন জিনকির কর্তৃত্বে চলে আসে।

নুরুদ্দিন জিনকির অব্যাহত বিজয়াভিযান এবং জিনকি পরিবারের ঐক্য ও সুদৃঢ় সামরিক শক্তি প্রত্যক্ষ করে এ অঞ্চলের ক্রুসেডাররা উপলব্ধি করে, জিনকি পরিবারকে পরাভূত করে শাম ও ইরাকের উত্তরাঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখা দিবাস্বপ্ন ব্যতীত অন্য কিছু নয়। তাই এদিকে অভিযানের চিন্তা বাদ দিয়ে এবার তারা দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দক্ষিণ-পশ্চিমে উবায়দি সাম্রাজ্যভুক্ত অঞ্চলের প্রতি।

৫৪৮ হিজরি সনে (১১৫৩ খ্রিষ্টাব্দে) বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসক ৩য় বল্ডউইন উবায়দিদের কাছ থেকে আসকালান দখল করে নেন। এর ফলে ফিলিস্তিনের উপকূলীয় অঞ্চলে ক্রুসেডারদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য নিশ্চিত হয়।

ক্রুসেডাররা আসকালান দখল করে নেওয়ায় নুরুদ্দিন জিনকি দামেশক নিয়ে নতুন করে চিন্তিত হয়ে পড়েন। কারণ, দামেশকের কারণেই তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে অগ্রসর হতে পারছিলেন না। সবদিক বিবেচনা করে তিনি এবার দামেশকে অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন।

৫৪৯ হিজরি সনের মুহাররম মাসে (১১৫৪ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে) নুরুদ্দিন জিনকি দামেশক অবরোধ করেন। এ সময় তিনি দশদিন দামেশক অবরোধ করে রাখলেও সেখানে কোনো আক্রমণ করেননি। তিনি এ সময় বলেন, 'মুসলমানদের পরস্পর একে অপরকে হত্যা করার কোনো প্রয়োজন নেই।' নুরুদ্দিন দামেশকের অধিপতি মুজিরুদ্দিনের কাছে বার্তা প্রেরণ করে তার দামেশকে আগমনের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। তিনি লেখেন—

> আমি তোমাদের সঙ্গে লড়াই করতে এখানে আগমন করিনি। আমি মুসলমানদের এই অভিযোগের কারণে এখানে আসতে বাধ্য হয়েছি যে, কৃষকদের সম্পদ কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, তাদের স্ত্রী-সন্তানদের খ্রিষ্টানদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। অথচ কেউ তাদের সাহায্য করছে না। আল্লাহর শোকর! তিনি আমাকে মুসলমানদের সাহায্য করার ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং প্রচুর সম্পদ ও সামরিক শক্তি দান করেছেন। এই নেয়ামতের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নির্যাতিত এসব মুসলমানের আহ্বান উপেক্ষা করে তাদের সাহায্য না করা আমার জন্য বৈধ হতে পারে না। অধিকন্তু আমার জানা আছে যে, তোমরা নিজেদের ভূখণ্ডের নিরাপত্তারক্ষায় অক্ষম। এই দুর্বলতার কারণেই তোমরা আমার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ফিরিঙ্গিদের সাহায্যপ্রার্থনা করেছ। তোমরা অসহায়-দুর্বল নাগরিকদের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে তা খ্রিষ্টানদের পেছনে ব্যয় করেছ। এমন গর্হিত আচরণ না আল্লাহ তাআলা পছন্দ করবেন, না কোনো মুসলমান বরদাশত করবে।

কিন্তু মুজিরুদ্দিন তার বার্তা উপেক্ষা করে ক্রুসেডারদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাদেরকে নুরুদ্দিনের বাহিনীর উপর আক্রমণের প্রতি প্ররোচিত করেন। বিনিময়ে দেওয়া হয় প্রচুর অর্থসম্পদ প্রদানের পাশাপাশি বালাবাক্কু দুর্গের নিয়ন্ত্রণ সমর্পণের প্রস্তাব!

কিন্তু দামেশকের অধিবাসীরা তো নুরুদ্দিনেরই প্রতীক্ষা করছিল! তারা এবার অগ্রসর হয়ে নুরুদ্দিনের জন্য নগরীর প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। নুরুদ্দিন দামেশকে প্রবেশ করে সাধারণ নিরাপত্তা ঘোষণা করেন এবং

জনগণের উপর আরোপিত কর বাতিল করেন। নুরুদ্দিন জিনকি রহ. দামেশককেই তার রাজধানী নির্ধারণ করেন। কিছুদিন পর তিনি শাইজার ও বালাবাক্কু নগরীকেও জিনকি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ফলে পুরো শাম অঞ্চল তার নেতৃত্বে একক-ঐক্যবদ্ধ ইসলামি শক্তিতে পরিণত হয়।

৫৫২ হিজরি সনে সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি হঠাৎ করেই প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং আলেপ্পোর দায়িত্ব তার ভাই নুসরতুদ্দিনের হাতে সোপর্দ করেন। নুরুদ্দিনের অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে ক্রুসেডাররা কয়েকটি যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করে। অবশ্য আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহে তিনি কিছুদিন পরই সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নবোদ্যমে অগ্রসর হন।

এরপর নুরুদ্দিন জিনকি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন মিশরের প্রতি। কারণ, ক্রুসেডাররা ইতিমধ্যে উবায়দি শাসকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মিশরে লোলুপ দৃষ্টি ফেলতে শুরু করেছে। মিশর যদি ক্রুসেডারদের দখলে চলে যায়, তাহলে শাম অঞ্চলে ইসলামি শক্তির ক্রমবর্ধমান অগ্রযাত্রা নিশ্চিতভাবেই বাধার সম্মুখীন হবে। অধিকন্তু শাম ও মিশর মিলে যদি একক শক্তিতে পরিণত হয়, তাহলে তা ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে এক দুর্জেয় শক্তিরূপে আবির্ভূত হতে পারবে।

মিশরের উবায়দি সাম্রাজ্য তখন দুর্বলতার সর্বনিম্ন স্তরে উপনীত হয়েছিল। উবায়দি খলিফা উজিরদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছিলেন। উজিরই মূলত প্রশাসনসহ যাবতীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণ করতেন। উজির পদ নিয়েও চলছিল প্রতিযোগিতা ও চরম বিবাদ-সংঘাত। এ সময় উজির পদ-প্রত্যাশী কেউ কেউ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসকদের কাছেও ধরনা দেয়। তাদেরই একজন ছিলেন শাওয়ার বিন মুজির। তিনি ৫৫৮ হিজরি সনে (১১৬৩ খ্রিষ্টাব্দে) যিরগাম নামক জনৈক সেনাপতির কাছে পরাজিত হন এবং উজির পদ হতে পদচ্যুত হয়ে সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদের কাছে আশ্রয় নেন। শাওয়ার মিশরের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে নুরুদ্দিনের কাছে সামরিক সহায়তা প্রার্থনা করেন এবং বিনিময়ে মিশরের রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ প্রদানের অঙ্গীকার করেন। নুরুদ্দিন শাওয়ারের প্রস্তাবে রাজি হয়ে আসাদুদ্দিন শিরকুহের নেতৃত্বাধীন একটি বাহিনী দিয়ে শাওয়ারকে সহায়তা করেন। দামেশক বাহিনীর সহায়তায় শাওয়ার যিরগামকে

পরাজিত করে ৫৫৯ হিজরি সনে পুনরায় মিশরের উজির পদে আসীন হন। কিন্তু কর্তৃত্ব ফিরে পেয়েই শাওয়ার তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। তিনি একদিকে শিরকুহকে মিশর ত্যাগ করে শামে ফিরে যেতে নির্দেশ দেন, অন্যদিকে বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসক অ্যামালরিকের কাছে সাহায্য চেয়ে বার্তা পাঠান। তিনি অ্যামালরিককে বোঝান যে, নুরুদ্দিন মিশর ভূমি দখল করতে পারলে ভবিষ্যতে তার রাজ্যের জন্যও হুমকি হয়ে দাঁড়াবেন। অ্যামালরিক দ্রুত শাওয়ারের সহায়তায় ছুটে আসেন এবং আসাদুদ্দিন শিরকুহকে মিশর ত্যাগে বাধ্য করেন।

শাওয়ারের বিশ্বাসঘাতকতার সমুচিত জবাব দিতে সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ ৫৬২ হিজরি সনে (১১৬৭ খ্রিষ্টাব্দে) শিরকুহের নেতৃত্বেই আরেকটি বাহিনী মিশরে প্রেরণ করেন। শিরকুহের ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহুদ্দিন আইয়ুবিও এই অভিযানে অংশ নেন।

শাওয়ার এবারও অ্যামালরিকের কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করলে তিনি আবারও তার মিত্রের সাহায্যে ছুটে আসেন। মিশরের বাবাইন এলাকায় শিরকুহের নেতৃত্বাধীন বাহিনী শাওয়ার ও অ্যামালরিকের বাহিনীর মুখোমুখি হয়। যুদ্ধে জিনকি বাহিনী জয়লাভ করে। শিরকুহ সার্বিক দিক বিবেচনা করে উবায়দি সাম্রাজ্যের রাজধানী কায়রো অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে বিজিত অঞ্চলে কর্তৃত্ব দৃঢ়করণে মনোযোগ দেন এবং সেখান থেকে কর উসুল করেন। এরপর তিনি মরুভূমি পাড়ি দিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহুদ্দিনকে সেখানকার প্রশাসক নিযুক্ত করে সামনে অগ্রসর হন। কিন্তু ক্রুসেডার-উবায়দি সম্মিলিত বাহিনী জল-স্থল উভয় দিক থেকে আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ করলে শিরকুহ দ্রুত সালাহুদ্দিনকে সহায়তা করতে ফিরে আসেন। তখন সম্মিলিত বাহিনী তার সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করতে চাইলে তিনি এই শর্তে চুক্তি করতে সম্মত হন যে, ক্রুসেডার বাহিনী মিশরে অবস্থান করতে পারবে না। এরপর শিরকুহ দামেশকে ফিরে আসেন। কিন্তু শাওয়ার আবারও তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন এবং ক্রুসেডারদের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি করেন। চুক্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল, কায়রোতে সব সময় একটি ক্রুসেডার প্রতিরক্ষা বাহিনী অবস্থান করবে এবং কায়রো নগরদ্বারসমূহের নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে থাকবে। তারা মিশরে নুরুদ্দিনের প্রেরিত বাহিনীকে বাধা প্রদান করবে।

উভয়পক্ষ এই মর্মেও সম্মত হয় যে, ক্রুসেডাররা প্রতিবছর মিশরের রাজস্ব হতে এক লক্ষ দিনার লাভ করবে।

মিশরের উবায়দি সাম্রাজ্যের এই দুর্বল ও পরাশ্রয়ী নীতি বাইতুল মুকাদ্দাসের অধিপতি অ্যামালরিককে নতুন করে মিশর নিয়ে ভাবতে প্ররোচিত করে। তিনি ৫৬৪ হিজরি সনে (১১৬৮ খ্রিষ্টাব্দে) মিশর জয় করার জন্য বাহিনী নিয়ে রওনা হন। নিরুপায় শাওয়ার খ্রিষ্টান বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য আর কোনো উপায় না পেয়ে শেষ পর্যন্ত এমন এক পদ্ধতি অবলম্বন করেন, যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া কঠিন। খ্রিষ্টান ক্রুসেডাররা যেন মিশর আক্রমণে নিরুৎসাহিত হয়, এজন্য তিনি ফুসতাত নগরীতে আগুন লাগিয়ে দেন। একটানা চুয়ান্ন দিন আগুন জ্বলতে থাকে। এরপর তিনি অ্যামালরিকের কাছে বার্তা পাঠান, 'আপনি যদি মিশরে প্রবেশ করেন, তাহলে নুরুদ্দিন মাহমুদ মিশর দখল করতে অগ্রসর হতে পারেন।' পাশাপাশি তিনি অ্যামালরিককে বার্ষিক দশ লক্ষ দিনার প্রদানের শর্তে সন্ধি করারও প্রস্তাব দেন।

শাওয়ার জানতেন, তার এই প্রস্তাব পাওয়ার পরও অ্যামালরিক ছলচাতুরির আশ্রয় নিতে পারেন। তাই তিনি নুরুদ্দিনের কাছেও সাহায্যপ্রার্থনা করে বার্তা পাঠান। তিনি নুরুদ্দিনকে প্রতিশ্রুতি দেন, মিশরের এক-তৃতীয়াংশ ভূমি তিনি নুরুদ্দিনকে ছেড়ে দেবেন এবং আসাদুদ্দিন শিরকুহকে সসৈন্য কায়রোতে অবস্থানের অনুমতি দেবেন। শিরকুহের বাহিনীর সৈন্যদেরকে জায়গির হিসেবে প্রচুর জমি প্রদান করা হবে, যা নুরুদ্দিনকে প্রদত্ত এক-তৃতীয়াংশ ভূমির বাইরে অতিরিক্ত বিবেচিত হবে।

নুরুদ্দিন মিশর অভিযানের জন্য দ্রুততার সঙ্গে আসাদুদ্দিন শিরকুহের নেতৃত্বে বিরাট এক বাহিনী প্রস্তুত করেন। অ্যামালরিকের ক্রুসেডার বাহিনী এ সংবাদ জানতে পেরে যুদ্ধ না করেই বাইতুল মুকাদ্দাসে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ৫৬৪ হিজরি সনের রবিউল আউয়াল মাসে (১১৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে) আসাদুদ্দিন শিরকুহ কায়রোতে প্রবেশ করেন। কায়রোবাসী তাকে স্বাগত জানায়। স্বয়ং উবায়দি খলিফা আবদুল্লাহ আল-আযিদ তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে সম্মানসূচক আলখেল্লা প্রদান করেন। এরপর আসাদুদ্দিন শিরকুহ খলিফার প্রধান উজির মনোনীত হন। তিনি

অল্প সময়ের মধ্যেই উবায়দি সাম্রাজ্যের ক্ষমতার লাগাম নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে সক্ষম হন।

আসাদুদ্দিন কায়রোয় প্রবেশের মাস-তিনেক পরই ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুর পর নতুন উজির মনোনীত হন তার ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহুদ্দিন আইয়ুবি।

দায়িত্ব গ্রহণ করার পর সালাহুদ্দিন আইয়ুবি জনকল্যাণে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। ফলে মিশরে তার বিপুল জনপ্রিয়তা তৈরি হয়। তিনি খুতবায় উবায়দি খলিফার নামের পর নুরুদ্দিনের নাম পাঠের নির্দেশ জারি করেন। উজির সালাহুদ্দিন আইয়ুবি তার বাহিনীর সেনাপতিদের বিভিন্ন অঞ্চলের জায়গির প্রদান করেন এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে তাদের অধিষ্ঠিত করেন।

জিনকি সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদের কর্তৃত্ব মিশরেও বিস্তৃত হওয়ায় বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজা অ্যামালরিক অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তিনি এবার নতুন করে মিশরে অভিযান পরিচালনার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এ সময় বাইজান্টাইন সম্রাট ১ম ম্যানুয়েল কমনিনোস অ্যামালরিকের সাহায্যপ্রার্থনায় সাড়া দিয়ে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামে সমৃদ্ধ একটি বাইজান্টাইন নৌবহর প্রেরণ করেন। মিশর জয়ের উদ্দেশ্যে খ্রিষ্টান বাহিনী ৫৬৫ হিজরি সনের সফর মাসে (১১৬৯ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে) দিমইয়াতে (Damietta) পৌঁছায়। নিজে কায়রো ত্যাগ করলে উবায়দিরা ষড়যন্ত্র করতে পারে—এই আশঙ্কায় সালাহুদ্দিন আইয়ুবি কায়রোতেই অবস্থান করেন এবং খালিদ শিহাবুদ্দিন মাহমুদ ও ভ্রাতুষ্পুত্র তাকিউদ্দিন উমরের নেতৃত্বে একটি বাহিনী খ্রিষ্টান বাহিনীর মোকাবিলায় প্রেরণ করেন। মুসলিম বাহিনীর প্রবল প্রতিরোধের মুখে ক্রুসেডারদের যুদ্ধ-উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে পড়ে। ৫৬৫ হিজরি সনের রবিউল আউয়াল মাসে (১১৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে) তারা অবরোধ প্রত্যাহার করে প্রস্থান করে।

এর কিছুদিন পর সুলতান নুরুদ্দিন সালাহুদ্দিন আইয়ুবিকে মিশরের মসজিদসমূহে উবায়দি খলিফার পরিবর্তে সমকালীন আব্বাসি খলিফার নামে খুতবা পাঠের নির্দেশ জারি করতে বলেন। কিন্তু মিশরবাসীর বিক্ষুব্ধ হওয়ার আশঙ্কায় সালাহুদ্দিন এই নির্দেশ জারি করতে দ্বিধান্বিত হয়ে

পড়েন। নুরুদ্দিন বারবার একই নির্দেশ প্রেরণ করতে থাকলে ৫৬৭ হিজরি সনের প্রথম জুমার দিন (১১৭১ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে) সালাহুদ্দিন মিশরের সকল খতিবকে খুতবায় আব্বাসি খলিফা আল-মুসতাযি বি-আমরিল্লাহর নাম পাঠের নির্দেশনা জারি করেন। উবায়দি খলিফা আযিদ তখন অসুস্থ থাকায় তার পরিবার তাকে এ বিষয়ে অবগত করেনি। ৫৬৭ হিজরি সনের ১০ মুহাররম (১১৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর) খলিফা আযিদ মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মিশরে শিয়া উবায়দি সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন ঘটে।

নুরুদ্দিন জিনকির বড় ভাই ও মসুলের শাসক সাইফুদ্দিন গাজি ৫৪৪ হিজরি সনে (১১৪৯ খ্রিষ্টাব্দে) ইন্তেকাল করেছিলেন। এরপর মসুল রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাদের আরেক ভাই কুতুবুদ্দিন মওদুদ। কুতুবুদ্দিন নুরুদ্দিনের পূর্ণ অনুগত ছিলেন। তিনি তার রাজ্যে ভাই নুরুদ্দিনের নামে খুতবা পাঠ চালু করেন এবং নুরুদ্দিনের সঙ্গে অধিকাংশ যুদ্ধে শরিক হন। ৫৬৫ হিজরি সনে (১১৭০ খ্রিষ্টাব্দে) কুতুবুদ্দিনের মৃত্যু হলে মসুল রাজ্যের ক্ষমতা নিয়ে অস্থিরতা শুরু হয়। এ সময় মসুলের উজির ফখরুদ্দিন কুতুবুদ্দিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র ২য় ইমাদুদ্দিনের পরিবর্তে অপর পুত্র ২য় সাইফুদ্দিন গাজিকে মসনদে বসিয়ে নিজের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। মসুলের এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিক্ষুব্ধ হয়ে নুরুদ্দিন মসুল অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি পথিমধ্যে সিনজারে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ভ্রাতুষ্পুত্র ২য় ইমাদুদ্দিনকে নগরটির দায়িত্ব প্রদান করেন। এরপর তিনি মসুল অবরোধ করেন এবং ফখরুদ্দিনকে নতি স্বীকারে বাধ্য করে নগরীটিকে আপন রাজ্যভুক্ত করে নেন। অবশ্য ভ্রাতুষ্পুত্র সাইফুদ্দিনকে তিনি মসুলের প্রশাসক পদে বহাল রাখেন। এর মধ্য দিয়ে পুরো জিনকি রাষ্ট্র আবারও একক নেতৃত্বে চলে আসে। এটি ৫৬৬ হিজরি সনের ঘটনা।

সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রহ. অসুস্থ অবস্থায় ৫৬৯ হিজরি সনের ১১ শাওয়াল (১১৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ মে) বুধবার আটান্ন বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

ঐতিহাসিক ইবনুল আছির বলেন, 'উমর ইবনে আবদুল আজিজের পর নুরুদ্দিনের চেয়ে অধিক ন্যায়পরায়ণ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট কোনো শাসক ছিল না।'

আরেক ঐতিহাসিক ইবনে কাছির রহ. *'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া'* গ্রন্থে কয়েক পৃষ্ঠাজুড়ে নুরুদ্দিন জিনকি রহ.-এর চরিত্রগুণের কথা উল্লেখ করেছেন। আমরা সেখান থেকে সামান্য কিছু অংশ তুলে ধরছি।

> নুরুদ্দিন রহ. সুন্দর হস্তলিপির অধিকারী ছিলেন। তিনি প্রচুর দ্বীনি কিতাবাদি অধ্যয়ন করতেন, নববি নির্দেশনাবলি অনুসরণ করতেন। তিনি জামাতে নামাজ আদায়ে যত্নবান ছিলেন। তিনি অধিক পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াত করতেন, কল্যাণমূলক কাজ ভালোবাসতেন।
>
> সুলতান নুরুদ্দিন মিতাহারী ও সংযমী ছিলেন। নিজের ও পরিবারের পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত মিতব্যয়ী ছিলেন। এমনকি কথিত আছে, তার শাসনামলের সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তির খরচও তার চেয়ে বেশি ছিল। তিনি সম্পদ সঞ্চয় করতেন না, পার্থিব চাহিদাকে প্রাধান্য দিতেন না। স্বাভাবিক বা রাগান্বিত—কোনো অবস্থায়ই তার মুখ থেকে কোনো অশ্লীল বা অশোভনীয় উচ্চারণ শোনা যায়নি। তিনি মৌনতাপ্রিয় ও গম্ভীর ছিলেন।
>
> সুলতান নুরুদ্দিন হানাফি মাজহাবের ফকিহ ছিলেন। তিনি হাদিসের শিক্ষাগ্রহণ করেছেন, হাদিসের পাঠগ্রহণ ও পাঠদান করেছেন। রাতভর প্রচুর নামাজ পড়তেন, সাহরির সময় হতে দিবসে ঘোড়ায় আরোহণের পূর্ব পর্যন্ত সময় নামাজে কাটিয়ে দিতেন।
>
> সুলতান নুরুদ্দিন বিভিন্ন সড়ক ও পথের পাশে অনেক ছাউনি ও সরাইখানা নির্মাণ করেন। তিনি দুর্গম ও ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলোতে নিরাপত্তারক্ষী নিয়োজিত করেন এবং তাদের কাছ থেকে যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ে পাওয়ার জন্য বার্তাবাহী কবুতরের ব্যবস্থা করেন। তিনি প্রচুর খানকাও প্রতিষ্ঠা করেন।

সুলতান নুরুদ্দিন তার কাছে ফুকাহায়ে কেরাম, উলামা-মাশায়েখ ও সুফি-বুজুর্গদের সমবেত করতেন এবং তাদের সম্মান করতেন। তিনি সৎ লোকদের ভালোবাসতেন।

তিনি হাদিসে নববির পাঠদানের জন্য দামেশকে একটি দারুল হাদিস প্রতিষ্ঠা করেন। ইবনুল আছিরের ভাষ্যমতে তিনিই প্রথম দারুল হাদিস (নামক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান) প্রতিষ্ঠা করেন।

সুলতান নুরুদ্দিন অত্যন্ত গম্ভীর ও প্রতাপসম্পন্ন ছিলেন। প্রশাসক ও সেনাপতিদের অন্তরে তার ব্যক্তিত্বের প্রবল ভীতি ও প্রতাপ কাজ করত। তার অনুমতি ব্যতীত কেউ তার সামনে বসার সাহস করত না। কিন্তু কোনো আলিম বা ফকিহ আগমন করলে নুরুদ্দিন তার সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং কয়েক কদম এগিয়ে আসতেন; এরপর তাকে শান্তভাবে ধীরস্থিরতার সঙ্গে নিজের সঙ্গে গালিচায় বসাতেন। কোনো আলিমকে প্রচুর পরিমাণ হাদিয়া প্রদান করার পর তিনি বলতেন, 'তারা হচ্ছেন আল্লাহর সৈনিক। তাদের দোয়ার বরকতেই আমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করি। আমি যে হাদিয়া প্রদান করি, তার চেয়ে বাইতুল মালে তাদের অনেকগুণ বেশি অধিকার আছে। সুতরাং, তারা যদি তাদের অধিকারের এই যৎসামান্য প্রাপ্তিতেই আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তা তো আমাদের প্রতি তাদের অপার অনুগ্রহ।'[৫৮৪]

পিতা ইমাদুদ্দিন জিনকির মতো নুরুদ্দিন জিনকিও ইসলামি ভূখণ্ডকে ক্রুসেডারমুক্ত করার লক্ষ্যে আজীবন চেষ্টা-সাধনা অব্যাহত রেখেছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন, আল-কুদস নগরপ্রাচীরের শীর্ষদেশে আবারও ইসলামের পতাকা উড্ডীন হবে এবং মসজিদুল আকসায় মুমিনদের সিজদা-চিহ্ন অঙ্কিত হবে। এ লক্ষ্যেই তিনি ৫৬৩ হিজরি সনে (১১৬৮ খ্রিষ্টাব্দে) মসজিদুল আকসায় স্থাপনের জন্য একটি মিম্বর তৈরি করেন। নুরুদ্দিন জিনকি রহ. জীবদ্দশায় যদিও এ স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি; কিন্তু তার শিষ্য সালাহুদ্দিন আইয়ুবি আল-কুদস পুনরুদ্ধার করেন এবং মিম্বরটি সেখানে স্থাপন করেন। এই সালাহুদ্দিন

---

৫৮৪. ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১২/২৫৮-২৬৪।

আইয়ুবি রহ.-ই হলেন আমাদের ক্রুসেড ইতিহাসের পরবর্তী তথা তৃতীয় মহানায়ক।

নুরুদ্দিন জিনকি রহ.-এর ইন্তেকালের পর তার পুত্র সালিহ ইসমাইলের নামে জিনকি রাষ্ট্রের নেতৃত্বের বায়আত গ্রহণ করা হয়। সালিহ তখন বয়সের বিবেচনায় একেবারেই নবীন ছিলেন। তাই সেনাপতি শামসুদ্দিন ইবনে মুকাদ্দিমকে তার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। এ সময় রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসক ও সেনাপতিগণ বিরোধে জড়িয়ে পড়ে এবং মতবিরোধকে কেন্দ্র করে পুরো জিনকি রাষ্ট্রে অস্থিরতা-অরাজকতা শুরু হয়। চতুর্দিক থেকে ইসলামের শত্রুরা মুসলমান ও ইসলামি ভূখণ্ডের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি ফেলতে থাকে। ক্রুসেডাররা মুসলমানদের হাত থেকে দামেশক নগরী কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করে। শামসুদ্দিন ইবনে মুকাদ্দিম তাদের প্রতিরোধে দৃঢ়তার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হন এবং শেষ পর্যন্ত প্রচুর সম্পদ প্রদান করে তাদের সঙ্গে সন্ধি করেন। অবশ্য তিনি যদি ক্রুসেডারদের (মিশরের প্রশাসক) সালাহুদ্দিন আইয়ুবির আগমনের ভয় না দেখাতেন, তাহলে তারা সন্ধিপ্রস্তাবেও রাজি হতো না।

সালাহুদ্দিনের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং ক্রুসেডারদের সঙ্গে আপস করে তাদেরকে অর্থ প্রদান করায় ইবনে মুকাদ্দিমসহ শামের বিভিন্ন অঞ্চলের সেনাপতি ও প্রশাসকদের কাছে পত্র পাঠিয়ে তাদেরকে ভর্ৎসনা করেন। সালাহুদ্দিনের পত্র পেয়ে অনুতপ্ত হওয়া দূরে থাক, সেনাপতি ও প্রশাসকগণ কঠোর ভাষায় জবাবি পত্র প্রেরণ করে। তখন সুলতান সালাহুদ্দিন শাম অভিমুখে অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন।

কিন্তু এরই মধ্যে ৫৭০ হিজরি সনে ক্রুসেডাররা মিশরে হামলা চালায়। এদিকে উবায়দিরাও সালাহুদ্দিনকে হটিয়ে ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করার জন্য সার্বক্ষণিক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। বাধ্য হয়ে সালাহুদ্দিন শাম অভিযানের পরিকল্পনা আপাতত মুলতবি রাখেন।

এ সময় সিসিলি থেকে ক্রুসেডারদের বিশাল এক নৌবহর মিশরে আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। নৌবহরটিতে ছিল সৈন্যবহনকারী দুইশ জাহাজ, অশ্ববহনকারী ছত্রিশটি জাহাজ, যুদ্ধাস্ত্রে পূর্ণ ছয়টি বিশাল জাহাজ এবং রসদসামগ্রীতে পূর্ণ চল্লিশটি বড় জাহাজ। নৌবহরটিতে পঞ্চাশ

হাজার পদাতিক সৈন্য এবং দেড় হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। ক্রুসেডার বাহিনী আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছেই কামান ও মিনজানিক স্থাপন করে আক্রমণ শুরু করে। আলেকজান্দ্রিয়াবাসী বীরত্বের সঙ্গে তাদের প্রতিরোধ করে। দ্বিতীয় দিন অন্যান্য অঞ্চল থেকেও মুসলিম সৈন্যগণ ক্রুসেডারদের মোকাবিলায় আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছে যায়। তৃতীয় দিনই মুসলিম সৈন্যদের প্রচণ্ড আক্রমণে ক্রুসেডাররা পিছু হটে এবং পলায়নের পথ ধরে। মুসলমানরা ক্রুসেডারদের কামানগুলো জ্বালিয়ে দেয় এবং পলায়নরত ক্রুসেডারদের তাড়া করে। অসংখ্য খ্রিষ্টান সৈন্য নিহত হয়, অনেকে পানিতে ডুবে মারা যায়। এভাবে ক্রুসেডারদের মিশর দখলের চেষ্টা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে যায়।

এরপর সুলতান সালাহুদ্দিন উবায়দিদের সব চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র সফলতার সঙ্গে দমন করেন। মিশরের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে পূর্ণ নিশ্চিন্ত হওয়ার পর তিনি শাম অভিমুখে রওনা হন। ৫৭০ হিজরি সনে তিনি তার ভাই আবু বকরকে মিশরে অস্থায়ী নায়েব নিযুক্ত করে দামেশক অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি কোনো ধরনের রক্তপাত ছাড়াই দামেশকে প্রবেশ করেন এবং নুরুদ্দিনের মৃত্যুপরবর্তী সময়ে সেখানে সৃষ্ট সকল বিশৃঙ্খলা দূর করেন। এরপর তিনি তার আরেক ভাই সাইফুল ইসলাম তুগতেকিনকে দামেশকের প্রশাসক নিযুক্ত করে আলেপ্পো অভিমুখে রওনা হন। এ সময় উবায়দি গুপ্তঘাতক ও আলেপ্পোর সেনাপতিরা মিলে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলেও আল্লাহ তাআলা ইসলামের এই মহান সৈনিককে রক্ষা করেন এবং তিনি তাদের সকলকে পরাভূত করেন।

সুন্নিদের কাছে মিশরের কর্তৃত্ব হারানো শিয়া উবায়দি শক্তি কিন্তু নিশ্চুপ বসে ছিল না। তারা এবার খ্রিষ্টরাজ্য ত্রিপোলির শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং সালাহুদ্দিনের বিরুদ্ধে তাদেরকে সহায়তা করলে বিপুল পরিমাণ সম্পদ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দিন ছিলেন চূড়ান্ত পর্যায়ের সতর্ক ও দূরদর্শী। তিনি তাদের সকল চক্রান্ত প্রতিহত করেন এবং হিমস, আলেপ্পো ও হামা অঞ্চল পুনরুদ্ধার করে ইসলামি ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হন। এভাবে এ অঞ্চলের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার অব্যাহত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সালাহুদ্দিন এমন এক সুবিশাল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন, যার ব্যাপ্তি ছিল উত্তর ইরাক (কুর্দিস্তান), শাম, মিশর

ও বারকা (Cyrenaica) অঞ্চলজুড়ে। সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি-প্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্র পরিচিতি লাভ করে আইয়ুবি রাষ্ট্র নামে।

৫৮২ হিজরিতে বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের অধীনস্থ কারাক অঞ্চলের প্রশাসক রেনাল্ড (Raynald of Châtillon) মুসলমানদের একটি বণিক কাফেলার উপর আক্রমণ করে। অথচ বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের সঙ্গে তখন সুলতান সালাহুদ্দিনের শান্তিচুক্তি কার্যকর ছিল এবং চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল, যেকোনো মুসলিম কাফেলা নির্বিঘ্নে মিশর থেকে শামে আসা-যাওয়া করতে পারবে; ক্রুসেডাররা তাতে কোনো প্রকার বাধা সৃষ্টি করবে না। কিন্তু রেনাল্ড চুক্তিভঙ্গ করে কাফেলার সদস্যদের বন্দি করে এবং ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে বন্দিদেরকে বলে, 'তোমরা যদি মুহাম্মাদের ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে থাকো, তাহলে এখন তাকে ডাকো। সে এসে তোমাদের মুক্ত করুক এবং এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুক!' সালাহুদ্দিনের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি রেনাল্ডকে বন্দি করতে পারলে নিজ হাতে হত্যা করার শপথ করেন।

ঐতিহাসিক হিত্তিনের যুদ্ধ

ক্রুসেডারদের এই চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণের পর সুলতান সালাহুদ্দিন দ্রুত যুদ্ধপ্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তিনি ৫৮৩ হিজরি সনের ১৭ রবিউল আউয়াল দামেশক থেকে বেরিয়ে আসেন। বিভিন্ন সামরিক পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করে অবশেষে তিনি তাবারিয়ায় পৌঁছান।

সুলতান সালাহুদ্দিনের বিস্তৃত পরিকল্পনা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সৈন্যসমাবেশ শুরু করে। এরপর তারাও তাবারিয়ার উদ্দেশে রওনা হয়। উভয় বাহিনী হিত্তিন নামক স্থানে পরস্পর মুখোমুখি হয়। মুসলিম বাহিনী পূর্বেই যুদ্ধক্ষেত্রের আশেপাশের পানির উৎসগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করায় ক্রুসেডার বাহিনী এ সময় প্রচণ্ড পানিস্বল্পতার সম্মুখীন হয়।

৫৮৩ হিজরি সনের ২৫ রবিউস সানি (১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ৪ জুলাই) উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সুলতান সালাহুদ্দিন এ যুদ্ধে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেন। চরমভাবে পরাজিত ক্রুসেডার বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য নিহত বা বন্দি হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর

মুসলিম সৈন্যরা পলায়নপর ক্রুসেডারদের পিছু নিয়ে নিকটবর্তী পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করতে থাকে এবং তাদের তরবারির আঘাতে খ্রিষ্টান সৈন্যরা লুটিয়ে পড়তে থাকে। বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজা গায় (Guy of Lusignan)-এর পাশে থাকে মাত্র দেড়শ সৈন্য। ক্লান্তি ও ক্ষুৎপিপাসায় একসময় তারা পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে মারা যায়। বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজা গায় ও কারকের প্রশাসক রেনাল্ড মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দি হয়।

যুদ্ধক্ষেত্রেই সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির জন্য একটি তাঁবু প্রস্তুত করা হয়। তাঁবুতে সুলতানের বিজ্ঞ উপদেষ্টা ও সেনাপতিগণ সমবেত হয়। সকলে কৃতজ্ঞতায় আল্লাহর দরবারে সিজদাবনত হয়ে পড়ে। এরপর সুলতানের নির্দেশে বন্দি রাজা ও প্রশাসককে উপস্থিত করা হয় এবং তাঁবুর ভেতরে বসানো হয়। প্রচণ্ড পিপাসায় কাতর বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজা গায় পানি পান করতে চাইলে তার জন্য ঠান্ডা পানি পরিবেশন করা হয়। সামান্য পানি পান করার পর তিনি অবশিষ্ট পানি রেনাল্ডকে দিতে উদ্যত হলে সালাহুদ্দিন বজ্রকণ্ঠে বলে ওঠেন, 'আমরা এ পানি তাকে পান করার জন্য দিইনি। কাজেই তার নিজেকে নিরাপদ ভাবার কোনো কারণ নেই।' এরপর ক্রুদ্ধ সুলতান দাঁড়িয়ে যান এবং রেনাল্ডকে তার গর্হিত আচরণ ও নবীজির শানে ধৃষ্টতার জন্য ভর্ৎসনা করেন। এরপর তিনি আপন প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে নিজ হাতে তাকে হত্যা করেন। রেনাল্ডের পরিণতি স্বচক্ষে অবলোকন করে রাজা গায় ভীত হয়ে পড়লে সুলতান সালাহুদ্দিন তাকে বলেন, 'রাজাদের হত্যা করা রাজন্যবর্গের নীতি নয়; কিন্তু এই লোক সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।'

এরপর বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজা ও তার জীবিত অনুচরদের সসম্মানে দামেশকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

আল-কুদস পুনরুদ্ধার

৫৮৩ হিজরি সনের জুমাদাল উলা মাসে সুলতান সালাহুদ্দিন আক্কায় প্রবেশ করেন। মুসলিম বাহিনীর আগমন সংবাদ পেয়ে সেখানকার ক্রুসেডাররা পালিয়ে সুর নগরীতে চলে যায়। এরপর সালাহুদ্দিন তিবনিন (Tebnine), সিডন, ব্যাবলস ও বৈরুতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তিনি উপকূলীয় পথ ধরে আসকালানে পৌঁছে আসকালান অবরোধ করেন। চৌদ্দ দিনের অবরোধের পর আসকালানবাসী আত্মসমর্পণ করে।

এর পাশাপাশি রামলা, দারুম, গাজা, বেথেলহাম, নাতরুন ইত্যাদি অঞ্চল বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে। এর ফলে একদিকে আল-কুদস অবরোধ করার পথ সুগম হয়, অপরদিকে উপকূলীয় পথে আল-কুদসে সাহায্য প্রেরণের পথও বন্ধ হয়ে যায়।

সার্বিক প্রস্তুতি শেষে সালাহুদ্দিন আইয়ুবি অগ্রসর হন আল-কুদস অভিমুখে। তিনি সেখানে কোনো রক্তপাত ঘটাতে চাননি। কিন্তু ক্রুসেডাররা আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতি জানালে তিনি বাধ্য হয়ে শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে আল-কুদসে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর ক্রুসেডাররা সন্ধিচুক্তি করতে সম্মত হয় এবং এই শর্তে চুক্তি সম্পাদিত হয় যে, আগামী চল্লিশ দিন তাদেরকে আল-কুদস ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। বিনিময়ে পুরুষগণ জনপ্রতি দশ দিনার, নারীগণ জনপ্রতি পাঁচ দিনার এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিনিময়ে জনপ্রতি দুই দিনার প্রদান করতে হবে। কেউ নির্ধারিত দিনার প্রদান করতে না পারলে সে বন্দি বিবেচিত হবে। যারা শর্ত মেনে প্রস্থান করবে, তাদেরকে নিরাপদে সুর নগরীতে চলে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে।

৫৮৩ হিজরি সনের ২৭ রজব (১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ২ অক্টোবর) সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি আল-কুদসে প্রবেশ করেন।

কত ব্যবধান ৪৯২ হিজরি ও ৫৮৩ হিজরি সনের মাঝে!

৪৯২ হিজরি সনের ২২ শাবান (১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ জুলাই) ক্রুসেডাররা আল-কুদস দখল করার পর নির্মম গণহত্যা চালিয়েছিল, এক দিনে হত্যা করেছিল সত্তর হাজার মুসলিম নাগরিককে। এ সম্পর্কে দুজন খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকের ভাষ্য দেখুন।

- তৎকালীন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক উইলিয়াম সুরি (William of Tyre) বলেন, ক্রুসেডারদের প্রবেশকালে আল-কুদস নগরী এক ভয়ানক হত্যাযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করে। মুসলমানদের রক্তে নগরীটি রক্তপ্রান্তরে পরিণত হয়। নগরীজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে ভীতি ও আতঙ্ক।[৫৮৫]
- সমসাময়িক আরেক খ্রিষ্টান ঐতিহাসিক উল্লেখ করেন, বাইতুল

৫৮৫. Guillaume de Tyr, 1, p. 354.

> মুকাদ্দাসে ক্রুসেডাররা নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালানোর পরের দিন সকালে তিনি যখন দর্শনার্থী হিসেবে সেখানে প্রবেশ করেন, তখন অনেক কষ্টে মুসলমানদের লাশের মধ্য দিয়ে রাস্তা পাড়ি দিতে সক্ষম হন। তিনি আরও উল্লেখ করেন, নিহতদের রক্ত তার হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল![৫৮৬]

বিপরীতে ৫৮৩ হিজরি সনের ২৭ রজব (১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ২ অক্টোবর) সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি আল-কুদস পুনরুদ্ধার করার পর সেখানকার খ্রিষ্টান নাগরিকদের সঙ্গে কী আচরণ করেছিলেন, সে সম্পর্কে কয়েকজন খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকের ভাষ্য লক্ষ করুন।

- স্টিফেনসন বলেন, 'সুলতান সালাহুদ্দিন প্রচুর সংখ্যক লোককে মুক্তিপণ ছাড়াই বাইতুল মুকাদ্দাস ত্যাগের সুযোগ দিয়েছেন।'
- বৃটিশ প্রাচ্যবিদ স্ট্যানলি লেন পোল (Stanley Edward Lane-Poole) বলেন, সুলতান একদিন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পুরো সময় নগরদ্বার খুলে রেখে অসহায় ও দরিদ্রদেরকে মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই যেতে দিয়েছেন।'
- ভারতীয় প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ সৈয়দ আমির আলি ইংরেজ ঐতিহাসিক মিলস-এর বরাতে উল্লেখ করেন—'আল-কুদস ত্যাগ করে প্রচুর সংখ্যক খ্রিষ্টান নাগরিক খ্রিষ্টরাজ্য এন্টিয়কের উদ্দেশে রওনা হয়। কিন্তু এন্টিয়কের শাসক তাদের আশ্রয় দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে তাড়িয়ে দেন। বাধ্য হয়ে তারা ফিরতি পথ ধরে এবং বিভিন্ন ইসলামি রাজ্য অভিমুখে রওনা হয়। মুসলিম রাজ্যগুলোতে তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করা হয়।'
- আমির আলি আরও উল্লেখ করেন, স্ট্যানলি লেন পোলের বর্ণনামতে বাইতুল মুকাদ্দাসের তৎকালীন গির্জাধ্যক্ষ ছিলেন মায়া-মমতাহীন চরম নিষ্ঠুর একজন ব্যক্তি। দরিদ্র ও অসহায় নাগরিকদের মুক্তিপণ আদায়ে সাহায্য করার পরিবর্তে তিনি নিজের প্রচুর সম্পদ নিয়ে আল-কুদস ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন সালাহুদ্দিনকে জিজ্ঞেস করা

---

৫৮৬. Raymond d'Aigles, p. 300.

হয়, 'আপনি কেন মুসলমানদের উন্নয়নের কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করছেন না?' উত্তরে সুলতান বলেন, 'আমি তার কাছ থেকে দশ দিনারের চেয়ে সামান্য বেশিও গ্রহণ করব না এবং তার সঙ্গে প্রতারণা করব না।' এ ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে স্ট্যানলি লেন পোল বলেন, 'বিষয়টি এমন দাঁড়াল যে, একজন মুসলিম সুলতান এক খ্রিষ্টান ধর্মযাজককে দয়া ও অনুগ্রহের পাঠদান করছেন।'

- প্রখ্যাত ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি (Philip Khuri Hitti) শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'খ্রিষ্টান নাগরিকদের সঙ্গে সুলতান সালাহুদ্দিনের আচরণ ও ইতিপূর্বে আটাশি বছর ধরে মুসলমানদের সঙ্গে খ্রিষ্টানদের আচরণের মাঝে পার্থক্য ছিল পুরোপুরি দৃশ্যমান ও সুস্পষ্ট।'

আল-কুদস জয়ের পর ইসলামি প্রাচ্যে ক্রুসেডারদের প্রতিপত্তি আরও সংকুচিত হয়ে পড়ে। তাদের হাতে থাকে এন্টিয়ক ও সুর নগরীর মতো গোটাকয়েক নগরী। এ সময় মুসলমানদের হাতে বিজিত প্রতিটি নগরী হতে ক্রুসেডাররা ধীরে ধীরে সুর নগরীতে আশ্রয় নিতে থাকে। একত্রিত হয়েই তারা সালাহুদ্দিনের সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। সংগঠিত ক্রুসেড শক্তি এবার আক্কা অভিমুখে রওনা হয় এবং জল-স্থল উভয় দিক থেকে আক্কা অবরোধ করে। ৫৮৫ হিজরি সনের ৮ রজব (১১৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২১ আগস্ট) থেকে শুরু হওয়া এ অবরোধ দুই বছর অব্যাহত থাকে।

সংবাদ পেয়ে মুসলিম বাহিনীও আক্কায় পৌঁছে ক্রুসেডারদের স্থল ভাগে অবরুদ্ধ করে রাখে। সুলতান সালাহুদ্দিন নিজে তিল-কায়সানে (Tell Keisan) শিবির স্থাপন করেন। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে অনেকবার যুদ্ধ সংঘটিত হলেও কোনো পক্ষই নিরঙ্কুশ জয় অর্জন করতে পারেনি। এরই মধ্যে বেজে ওঠে তৃতীয় ক্রুসেড যুদ্ধের দামামা।

তৃতীয় ক্রুসেড যুদ্ধ

[৫৮৫-৫৮৭ হিজরি/১১৮৯-১১৯২ খ্রিষ্টাব্দ]

হিত্তিনের যুদ্ধে ক্রুসেডারদের শোচনীয় পরাজয় এবং এরপর আল-কুদস নগরীর পতনের ফলে ইউরোপে নতুন করে ক্রুসেড অভিযানের আওয়াজ ওঠে। তৎকালীন পোপ ৮ম গ্রেগরি (Gregory VIII) ১১৮৯ খ্রিষ্টাব্দে পবিত্র নগরী আল-কুদস পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে তৃতীয় ক্রুসেড যুদ্ধের ডাক দেন।

পোপের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইউরোপের শক্তিশালী কয়েকজন শাসক এবারের অভিযানে যোগদান করেন। তারা হলেন—

- জার্মানির রাজা ও পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের (The Holy Roman Emperor) সম্রাট ১ম ফ্রেডেরিক (Frederick Barbarossa)।
- ফ্রান্সের রাজা ২য় ফিলিপ (Philip Augustus)।
- ইংল্যান্ডের রাজা 'সিংহহৃদয়' খ্যাত প্রথম রিচার্ড (Richard the Lionheart)।

ইউরোপের বিভিন্ন স্থান থেকে ক্রুসেডার বাহিনী আক্কা অভিমুখে রওনা হয়। জার্মানি থেকে প্রায় এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে রওনা হওয়ার পর রাজা ১ম ফ্রেডেরিক ৫৮৬ হিজরি সনের জুমাদাল উলা মাসে (১১৯০ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে) পথিমধ্যে ডুবে মারা গেলে তার নেতৃত্বাধীন জার্মান বাহিনীর সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং অধিকাংশই দেশে ফিরে যায়। অল্প কিছু সৈন্য আক্কায় পৌঁছতে সক্ষম হয়।

অপরদিকে ২য় ফিলিপের নেতৃত্বাধীন ফরাসি বাহিনী ও ১ম রিচার্ডের নেতৃত্বাধীন ইংরেজ বাহিনী প্রথমে সিসিলিতে একত্র হয়। এরপর তারা নিজেরা পরস্পরে বিরোধে জড়িয়ে পড়ায় দীর্ঘ সময় সিসিলিতেই অবস্থান করে। কিছুদিন পর ফরাসিরা সিসিলি ত্যাগ করে আক্কা অভিমুখে রওনা হয়।

ইংরেজরাও আক্কার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু পথিমধ্যে ঝড়ের কবলে পড়ে ইংরেজ নৌবহর সাইপ্রাস দ্বীপে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। সাইপ্রাস তখন বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। সাইপ্রাসে অবতরণ করার পর রাজা রিচার্ড বাইজান্টাইনদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন এবং

সাইপ্রাস দখল করে সেখানে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন। এরই মধ্যে বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজা গায় রিচার্ডের কাছে দ্রুত ক্রুসেড অভিযানে যোগ দেওয়ার আবেদনবার্তা পাঠালে রিচার্ড সমুদ্রপথে আক্কার উদ্দেশে যাত্রা করেন। এই গায়কেই সুলতান সালাহুদ্দিন বন্দি করার পরও ক্ষমা করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। ফরাসি ও ইংরেজ বাহিনী আক্কায় পৌঁছে যাওয়ায় অবরোধকারী ক্রুসেডারদের মনোবল বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। সম্মিলিত ক্রুসেডার বাহিনী আক্কার পতন ঘটানোর জন্য পূর্ণ উদ্যমে অবরোধ অব্যাহত রাখে।

৫৮৭ হিজরি সনের ১৭ জুমাদাল উখরা (১১৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১২ জুলাই) শুক্রবার হঠাৎ করেই আক্কা নগরপ্রাচীরের শীর্ষদেশে ক্রুশচিহ্নিত পতাকা উড়তে থাকে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় মুসলমানরা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে এবং ক্রুসেডারদের হিংস্র হামলার শিকার হয়। ষাট হাজার মুসলিম নাগরিকের প্রাণ-বিয়োগের পর আক্কার কর্তৃত্ব চলে যায় ক্রুসেডারদের হাতে।

আক্কা দখল করার পর ক্রুসেডার বাহিনীর সদস্যরা সেখানেই আনন্দ-উল্লাসে মত্ত হয়ে যায় এবং দীর্ঘ দিন সেখানেই কাটিয়ে দেয়। অথচ তারা বের হয়েছে 'পবিত্র ভূমি' আল-কুদস পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে!

এদিকে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের রাজার মধ্যে নতুন করে শুরু হয় বিরোধ ও সংঘাত। এর পরিণতিতে ফরাসি রাজা ফিলিপ দেশে ফিরে যান। এরপর সালাহুদ্দিনের নেতৃত্বাধীন মুসলিম বাহিনী ও ১ম রিচার্ডের নেতৃত্বাধীন ক্রুসেডার বাহিনীর মাঝে একের পর এক রক্তক্ষয়ী লড়াই চলতে থাকে। জয়-পরাজয়ের পাল্লা ছিল উভয়দিকেই দোদুল্যমান।

এসব যুদ্ধের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আরসুফের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে ক্রুসেডাররা জয়ী হয়। ক্রুসেডারদের দৃষ্টিতে এ বিজয় ছিল হিত্তিনের যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ।

ক্রুসেডাররা এ সময় আসকালান ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দিক থেকে আল-কুদস দখলের চেষ্টা করলেও মুসলিম প্রহরীদের তীব্র প্রতিরোধের কারণে কাছে ভিড়তে ব্যর্থ হয়। প্রহরীদের সঙ্গে মাঝেমধ্যেই তাদের লড়াই হচ্ছিল এবং লড়াইতে কখনো মুসলিম প্রহরীরা, আবার কখনো ক্রুসেডাররা জয়ী হচ্ছিল। অবশ্য এ সময় তারা উপকূলীয় বিভিন্ন নগরী দখল করতে সক্ষম হয়। একদিকে প্রচুর জনবল ক্ষয়, অপরদিকে দীর্ঘ

দিনের মাতৃভূমির বিচ্ছেদের কারণে রাজা রিচার্ড এ সময় অস্থির হয়ে ওঠেন এবং সন্ধিচুক্তির চেষ্টা চালান। তিনি একের পর এক কয়েকজন দূতকে সুলতানের কাছে প্রেরণ করেন। তার সন্ধিপ্রস্তাবে উল্লেখ ছিল—উভয়পক্ষ তিন বছর যুদ্ধবিরতি মেনে চলবে, আসকালানের অধিকার ক্রুসেডারদের ফিরিয়ে দিতে হবে, বাইতুল মুকাদ্দাসের আল-কিয়ামা গির্জা তাদেরকে দান করতে হবে এবং খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীদেরকে বিনা মাশুলে আল-কিয়ামা গির্জা পরিদর্শন ও তীর্থযাত্রার সুযোগ দিতে হবে। সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি আল-কিয়ামা গির্জা তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে সম্মত হলেও আসকালান ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানান এবং তীর্থযাত্রীদের উপর যৎসামান্য অর্থ আরোপের কথা বলেন। কিন্তু ইংরেজরা দাবি জানায়, মুসলমানরা যদি আসকালানের নিরাপত্তাপ্রাচীর পুনর্নির্মাণ করে নগরীটির নিয়ন্ত্রণ ইংরেজদের বুঝিয়ে না দেয়, তাহলে তারা সন্ধি করবে না। ফলে সুলতানও তাদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি না করার সিদ্ধান্ত নেন।

এরপর সুলতান সালাহুদ্দিন জাফা পৌঁছে কঠিন অবরোধ আরোপ করেন এবং জাফা জয় করেন। ক্রুসেডারদের আবেদনের কারণে তাদের ছোট-বড় সকলকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। এরই মধ্যে সমুদ্রপথে সামরিক সহায়তা চলে আসায় ইংরেজ বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে মুসলিম বাহিনীর উপর হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। রাজা রিচার্ড আক্রমণ চালিয়ে জাফা পুনরুদ্ধার করেন। যেসব মুসলমান পেছনে পড়ে গিয়েছিল, তাদেরকে বন্দি করে ইংরেজ রাজার সামনে হত্যা করা হয়।

এভাবে উভয় পক্ষের মধ্যে লড়াই চলতে থাকে। এরই মাঝে ইংল্যান্ডের রাজা দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। অসুস্থ ইংরেজ রাজা মুসলিম সুলতানের কাছে ফলমূল ও বরফ চেয়ে বার্তা পাঠালে সুলতান উদার চিত্তে তার চাওয়া পূরণ করেন। অল্প কদিনের মধ্যেই তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। সুস্থ হওয়ার পরই পরিবার-পরিজন ও মাতৃভূমির বিরহে অস্থির ইংরেজ রাজা বারবার দূত পাঠিয়ে সুলতানকে সমঝোতাচুক্তি করার অনুরোধ জানান এবং আসকালানের দাবি ছেড়ে দিয়ে সুলতানের দাবিমতো চুক্তি করতেই সম্মতি জানান। ১৭ শাবান উভয় পক্ষের মধ্যে

সন্ধিচুক্তি লিপিবদ্ধ হয়। 'রামলা চুক্তি' নামে খ্যাত চুক্তিটির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ধারা হলো—

- ক্রুসেডাররা সুর থেকে হাইফা পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাস করতে পারবে।
- কোনো প্রকার 'দর্শনার্থী মাশুল' প্রদান ছাড়াই খ্রিষ্টানরা আল-কুদসে ভ্রমণ করতে পারবে।
- আগামী তিন বছর আট মাস উভয় পক্ষের মাঝে শান্তি অবস্থা বিরাজমান থাকবে।

এই চুক্তি সম্পাদনের কারণে ইংল্যান্ডের রাজা ১ম রিচার্ড ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। চুক্তি সম্পাদনের কিছুদিন পর ৫৮৮ হিজরি সনের শাওয়াল মাসে (১১৯২ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে) তিনি নিজ দেশে ফিরে যান। অপরদিকে সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ.-এর দিক থেকে বিবেচনা করলে বলতে হয়, আরসুফ ও জাফার যুদ্ধে প্রচুর সৈন্যক্ষয় এবং শাম অঞ্চলের প্রশাসকদের অসহযোগিতার কারণে তিনি কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জনে ব্যর্থ হন এবং যেকোনো মূল্যে আল-কুদসের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে উপকূলীয় অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

এভাবেই দীর্ঘ কয়েক বছরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, অসংখ্য প্রাণহানি ও বিভিন্ন নগরী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হওয়ার পর তৃতীয় ক্রুসেড যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। তৃতীয় ক্রুসেড যুদ্ধে জার্মানি হারায় তাদের রাজাকে, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড হারায় তাদের নির্বাচিত ও সুদক্ষ অনেক সৈনিক ও সেনাপতিকে। যদিও সম্মিলিত ক্রুসেডার বাহিনী আল-কুদস পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন নিয়ে অভিযানে বের হয়েছিল; কিন্তু তাদের চেষ্টা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। এ অভিযানে তারা কেবল আক্কা দখল করতে সক্ষম হয়।

তৃতীয় ক্রুসেড-পরবর্তী সময়

ক্রুসেডার বাহিনীর প্রস্থানের পর সুলতান সালাহুদ্দিনের সুশাসনে জনসাধারণ নিরাপদে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। তার উদার আচরণের কারণে আল-কুদসে খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীদের আগমনও প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায়। এমনকি ইংল্যান্ডের রাজা ১ম রিচার্ড অধিক হারে তীর্থযাত্রীদের আগমনে সুলতান সালাহুদ্দিনের ক্রুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা করে

সুলতানের কাছে বার্তা প্রেরণ করেন যে, তিনি যেন আল-কুদসে তীর্থযাত্রীদের অবাধ প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন এবং রাজা রিচার্ডের লিখিত অনুমতিপত্র বা নিদর্শন ছাড়া কাউকে সেখানে প্রবেশের অনুমতি না দেন। কিন্তু সুলতান এ প্রস্তাবে অসম্মতি জানিয়ে প্রত্যুত্তরে লেখেন, তারা এত দূর থেকে এই পবিত্র স্থান পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে এসে পৌঁছেছে। আমি তাদের বাধাদান মোটেও বৈধ মনে করি না।

এর কিছুদিন পরই মহান সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বারো দিন অসুস্থ থাকার পর ৫৮৯ হিজরি সনের ২৭ সফর (১১৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩ মার্চ) বুধবার তার বিদেহী আত্মা পরম প্রভুর সান্নিধ্যে গমন করে। আল-কুদস মুক্তকারী এই মহান মুসলিম বীর যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তার ব্যক্তিগত সঞ্চয়ে ছিল মাত্র সাতচল্লিশটি দিরহাম ও একটি দিনার! এ ছাড়া অন্য কোনো স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ তার ছিল না।

সুলতান সালাহুদ্দিনের ইন্তেকালের পর তার পুত্র আল-আজিজ ইমাদুদ্দিন আইয়ুবি রাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু শুরুতেই তিনি তার ভাই ও দামেশকের প্রশাসক আফজালের সঙ্গে বিরোধ ও লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েন। দু-ভাইয়ের সংঘাতের সমাপ্তি ঘটে আফজালকে দামেশক থেকে নির্বাসিত করার মাধ্যমে। দামেশকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন সালাহুদ্দিনের ভাই ও জাযিরার প্রশাসক আল-আদিল সাইফুদ্দিন মুহাম্মাদ। সাইফুদ্দিন অত্যন্ত দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ শাসক ছিলেন। দামেশকের অভ্যন্তরীণ সমস্যাদি দমন করার পর শামের সকল অঞ্চল তার বশীভূত হয়ে যায়।

৫৯৫ হিজরি সনে (১১৯৮ খ্রিষ্টাব্দে) আল-আজিজ ইমাদুদ্দিন ইন্তেকাল করেন। তখন তার চাচা সাইফুদ্দিন মিশরে এসে সালাহুদ্দিনের অপর দুই পুত্রকে পরাভূত করেন এবং নতুন প্রশাসক (আল-আজিজ ইমাদুদ্দিনের পুত্র) মাত্র নয় বছর বয়সী মানসুর বিন আল-আজিজকে বরখাস্ত করে মিশরের শাসনভার গ্রহণ করেন। ৫৯৬ হিজরি সনের মধ্যেই সালাহুদ্দিনের সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চল আল-আদিল সাইফুদ্দিনের আয়ত্তে চলে আসে। তার শাসনাধীন আইয়ুবি রাষ্ট্র পরিণত হয় সমকালীন বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাসম্পন্ন রাষ্ট্রে।

৫৯৩ হিজরি সনে সুলতান সাইফুদ্দিন যখন শাম অঞ্চলে রাষ্ট্রের ভিত্তি মজবুতকরণে ব্যস্ত ছিলেন, তখন স্থানীয় ক্রুসেডাররা জার্মানির সামরিক

সহায়তা লাভ করে। মুসলমানদের পারস্পরিক বিভেদের সুযোগ নিয়ে তারা এ সময় আবারও আল-কুদস পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালায়। ক্রুসেডার বাহিনী যুদ্ধে সাইফুদ্দিনকে পরাজিত করে তার কাছ থেকে বৈরুতের নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু এরপরই তারা নিজেদের মধ্যে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। আল-আদিল সাইফুদ্দিন জাফা ও রামলা ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে তাদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করেন।

চতুর্থ ক্রুসেড যুদ্ধ

[৫৯৯-৬০০ হিজরি/১২০২-১২০৪ খ্রিষ্টাব্দ]

খ্রিষ্টানদের প্রধান ধর্মীয় গুরু পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট (Innocent III) ১২০২ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে ইউরোপে নতুন ক্রুসেডের ডাক দেন। এবারের অভিযানে নেতৃত্ব প্রদান করে ফ্রান্সের আঞ্চলিক রাজন্যবর্গ। তারা ফ্রান্স থেকে প্রথমে মিশরে গমন করে তৎকালীন ইসলামি বিশ্বের প্রধান শক্তি আইয়ুবি রাষ্ট্রকে পরাভূত করে তারপর আল-কুদস অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ শেষে ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ক্রুসেডার বাহিনী যখন রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তখনই হঠাৎ করে পট পরিবর্তন ঘটে। এ সময় কনস্টান্টিনোপলে বাইজান্টাইন সম্রাট ২য় ইসহাক (Isaac II Angelos) তার বিরুদ্ধে পরিচালিত এক বিদ্রোহে ক্ষমতাচ্যুত হন এবং তার পুত্র ৪র্থ অ্যালেক্সিয়াস (Alexius IV Angelus) পালিয়ে পশ্চিম ইউরোপে এসে পোপ ও ক্রুসেডারদের কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করেন। বিনিময়ে তিনি পূর্ব ইউরোপের অর্থোডক্স চার্চকে পোপের নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেওয়ার এবং ক্রুসেডারদের মিশর অভিযানে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য কর্তৃক সামরিক সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন।

ফলে সংগঠিত ক্রুসেড শক্তি নিজেদের লক্ষ্যপথ পরিবর্তন করে এবার কনস্টান্টিনোপল অভিমুখে রওনা হয়! ক্রুসেডাররা কনস্টান্টিনোপলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে সেখানে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। পরিস্থিতি এত শোচনীয় হয়ে পড়ে যে, অনেক বাইজান্টাইন নাগরিক তখন মনেপ্রাণে কামনা করছিল, হায়! এর পরিবর্তে যদি কনস্টান্টিনোপল মুসলমানদের কর্তৃত্বে চলে যেত! ক্রুসেডাররা বিভিন্ন গির্জা ও উমাইয়া শাসনামলে

নির্মিত প্রাচীন মসজিদটি জ্বালিয়ে দেয় এবং নগরীজুড়ে ব্যাপক লুটতরাজ চালায়।

এই অভিযানের ফলে (বিভক্ত হওয়ার পর) প্রথমবারের মতো প্রাচ্যকেন্দ্রিক অর্থোডক্স চার্চ পশ্চিমা ক্যাথলিক চার্চের বশীভূত হয়ে পড়ে। এরপর ক্রুসেড যোদ্ধাদের যুদ্ধস্পৃহায় ভাটা সৃষ্টি হয় এবং মিশর ও বাইতুল মুকাদ্দাস অভিযানের চিন্তা বাতিল হয়ে যায়।

ক্রুসেডারদের আগ্রাসনের ফলে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য কার্যত ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং কয়েকটি রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের এই ক্ষয়িষ্ণু পরিস্থিতি পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে মুসলমানদের সামনে বলকান ও এশিয়া মাইনর অঞ্চলে বিজয়াভিযান পরিচালনার পথ সুগম করেছিল।

এ অভিযানের মাধ্যমে এ বিষয়টি আরও সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, ক্রুসেড অভিযানে অংশগ্রহণকারী খ্রিষ্টান নেতৃবৃন্দ মোটেও ধর্মীয় চেতনায় উদ্দীপ্ত ছিল না; তাদের মূল লক্ষ্য ছিল নিজেদের ক্ষমতা ও সম্পদের লালসা চরিতার্থ করা।

পঞ্চম ক্রুসেড যুদ্ধ

[৬১০-৬১৮ হিজরি/১২১৩-১২২১ খ্রিষ্টাব্দ]

৬১০ হিজরিতে (১২১৩ খ্রিষ্টাব্দে) পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট পঞ্চম ক্রুসেড অভিযানের ডাক দেন। চতুর্থ ক্রুসেড যুদ্ধের মতো পঞ্চম ক্রুসেডেরও লক্ষ্য ছিল আইয়ুবি রাষ্ট্রকে পরাভূত করে আল-কুদস পুনর্দখল করা। পোপের নির্দেশে পরবর্তী দু-বছর ক্যাথলিক ইউরোপজুড়ে ক্রুসেড অভিযানের প্রচারণা চালানো হয়। ১২১৫ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রোমে পোপের নেতৃত্বে এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং পুরো অভিযানের রূপরেখা চূড়ান্ত করার পাশাপাশি অভিযানে রওনা হওয়ার সময় নির্ধারণ করা হয় ১২১৭ খ্রিষ্টাব্দ।

পঞ্চম ক্রুসেডে ইউরোপের যেসব শাসক অংশগ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন—

- ডিউক অব অস্ট্রিয়া ৬ষ্ঠ লিওপোল্ড (Leopold VI)।
- হাঙ্গেরির রাজা ২য় অ্যান্ড্রু (Andrew II)।

- সাইপ্রাসের শাসক ১ম হিউ (Hugh I)।
- কাউন্ট অব ত্রিপোলি ৪র্থ বোহেমন্ড (Bohemond IV of Antioch)।

কিন্তু অভিযান শুরু হওয়ার পূর্বেই ৬১৩ হিজরি সনের রবিউল আউয়াল মাসে (১২১৬ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে) পোপ ৩য় ইনোসেন্ট ইহধাম ত্যাগ করেন। এরপর অভিযান শুরু হতে না হতেই হাঙ্গেরির রাজা ২য় অ্যান্ড্রু নিজ দেশে ফিরে যান।

ক্রুসেডার বাহিনী মিশরে পৌঁছার পূর্বেই ৬১৫ হিজরি সনে (১২১৮ খ্রিষ্টাব্দে) সুলতান আল-আদিল সাইফুদ্দিন মাহমুদ মৃত্যুবরণ করেন। এরপর আইয়ুবি সাম্রাজ্যের হাল ধরেন তাঁর পুত্র আল-কামিল মুহাম্মাদ।

ক্রুসেডার বাহিনী মিশর অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং ১২১৮ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে দিমইয়াতে পৌঁছে নৌবন্দরটি অবরোধ করে। ভূমধ্যসাগর হয়ে কায়রোতে পৌঁছতে আলেকজান্দ্রিয়া বা দিমইয়াত দুই নৌবন্দরের যেকোনো একটি অবশ্যই ব্যবহার করতে হয়। তুলনামূলক কম সুরক্ষিত হওয়ায় ক্রুসেডাররা দিমইয়াতকেই বেছে নেয়। আল-কামিল দিনরাত তাদের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখলেও তাদেরকে দিমইয়াত থেকে সরাতে ব্যর্থ হন। বাধ্য হয়ে তিনি ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দকে দিমইয়াত ত্যাগের বিনিময়ে প্রলুব্ধকর সন্ধিচুক্তির প্রস্তাব দেন। কিন্তু নিজেদের সামরিক শক্তি ও সংখ্যাধিক্যের গর্বে অন্ধ ক্রুসেড শিবির সরাসরি সন্ধিপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। দীর্ঘ দেড় বছরের অবরোধের পর ১২১৯ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তারা দিমইয়াত দখল করে নেয় এবং নগরজুড়ে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।

এরপর ক্রুসেডাররা কায়রো অভিমুখে অগ্রসর হয়। সুলতান আল-কামিল এ সময় পুনরায় তাদেরকে সন্ধিচুক্তির প্রস্তাব দিলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। ক্রুসেডার বাহিনী তিনদিক থেকে জলভাগ দ্বারা বেষ্টিত একটি এলাকা দিয়ে কায়রোর দিকে অগ্রসর হয়। এলাকাটি পূর্ব দিক থেকে মানজালা হ্রদ (Lake Manzala), পশ্চিম দিক থেকে দিমইয়াত (শাখা) নদী এবং দক্ষিণ দিক থেকে আল-বাহরুস সগির নদী দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ইসলামি নৌবহর তাদের প্রতিরোধের জন্য নীলনদে অবস্থান নিয়েছিল।

নীলনদে তখন ভরা জোয়ার চলছিল। মুসলমানরা নদীর বিভিন্ন বাঁধ কেটে দিলে উক্ত এলাকা পানিতে ডুবে যায় এবং ক্রুসেডারদের সামনে গমনের

পথ বন্ধ হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে তারা দিমইয়াতে ফিরে যেতে উদ্যত হয়। কিন্তু দিমইয়াতে প্রত্যাবর্তনের একমাত্র সংকীর্ণ পথটিতে আল-কামিল তার সৈন্যদের মোতায়েন করে রেখেছিলেন। আল-কামিলের সৈন্যরা এবার ক্রুসেডারদের পথ আগলে দাঁড়ায়।

অবরুদ্ধ ও কোণঠাসা ক্রুসেডাররা এবার নিজেরাই সন্ধিচুক্তির আবেদন জানায়। আল-কামিল এই শর্তে তাদের সঙ্গে চুক্তি করতে সম্মত হন যে, তারা দিমইয়াত অঞ্চল ফেরত দেবে এবং এর নিশ্চয়তাস্বরূপ আপাতত কয়েকজন খ্রিষ্টান রাজন্যকে জামানত হিসেবে আল-কামিলের হাতে তুলে দেবে। অবশেষে ৬১৮ হিজরি সনের রজব (১২২১ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর) মাসে ক্রুসেডাররা দিমইয়াত ত্যাগ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। এভাবে ইউরোপের খ্রিষ্টানশক্তির পঞ্চম ক্রুসেড অভিযানও পুরোপুরি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

ষষ্ঠ ক্রুসেড যুদ্ধ

[৬২৫-৬২৬ হিজরি/১২২৮-১২২৯ খ্রিষ্টাব্দ]

৬২৫ হিজরি সনে (১২২৮ খ্রিষ্টাব্দে) জার্মানির রাজা ২য় ফ্রেডেরিক (Frederick II) আল-কুদসের শাসনক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে ক্রুসেড অভিযান পরিচালনার মনস্থ করেন। পুরো ইউরোপীয় বাহিনীই তার সঙ্গে এ অভিযানে যোগ দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ফ্রেডেরিকের সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বেচ্ছাচারিতার কারণে পোপ ও বিভিন্ন অঞ্চলের খ্রিষ্টান শাসকবর্গ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয় এবং তার সঙ্গে অভিযানে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানায়। অবশেষে ফ্রেডেরিক একাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

আইয়ুবি সাম্রাজ্য তখন ভেতর-বাহির উভয় দিক থেকেই হুমকির সম্মুখীন ছিল। একদিকে সুলতান আল-কামিলের সঙ্গে তার ভাই মুয়াযযাম ও আশরাফের প্রচণ্ড বিরোধ চলছিল এবং একে কেন্দ্র করে পারস্পরিক লড়াইয়ের উপক্রম হয়েছিল, অপরদিকে বাইরে থেকে খোয়ারিজমিরাও আইয়ুবি সাম্রাজ্যের কাঁধে তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করেছিল। চেঙ্গিস খানের আগ্রাসনে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়া খোয়ারিজমিরা তখন ইস্পাহানে সমবেত হয়ে শক্তি সঞ্চয়ে সচেষ্ট ছিল এবং ধীরে ধীরে শাম ও ইরাকের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। দ্বিমুখী চাপে অস্থিরপ্রায় আইয়ুবি সুলতান

আল-কামিল যখন জানতে পারেন যে, নতুন বিপদরূপে জার্মানির সম্রাট ফ্রেডেরিক আবির্ভূত হতে যাচ্ছেন, তখন তিনি ফ্রেডেরিকের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করেন। ৬২৬ হিজরি সনের রবিউল আউয়াল মাসে (১২২৯ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে) সম্পাদিত চুক্তিটির শর্তের মধ্যে ছিল—আল-কামিল আল-কুদস, আক্কা ও জাফার নিয়ন্ত্রণ ফ্রেডেরিকের হাতে ছেড়ে দেবেন এবং বন্দি ক্রুসেডারদের মুক্তি দেবেন। অপরদিকে আল-কামিল যখন যার বিরুদ্ধে লড়াই করবেন—হোক সে খ্রিষ্টান—ফ্রেডেরিক তখন আল-কামিলকে সহায়তা করবেন এবং আগামী সাড়ে দশ বছর তিনি শামের ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দের কাছে যেকোনো ধরনের সামরিক সাহায্য পৌছতে বাধা প্রদান করবেন।

এভাবে জার্মানির রাজা ফ্রেডেরিক বিনা যুদ্ধেই আল-কুদসের কর্তৃত্ব লাভ করেন। নিঃসন্দেহে এটি ছিল আইয়ুবি সুলতান আল-কামিলের জীবনের অন্যতম গর্হিত অন্যায়। তার এই নির্বুদ্ধিতার কারণে মহাবীর সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি কর্তৃক পুনরুদ্ধারের মাত্র বিয়াল্লিশ বছর পর আল-কুদস আবারও চলে যায় ক্রুসেডারদের দখলে।

ষষ্ঠ ক্রুসেড-পরবর্তী সময়

ফ্রেডেরিকের সঙ্গে সমঝোতা করার পর সুলতান আল-কামিল তার পূর্ণ শক্তি ব্যয় করেন নিকটাত্মীয়দের কাছ থেকে তাদের শাসনাধীন অঞ্চল কেড়ে নেওয়ার কাজে। আইয়ুবি রাজপরিবারের সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করে তিনি পুরো অঞ্চল নিজের কর্তৃত্বে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। এ সময় প্রায় নয় বছর তিনি ক্রুসেডারদের সঙ্গে কোনো লড়াই করেননি। আল-কামিল মুহাম্মাদ তার শাসনামলের শেষ দিকে ৬৩৫ হিজরি সনে (১২৩৮ খ্রিষ্টাব্দে) দামেশক দখলের উদ্দেশ্যে অভিযানে বের হন এবং দামেশক জয় করেন। এ বিজয়ের কিছুদিন পরই তিনি ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুর পর আইয়ুবি সাম্রাজ্যের প্রশাসকদের পারস্পরিক সংঘাত আরও তীব্র আকার ধারণ করে।

আল-কামিলের মৃত্যুর পর তার পুত্র (২য় আদিল) সাইফুদ্দিন আবু বকর তার স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু তিনি শাসনকার্যে মনোযোগী হওয়ার পরিবর্তে ভোগবিলাসে মত্ত ছিলেন। ফলে প্রশাসকগণ মিলে দু-বছর পর ৬৩৭ হিজরি সনে (১২৪০ খ্রিষ্টাব্দে) তাকে অপসারণ করে।

এরপর আইয়ুবি সাম্রাজ্যের হাল ধরেন আল-কামিলের আরেক পুত্র আল-মালিকুস সালিহ আইয়ুব। তিনি ছিলেন আইয়ুবি সাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক। তিনি সব ধরনের ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা নির্মূল করে যথাযথভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।

সুলতান আল-মালিকুস সালিহ আইয়ুব নিজের ব্যক্তিগত নিরাপত্তাবিধান এবং আইয়ুবি সেনাবাহিনীর জন্য একটি বিশেষ ইউনিট গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৬৩৮ হিজরি সনে কায়রোর অদূরে নীল নদের রওজা দ্বীপে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং প্রচুর সংখ্যক তুর্কি মামলুক (ক্রীতদাস) ক্রয় করে সেখানে জড়ো করেন। সুলতান তাদের সঙ্গে দাসের মতো আচরণ করতেন না; বরং সন্তানের ন্যায় স্নেহ করতেন। সুলতানের তত্ত্বাবধানে প্রথমেই তাদের কুরআন-সুন্নাহ ও ফিকহের প্রাথমিক জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা করা হতো। এরপর তাদেরকে অশ্বারোহণ, তিরন্দাজি ও তরবারি চালনাসহ বিভিন্ন যুদ্ধবিদ্যার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো। পাশাপাশি তাদেরকে প্রদান করা হতো নেতৃত্ব, যুদ্ধ পরিচালনা, যুদ্ধের পরিকল্পনা প্রণয়ন, সামরিক সমস্যাবলির সমাধান ইত্যাদি বিষয়ের বাস্তব জ্ঞান। সুলতান নিজে যাবতীয় কর্মকাণ্ড তদারকি করতেন। মামলুকদের কেউ সামরিক বা ধর্মীয় বিষয়ে বিশেষ প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ ঘটালে তাকে পদোন্নতি দেওয়া হতো; ক্ষেত্রবিশেষে রাজ্যের কিছু এলাকার জায়গির প্রদান করা হতো। যোগ্যতা ও প্রতিভাবলে মামলুকদের অনেকেই সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অংশের সেনাপতি ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসকের দায়িত্বও লাভ করে। পরবর্তীকালে তারাই মামলুক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে এবং রওজা দ্বীপের প্রতি সম্বন্ধিত হয়ে 'বাহরি মামলুক' নামে পরিচিতি লাভ করে। সুলতান সালিহ আইয়ুবের প্রতি সম্বন্ধ করে তাদেরকে 'সালিহি মামলুক'ও বলা হয়।

দ্বিতীয়বার আল-কুদস পুনরুদ্ধার

সুলতান সালিহ আইয়ুব ৬৪২ হিজরি সনে (১২৪৪ খ্রিষ্টাব্দে) আল-কুদস পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে অভিযান পরিচালনার ঘোষণা দেন। তেরো হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে তিনি রওনা হন আল-কুদসের উদ্দেশে। সংবাদ পেয়ে শামের বিভিন্ন এলাকার ক্রুসেডাররা সমবেত হয়ে ব্যাপক সৈন্যসমাবেশ ঘটায়। পরিতাপের বিষয়, হিমস ও আলেপ্পোসহ শামের

বিভিন্ন এলাকার আইয়ুবি প্রশাসকগণও তাদের সমর্থন জানায় এবং আল-মালিকুস সালিহের বাহিনীর প্রতিরোধের লক্ষ্যে ক্রুসেডারদের সঙ্গে নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে জড়ো হয়! সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় বিশ হাজার। আল-কুদসের পথে গাজার নিকটে আল-মালিকুস সালিহের বাহিনী প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয় এবং তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। এরপর তারা সামনে অগ্রসর হয়ে আল-কুদস অবরোধ করে। মুসলিম বাহিনীর প্রবল আক্রমণে এগারো হাজার সৈন্যবিশিষ্ট আল-কুদসের স্থানীয় ক্রুসেডার বাহিনীর প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে; পনেরো বছর পর আবারও আল-কুদসে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে একটানা ছয়শ তিরানব্বই বছর পবিত্র আল-কুদস নগরী ইসলামি শাসনাধীন ছিল। ১৩৩৫ হিজরি সনে (১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে) ব্রিটিশ বাহিনী আল-কুদস দখল করে নেয় এবং পরবর্তী সময়ে ইহুদিদের হাতে তুলে দেয়। তারপর থেকে আল-কুদস আজও অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে আরেকজন আইয়ুবি বা আইয়ুবের প্রতীক্ষায়; যিনি হবেন আল-কুদসের তৃতীয় পুনরুদ্ধারকারী।

সপ্তম ক্রুসেড যুদ্ধ

[৬৪৭-৬৪৮ হিজরি/১২৪৯-১২৫০ খ্রিষ্টাব্দ]

৬৪২ হিজরি সনে (১২৪৪ খ্রিষ্টাব্দে) সুলতান আল-মালিকুস সালিহ আইয়ুবের হাতে আল-কুদসের কর্তৃত্ব হারানোর পর ইউরোপে নতুন করে ক্রুসেড যুদ্ধের আওয়াজ ওঠে। ফ্রান্সের রাজা ৯ম লুই (Louis IX of France) এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং ইউরোপজুড়ে ব্যাপক প্রচারণা চালান। তৎকালীন পোপ ৪র্থ ইনোসেন্ট (Pope Innocent IV) ১২৪৫ খ্রিষ্টাব্দে রাজা লুইকে সমর্থন জানান এবং অভিযানের সফলতার বিষয়ে ধর্মীয় নিশ্চয়তা প্রদান করেন। রাজা ৯ম লুই পরবর্তী তিন বছর অভিযানের প্রস্তুতিতে ব্যয় করেন। এ সময় তিনি তৎকালীন পরাশক্তি তাতারিদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনেরও চেষ্টা চালান। কিন্তু তাতারিরা নিজেদের মতো করে সাম্রাজ্য বিস্তারে আগ্রহী থাকায় তার এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

সুলতান সালিহ আইয়ুবের শাসনামলের শেষ দিকে ৬৪৬ হিজরি সনের জুমাদাল উলা মাসে (১২৪৮ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে) এক লক্ষের অধিক

সৈন্যের সুবিশাল ক্রুসেডার বাহিনী ফ্রান্সের রাজা ৯ম লুই-এর নেতৃত্বে আঠারোশ জাহাজে করে মিশর অভিমুখে রওনা হয়। যদিও ক্রুসেডার বাহিনীর মূল লক্ষ্য ছিল আল-কুদস পুনরুদ্ধার; কিন্তু তারা উপলব্ধি করেছিল যে, আল-কুদস ও শাম অঞ্চলে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হলে আগে মিশর অধিকার করতে হবে। মিশর দখল না করে আল-কুদস পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হলেও পূর্বের দু-বারের ন্যায় হয়তো তা আবারও হাতছাড়া হয়ে যাবে।

৬৪৭ হিজরি সনের ২২ সফর (১২৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ৬ জুন) ক্রুসেডার বাহিনী দিমইয়াতে অবতরণ করে এবং কয়েকদিনের প্রচণ্ড যুদ্ধের পর দিমইয়াতের দুর্গ দখল করে নেয়। দুর্গের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিল ক্ষুদ্র একটি বাহিনী। তারা দীর্ঘ সময় সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে প্রতিরোধ অব্যাহত রাখলেও কায়রো থেকে সামরিক সহায়তা না আসায় একসময় হাল ছেড়ে দিয়ে দুর্গ ত্যাগ করে।

আইয়ুবি সুলতান আল-মালিকুস সালিহ আইয়ুব তখন অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন। সুলতানের স্ত্রী শাজারাতুদ-দুর তৎক্ষণাৎ জাযিরা অঞ্চলে অবস্থানরত সুলতানের পুত্র তুরানশাহর কাছে বার্তা পাঠিয়ে তাকে দ্রুত মিশরে চলে আসতে বলেন। ১৫ শাবান (২৩ নভেম্বর) সুলতান আইয়ুব মৃত্যুবরণ করলে শাজারাতুদ-দুর তার মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখেন এবং সুলতানের নকল স্বাক্ষরের মাধ্যমে বিভিন্ন নির্দেশনা জারি রেখে সকলকে বোঝান যে, সুলতানই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি সেনাপতি ও রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সমবেত করে জানান যে, সুলতান তাদেরকে সুলতান-পুত্র তুরানশাহর নামে বায়আত গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে সকলে তুরানশাহর নামে বায়আত গ্রহণ করে।

দিমইয়াত দখলের প্রায় ছয় মাস পর ৬৪৭ হিজরি সনের শাবান মাসে (১২৪৯ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে) ক্রুসেডার বাহিনী মানসুরা নগরী অভিমুখে রওনা হয়। কিন্তু তারা ইতিপূর্বে আল-কামিলের যুগে যে ভুল করেছিল, এবারও সেই একই ভুল করে। তারা পূর্বের ন্যায় এবারও দিমইয়াত ও মানসুরা হয়ে কায়রো দখলের চেষ্টা করে। এ পথে তাদের অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে প্রচুর খাল, নদী ও শাখা নদী প্রতিবন্ধক হয়ে ছিল।

৬৪৭ হিজরি সনের ১৪ রমজান (১২৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর) ক্রুসেডার বাহিনী এসে পৌঁছায় আল-বাহরুস সগিরের তীরে। নদীর অপর তীরেই মানসুরা নগরী। এ সময় ক্রুসেডার বাহিনী নদী পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করলে অপর পারে অবস্থানরত আইয়ুবি বাহিনীর তীব্র তিরবৃষ্টির শিকার হয়। টানা কয়েক সপ্তাহ নদী পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে ক্রুসেডার বাহিনী যখন দিমইয়াতে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তখনই স্থানীয় জনৈক খ্রিষ্টান নাগরিকের মাধ্যমে তারা জানতে পারে, কয়েক মাইল দূরেই নদীর তুলনামূলক অপ্রশস্ত একটি জায়গায় পাড়ি দেওয়ার জন্য সাঁকোর ব্যবস্থা আছে। তৎক্ষণাৎ ক্রুসেডার বাহিনীর একটি অংশ রাজা ৯ম লুইয়ের ভাই রবার্টের নেতৃত্বে অত্যন্ত গোপনে মূল বাহিনী থেকে সরে পড়ে এবং নদী পাড়ি দিয়ে পেছন থেকে নদীর তীরে অবস্থানরত মুসলিম বাহিনীর ওপর হামলা চালায়। অল্প সময়ের মধ্যেই ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। সেদিন ছিল ৬৪৭ হিজরি সনের ৪ জিলকদ (১২৫০ খ্রিষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি)।

তুরানশাহ তখনও মিশরে এসে পৌঁছাননি। শাজারাতুদ-দুর তাই ক্রুসেডারদের মোকাবিলায় বিশেষ বাহরি মামলুক বাহিনীকে প্রেরণ করেন। বাহিনীটির প্রধান ছিলেন আয-যাহির বাইবার্স। মহান মুসলিম বীর বাইবার্সই পরবর্তী ইসলামি ইতিহাসের মহানায়ক। ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাসে যে চারজন সংগ্রামী মুসলিম বীরযোদ্ধা বিশেষ কর্ম-অবদানে চির স্মরণীয় হয়ে আছেন, তিনি তাদের চতুর্থজন। প্রথম তিনজন—ইমাদুদ্দিন জিনকি, নুরুদ্দিন জিনকি ও সালাহুদ্দিন আইয়ুবির কথা তো আগেই বলা হয়েছে। স্বভাবতই আমাদের পরবর্তী আলোচনা রুকনুদ্দিন বাইবার্সকে ঘিরেই আবর্তিত হবে।

বাইবার্স পথিমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন জায়গায় তার সৈন্যদের মোতায়েন করে মাত্র তিন হাজার সৈন্য নিয়ে রবার্টের বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। মামলুক বাহিনীর প্রবল আক্রমণে ক্রুসেডার বাহিনীটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। জীবিত দু-চারজন তাড়া খেয়ে নদীতে পড়ে গিয়ে প্রাণ হারায়।

এরই মধ্যে তুরানশাহ উপস্থিত হন এবং তার সৈন্যদের নিয়ে দিমইয়াত থেকে মানসুরা আসার পথের মাঝে অবস্থান নেন। ৬৪৭ হিজরি সনের ৯

জিলহজ (১২৫০ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ মার্চ) এ পথে ক্রুসেডার বাহিনীর জন্য রসদপত্র নিয়ে একটি নৌবহর এগিয়ে আসলে মিশরীয় নৌবাহিনী তাদের ওপর হামলা চালায়। এ সময় তারা প্রতিপক্ষের আশিটির অধিক জাহাজ আটক করতে সক্ষম হয়। ফলে ক্রুসেড শিবিরে প্রচণ্ড খাদ্যাভাব দেখা দেয়। ৬৪৮ হিজরি সনের ২ মুহাররম (১২৫০ খ্রিষ্টাব্দের ৬ এপ্রিল) তুরানশাহ তার বাহিনী নিয়ে ফারিসকুর নামক স্থানে ক্রুসেডারদের নৌবাহিনীর মোকাবিলা করেন এবং প্রচণ্ড যুদ্ধের পর তাদেরকে পরাজিত করেন। প্রায় পাঁচ হাজার ক্রুসেডার সৈন্য এ সময় নিহত হয়।

এদিকে রাজা ৯ম লুইয়ের নেতৃত্বে মূল ক্রুসেডার বাহিনী নদী পাড়ি দিয়ে বাইবার্সের বাহিনীর মুখোমুখি হয়। বাইবার্স তার ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়েই সুবিশাল ক্রুসেডার বাহিনীর মোকাবিলা করেন এবং বীরত্বের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করেন। মুসলিম বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে প্রায় ত্রিশ হাজার ক্রুসেডার সৈন্য নিহত হয়, নদীতে ডুবে মারা যায় প্রচুর সৈন্য। পরাজিত ক্রুসেডার বাহিনী পলায়ন করার সময় ৬৪৮ হিজরি সনের ২ মুহাররম (১২৫০ খ্রিষ্টাব্দের ৬ এপ্রিল) রাজা ৯ম লুইকে জীবিত অবস্থায় বন্দি করা হয়। এভাবে ক্রুসেডারদের সপ্তম অভিযানও পুরোপুরি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

মুসলিম শক্তির দিক থেকে বিবেচনা করলে বলতে হয়, সপ্তম ক্রুসেড অভিযানের পরই আইয়ুবি সালতানাতের পতন ঘটে এবং ইসলামি বিশ্বের নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয় মামলুক সাম্রাজ্য। পরবর্তী সময়ে কেবল ক্রুসেডারদের দমন নয়; সময়ের মূর্তিমান আতঙ্ক তাতারিদের দমনেও মামলুক সাম্রাজ্যের অসামান্য অবদান ছিল।

সপ্তম ক্রুসেড-পরবর্তী সময়

যুদ্ধ শেষে তুরানশাহ 'আল-মালিকুল মুয়াযযাম' উপাধি ধারণ করে আইয়ুবি সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তিনি চার লক্ষ দিনারের সমপরিমাণ অর্থ মুক্তিপণ ও দিময়িয়াতের নিয়ন্ত্রণ ফেরত লাভের বিনিময়ে রাজা লুইকে তার পরিজন ও অন্যান্য বন্দি সৈন্যসহ মুক্তি দিয়ে দেন।

এরপর সুলতান তুরানশাহ শাজারাতুদ-দুরের কাছে তার পিতার সম্পদ দাবি করেন এবং মামলুকদের বিভিন্নভাবে হুমকি প্রদান করেন। অবশেষে

মামলুকরা তুরানশাহকে দায়িত্ব গ্রহণের সত্তর দিনের মাথায় হত্যা করে এবং ৬৪৮ হিজরি সনের সফর মাসে 'উম্মে খলিল শাজারাতুদ-দুর'কে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে। ইতিপূর্বে কোনো নারী মুসলমানদের শাসনভার গ্রহণ করেনি। শাজারাতুদ-দুর অবশ্য কিছুদিন পরই নিজেকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নেন।

এরপর মামলুকরা আইয়ুবি পরিবারের জনৈক রাজপুত্র আল-আশরাফ মুসা বিন ইউসুফ বিন মাসউদ বিন আল-কামিলকে সুলতান পদে অধিষ্ঠিত করে। মাত্র আট বছর বয়সী অপ্রাপ্তবয়স্ক মুসার তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচন করা হয় সুলতান আল-মালিকুস সালিহ আইয়ুবের ক্রীতদাস ইযযুদ্দিন আইবেক তুর্কমানিকে। ইযযুদ্দিন শাজারাতুদ-দুরকে বিয়ে করেন এবং কিছুদিন না যেতেই মুসাকে অপসারণ করে নিজেই সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র ক্ষমতা অর্জন করেন। এর মাধ্যমে মিশরে আইয়ুবি সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং মামলুক সাম্রাজ্যের সূচনা হয়। শামে অবশ্য এরপরও কিছুদিন আইয়ুবি সাম্রাজ্য টিকে ছিল। পরবর্তীকালে শামকেন্দ্রিক আইয়ুবি রাষ্ট্র সীমিত স্বাধীনতাসহ মামলুকদের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়।

৬৫৫ হিজরি সনে (১২৫৭ খ্রিষ্টাব্দে) ইযযুদ্দিন আইবেক নিহত হন। কিছুদিন পর শাজারাতুদ-দুরকেও হত্যা করা হয়। এরপর ইযযুদ্দিন আইবেকের আগের স্ত্রীর পুত্র নুরুদ্দিন আলি 'আল-মালিকুল মানসুর' উপাধি ধারণ করে মিশরের শাসনভার গ্রহণ করেন। নুরুদ্দিনের বয়স তখন মাত্র এগারো! তাই সেনাপতি সাইফুদ্দিন কুতুজ তার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে থাকেন। তার শাসনামলেই ৬৫৬ হিজরি সনে সমকালীন মুসলিম উম্মাহর জীবনে এক বিরাট বিপর্যয় সংঘটিত হয়—তাতারিদের হাতে বাগদাদের পতন ঘটে এবং খিলাফতব্যবস্থার সমাপ্তি ঘটে। পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাইফুদ্দিন কুতুজ মিশরের আলিম-উলামা ও কাজিদেরকে সমবেত করেন। সকলে কিশোর সুলতানকে অপসারণ করে তাকে দায়িত্বগ্রহণের ফতোয়া প্রদান করে। অবশেষে ৬৫৭ হিজরি সনে সাইফুদ্দিন কুতুজ 'আল-মালিকুল মুযাফফার' উপাধি ধারণ করে মিশরের শাসনভার গ্রহণ করেন।

৬৫৮ হিজরিতে তাতারি নেতা হালাকু খান সাতদিন অবরোধের পর আলেপ্পোতে প্রবেশ করে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালান। আলেপ্পোতে

বাগদাদের চেয়েও অধিক সংখ্যক মানুষ হালাকুবাহিনীর নির্মম ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়। কেবল খ্রিষ্টান নাগরিকরাই গণহত্যা হতে রেহাই পায়। এ সময় তাতারিদের আগ্রাসনের সংবাদ পেয়ে পার্শ্ববর্তী হামা অঞ্চলের প্রশাসক ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং হালাকুবাহিনী সেদিকে অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই নগরদ্বারের চাবি হালাকু খানের কাছে পাঠিয়ে দেন।

৬৫৮ হিজরি সনের সফর মাসের শেষ দিকে (১২৬০ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে) হালাকুবাহিনী কোনোরূপ বাধা-বিপত্তি ছাড়াই দামেশকে প্রবেশ করে। দামেশকের দুর্ভেদ্য ও সুরক্ষিত দুর্গ জয় করার জন্য তাতারিরা উপর্যুপরি গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। একসময় দুর্গের অধিবাসীরা নতি স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করে। হালাকু খান ইবিল সিয়ান নামক জনৈক তাতারিকে দামেশক নগরী ও দুর্গের শাসনভার প্রদান করেন।

তৎকালীন ইসলামি প্রাচ্যের তিন বৃহৎ নগরী বাগদাদ, আলেপ্পো ও দামেশকে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালানোর পর তাতারিরা একে একে বালাবাক্কু, আজালুন (Ajloun), সাল্‌ত (Al-Salt), হাওরান (The Hauran), নাবলুস, গাজা, জেবরিন ও হেবরন (Hebron)-সহ পুরো শাম অঞ্চল দখল করে নেয় এবং প্রতিটি অঞ্চলে নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। শামে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর তাতারিরা এবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মামলুক নিয়ন্ত্রিত মিশরের প্রতি।

মিশরের সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ সার্বিক দিক বিবেচনা করে তাতারিরা মিশরে আগমনের পূর্বে নিজেই অগ্রসর হয়ে তাদের উপর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তার বাহিনী প্রস্তুত করে শাম অভিমুখে রওনা হন। সংবাদ পেয়ে হালাকু খানের প্রধান সহকারী কিতবুগার নেতৃত্বে বিশাল তাতারি বাহিনী কুতুজের বাহিনীর দফারফা করতে অগ্রসর হয়।

৬৫৮ হিজরি সনের রমজান মাসে (১২৬০ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে) আইনে জালুতের প্রান্তরে উভয় পক্ষের মধ্যে এক যুগান্তকারী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে তাতারি বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়, তাদের সেনাপতি কিতবুগা ও বহু সৈন্য নিহত হয়। সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ তার সেনাপতি রুকনুদ্দিন বাইবার্সকে পরাজিত

তাতারি বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দিলে তিনি সুদূর আলেপ্পো পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করেন।

আইনে জালুতে তাতারি বাহিনীর পরাজয়ের সংবাদ দামেশকে পৌঁছলে সেখানে অবস্থানরত তাতারিরাও পালিয়ে যায়। দামেশকের মুসলিম অধিবাসীগণ তাদের পিছু নিয়ে তাদেরকে হত্যা করে এবং তাদের হাতে বন্দি মুসলমানদের মুক্ত করে।

সেনাপতি রুকনুদ্দিন বাইবার্স শামের অধিকাংশ এলাকা আইয়ুবি পরিবারের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে মামলুক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হন। রুকনুদ্দিনের সাফল্যে খুশি হয়ে সুলতান কুতুজ তাকে আলেপ্পোর প্রশাসক নিযুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তিনি তার প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সক্ষম হননি। মিশরে ফেরার পর বাইবার্স তাকে হত্যা করে মামলুক সাম্রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৫৮৭] রুকনুদ্দিন বাইবার্সের দায়িত্বগ্রহণের মধ্য দিয়েই মূলত বাহরি মামলুক সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসনব্যবস্থার সূচনা হয়।

দায়িত্ব গ্রহণের পরই রুকনুদ্দিন বাইবার্স মামলুক সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা সুবিন্যস্তকরণ, সেনাবাহিনীর সংস্কার ও নৌবহর নির্মাণে কাজ শুরু করেন। এরপর তিনি শামের নিরাপত্তাব্যবস্থা দৃঢ়করণে মনোযোগ দেন এবং দামেশক ও কায়রোর মাঝে বার্তাবাহী কবুতরবিশিষ্ট দ্রুতগামী ডাকব্যবস্থার প্রচলন করেন। তিনি তাতারিদের আগ্রাসনের পর বাগদাদ থেকে পালিয়ে বেড়ানো জনৈক আব্বাসি রাজপুত্রকে মিশরে নিয়ে আসেন এবং তার হাতে খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করে ইসলামি খিলাফতব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করেন।

মামলুক সাম্রাজ্যকে তখন একই সঙ্গে তিন-তিনটি প্রবল শক্তিধর প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। এক দিকে ছিল ধেয়ে আসা তাতারিদের হুমকি, আরেক দিকে ছিল ক্রুসেডারদের অব্যাহত রাজ্যবিস্তৃতির প্রচেষ্টা। আর তৃতীয় শত্রু হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল শিয়া বাতিনি হাশাশিন গোষ্ঠী।

---

৫৮৭. এর কারণ সম্পর্কে জানতে দেখুন মাকতাবাতুল হাসান থেকে প্রকাশিত—*ইসলামি ইতিহাস সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড।

সুলতান বাইবার্স ৬৬১ হিজরি সনে (১২৬৩ খ্রিষ্টাব্দে) শামের ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ লড়াই শুরু করেন। প্রথমেই তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যভুক্ত খ্রিষ্টানদের তীর্থভূমি নাজারেথ (Nazareth) অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করেন এবং নগরীটি জয় করে নেন। এরপর তিনি রাজ্যটির রাজধানী আক্কা অভিমুখে অগ্রসর হন। আক্কার উপকণ্ঠে সংঘটিত এক প্রচণ্ড যুদ্ধে বাইবার্স বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজা ৩য় কনরাড (Conrad III)-কে পরাজিত করেন। পরাজিত কনরাড পালিয়ে আক্কার দুর্গে আশ্রয় নেন। সুলতান বাইবার্স কিছু সৈন্যকে আক্কা অবরোধে নিয়োজিত করে নিজে আরসুফ অভিমুখে রওনা হন। টানা চল্লিশ দিন অবরোধ করে রাখার পর আরসুফের ক্রুসেডার সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করে।

পরের বছর সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের আরেক দুর্ভেদ্য দুর্গ আতলিত (Athlith) অবরোধ করেন এবং যুদ্ধের মাধ্যমে জয় করে নেন। আতলিত বিজয়ের পর সুলতান বাইবার্স হাইফা অভিমুখে রওনা হন। হাইফা অবরোধ করার পর সুলতানের নির্দেশে মুসলিম সৈন্যরা নগরপ্রাচীর লক্ষ্য করে বিরামহীন পাথর ও গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। একপর্যায়ে নগরপ্রাচীর ভেঙে পড়লে মুসলিম বাহিনী হাইফায় প্রবেশ করে নগরীটি দখল করে নেয়।

৬৬৩ হিজরি সনে (১২৬৫ খ্রিষ্টাব্দে) বাইবার্সের নেতৃত্বে মামলুক বাহিনী কায়সারিয়া অবরোধ করে। নাইট হসপিটালারদের সঙ্গে নিয়ে ক্রুসেডার বাহিনী চল্লিশ দিন পর্যন্ত অবিচল থাকলেও একপর্যায়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। কায়সারিয়া জয়ের পর বাইবার্স তার অন্যতম সেনাপতি কালাউন ও আল-মানসুর আলিকে পাঠান আর্মেনীয় জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত কিলিকিয়া অঞ্চল জয়ের জন্য আর নিজে রওনা হন সাফাদ (Safad) নগরী জয়ের লক্ষ্যে।

কালাউন ও আল-মানসুর আলির নেতৃত্বে মামলুক বাহিনীর একটি অংশ ৬৬৪ হিজরি সনের (১২৬৬ খ্রিষ্টাব্দের) মধ্যে আদানা ও তারসুসসহ পুরো কিলিকিয়া অঞ্চল জয় করতে সক্ষম হয়। এদিকে সুলতান বাইবার্স নিজে বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যভুক্ত সাফাদ নগরী অবরোধ করেন। দুই হাজার নাইট টেম্পলারের উপস্থিতি সত্ত্বেও ভীত ক্রুসেডাররা আত্মসমর্পণ

করে সাফাদ নগরীর নিয়ন্ত্রণ বাইবার্সের হাতে তুলে দেয়। এরপর বাইবার্স একে একে আসকালান ও জাফাও জয় করেন। এর ফলে শামের পুরো উপকূলীয় অঞ্চল মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে আর বাইতুল মুকাদ্দাস ক্রুসেড রাজ্য সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে কেবল আক্কা নগরীতে।

বাইতুল মুকাদ্দাস ক্রুসেড রাজ্যের দফারফা করে সুলতান বাইবার্স এবার নজর দেন আরেক ক্রুসেড রাজ্য এন্টিয়কের প্রতি। ৬৬৬ হিজরি সনে (১২৬৮ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি এন্টিয়ক অবরোধ করেন। দীর্ঘ অবরোধের পর ৬৬৬ হিজরি সনের ৪ রমজান (১২৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ মে) এন্টিয়কের সাধারণ জনগণ আত্মসমর্পণ করলে এন্টিয়কের পতন ঘটে। নগরীর নিরাপত্তায় নিয়োজিত দশ হাজার ক্রুসেডার সৈন্য আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতি জানিয়ে দুর্গে আশ্রয় নিলে মামলুক বাহিনী আক্রমণ চালিয়ে ২০ মে তাদেরকেও পরাভূত করে। ১০৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ৩ জুন প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধের শুরুর দিকে পতন ঘটেছিল ঐতিহ্যবাহী এন্টিয়ক নগরীর। দীর্ঘ একশ সত্তর বছর পর অবশেষে পুনরায় সেখানে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকে নিয়ে এখনও পর্যন্ত এন্টিয়ক মুসলমানদের অধিকারে আছে।

অষ্টম ক্রুসেড যুদ্ধ

[৬৬৮-৬৬৯ হিজরি/১২৬৯-১২৭০ খ্রিষ্টাব্দ]

এন্টিয়কের পতন যেন ছিল ইসলামি প্রাচ্যে ক্রুসেডারদের চূড়ান্ত পতনধ্বনি। এডেসা রাজ্যের তো আগেই পতন ঘটেছে, মামলুক ঝড়ে এন্টিয়ক ক্রুসেড রাজ্যও হারিয়ে গেছে বিশ্ব মানচিত্র থেকে। বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্য সীমিত হয়ে পড়েছে আক্কা নগরীতে। তুলনামূলক ক্ষুদ্র ত্রিপোলি ক্রুসেড রাজ্য লেবানন অঞ্চলের সামান্য অংশ নিয়ে কোনোমতে টিকে আছে। স্বভাবতই এতে ইউরোপ প্রবলভাবে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। তৎকালীন পোপ ৪র্থ ক্লেমন্ত (Pope Clement IV) তাই নতুন করে ক্রুসেড যুদ্ধের ডাক দেন।

পোপের আহ্বানে ইউরোপজুড়ে প্রস্তুতি শুরু হয়। অভিযানে অংশ নিতে সম্মতি জানান ইংল্যান্ডের যুবরাজ অ্যাডওয়ার্ড, সাইপ্রাসের রাজা ৩য় হিউ (Hugh III of Cyprus) এবং সপ্তম ক্রুসেডের সর্বাধিনায়ক ফ্রান্সের রাজা ৯ম লুই। তাদের সঙ্গে আরও যোগ দেন তাতারি রাজ্য ইলখানাতের শাসক ও হালাকু খানের পুত্র আবাগা খান। সিদ্ধান্ত হয়, রাজা ৯ম লুই

মামলুক সাম্রাজ্যের পশ্চিম কোণ তিউনিসিয়ায় ঘাঁটি স্থাপন করে একে একে (লিবিয়ার) ত্রিপোলি ও কায়রো দখল করে নেবেন, এরপর সরাসরি আল-কুদস অভিমুখে অগ্রসর হবেন; অ্যাডওয়ার্ড ও হিউ নৌপথে আক্কায় পৌঁছে আল-কুদসে হামলা চালাবেন আর আবাগা খান মামলুক সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করে একে একে আলেপ্পো ও দামেশক দখল করে নেবেন, এরপর ফ্রান্স-ইংল্যান্ড-সাইপ্রাস বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে আল-কুদস দখল করবেন।

এদিকে এন্টিয়ক রাজ্যের দফারফা করার পর রুকনুদ্দিন বাইবার্স কায়রোতে ফিরে যান। কিছুদিন পর তিনি আবারও শাম অঞ্চলে অভিযান চালান। এবার তিনি আক্রমণ করেন শামের নাসিরিয়া পার্বত্যাঞ্চলে অবস্থিত শিয়া বাতিনি রাজ্য মাসইয়াফে। ৬৫৪ হিজরি সনে (১২৫৬ খ্রিষ্টাব্দে) পারস্যের বাতিনি হাশাশিন রাজ্যের পতন ঘটলেও শামের বাতিনি রাজ্যটি তখনও টিকে ছিল। পূর্বে নাসিরিয়া পর্বতমালা হতে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত এবং উত্তরে এন্টিয়ক রাজ্যসীমা হতে দক্ষিণে ত্রিপোলি রাজ্যসীমা পর্যন্ত ছিল বাতিনি হাশাশিন গোষ্ঠীর রাজ্যবিস্তৃতি। রাজ্যজুড়ে ছিল দুর্ভেদ্য উনিশটি দুর্গ। বাইবার্স তার বাহিনীকে অনেকগুলো ভাগে বিভক্ত করে প্রতিটি দুর্গকে তিনদিক থেকে অবরুদ্ধ করে ফেলেন। খোলা থাকে কেবল পশ্চিমে সাগরের দিক। সুকঠিন অবরোধ ও অনবরত গোলা নিক্ষেপের মাধ্যমে সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স এক বছরের মধ্যে একে একে সবগুলো দুর্গের পতন ঘটাতে সক্ষম হন। এর ফলে পৃথিবী শিয়া বাতিনি গোষ্ঠীর বর্বরতা থেকে চিরতরে নিষ্কৃতি লাভ করে।

রাজা ৯ম লুই ফরাসি বাহিনীর সঙ্গে ইতালির নেপলস ও আন্দালুসের খ্রিষ্টরাজ্য নাফারের সহায়ক বাহিনী নিয়ে ৬৬৮ হিজরি সনের জিলকদ মাসে (১২৭০ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে) তিউনিসিয়ার কার্থেজ (Carthage) নগরীর উপকূলে পৌঁছান। তিউনিসিয়ার তৎকালীন শাসকপরিবার বনু হাফস মুসলমান হলেও ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের সঙ্গে মিত্রতা বজায় রেখে চলত। কিন্তু তিউনিসিয়ায় পৌঁছেই ক্রুসেডার বাহিনী মহামারির শিকার হয় এবং অনেক সৈন্য আমাশয়ে আক্রান্ত হয়ে ইহধাম ত্যাগ করে। খোদ রাজা লুই-ও ২৫ আগস্ট মারা যান। তখন বাকিরা সামনে অগ্রসর না হয়ে সেখান থেকেই নিজ নিজ দেশে ফিরে যায়। এ সংবাদ জানতে পেরে

অ্যাডওয়ার্ড ও হিউয়ের নেতৃত্বাধীন ইংল্যান্ড ও সাইপ্রাসের বাহিনী এবং আবাগা খানের নেতৃত্বাধীন তাতারি বাহিনীও অভিযানের চিন্তা বাদ দেয়। এভাবে অষ্টম ক্রুসেডও পুরোপুরি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

শাম অঞ্চলে বাতিনি রাজ্যের অবরোধে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় বাইবার্স ক্রুসেডারদের সংগঠিত হওয়ার সংবাদ জানতে পেরে দ্রুত কায়রোতে ফিরে এসেছিলেন। ক্রুসেডারদের প্রস্থানের পর তিনি পুনরায় শাম অঞ্চলে ফিরে যান। ১২৭১ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতে তিনি জয় করেন ত্রিপোলি রাজ্যের অধীনস্থ বুর্জ সাফিতা (Chastel Blanc)। এরপর তিনি অবরোধ করেন ত্রিপোলি নগরী।

নবম ক্রুসেড যুদ্ধ

[৬৭০ হিজরি/১২৭১-১২৭২ খ্রিষ্টাব্দ]

ত্রিপোলি অবরোধের সংবাদ জানতে পেরে ইউরোপের টনক নড়ে ওঠে। আল-কুদস, এডেসা, এন্টিয়ক সবই হাতছাড়া হয়ে গেছে। এখন যদি ত্রিপোলি ও আক্কারও পতন ঘটে, তাহলে ইসলামি প্রাচ্য থেকে ক্রুসেডারদের পাততাড়ি গুটাতে হবে। তাতারিদের সহায়তায় এবার ঘোষিত হয় নবম ক্রুসেড।

অষ্টম ক্রুসেডের মতো এবারও অভিযানে যোগ দেয় ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, সাইপ্রাস ও তাতারি রাজ্য ইলখানাত। আবাগা খান অবশ্য এবার নিজে না এসে তার বিশেষ সেনাপতি সামাগার (Samagar)-কে প্রেরণ করেন। পরিকল্পনা করা হয়, ইউরোপীয় ক্রুসেডাররা রুকনুদ্দিন বাইবার্সকে যুদ্ধে ব্যস্ত রাখবে, এ ফাঁকে তাতারি বাহিনী শামের বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে নেবে।

৬৭০ হিজরি সনের রবিউল আউয়াল মাসে (১২৭১ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে) সামাগারের নেতৃত্বে ত্রিশ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী উত্তর দিক থেকে মামলুক সাম্রাজ্যে পা রাখে। প্রথমে তারা আলেপ্পোতে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, এরপর একে একে হামলা চালায় মাআ'ররাতুন-নোমান ও আফামিয়া নগরীতে। সংবাদ পেয়ে সুলতান বাইবার্স অল্প কিছু সৈন্যকে ত্রিপোলিতে রেখে বাকিদেরকে নিয়ে দ্রুত আফামিয়া অভিমুখে রওনা হন। বাইবার্সের রওনা হওয়ার সংবাদ পেয়েই তাতারি বাহিনী ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে শুরু করে। বাইবার্স দ্রুত গতিতে তাদের ধাওয়া করে তার

রাজ্যের সীমান্ত খাবুর নদী পর্যন্ত পৌঁছে যান। কিন্তু তার আগেই তারা পালিয়ে ইলখানাত রাজ্যে চলে যায়।

বাইবার্স যখন তাতারিদের তাড়া করে রাজ্যের উত্তর সীমান্তে পৌঁছে গেছেন, ওদিক থেকে ইউরোপীয় ক্রুসেডাররা তখন ফিলিস্তিন অঞ্চলে হামলা চালায়। মামলুক বাহিনী অন্যদিকে ব্যস্ত থাকায় ইংল্যান্ডের যুবরাজ অ্যাডওয়ার্ডের নেতৃত্বে ক্রুসেডার বাহিনী অনেকটা বিনা যুদ্ধে একে একে মন্টফোর্ট দুর্গ (Montfort Castle), নাজারেথ নগরী ও কাকুন দুর্গ দখল করে নেয়।

সংবাদ পেয়ে কালবিলম্ব না করে সুলতান বাইবার্স আবার ছোটেন শামের দক্ষিণ প্রান্তে। মাত্র বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি আক্কায় পৌঁছান বত্রিশ হাজার সৈন্যবিশিষ্ট ক্রুসেডার বাহিনীর মোকাবিলা করতে। বাইবার্সের আগমনে অ্যাডওয়ার্ডের যুদ্ধস্পৃহা মুহূর্তেই উবে যায়। তিনি বাইবার্সের কাছে দূত প্রেরণ করে সন্ধির আবেদন জানান! ৬৭০ হিজরি সনের শাওয়াল মাসে (১২৭২ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে) উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 'কায়সারিয়া চুক্তি' নামে খ্যাত দশ বছর দশ মাস দশ দিন মেয়াদি চুক্তিটির ধারাগুলো হলো—

- মন্টফোর্ট, নাজারেথ ও কাকুন দুর্গের অধিকার মুসলমানরা ফেরত পাবে।
- এসব এলাকার যেসব মুসলিম নাগরিককে হত্যা করা হয়েছে, তাদের পরিবারকে নিহত প্রত্যেক ব্যক্তির বিপরীতে প্রতিবছর তিনশ ষাট দিরহাম প্রদান করতে হবে। এই ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে বাইতুল মুকাদ্দাস ও ত্রিপোলি রাজ্য।
- খ্রিষ্টানরা তীর্থযাত্রার জন্য আল-কুদসে আগমন করলে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করতে হবে।
- তীর্থযাত্রীরা ইসলামি ভূখণ্ডে ধর্মপ্রচার করতে পারবে না, ভূমি ক্রয় করতে পারবে না, ইসলামি ভূখণ্ডের কোনো খ্রিষ্টান নাগরিকের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না এবং তীর্থযাত্রার আগে-পরে মিলিয়ে অতিরিক্ত দুদিনের বেশি অবস্থান করতে পারবে না।

এভাবে নবম ক্রুসেডও পুরোপুরি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যুদ্ধ না করে অবমাননাকর সন্ধিচুক্তি মেনে নিয়েই ক্রুসেডাররা ফিরে যায় নিজ নিজ দেশে।

নবম ক্রুসেড-পরবর্তী সময়

৬৭৬ হিজরি সনের ২৭ মুহাররম (১২৭৭ খ্রিষ্টাব্দের ১ জুলাই) সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স ইন্তেকাল করেন। এরপর মামলুক সাম্রাজ্যের ক্ষমতা নিয়ে সংঘাত শুরু হয় এবং বাইবার্সের দুই পুত্র আস-সাইদ নাসিরুদ্দিন ও আল-আদিল বদরুদ্দিন একের পর এক শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তাদের কারও শাসনামলই দীর্ঘায়িত হয়নি। অবশেষে ৬৭৮ হিজরি সনে (১২৭৯ খ্রিষ্টাব্দে) মামলুক সাম্রাজ্যের হাল ধরেন আল-মালিকুল মানসুর সাইফুদ্দিন কালাউন। তিনি ৬৮৮ হিজরি সনের রবিউল আউয়াল মাসের শুরুতে ত্রিপোলি অবরোধ করেন। মাসখানেক পর ৪ রবিউস সানি (১২৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ এপ্রিল) মামলুক বাহিনী চূড়ান্ত হামলা চালিয়ে ত্রিপোলিতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ৫০৩ হিজরি সনের ১১ জিলহজ ক্রুসেডাররা ত্রিপোলি দখল করে নিয়েছিল। দীর্ঘ একশ পঁচাশি বছর পর পুনরায় তা মুসলমানদের হাতে আসে।

ত্রিপোলির পতনের পর ইসলামি প্রাচ্যে ক্রুসেডারদের দখলে অবশিষ্ট থাকে সুর, আক্কা ও বৈরুত নগরী। ৬৮৯ হিজরি সনে সুলতান কালাউন আক্কায় অভিযান পরিচালনার প্রস্তুতি নেন। কিন্তু অভিযানে রওনা হওয়ার পূর্বেই ৬৮৯ হিজরি সনের জিলকদ মাসে (১২৯০ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে) তিনি ইন্তেকাল করেন।

সুলতান কালাউনের ইন্তেকালের পর তার পুত্র আল-আশরাফ সালাহুদ্দিন খলিল তার স্থলাভিষিক্ত হন। দুঃসাহসী বীরযোদ্ধা সুলতান খলিল ৬৯০ হিজরি সনের জুমাদাল উখরা মাসে (১২৯১ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে) প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধের পর আক্কা নগরী জয় করেন। আক্কার পতনের পর সুর, সিডন ও বৈরুতসহ একে একে শাম অঞ্চলের অবশিষ্ট খ্রিষ্টান নগরীগুলোরও পতন ঘটে এবং শামে ক্রুসেড রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে। জীবিত ক্রুসেডাররা শাম থেকে পালিয়ে আর্মেনিয়া ও সাইপ্রাসে আশ্রয় নেয়।

আল-কুদস ও শামের বিভিন্ন অঞ্চল জয়ের পর ক্রুসেডাররা দামেশকসহ অবশিষ্ট শাম এবং তারপর মিশর জয়েরও স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু তাদের স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত করতে ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ. এক অব্যাহত জিহাদের ধারা শুরু করেছিলেন। তার সুযোগ্য উত্তরসূরি নুরুদ্দিন জিনকি সে ধারাকে আরও বেগবান করেন আর সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ. পবিত্র নগরী আল-কুদস পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে তাকে চূড়ান্ত লক্ষ্যপানে এগিয়ে নেন। অবশেষে ক্রুসেডার বিতাড়নের এই মহান পদক্ষেপের পরিসমাপ্তি ঘটে মামলুক সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স, সাইফুদ্দিন কালাউন ও আল-আশরাফ খলিলের হাত ধরে।

নবম ক্রুসেডই ছিল সর্বশেষ ক্রুসেড। এরপর আর কখনো ইউরোপীয় ক্রুসেডাররা ঘোষণা দিয়ে আল-কুদস জয়ের চেষ্টা করেনি। অবশ্য (৯ম ক্রুসেড যুদ্ধের পরাজিত সেনাপতি) ইংল্যান্ডের রাজা ১ম অ্যাডওয়ার্ডের অনুরোধে ১২৭৪ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন পোপ ১০ম গ্রেগরি (Pope Gregory X) দশম ক্রুসেডের ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু মহান মুসলিম বীর রুকনুদ্দিন বাইবার্সের আতঙ্কে ভীত-সন্ত্রস্ত ইউরোপের রাজন্যবর্গ কেউ এই আহ্বানে সাড়া না দেওয়ায় তার প্রচেষ্টা আলোর মুখ দেখেনি। ফলে ৪৮৮ হিজরি সনে (১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দে) 'ক্রুসেড যুদ্ধ' নামে ইউরোপীয় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও শাসকগোষ্ঠীর যে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন শুরু হয়, প্রায় দুই শতাব্দী পর ৬৭০ হিজরি সনে (১২৭২ খ্রিষ্টাব্দে) তার অবসান ঘটে।

কিন্তু ক্রুসেড ঘোষিত না হলেও ক্রুসেড আগ্রাসন কি শেষ হয়ে গেছে?! হিজরি দশম শতকে (খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে) স্পেন ও পর্তুগালের উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলে উপর্যুপরি আক্রমণ, পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ ও ফরাসিদের দীর্ঘ সাম্রাজ্যবাদী অভিযান, নিকট অতীতে ১৪১২ হিজরি সনে (১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে) বসনিয়ায় সার্বদের নির্মম গণহত্যা, ১৪২১ হিজরি সনে (২০০১ খ্রিষ্টাব্দে) আফগানিস্তানে ও ১৪২২ হিজরি সনে (২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে) ইরাকে আমেরিকার আক্রমণ—এ সবই তো একেকটি অঘোষিত ক্রুসেডের উদাহরণ! আর সমরাঙ্গনের বাইরে বুদ্ধিবৃত্তিক বিভিন্ন অঙ্গনে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে পরাভূত করতে পশ্চিমাদের যে অব্যাহত প্রচেষ্টা, তাও কী যুগচাহিদার প্রেক্ষিতে ভিন্নধর্মী ক্রুসেডের উদাহরণ নয়?! ইরাকে হামলা চালানোর সময় যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বুশ স্বেচ্ছায় বা মুখ ফসকে যা কিছু

বলেছেন, তার চেয়ে পরিষ্কার করে আর কিছু কি বলা যায়!

প্রশ্ন হলো, সমকালীন মুসলিম উম্মাহ তার কথার মর্ম বুঝতে পেরেছে, নাকি দিবানিদ্রায় মগ্ন থেকে স্বপ্ন দেখছে আরেকজন ইমাদুদ্দিন, নুরুদ্দিন, সালাহুদ্দিন বা রুকনুদ্দিনের আগমনের?!

এ প্রশ্নের উত্তরও ইতিহাসের কাছেই তোলা থাক! ইতিহাসেই তো লুকিয়ে আছে আগামীর পদচিত্র।

* * *

নির্ঘণ্ট-১

অঞ্চল-পরিচিতি

স্থান	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর	টীকা নম্বর
এশিয়া মাইনর অঞ্চল	১	২৩	৫
শাম অঞ্চল	১	২৩	৫
ফিলিস্তিন অঞ্চল	১	২৪	৫
আ'মাক	১	২৮	৭
দাবিক	১	২৮	৭
সিসিলি	১	৩৫	৯
মাগরিব	১	৩৭	১০
আল-মাগরিবুল আদনা (নিকট-মাগরিব অঞ্চল)	১	৩৭	১০
আল-মাগরিবুল আওসাত (মধ্য-মাগরিব অঞ্চল)	১	৩৭	১০
আল-মাগরিবুল আকছা (দূর-মাগরিব অঞ্চল)	১	৩৭	১০
রোমান সাম্রাজ্য	১	৩৯-৪১	১১
হাবশা (আবিসিনিয়া)	১	৪১	১২
বুছরা ও বসরা	১	৪৩	১৭
ইসলামি প্রাচ্য	১	৪৭	৩১
ইসলামি প্রতীচ্য	১	৪৭	৩১
যিবাত্‌রা	১	৪৮-৪৯	৩৫
জাযিরা অঞ্চল (আপার-মেসোপটেমিয়া)	১	৫০	৩৮

স্থান	খণ্ড	পৃষ্ঠা নম্বর	টীকা নম্বর
এন্টিয়ক	১	৫০	৩৯
আলেপ্পো	১	৫২	৪৪
মাওয়ারাউন নাহার (ট্রান্স অক্সিয়ানা)	১	৬৫	৬৩
আরবি ইরাক	১	৬৭	৬৮
আজমি ইরাক	১	৬৭	৬৮
তারাবলুস (ত্রিপোলি)	১	৭০	৭২
এডেসা	১	৭২	৭৯
জেনোভা ও জেনেভা	১	৯১	১০৮
ক্লেরমন্ট	১	১০৫	১৩৮
নিকিয়া	১	১৪৯	২৩৬
কোনিয়া	১	১৫৯	২৫৬
তারসুস ও তারতুস	১	১৬৬	২৬৮
প্রাচীন বিশ্ব ও আধুনিক বিশ্ব	১	১৭৭	২৯৪
বারা	১	১৮৭	৩১৯
আরসুফ	১	২৩৩	৪২৬
জাযিরা ইবনে উমর	২	১৬৬	২৫৮

* * *

নির্ঘণ্ট-২

সংক্ষিপ্ত ব্যক্তি-পরিচিতি

মুসলিম শিবির

সুলায়মান বিন কুতুলমিশ : এশিয়া মাইনর অঞ্চলে রোমান সেলজুক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ক্রুসেড-যুগ পাননি। ৪৭৮ হিজরি সনে (১০৮৬ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি তুতুশ বিন আলপ আরসালানের হাতে নিহত হন।

১ম কিলিজ আরসালান : সুলায়মান বিন কুতুলমিশের পুত্র ও পরবর্তী রোমান সেলজুক শাসক। ক্রুসেড আগ্রাসনের প্রথম ঝড় তার ওপর দিয়েই যায় এবং ক্রুসেডারদের হাতে তিনি তার রাজধানী নিকিয়া নগরীসহ রাজ্যের বৃহৎ অংশ হারান। অবশ্য পরবর্তীকালে ৪৯৪ হিজরি সনে (১১০১ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি ইউরোপ থেকে আগত সহায়ক ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে স্মরণীয় বিজয় অর্জন করেন। ৫০০ হিজরি সনে (১১০৬ খ্রিষ্টাব্দে) মসুলকে নিজ রাজ্যভুক্ত করতে গিয়ে তিনি নিহত হন।

গাজি কুমুশতেগিন বিন দানিশমান্দ : এশিয়া মাইনর অঞ্চলের দানিশমান্দ রাজ্যের শাসক। ক্রুসেড অভিযানের পুরোটা সময় কিলিজ আরসালানের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে থেকে ক্রুসেডারদের অগ্রযাত্রার পথ সুগম করেন। পরবর্তী সময়ে শক্তিশালী ক্রুসেডার নেতা বোহেমন্ডকে বন্দি করতে সমর্থ হলেও অর্থের বিনিময়ে তাকে ছেড়ে দেন। অবশ্য ৪৯৪ হিজরি সনে (১১০১ খ্রিষ্টাব্দে) কিলিজ আরসালানের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করেন। মারা যান ১১০৪ খ্রিষ্টাব্দে।

তুতুশ বিন আলপ আরসালান : বিখ্যাত সেলজুক শাসক আলপ আরসালানের পুত্র ও শামকেন্দ্রিক সেলজুক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। চরিত্রের দিক থেকে ছিলেন পিতার সম্পূর্ণ বিপরীত। ক্রুসেড আগ্রাসন শুরুর পূর্বেই ৪৮৭ হিজরি সনে (১০৯৪ খ্রিষ্টাব্দে) ভ্রাতুষ্পুত্র বারকিয়ারুকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে নিহত হন।

রিজওয়ান বিন তুতুশ : তুতুশের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর শামের সেলজুক রাষ্ট্রের আলেপ্পো অংশের শাসনভার লাভ করেন। প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধ ও যুদ্ধপরবর্তী সময়ে তার আচরণ ছিল সম্পূর্ণ নেতিবাচক। ক্রুসেডারদের তিনি প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেন এবং ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করেন। ৫০৭ হিজরি সনে (১১১৩ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

দাক্কাক বিন তুতুশ : তুতুশের আরেক পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর শামের সেলজুক রাষ্ট্রের দামেশক অংশের শাসনভার লাভ করেন। ক্রুসেড অভিযান চলাকালে অধিকাংশ সময় সংগ্রামী ভূমিকা পালনের পরিবর্তে ভাই রিজওয়ানের মতোই নেতিবাচক ভূমিকা পালন করেন। মৃত্যুবরণ করেন ৪৯৬ হিজরি সনে (১১০৩ খ্রিষ্টাব্দে)। শাসনকালের পুরো সময় তিনি ভাইয়ের সঙ্গেও সংঘাতে জড়িয়ে ছিলেন।

তুগতেকিন : তুতুশের মুক্ত ক্রীতদাস এবং তুতুশ-পুত্র দাক্কাকের রাজশিক্ষক। দাক্কাকের মৃত্যুর পর তিনি দামেশকের শাসনভার গ্রহণ করেন। শাসনকালে তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে একাধিকবার লড়াই করেন, আবার ক্ষেত্রবিশেষে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা বিনিময়ও করেন। পঁচিশ বছর দামেশক শাসন করার পর ৫২২ হিজরি সনে তিনি ইন্তেকাল করেন।

আবু আলি বিন আম্মার : ত্রিপোলির নগরীর শিয়া প্রশাসক। ক্রুসেডারদের আগ্রাসনের মুখেও দীর্ঘদিন তাদের সঙ্গে মিত্রতা বজায় রেখে নিজ রাজ্য টিকিয়ে রেখেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ৫০৩ হিজরি সনে (১১০৯ খ্রিষ্টাব্দে) ক্রুসেডারদের কাছে রাজ্য হারান।

১ম মালিকশাহ : আলপ আরসালানের পুত্র। বৃহত্তর সেলজুক সাম্রাজ্যের মহান শাসক। ক্রুসেড আগ্রাসন শুরু হওয়ার কয়েক বছর পূর্বে ৪৮৪ হিজরি সনে (১০৯২ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

বারকিয়ারুক : ১ম মালিকশাহর পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর বৃহত্তর সেলজুক সাম্রাজ্যের হাল ধরেন। তার শাসনমালেই ইসলামি ভূখণ্ডে ক্রুসেডারদের আগ্রাসন শুরু হয়। তিনি এ সময় ক্রুসেডারদের মোকাবিলায় তার অধীনস্থ মসুলের প্রশাসক কারবুগার নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করলেও

বাহিনীটি পরাজিত হয়। ভাই ও চাচাতো ভাইদের সঙ্গে অব্যাহত সংঘাতের কারণে তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হননি। মৃত্যুবরণ করেন মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে ৪৯৮ হিজরি সনে (১১০৪ খ্রিষ্টাব্দে)।

সুলতান মুহাম্মাদ : মালিকশাহর আরেক পুত্র। ভাইদের মৃত্যুর পর পুরো বৃহত্তর সেলজুক সাম্রাজ্যের দায়িত্ব লাভ করেন। আপন শাসনমালে তিনি একাধিকবার ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বাহিনী প্রেরণ করলেও সামগ্রিক বিচারে এ বিষয়ে পূর্ণ আন্তরিক ছিলেন না। ১১১৮ খ্রিষ্টাব্দে সাইত্রিশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

সুলতান মাহমুদ : সুলতান মুহাম্মাদের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে বৃহত্তর সেলজুক সাম্রাজ্যের হাল ধরেন। দুই ভাই মাসউদ ও তুগরল এবং চাচা সানজারের বিরোধের কারণে নির্ঝঞ্ঝাট রাজ্যশাসন করতে পারেননি। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণে যথেষ্ট আন্তরিক ছিলেন। তিনিই ইমাদুদ্দিন জিনকিকে মসুলের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। ৫২৫ হিজরি সনে (১১৩১ খ্রিষ্টাব্দে) মাত্র সাতাশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

মাসউদ, তুগরল ও সেলজুকশাহ : সুলতান মাহমুদের তিন ভাই। মাহমুদের মৃত্যুর পর তারা বৃহত্তর সেলজুক রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা নিয়ে দীর্ঘ সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মাসউদ এই সংঘাতে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেন এবং দীর্ঘ সময় বৃহত্তর সেলজুক রাষ্ট্র শাসন করেন।

সুকমান বিন উরতুক : উরতুক রাজপরিবারের প্রধান পুরুষ উরতুক তুর্কমানির পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর প্রথমে তুতুশ ও দাক্কাকের অধীনে বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। ৪৯১ হিজরি সনে (১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দে) উবায়দিরা বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করে নিলে তিনি উত্তর ইরাকের দিয়ারে বকর অঞ্চলে পৌঁছে সেখানে হাসানকেইফকেন্দ্রিক একটি ইসলামি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বালিখের যুদ্ধসহ একাধিক রণক্ষেত্রে তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী ভূমিকা রাখেন। ৪৯৮ হিজরি সনে (১১০৫ খ্রিষ্টাব্দে) ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে এক অভিযানে রওনা হয়ে পথিমধ্যে তিনি ইন্তেকাল করেন।

ইলগাজি বিন উরতুক : সুকমান বিন উরতুকের ভাই ও মারদিনের আমির। বালাতের যুদ্ধে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে স্মরণীয় বিজয় লাভ করেন। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকবার অভিযান পরিচালনা করেন এবং জয়-পরাজয় উভয় ধরনের ফলাফল লাভ করেন। ৫১৬ হিজরি সনে (১১২৩ খ্রিষ্টাব্দে) ইন্তেকাল করেন।

বালক বিন বাহরাম বিন উরতুক : সুকমান ও ইলগাজির ভ্রাতুষ্পুত্র। খারতাবিরত নগরীর প্রশাসক ছিলেন। ৫১৬ হিজরি সনে (১১২২ খ্রিষ্টাব্দে) মাত্র চারশ সৈন্য নিয়ে এডেসার ক্রুসেডার বাহিনীকে পরাজিত করেন এবং এডেসার শাসক জোসেলিনকে বন্দি করেন। এর সাত মাস পর আরেক যুদ্ধে ক্রুসেডারদের পরাজিত করে তিনি বন্দি করেন বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজা ২য় বল্ডউইনকে। মহান এই মুজাহিদ এর বছরখানেক পর ৫১৮ হিজরি সনে (১১২৪ খ্রিষ্টাব্দে) ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে এক অভিযান চলাকালে অজ্ঞাত উৎস হতে নিক্ষিপ্ত লক্ষ্যহীন তিরের আঘাতে শহিদ হন।

হুসামুদ্দিন তামারতাশ : ইলগাজির পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর মারদিন ও দিয়ারে বকরের দক্ষিণ অংশের শাসনভার লাভ করেন। বিলাসী ও আরামপ্রিয় একজন শাসক। ক্রুসেডারদের বিষয়ে অনেকটা নমনীয় ছিলেন। ইমাদুদ্দিন জিনকির সঙ্গে জোটবদ্ধ যেমন হয়েছেন, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছেন।

রুকনুদ্দৌলা দাউদ : সুকমানের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর হাসানকেইফের প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। চরিত্রের দিক থেকে অনেকটা চাচাতো ভাই হুসামুদ্দিন তামারতাশের মতোই।

কারবুগা : মসুলের প্রশাসক। সুলতান বারকিয়ারুকের নির্দেশে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে এন্টিয়ক অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। মৃত্যুবরণ করেন ৪৯৫ হিজরি সনে (১১০২ খ্রিষ্টাব্দে)। ইমাদুদ্দিন জিনকি শৈশবে তার তত্ত্বাবধান লাভ করেছেন।

জাকারমিশ : কারবুগা-পরবর্তী মসুলের প্রশাসক। বালিখের যুদ্ধসহ ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযানে অংশ নিয়েছেন। ৫০০ হিজরি

সনে (১১০৬ খ্রিষ্টাব্দে) বরখাস্ত হন। ইমাদুদ্দিন জিনকি শৈশবে তার তত্ত্বাবধানও লাভ করেছেন।

মওদুদ বিন তুনতেকিন : জাকারমিশ বরখাস্ত হওয়ার কিছুদিন পর মসুলের প্রশাসনিক দায়িত্ব লাভ করেন। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী লড়াইয়ে প্রথম পরিপূর্ণ নেতা। ইন্তেকাল করেন ৫০৭ হিজরি সনে (১১১৩ খ্রিষ্টাব্দে)।

আক সুনকুর আল-বুরসুকি : মওদুদ-পরবর্তী মসুলের প্রশাসক। আরেক মহান মুজাহিদ নেতা। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযান পরিচালনা করেন। ৫২০ হিজরি সনে (১১২৬ খ্রিষ্টাব্দে) শিয়া গুপ্তঘাতকদের হাতে নিহত হন।

কাসিমুদ্দৌলা হাজিব আক সুনকুর : ইমাদুদ্দিন জিনকির পিতা। আলেপ্পোর প্রশাসক ছিলেন। ক্রুসেড-যুগ পাননি। ৪৮৭ হিজরি সনে (১০৯৪ খ্রিষ্টাব্দে) তুতুশের হাতে নিহত হন।

দুবাইস বিন সাদাকা : আরব গোত্র বনু মাজিদের নেতা। বিভিন্ন সময় ক্রুসেডারদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। শেষ জীবনে তিনি ইমাদুদ্দিন জিনকিকে সুলতান মাসউদের ষড়যন্ত্রের বিষয়ে অবহিত করে হত্যাপ্রচেষ্টা হতে রক্ষা করেন। এ কারণেই সুলতান মাসউদ তাকে হত্যা করেন।

নাসিরুদ্দিন জাকার : মসুলে ইমাদুদ্দিন জিনকি কর্তৃক নিযুক্ত প্রশাসক।

সালাহুদ্দিন মুহাম্মাদ ইয়াগিসিয়ানি : ইমাদুদ্দিন জিনকির প্রধান সেনাপতি।

কাজি বাহাউদ্দিন শাহরাযুরি : ইমাদুদ্দিন জিনকির রাজ্যের প্রধান কাজি।

সিওয়ার বিন আবতেকিন : প্রথমে দামেশকের একজন সাধারণ সেনাপতি ছিলেন। সেখান থেকে পালিয়ে এলে ইমাদুদ্দিন জিনকি তাকে কাছে টেনে নেন এবং আলেপ্পোর প্রশাসক নিযুক্ত করেন। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযানে তিনি অনন্যসাধারণ অবদান রেখেছেন।

* * *

ক্রুসেড শিবির

২য় আরবান (Pope Urban II) : রোমান ক্যাথলিক পোপ। কয়েক শতাব্দী ব্যাপ্ত ক্রুসেড আগ্রাসনের স্বপ্নদ্রষ্টা ও প্রথম ক্রুসেড অভিযানের মূল সমন্বয়ক। প্রথম ক্রুসেডের শেষ সময়ে ৪৯২ হিজরি সনে (১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দে) রোমে মারা যান।

২য় পাসকাল (Pope Paschal II) : ২য় আরবানের পরবর্তী ক্যাথলিক পোপ। ইউরোপ থেকে দিক-নির্দেশনা প্রদান ও সামরিক সাহায্য প্রেরণের মাধ্যমে তিনি ইসলামি ভূখণ্ডে ক্রুসেড আগ্রাসন অব্যাহত রাখতে সহায়তা করেন। ৫১১ হিজরি সনে (১১১৮ খ্রিষ্টাব্দে) ইহধাম ত্যাগ করেন।

১ম অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোস (Alexios I Komnenos) : বাইজান্টাইন সম্রাট। প্রথম ক্রুসেড আগ্রাসনের অন্যতম নেপথ্য নায়ক। ক্রুসেডারদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেন। অবশ্য, তার মূল লক্ষ্য ছিল ইসলামি প্রাচ্য ভূখণ্ডে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের স্বার্থ বাস্তবায়ন। মৃত্যু ৫১২ হিজরি সনে (১১১৮ খ্রিষ্টাব্দে)।

২য় জন কমনিনোস (John II Komnenos) : ১ম অ্যালেক্সিয়াস কমনিনোসের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর তিনি বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের হাল ধরেন এবং পিতার মতোই ইসলামি প্রাচ্যে সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষায় কাজ করেন। অবশ্য ৫৩১ হিজরি ও ৫৩২ হিজরি সনে (১১৩৭ ও ১১৩৮ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি দু-বার ইসলামি ভূখণ্ডে সশরীরে অভিযান পরিচালনা করলেও উল্লেখযোগ্য কোনো সফলতা অর্জন করতে ব্যর্থ হন। মৃত্যু ৫৩৮ হিজরি সনে (১১৪৩ খ্রিষ্টাব্দে)।

ধর্মযাজক পিটার (Peter the Hermit) : প্রথম ক্রুসেড অভিযানের অন্যতম প্রচারক। সাধারণ জনগণ ও সন্ত্রাসী-অপরাধীদের নিয়ে তিনি একটি বাহিনী গঠন করে ক্রুসেড অভিযানে যোগ দেন।

ওয়ালটার (Walter the Penniless) : আরেক ধর্মযাজক ও ক্রুসেড অভিযানের প্রচারক। 'কাঙাল ওয়ালটার' নামে পরিচিত এই ধর্মযাজকও পিটারের ন্যায় সাধারণ জনগণের সমন্বয়ে একটি অনিয়মিত বাহিনী প্রস্তুত করে ক্রুসেড অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। অভিযানের শুরুতেই তিনি নিহত হন।

গডফ্রে ডি বোলোন (Godfrey de bouillon) : প্রথম ক্রুসেড অভিযানের অন্যতম সেনাপতি। ফরাসি নাগরিক গডফ্রে ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বাইতুল মুকাদ্দাস ক্রুসেড রাজ্যের প্রথম শাসক নির্বাচিত হন। মারা যান এর পরের বছরই ১১০০ খ্রিষ্টাব্দে (৫০৩ হিজরি সনে)।

১ম বল্ডউইন (Baldwin I) : গডফ্রের ভাই এবং প্রথম ক্রুসেডের আরেক গুরুত্বপূর্ণ সেনাপতি। ৪৯১ হিজরি সনে (১০৯৮ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে) তার হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম ক্রুসেড রাজ্য এডেসা। ১১০০ খ্রিষ্টাব্দে ভাই গডফ্রের মৃত্যুর পর তিনি এডেসা রাজ্যের দায়িত্ব ছেড়ে বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার হাত ধরে রাজ্যটি তার বিস্তৃতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌছায়। ৫১১ হিজরি সনে (১১১৮ খ্রিষ্টাব্দে) মিশর অভিযান থেকে ফেরার পথে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি এডেসা শাসন করেন দু বছর আর বাইতুল মুকাদ্দাস শাসন করেন আঠারো বছর।

বল্ডউইন ডি বুর্গ (Baldwin of Bourg) বা ২য় বল্ডউইন : ১ম বল্ডউইনের চাচাতো ভাই এবং প্রথম ক্রুসেড অভিযানের সক্রিয় সেনাপতি। ১১০০ খ্রিষ্টাব্দে ১ম বল্ডউইন এডেসা ছেড়ে বাইতুল মুকাদ্দাস চলে যাওয়ার সময় তাকে এডেসা রাজ্যের দায়িত্ব দিয়ে যান। ১১০৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মুসলমানদের হাতে বন্দি হলেও ৫০২ হিজরি সনে (১১০৮ খ্রিষ্টাব্দে) মুক্তিলাভ করেন এবং এডেসা রাজ্যের অন্তর্বর্তীকালীন শাসক টেনক্রেডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এডেসায় নিজের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। ১১১৮ খ্রিষ্টাব্দে ১ম বল্ডউইন মারা গেলে তিনি নির্বাচিত হন বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের তৃতীয় শাসক। দীর্ঘ সময় তিনি এন্টিয়ক রাজ্যের তত্ত্বাবধায়কও ছিলেন। মারা যান ৫২৫ হিজরি সনে (১১৩১ খ্রিষ্টাব্দে)। অর্থাৎ তিনি আঠারো বছর ছিলেন এডেসা রাজ্যের শাসক আর তেরো বছর বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের শাসক।

ফাল্ক অ্যাঞ্জো (Fulk the Younger) : ২য় বল্ডউইনের জামাতা এবং বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের চতুর্থ শাসক। তিনি ক্রুসেড অভিযানে শরিক ছিলেন না। ফ্রান্সের অ্যাঞ্জো অঞ্চলের কাউন্ট ফাল্ক ২য় বল্ডউইনের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের শাসনভার এবং এন্টিয়ক রাজ্যের তত্ত্বাবধান-দায়িত্ব লাভ করেন। মারা যান ৫৩৮ হিজরি সনে (১১৪৩ খ্রিষ্টাব্দে)।

৩য় বল্ডউইন (Baldwin III) : ফাল্ক অ্যাঞ্জোর পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর তিনি মাত্র তেরো বছর বয়সে বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের পঞ্চম শাসক নির্বাচিত হন।

জোসেলিন ডি কার্টেনি (Joscelin de Courtenay) : ২য় বল্ডউইনের ফুফাতো ভাই। প্রথমে ২য় বল্ডউইনের অধীনে এডেসা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত তিল-বাশির নগরীর প্রশাসক ছিলেন। ৫০৫ হিজরি সনে (১১১২ খ্রিষ্টাব্দে) ২য় বল্ডউইন তাকে বরখাস্ত করলে তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের শাসক ১ম বল্ডউইনের কাছে চলে যান এবং তাবারিয়া ও জালিল অঞ্চলের প্রশাসনিক দায়িত্ব লাভ করেন। পরবর্তীকালে ভাইয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়। ২য় বল্ডউইন ১১১৮ খ্রিষ্টাব্দে এডেসা ছেড়ে বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করার সময় তাকে এডেসা রাজ্যের শাসনভার প্রদান করে যান। এডেসা রাজ্যের তৃতীয় শাসক জোসেলিন তার ভাই ২য় বল্ডউইনের মতোই ৫২৫ হিজরি সনে (১১৩১ খ্রিষ্টাব্দে) মারা যান।

২য় জোসেলিন (Joscelin II of Edessa) : জোসেলিন ডি কার্টেনির পুত্র এবং এডেসা রাজ্যের চতুর্থ ও শেষ শাসক। পিতার মৃত্যুর পর এডেসা রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। তার শাসনামলেই ৫৩৯ হিজরি সনে (১১৪৪ খ্রিষ্টাব্দে) ইমাদুদ্দিন জিনকি রহ. এডেসা রাজ্যের পতন ঘটান।

১ম বোহেমন্ড (Bohemond I) : বিখ্যাত নরম্যান সেনাপতি রবার্ট গোয়েসকার্ডের পুত্র। প্রথম ক্রুসেড অভিযানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেনাপতি বোহেমন্ড ১০৯৮ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে ক্রুসেড রাজ্য এন্টিয়কের প্রথম শাসক নির্বাচিত হন। ১১০০ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে দানিশমান্দ

রাজ্যের শাসক গাজি বিন দানিশমান্দের হাতে বন্দি হলেও পরবর্তীকালে ১১০৩ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসের শুরুতে (৪৯৬ হিজরি সনে) মুক্তিলাভ করেন। বিভিন্ন দিক থেকে চাপের শিকার হয়ে ১১০৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এন্টিয়ক ছেড়ে ইউরোপে ফিরে যান এবং বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নেন। কিন্তু ৫০০ হিজরি সনে (১১০৭ খ্রিষ্টাব্দে) বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। কয়েক বছর পর ৫০৪ হিজরি সনে (১১১১ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি সিসিলি দ্বীপে ইহধাম ত্যাগ করেন।

টেনক্রেড (Tancred) : ১ম বোহেমন্ডের ভাগ্নে টেনক্রেড প্রথম ক্রুসেডের আরেক গুরুত্বপূর্ণ সেনাপতি। প্রথমে তিনি গডফ্রের শাসনাধীন বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের জালিল অঞ্চলের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। মামা বোহেমন্ডের বন্দিকালে (১১০১-১১০৩ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি এন্টিয়ক রাজ্যের অন্তর্বর্তীকালীন শাসকের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১১০৪ খ্রিষ্টাব্দে এডেসার শাসক ২য় বল্ডউইন বন্দি হলে তিনি পালন করেন এডেসা রাজ্যের অন্তর্বর্তীকালীন শাসকের দায়িত্ব। ১১০৪ খ্রিষ্টাব্দেই মামা বোহেমন্ড ইউরোপে চলে গেলে তিনি এন্টিয়ক রাজ্যের পূর্ণ শাসনভার লাভ করেন। ৫০২ হিজরি সনে (১১০৮ খ্রিষ্টাব্দে) ২য় বল্ডউইন মুক্তিলাভের পর তিনি তার কাছে এডেসার শাসনভার ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানালে বল্ডউইন যুদ্ধের মাধ্যমে নিজের অধিকার বুঝে নেন। দীর্ঘদিন এন্টিয়ক শাসনকারী টেনক্রেড রাজ্যটিকে একটি মজবুত স্থায়ী অবস্থানে পৌঁছাতে সক্ষম হন। ৫০৬ হিজরি সনে (১১১২ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

রজার সালের্নো (Roger of Salerno) : ২য় বল্ডউইনের ভগ্নিপতি, টেনক্রেডের চাচাতো ভাই রিচার্ড সালের্নোর পুত্র এবং এন্টিয়ক রাজ্যের তৃতীয় শাসক। টেনক্রেডের মৃত্যুর পর এন্টিয়ক রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি 'রজার অফ এন্টিয়ক' ও 'রজার অফ সিসিলি' নামেও পরিচিত। সাত বছর পর ৫১৩ হিজরি সনে (১১১৯ খ্রিষ্টাব্দে) বালাতের যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

২য় বোহেমন্ড (Bohemond II) : ১ম বোহেমন্ডের পুত্র ও ২য় বল্ডউইনের জামাতা। প্রথম জীবনে ইতালিতে ছিলেন। পরিণত বয়সে

উপনীত হওয়ার পর ৫২১ হিজরি সনে (১১২৭ খ্রিষ্টাব্দে) এন্টিয়কে এসে রাজ্যটির শাসনভার গ্রহণ করেন। রজারের মৃত্যুর পর থেকে ২য় বোহেমন্ডের আগমনের আগ পর্যন্ত (৫১৩-৫২১ হি./ ১১১৯-১১২৭ খ্রিষ্টাব্দ) বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের শাসক ২য় বল্ডউইনই এন্টিয়ক রাজ্যের দেখাশোনা করছিলেন। তিনি ১১৩০ খ্রিষ্টাব্দে আর্মেনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত হন।

রেমন্ড অফ পয়টিয়ার্স (Raymond of Poitiers) : ফরাসি যুবরাজ। ১১৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ২য় বোহেমন্ডের কন্যা কন্সটেন্সকে বিয়ে করে এন্টিয়কের শাসনভার গ্রহণ করেন। মাঝের ছয় বছর এন্টিয়ক কখনো বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজার তত্ত্বাবধানে ছিল, কখনো ছিল কন্সটেন্সের মা এলিসের শাসনাধীন। ১১৪৯ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রহ.-এর বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

৪র্থ রেমন্ড (Raymond IV) : প্রথম ক্রুসেড অভিযানের অন্যতম বর্ষীয়ান সেনাপতি। ফ্রান্সের তুলুজ ও প্রভিন্স অঞ্চলের কাউন্ট প্রচণ্ড মুসলিমবিদ্বেষী রেমন্ড ক্রুসেডের পূর্বে আন্দালুসেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। প্রথম ক্রুসেড অভিযানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এবং পরবর্তী সময়েও নিজের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠায় তিনি হন্যে হয়ে চেষ্টা চালিয়ে যান। স্বপ্নপূরণের একেবারে দোরগোড়ায় পৌঁছে ৪৯৮ হিজরি সনে (১১০৫ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি ত্রিপোলি অবরোধ চলাকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

উইলিয়াম জর্ডান (William Jordan) : ৪র্থ রেমন্ডের খালাতো ভাই ও তার প্রধান সহকারী। ভাইয়ের মৃত্যুর পর তিনি ত্রিপোলি অবরোধ অব্যাহত রাখেন। অবশ্য ৫০৩ হিজরি সনে (১১০৯ খ্রিষ্টাব্দে) যখন ত্রিপোলিতে ক্রুসেড রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তার পরিবর্তে রেমন্ড-পুত্র বারট্রাম রাজ্যটির শাসনভার গ্রহণ করেন আর তিনি লাভ করেন রাজ্যটির অন্তর্গত ইরকা ও তারতুস নগরীর শাসনভার। অবশ্য কিছুদিন পরই তিনি রহস্যজনকভাবে নিহত হন।

বারট্রাম (Bertram) : ৪র্থ রেমন্ডের পুত্র এবং ক্রুসেড রাজ্য ত্রিপোলির প্রথম শাসক। প্রথম জীবনে ফ্রান্সেই ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর ইসলামি

প্রাচ্যে আগমন করে ত্রিপোলি অবরোধে শরিক হন এবং নগরীটির পতন ঘটিয়ে সেখানে ক্রুসেড রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুবরণ করেন ৫০৬ হিজরি সনে (১১১৩ খ্রিষ্টাব্দে)।

পন্স (Pons) : বারট্রামের পুত্র ও ত্রিপোলি রাজ্যের দ্বিতীয় শাসক। পিতার মৃত্যুর পর ৫০৬ হিজরি সনে (১১১৩ খ্রিষ্টাব্দে) দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৫৩১ হিজরি সনে (১১৩৭ খ্রিষ্টাব্দে) দামেশকের একটি বিচ্ছিন্ন বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত হন।

২য় রেমন্ড (Raymond II) : পন্সের পুত্র ও ত্রিপোলি রাজ্যের তৃতীয় শাসক। ১১৫২ খ্রিষ্টাব্দে শিয়া বাতিনি গোষ্ঠীর হাতে নিহত হন।

অ্যাডমার ডি মনটেইল (Adhemar de Monteil) : ফ্রান্সের লি-পিউ অঞ্চলের গির্জাধ্যক্ষ এবং প্রথম ক্রুসেড অভিযানে পোপ ২য় আরবান কর্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধি। অভিযান চলাকালে এন্টিয়ক বিজয়ের কিছুদিন পর ১০৯৮ খ্রিষ্টাব্দের আগস্টে মারা যান।

আরনাল্ফ মালকোরন (Arnulf Malcorone) : বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের প্রথম গির্জাধ্যক্ষ। দায়িত্ব গ্রহণের কিছুদিন পরই বরখাস্ত হন। পরে অবশ্য নিজ দায়িত্ব ফিরে পান এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজা ১ম বল্ডউইনের সহায়তায় বিভিন্ন অন্যায়কর্ম সম্পাদন করেন। মারা যান ১১১৮ খ্রিষ্টাব্দে।

ডেমবার্ট : ইতালির পিসা অঞ্চলের গির্জাধ্যক্ষ। অ্যাডমারের মৃত্যুর পর পোপের প্রতিনিধি হিসেবে ইসলামি ভূখণ্ডে আগমন করেন। এর পূর্বে তিনি আন্দালুসেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজা গডফ্রের সহযোগিতায় আরনাল্ফের পরিবর্তে রাজ্যটির গির্জাধ্যক্ষের দায়িত্ব লাভ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে রাজ্যটির নতুন শাসক ১ম বল্ডউইনের ষড়যন্ত্রে তিনি বরখাস্ত হন।

অ্যাবরামার (Abramar) : পোপের পক্ষ থেকে ডেমবার্টের বিষয়ে তদন্ত করতে এসে তিনি ডেমবার্টকে বরখাস্ত করেন এবং নিজেই বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের গির্জাধ্যক্ষে পরিণত হন।

* * *

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. আল-কুরআনুল কারিম

২. তাওরাত ও ইঞ্জিল (বাইবেল আদিপুস্তক ও নতুন নিয়ম)

৩. হাদিস বিষয়ক গ্রন্থাবলি

- মুসনাদুত তায়ালিসি (مسند أبي داود الطيالسي) , সুলায়মান বিন আবু দাউদ আল-ফারিসি আত-তায়ালিসি (মৃত্যু ২০৪ হি.)।
- আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদিসি ওয়াল আসার (المصنف في الأحاديث والآثار), আবু বকর আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-কুফি ইবনে আবি শায়বা (মৃত্যু ২৩৫ হি.)।
- মুসনাদে আহমাদ (المسند), আহমাদ বিন হাম্বল আবু আবদুল্লাহ আশ-শায়বানি (মৃত্যু ২৪১ হি.)।
- সহিহ বুখারি (الجامع الصحيح المختصر), মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারি (মৃত্যু ২৫৬ হি.)।
- আল-আদাবুল মুফরাদ (الأدب المفرد), মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারি (মৃত্যু ২৫৬ হি.)।
- সহিহ মুসলিম (صحيح مسلم), মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান কুশায়রি (মৃত্যু ২৬১ হি.)।
- সুনানে ইবনে মাজা (سنن ابن ماجه), মুহাম্মাদ বিন ইয়াযিদ আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (মৃত্যু ২৭৩ হি.)।
- সুনানে আবু দাউদ (سنن أبي داود), সুলায়মান বিন আশআস আবু দাউদ সিজিস্তানি (মৃত্যু ২৭৫ হি.)।

- সুনানে তিরমিজি (الجامع الصحيح), মুহাম্মাদ বিন ঈসা আবু ঈসা তিরমিজি (মৃত্যু ২৭৯ হি.)।
- সুনানে দারিমি (سنن الداري) , আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আবু মুহাম্মাদ দারিমি (মৃত্যু ২৮০ হি.)।
- আস-সুনানুল কুবরা (سنن النسائي الكبرى), আহমাদ বিন শুআইব আবু আবদুর রহমান নাসায়ি (মৃত্যু ৩০৩ হি.)।
- আল-মুজতাবা মিনাস সুনান (المجتبى من السنن), আহমাদ বিন শুআইব আবু আবদুর রহমান নাসায়ি (মৃত্যু ৩০৩ হি.)।
- মুসনাদে আবি ইয়ালা (مسند أبي يعلى), আহমাদ বিন আলি ইবনুল মুছান্না আবু ইয়ালা (মৃত্যু ৩০৭ হি.)।
- সহিহ ইবনে খুযায়মা (صحيح ابن خزيمة) , মুহাম্মাদ বিন ইসহাক আবু বকর ইবনে খুযায়মা (মৃত্যু ৩১১ হি.)।
- সহিহ ইবনে হিব্বান (صحيح ابن حبان), মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আবু হাতিম আত-তামিমি ইবনে হিব্বান (মৃত্যু ৩৫৪ হি.)।
- আল-মুজামুল কাবির (المعجم الكبير), সুলায়মান বিন আহমাদ আবুল কাসিম তাবারানি (মৃত্যু ৩৬০ হি.)।
- আল-মুজামুল আওসাত (المعجم الأوسط), সুলায়মান বিন আহমাদ আবুল কাসিম তাবারানি (মৃত্যু ৩৬০ হি.)।
- সুনানে দারাকুতনি (سنن الدارقطني), আলি বিন উমর আবুল হাসান বাগদাদি দারাকুতনি (মৃত্যু ৩৮৫ হি.)।
- আল-মুসতাদ্‌রাক আলাস সহিহাইন (المستدرك على الصحيحين), মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আবু আবদুল্লাহ হাকিম (মৃত্যু ৪০৫ হি.)।
- হিলইয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء), আহমাদ বিন আবদুল্লাহ আবু নুআইম আল-ইসফাহানি (মৃত্যু ৪৩০ হি.)।

- আস-সুনানুল কুবরা (السنن الكبرى), আবু বকর আহমাদ বিন হুসাইন বায়হাকি (মৃত্যু ৪৫৮ হি.)।
- শুআ'বুল ঈমান (شعب الإيمان), আবু বকর আহমাদ বিন হুসাইন বায়হাকি (মৃত্যু ৪৫৮ হি.)।
- মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মামবাউল ফাওয়াইদ (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد), নুরুদ্দিন আলি বিন আবু বকর আল-হায়ছামি (মৃত্যু ৮০৭ হি.)।

৪. ইতিহাস ও জীবনী বিষয়ক গ্রন্থাবলি

- আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা (السيرة النبوية), আবু মুহাম্মাদ আবদুল মালিক ইবনে হিশাম (মৃত্যু ২১৮ হি.)।
- ফুতূহু মিসর ওয়া আখবারুহা (فتوح مصر وأخبارها), ইবনু আবদিল হাকাম (মৃত্যু ২৫৭ হি.)।
- তারীখুল হাম্‌লাতি ইলাল কুদস (تاريخ الحملة إلى القدس), ফুশিয়া আশ-শারতিরি (Fulcher of Chartres) (মৃত্যু ১১২৭ খ্রি.)। আরবি ভাষান্তর : যিয়াদ আল-আসালি। মূল গ্রন্থের নাম A history of the expedition to Jerusalem।
- যায়লু তারীখি দিমাশক (ذيل تاريخ دمشق), আবু ইয়ালা হামযা ইবনুল কালানিসি (মৃত্যু ৫৫৫ হি.)।
- তারীখুল উযায়মি (تاريخ العظيمي), মুহাম্মাদ বিন আলি তানুখি আল-হালাবি (মৃত্যু ৫৫৬ হি.)।
- তারীখু ইবনিল আযরাক আল-ফারিকি (تاريخ ابن الأزرق الفارقي), আহমাদ বিন ইউসুফ আল-আযরাক আল-ফারিকি (মৃত্যু ৫৭১ হি.)।
- তারীখুল আ'মালিল মুনজিযাহ ফী-মা ওয়ারাআল বিহার (تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار), উইলিয়াম সুরি (William of Tyre) (মৃত্যু ১১৮৬ খ্রি.)। আরবি ভাষান্তর : সুহাইল যাক্কার। ইংরেজি

গ্রন্থের নাম A History of Deeds done beyond the see।

- আল-ই'তিবার (الاعتبار), উসামা বিন মুনকিয (মৃত্যু ৫৮৪ হি.)।
- আল-মুনতাযাম ফি তারীখিল মুলুকি ওয়াল উমাম (المنتظم في تاريخ الملوك والأمم), আবদুর রহমান বিন আলি আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযি (মৃত্যু ৫৯৭ হি.)।
- তারীখু দাওলাতি আলি সালজুক (تاريخ دولة آل سلجوق), ইমাদুদ্দিন ইসফাহানি (মৃত্যু ৫৯৭ হি.)।
- মুজামুল বুলদান (معجم البلدان), শিহাবুদ্দিন আবু আবদুল্লাহ ইয়াকুত আল-হামাবি (মৃত্যু ৬২৬ হি.)।
- আল-কামিল ফিত তারীখ (الكامل في التاريخ), আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির (মৃত্যু ৬৩০ হি.)।
- আল-বাহির ফি তারীখিত দাওলাতিল আতাবিকিয়াহ বিল মাওসিল (الباهر في تاريخ الدولة الأتابكية بالموصل), আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির (মৃত্যু ৬৩০ হি.)।
- তারীখু দাওলাতি আলি সালজুক (تاريخ دولة آل سلجوق), আল-ফাতহ বিন আলি বিন মুহাম্মাদ আল-বুনদারি (মৃত্যু ৬৪৩ হি.)।
- মিরআতুয যামান ফী তাওয়ারীখিল আ'য়ান (مرآة الزمان في تواريخ الأعيان), সিবতু ইবনিল জাওযি (মৃত্যু ৬৫৪ হি.)।
- যুবদাতুল হালাব ফি তারীখি হালাব (زبدة الحلب في تاريخ حلب), কামালুদ্দিন উমর বিন আহমাদ ইবনুল আদিম (মৃত্যু ৬৬০ হি.)।
- বুগইয়াতুত তলব ফি তারীখি হালাব (بغية الطلب في تاريخ حلب), কামালুদ্দিন উমর বিন আহমাদ ইবনুল আদিম (মৃত্যু ৬৬০ হি.)।
- আর-রাওযাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন আন-নুরিয়া ওয়াস-সালাহিয়া (الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية), শিহাবুদ্দিন আবুল কাসিম আবু শামা আল-মাকদিসি (মৃত্যু ৬৬৫ হি.)।

- ওয়াফাইয়াতুল আ'য়ান ওয়া আমবাউ আবনাইয যামান (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان), আবুল আব্বাস আহমাদ বিন মুহাম্মাদ ইবনে খাল্লিকান (মৃত্যু ৬৮১ হি.)।
- তারীখুয যামান (تاريخ الزمان), ইবনুল ইবরি (Gregory Bar-Hebraeus) (মৃত্যু ১২৮৬ খ্রি.)।
- তারীখু মুখতাসারিদ-দুওয়াল (تاريخ مختصر الدول), ইবনুল ইবরি (Gregory Bar-Hebraeus) (মৃত্যু ১২৮৬ খ্রি.)।
- আলবায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুসি ওয়াল মাগরিব (البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب), ইবনে ইযারি (মৃত্যু ৬৯৫ হি.)।
- মুফাররিজুল কুরূব ফি আখবারি বনি আইয়ুব (مفرج الكروب في أخبار بني أيوب), জামালুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন সালিম ইবনে ওয়াসিল (মৃত্যু ৬৯৭ হি.)।
- আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার (المختصر في أخبار البشر), ইমাদুদ্দিন ইসমাইল বিন মুহাম্মাদ আবুল ফিদা (মৃত্যু ৭৩২ হি.)।
- নিহায়াতুল আরাব ফী ফুনূনিল আদাব (نهاية الأرب في فنون الأدب), শিহাবুদ্দিন আহমাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নুওয়াইরি (মৃত্যু ৭৩৩ হি.)।
- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (سير أعلام النبلاء), শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ যাহাবি (মৃত্যু ৭৪৮ হি.)।
- আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (البداية والنهاية), আবুল ফিদা ইসমাইল বিন উমর ইবনে কাছির দিমাশকি (মৃত্যু ৭৭৪ হি.)।
- ইত্তিআ'জুল হুনাফা বি-আখবারিল আইম্মাতিল ফাতিমিয়ীনাল খুলাফা (اتعاظ الحنفا في أخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء), তাকিউদ্দিন আহমাদ বিন আলি আল-মাকরিজি (মৃত্যু ৮৪৫ হি.)।
- আল-ইবার ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল খবার (العبر وديوان

(المبتدأ والخبر), আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ ইবনে খালদুন (মৃত্যু ৮০৮ হি.)।

- আল-ইসাবা ফি তাময়ীযিস সাহাবা (الإصابة في تمييز الصحابة), ইবনে হাজার আসকালানি (মৃত্যু ৮৫২ হি.)।
- আন-নুজুমুয যাহিরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরা (النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة), জামালুদ্দিন ইউসুফ বিন তাগরি বারদি আবুল মাহাসিন (মৃত্যু ৮৭৪ হি.)।
- মুজামুল আনসাব ওয়াল উসুরাতিল হাকিমা ফিত-তারীখিল ইসলামি (معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي), যামবাউর (Eduard von Zambaur) (মৃত্যু ১৯৪৭ খ্রি.)। আরবি ভাষান্তর : যাকি মুহাম্মাদ হাসান।
- তারীখুল ইসলামিস সিয়াসি (تاريخ الإسلام السياسي), হাসান ইবরাহিম হাসান (মৃত্যু ১৯৬৮ খ্রি.)।
- কিসসাতুল হাযারাহ (قصة الحضارة), উইলিয়াম দুরান্ত (মৃত্যু ১৯৮১ খ্রি.)। আরবি ভাষান্তর : মুহাম্মাদ বাদরান ও ড. আবদুল হামিদ ইউনুস। মূল গ্রন্থের নাম The Story of Civilization।
- দুখুলুত তুরকিল গায ইলাশ শাম (تاريخ الترك الغز إلى الشام), মুসতফা শাকির (মৃত্যু ১৯৯৭ খ্রি.)।
- আল-ফারুক আল-কায়িদ (الفاروق القائد), মাহমুদ শিত খাত্তাব (মৃত্যু ১৪১৯ হি.)।
- তারীখুল হুরূবিস সালীবিয়্যাহ (تاريخ الحروب الصليبية), স্টিফেন রানচিমান (Steven Runciman), (মৃত্যু ২০০০ খ্রি.)। আরবি ভাষান্তর : আস-সাইয়িদ আল-বায উরায়নি। মূল গ্রন্থের নাম A Hist. of the Crusades।
- আত-তারীখুল ওয়াসিত কিসসাতুল হাযারা : আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (التاريخ الوسيط : قصة الحضارة-البداية والنهاية), নরম্যান ফ্র্যাঙ্ক

ক্যান্টোর (Norman Frank Cantor) (মৃত্যু ২০০৪ খ্রি.)। আরবি ভাষান্তর : কাসিম আবদুহু কাসিম। মূল গ্রন্থের নাম Medieval history : the life and death of a civilization।

- আল-হারাকাতুস সালিবিয়্যাহ সফহাতুন মুশাররাকাতুন ফি তারীখিল জিহাদিল ইসলামি ফিল উসুরিল উসতা (الحركة الصليبية صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد الإسلامي في العصور الوسطى), সাইদ আশুর আবুল ফাত্তাহ (মৃত্যু ২০০৯ খ্রি.)।
- উরুব্বা ফিল উসুরিল উসতা (أوربا في العصور الوسطى), সাইদ আশুর আবুল ফাত্তাহ (মৃত্যু ২০০৯ খ্রি.)।
- মাদখালুন ইলা তারীখিল হুরূবিস-সালিবিয়্যাহ (مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية), সুহাইল যাক্কার (মৃত্যু ২০২০ হি.)।
- আখবারুদ দাওলাতিস সালজুকিয়াহ (أخبار الدولة السلجوقية), সদরুদ্দিন আবুল হাসান আলি ইবনুন নাসির।
- আল-আকরাদ তারীখু শা'ব ওয়া কাযিয়াতু ওয়াতান (الأكراد تاريخ شعب وقضية وطن), আহমাদ তাজুদ্দিন।
- কিয়ামু দাওলাতিল মুরাবিতীন (قيام دولة المرابطين), ড. হাসান আহমাদ মাহমুদ। মুহাযারাতুন ফি মাআলিমিত তারীখিল ইসলামিল ওয়াসিত (محاضرات في معالم التاريخ الإسلامي الوسيط), সাইদ মাহমুদ ইমরান।
- আল-হুরূবুস সালিবিয়্যাহ ওয়াল উসরাতুয যিনকিয়্যাহ (الحروب الصليبية والأسرة الزنكية), শাকির আহমাদ আবু যায়দ।
- তারীখু সালাজিকাতির রূম ফী আসিয়াস সুগরা (تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى), মুহাম্মাদ সুহাইল তাকূশ।
- তারীখুস সালাজিকা ফি বিলাদিশ শাম (تاريخ السلاجقة في بلاد الشام), মুহাম্মাদ সুহাইল তাকূশ।
- তারীখুয-যিনকিয়্যীন ফিল-মাওসিলি ওয়া বিলাদিশ-শাম (تاريخ

(الزنكيين في الموصل وبلاد الشام), মুহাম্মাদ সুহাইল তাকুশ।

- আত-তারীখুল-ইসলামিল ওয়াজিয (التاريخ الإسلامي الوجيز), মুহাম্মাদ সুহাইল তাকুশ।
- আল-ইমারাতুল উরতুকিয়্যাহ ফিল জাযিরাতি ওয়াশ শাম (الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام), ইমাদুদ্দিন খলিল।
- ইমাদুদ্দিন জিনকি (عماد الدين زنكي), ইমাদুদ্দিন খলিল।
- আল-হুরূবুস সালিবিয়্যাতিল উলা নুসুসুন ওয়া ওয়াসাইকু তারীখিয়্যাতুন (الحروب الصليبية الأولى نصوص ووثائق تاريخية), কাসিম আবদুহু কাসিম।
- আল-খালফিয়্যাতুল আইদিয়ুলুজিয়্যাহ লিল হুরূবিস সালিবিয়্যাহ (الخلفية الأيديولوجية للحروب الصليبية), কাসিম আবদুহু কাসিম।
- মাহিয়াতুল হুরূবিস সালিবিয়্যাহ (ماهية الحروب الصليبية), কাসিম আবদুহু কাসিম।
- আ'মালুল ফারানজা ওয়া হুজ্জাজি বাইতিল মাকদিস (أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس), লেখক অজ্ঞাত, আরবি ভাষান্তর : হাসান হাবাশি।

৫. অন্য ভাষার গ্রন্থাবলি

- Albert d'Aix p: Liber christianne Expedition pro Eroptione, Emundetione et Restione Sameta Hierosoluritanae Ecclesia. In: Recueil des Historiens des. Croisades (Paris 1841-1966) (E. H. C) occ vol IV
- Anna Comnena: The Alexiade. Trans. by Eliyabeth A. S Dawes. (London 1928).
- AOL: Archives de l'Orent Latin, 2 toms. (eds. P. Riant et H. Ha-genmeyer) (Paris 1884).
- Archer (T.) Kinigsford (C.) : The Crudades, (London. 1894)

- Baludric of Dol: Historia Jerosolimitana, RHC., Oc., IV, (Paris 1879).
- Barraclough The Medival Papacy.
- Benjamin W. Wheeler : The Reconquest of Spain befor 1095.
- Besant (W.) & Palmer (E.H.): Jerusalem, The City of Herod and Saladin, (London 1899).
- Bishop, M., The Penguin Book of the Middle Ages, (London, 1971
- Boase, Kingdoms and Strongholds of the Crusaders, (London, 1971)
- Boissonade: Life and Work in Med Europe, London, 1937
- Bradford, The Sword and the Scimitar _ the Sage of theCrusades, (London, 1971).
- (Brehier (L.) : Vie et Mort de Byzance, (Paris, 1947
- Brown, Edward Gran ville: Cambridge Medievel History, vols: IV, V.
- Cahen: La Syrie du Nord a I' Epoque des Croisades. (Paris, 1940).
- Cambridge History of Byzantine Empire.
- Chalandon, Ferdinande: Essai Sur la' Regan d'Alexis Comnene, Paris, 1913.
- Chronique de Michel le Syriens: editee et traduite en Francais Par J.B. Chabot, T.III, Farscicule, II, Paris 1908.
- Commeroratorium of the Churches of Jerusalem, in: Palestine Pilgrims
- Delaville Le Roulx (G): Les Hospitallers.en Terre Saint et en Chypre, (Paris, 1904).

- Duncalf,, F: The First Crusade, Clermont to Contantiople, in Setton (ed.,), History of the crusades, Vol. I, pp. 253-279. (PhiladelPhia 1953).
- Ekkhrad of Aura: Hierosolymitana, RHC., Oc.V, (Paris 1886).
- Elisseff, N: Nur AD- Din, Un Grand Prince MUsulman de Syrie Au temps Croisdes, Damas 1967.
- Ephraim Emerton, The correspondence of Pope Gregory VII. Selected letters from the Registum, (New York, 1932).
- Fulcher of Chartres: A history of the expedition to Jerusalem, (ed. H. Fink) (Knox ville 1969).
- Gesta Fancorum et aliorum Hierolymintonrum (ed. And transl. by Rosalibd M. Hill, London, 1962)
- Grousset, R: Histoire des Croisades etdu Royaume France de Jerusalem, (Paris, 1935)
- Guibert of Nogent: Historia quae Diciture Gesta Dei Per Francos, RHC, Oc. IV, (Paris, 1866)
- Hagenmeyer (H.) : Chronologie du Royaume de Jerusalem, Paris, 1901.
- Hagenmeyer (H.): Chronologi de la Premiere Croisade, Paris, 1902.
- Hans E. Mayer: The Crusades, (transl. from German by: John Gilling-ham)(Oxford 1972)
- (Heyd (W.): Hist. du Commerce du Levant, 2 vola, (Leipzig, 1936
- Histoire de la Premiere Croisade, 3 tons (Paris, 1925)
- Hoyt and Chodorow: Europ in the Middle Ages.
- Iorga : Hist. des Croisades, (Paris , 1924)
- Ivanow: An Islamic Ode in Praise of Fidawis.

- John Wilkinson(ed.), Jerusalem Pilgrims before the Crusades, (England, 1977)
- King (E.J): the Kinghts Hospitallers In the Holy land, (London, 1931).
- Iorga: L'Armenie Cilicienne.
- Marc Bloch: feudal Socity,(ChIcgo, 1961).
- Chronique,in R. H. C. Arm Doc vol, I.: Matthieu d'Edesse
- Maurice Keen, The Pelican History of the Middle Agws, (Penguin, 1971).
- Mayer, The Crusades, (transl. by Gillingham, Oxford, 1972).
- Michaud : Hist. des Croisades (5 Vols) (Paris, 1817-1822).
- Michel Le Syrien Chronique. Edited J. B. Chabort. (Bruxelles 1899-1910).
- Morco Polo: Travels, (London, 1903).
- Munro (D.C.): The Speech of Pope Urban II at Clemont, A.H.R., Vol II, 1905.
- Nerses, Shnorhali: Sur la Prise d'Edesse, in: R. H. C. Doc Armenienne vol I.
- Oman (C. W): A Hist. of the Art of War in the Middile Ages (2 Vols) (London 1925)
- Ostrogorsky (G.) : Hist, of the Byzantine State. (Oxford, 1956).
- (Painter S., A history of the middle ages (Enland1955
- Pianter: westem Europ on the eve of the Crussades, in Setton (ed), A History of the Crussades, (The University of Wisconsin Press, 1969).
- Raoul de combria, transl, J. Crossland (London, 1926).

- Raymond of Agiles: Historia Francorum quiceperunt Jerusalem, RGC, Oc III. (Paris 1866).
- Robert S. Hoyt and Stanley Chodorow. Europe in the middle Ages, (3rd ed., U.S.A. 1976).
- Robert the Monk : Historia Hieroso Lymitana. In R. H. C. occ. (3 vols
- Runciman (S): A Hist. of the Crusades (3 vols), (Cambridge. 1957
- Schlumberger: Un EMpereur Byzantin au Dixieme Sieclm, Nice-phore phocas, Paris, 1890.
- Schomberger (G): Racit de Byzance et des Croisades. (2 vols). (Paris, 1917-22)
- Setton (K. M.): A history of Crusades, (5 vols). (Penslvania, 1958-1985)
- Stevenson: The Crusaders in the East. (Cambridge, 1907).
- The Cambridge Medieval. History (Camb, Univ, Uress 1966)
- Thompson Economic and Social Hist. of the Middle Ages. (2 vols-london, 1959)
- Tranlatio Sancti Nicolai Veoetian (Hist Occid, Tome V).
- Vasiliev: A History of the Byzantine Empire. (Madison 1928-1973
- William of Tyre, A History of Deeds done beyond the see, (transl. by: E. A. Babcock and A.C. Krey) (New York 1943-1947).

-দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত-

‘ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস’-এর কিছু শিক্ষা

- প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের ইতিহাস জানি না!
- পারস্পরিক সংঘাত একটি বিশ্বজনীন রীতি!
- আমাদের পরাজয় প্রতিপক্ষের শক্তির কারণে নয়; নিজেদের দুর্বলতার কারণে!
- বিজয় নিশ্চিত করার জন্য ঐক্য জরুরি!
- আদর্শ নমুনা ব্যতীত পরিবর্তন ও সংস্কারের আশা নেই!
- পরিবর্তন ও সংস্কারের চাবিকাঠি উলামায়ে কেরামের হাতে!
- সুপরিণতি কেবল ঈমানদার-মুত্তাকিদের ভাগ্যে জোটে!
- সংস্কারকদের জীবনযাত্রা সাধারণ দায়িত্বশীলদের তুলনায় অনেক ব্যতিক্রম!
- সংস্কারকগণের মৃত্যুতে ইসলামের ঝান্ডা অবনমিত হয় না!

—ড. রাগিব সারজানি

ISBN
B0062
9 789848 012536

মাকতাবাতুল হাসান